অতুলচন্দ্র গুপ্ত

রচনাসংগ্রহ

রচনাসংগ্রহ

রচনাসংগ্রহ
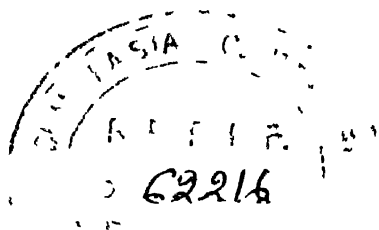
অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ভূমিকা

যাঁর লেখায় এই বই সমৃদ্ধ, তাঁর সম্বন্ধে লেখা সহজ নয়। সহজাত সফল বহুমুখী প্রতিভার বর্ণনা কেবল ওই ক্ষমতার অধিকারীই করতে পারেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত পেশায় ছিলেন আইনজ্ঞ, কিন্তু শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সফল এবং অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ইচ্ছে করলেই জীবিকা পরিবর্তন করতে পারতেন। অল্পবয়সে কিছুদিন রংপুরে ন্যাশনাল স্কুলে পড়িয়েছিলেন, পরে ল কলেজে। আমাকে একবার বলেছিলেন পড়ানোর কাজ নেওয়াই উচিত ছিল, আইন অত আনন্দের নয়।

সপরিবারে দেশভ্রমণের শখ ছিল। আমাকে স্কুলের বইপত্র নিয়ে যেতে হত— প্রায়শই ইংরেজি কবিতা পড়াতেন। এখনও মনে আছে পুরীর সমুদ্রসৈকতের সামনে হোটেলের চওড়া বারান্দায় আমাকে পড়াচ্ছেন। ছোটদের মনঃসংযোগের ক্ষমতা থাকে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। রীতি অনুসারে ঘণ্টাখানেক পরে ছুটি পেলাম। একপাক ঘুরে এসে দেখি পাশের ঘরের ভদ্রলোক যিনি বারান্দায় একটু দূরে বসেছিলেন, আনন্দবিভাসিত মুখে পাশের চেয়ারে বসে আছেন। কথাবার্তা যা কানে এল তাতে বুঝলাম তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। কবিতা পড়ানোর ধরন শুনে আমাব অন্তর্ধানের পর কথা বলতে উঠে এসেছেন। এই দৃশ্য আমি বহুবার দেখেছি।

কবিতা পড়ানো মানে যে কাব্যজিজ্ঞাসা তা নয়। রসের সন্ধানপথ অতি সহজে দিতে পারতেন। পুজোর ছুটিতে মধুপুরে বাড়ির পিছনের বারান্দায় সন্ধ্যার পর কাঠের টেবিলে মোমবাতি জ্বেলে আমাকে পড়াচ্ছেন। পাঠ্যবই থেকে Abou Ben Adhem। আরম্ভ করার আগে বলেছিলাম এই কবিতায় বিশেষ ছন্দ নেই, পড়তে ভাল লাগে না। শুনে হেসেছিলেন। আধঘণ্টা পড়িয়ে বলেছিলেন এইবার বুঝতে পারছিস তো কবিতাটা ভাল, আর ভাল কবিতার ধরন কী। চোদ্দো বছরের বালকের পক্ষে সেদিন স্বীকার করতে অসুবিধা হয়নি, কবিতাটা পাল্টে গেছে।

অসাধারণ মনঃসংযোগের ক্ষমতা ছিল। যা পড়তেন, সঙ্গে থাকত। আরেকবার পুজোর ছুটিতে জামসেদপুর গিয়েছি। সকালে চা খাওয়ার পর বারান্দায় বসে লিখতেন। সেই লেখা অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতার জন্য— পরে প্রকাশিত 'ইতিহাসের মুক্তি'র প্রথম দুই প্রবন্ধ। এইখানেই আছে। প্রথম খসড়া শীতের রৌদ্রে বারান্দায় বসে সামনের দলমা পাহাড়ের দিকে না চেয়ে ভাঁজ করা ফুলস্কেপ কাগজে কোনও বইপত্রের সাহায্য ছাড়া লেখা।

যখন থেকে তাঁর কথা আমি মনে করতে পারি, তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট পেরিয়েছে।

কোনও সফল আইনব্যবসায়ীর পক্ষে এত বিভিন্ন বিষয় চর্চার সময় পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। কিন্তু সময়ের উপরে তাঁর অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত বারান্দায় বসে আলোচনায় যোগ দিতেন। ঠিক সাড়ে ছ'টা বাজলেই কাজের ঘরে গিয়ে বসতেন। মনকে অবলীলাক্রমে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত করতে অসুবিধা হত না। একমাত্র ব্যতিক্রম শুক্রবার সন্ধ্যায়। তখন তাঁর বন্ধু মিষ্টভাষী সৌম্যদর্শন কুশীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আসতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর নীচের বারান্দায় দুইজনের আলাপ চলত। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর সেই সময়ের বর্ণনা বুদ্ধদেব বসু করেছেন।

স্মৃতিশক্তি এবং মনঃসংযোগের অনেক গল্প আমি কলকাতা হাইকোর্টের অন্যান্য আইনজ্ঞদের কাছে শুনেছি। আমি শুধু জানি বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের কী তাঁর স্মরণে থাকত না, বলা দুঃসাধ্য। 'নদীপথে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোচ্ছে। আমি অর্বাচীন স্কুল-বালকের মতো বলেছিলাম 'গতায়াত' লিখেছ কেন? ওটা কি প্রকৃত বাংলা— 'যাতায়াত' লিখলেই তো পারতে। তৎক্ষণাৎ ভারতচন্দ্র থেকে উদ্ধৃতি— ভারতচন্দ্র খাঁটি বাঙালি কবি। প্রমাণ করার উপায় নেই, কিন্তু এখন আমার দৃঢ় ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মনে কোথাও-না-কোথাও স্তরে স্তরে সাজানো থাকত। ইচ্ছে করলেই অল্প প্রচলিত কবিতা স্মরণ করতে পারতেন।

অতি সহজভাবে অন্তঃসলিলা পরিহাসের সঙ্গে গম্ভীর বিষয়ের অসাধারণ আলোচনা করতে পারতেন। প্রায় সব বিষয়ের লোকের সঙ্গেই। আমার জন্ম সবুজ পত্রের দলের বহু পরে, কিন্তু তাঁর বন্ধুদের কাউকে কাউকে দেখেছি। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আসতেন, পিছনের বসবার ঘরে পাঞ্জাবি খুলে ফেলে সোফার উপরে পা মুড়ে বসে আলোচনায় যোগ দিতেন। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তাঁকে বলা হল আইনস্টাইনের সম্বন্ধে কিছু বলতে। বাড়ির উঠোনে গোল করে বেতের চেয়ার পাতা হল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঘণ্টাখানেক স্মৃতিচারণা করলেন। খুব সহজ করে বলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে হতে লাগল তিনি তাঁর বন্ধুর উদ্দেশেই বলছেন। আমরা কেবল চেয়ার অধিকার করে বসে আছি, ওই স্তরের সভ্য আলোচনায় অংশগ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যিক আলোচনা যে কী পর্যায়ে পৌঁছত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখায় তার বর্ণনা রয়েছে। শ্বেতশুভ্র সন্দেশ এবং বৃহৎ আকারের রসের মিষ্টান্ন সেই আলোচনার মধ্যে নিয়মিত দেখা দিত।

আমাকে তাঁর কলেজ জীবনের কাহিনি বলতেন। হ্যারিসন রোড এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে একটি মেসবাড়িতে থেকে প্রেসিডেন্সিতে পড়াশোনা করেছিলেন। যে মেসে অনেকেই ব্যবহারে না হোন, পরিচয়ে ছাত্র ছিলেন। বলতেন ঘরে প্রচণ্ড হই-চই-র মধ্যে বসে পড়াশোনা করতে হত, মনঃসংযোগের ক্ষমতা ওইখান থেকেই। বলা বাহুল্য যে সে মেসের সকলেরই পরীক্ষায় ফল শুভ হত না, তবে প্রতিকারের চেষ্টা হত। ডাক্তারি ছাত্ররা খাওয়ার উন্নতি বিধান করতেন। একবার সরস্বতী পূজার প্রয়োজন বোধ করা হল। যে পুরোহিতকে ধরে আনা হল, তিনি বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ বলে প্রস্থান করলেন, পরীক্ষার ফল একইরকম রয়ে গেল। এই গল্প বলে অত্যন্ত আনন্দ পেতেন।

অবশ্য তাঁর সময়ের প্রেসিডেন্সি কলেজের কাহিনিও শুনেছি। একদিন সকালে কলেজে

দেখেন তাঁর উপরের ক্লাসের হিন্দু হস্টেল নিবাসী একজন সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন, পিছনে হস্টেলের চাকর খাবারের থালা হাতে। কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রিন্সিপাল সাহেবকে দেখাতে যাচ্ছেন। সাহেব একটা মাছভাজা খেয়ে ফেললেন, বললেন Not bad, properly roasted। তারপর বিজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপককে ডেকে অনুসন্ধানের ভার দিলেন। অনুসন্ধানের ফলে খাওয়ার উন্নতি হল, কিন্তু যাঁকে ভার দেওয়া হয়েছিল তিনি উৎসাহিত হয়ে গবেষণায় রত হলেন। প্রকাশ্য জনসভায় বাঙালির খাদ্য বিষয়ে বক্তৃতা হল— যার নাম দেওয়া হয়েছিল: A plea for a rational diet। সেটা ছাপা হল A plea for a national diet। বক্তা বললেন এইটেই ঠিক নামকরণ হয়েছে। বাঙালিছাত্রের ডালের বাটিতে চুমুক দেওয়া উচিত, এই ধরনের স্লোগান তৈরি হল। সেই সময়ের কলেজজীবনের কিছু আভাস তাঁর রবীন্দ্রনাথের উপরে বিভিন্ন লেখায় ছড়িয়ে আছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রীতি অনুসারে কৃতী ছাত্র ছিলেন। দর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার মিটিং-প্রত্যাগত অধ্যাপকের মুখে নিজের নাম শুনেছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে এই কাহিনি যখন আমাকে বলতেন মুখে আনন্দের আভাস দেখা দিত।

প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, সেটা অনেকেই করেন, কিন্তু অপরের প্রয়োজনে অর্থব্যয়ের তাঁর দৃষ্টান্ত আমি দেখিনি। স্থানীয় লাইব্রেরি, রাজনৈতিক পত্রিকা, থিয়েটারের ক্লাব, দুঃস্থ মানুষ, খ্যাতি ও খ্যাতিবিহীন সাহিত্যিক সকলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। এঁদের মধ্যে কারুর কারুর জীবনযাত্রার বর্ণনা তাঁর কাছে এসে হাজির হত। পরের মাস থেকে পাঠানো অর্থ তাঁদের স্ত্রীদের হাতে সোজাসুজি পৌঁছাত।

বাঙালি হিন্দুর জীবনে মধ্যে মধ্যে ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে হয়। সেটি করতেন, বলতেন এটি সমাজসংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু বাড়াবাড়ি দেখলে অসন্তুষ্ট হতেন। তোমরা যদি মনে কর ভগবান ঘুষ নেন তা হলে করতে পার, এইকথা তাঁকে বলতে শুনেছি। আমার শৈশবে আমাকে বলেছিলেন রামায়ণ-মহাভারত বানানো গল্প। শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম।

শেষ জীবনে একজন মানুষের পক্ষে যা পাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি শোক তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। যে সম্মানের সঙ্গে তিনি তা বহন করতেন সে বর্ণনার ক্ষমতা আমার নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবলম্বন, তাঁর অন্যকিছুর প্রয়োজন হয় না, এইকথা একবার বলেছিলেন।

আইন, সাহিত্য, রাজনীতি সবই করেছেন, কিন্তু কখনও অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেননি। সত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল; প্রয়োজনে অপ্রিয় সত্য অক্লেশে বলতেন, মধ্যে মধ্যে তার উপরে মিষ্টভাষের প্রলেপ পড়ত। এই সংকলনে তার বহু প্রমাণ পাবেন। প্রমথ চৌধুরীর লেখার ঋজু অথচ বিধ্বংসী বিদ্রূপ অত্যন্ত পছন্দ করতেন। সে অস্ত্র যে তাঁরও ছিল, এই সংকলনে তারও উদাহরণ আছে।

পৃথিবী, পরিবেশ, বিজ্ঞান তাঁর ঔৎসুক্যের তালিকা থেকে কিছুই বাদ পড়েনি। কাজের টেবিলের দেরাজে বড় বাঁধানো পৃথিবীর মানচিত্রের বই ছিল। প্রচুর ব্যবহার হতে দেখেছি। বাংলার নদনদী, পশুপাখি, গাছ, ফুল চিনতেন এবং চেনাতেন। গভীররাত্রে ঘুমন্ত স্কুল-

বালককে জাগিয়ে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল চেনার উৎসাহ সঞ্চার করে দিতেন।

তাঁর কিছু সৃষ্টির কথা কালক্রমে বিস্মৃত হয়ে এসেছে! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করি। আমি স্কুলে ভরতি হয়েছিলাম তৎকালীন বাংলা পাঠ্যবই কিশলয় সংকলিত হবার বছরে। পাঠ্য বইয়ে আমার চেনা শিশুসাহিত্যের প্রবেশ দেখে অবাক হয়েছিলাম। তার পূর্বের বাংলা বই এবং তৎকালীন যে-সব ইংরেজি বই আমাদের পড়তে হত, তাতে ছাত্রমহলে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সহজে জাগে না, বিপরীত ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। এখন বহির্বিশ্বে বাস করি। সেখানে ইংরেজি ক্লাসে ছোটদের বই পড়ানো হয়। শিশুদের উপর স্নেহের আতিশয্যে বড়দের সাহিত্যের জলমেশানো টুকরো চাপিয়ে তাদের ভারাক্রান্ত করার দিন অতীত। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কিশলয় সংকলনে তাঁর হাত ছিল। এখন যে পাঠ্য বই পড়ানো হয়, তার ফল অধুনারচিত সাহিত্য দেখলেই বোঝা যায়। তাঁর সময়ের রবীন্দ্রপুরস্কারের মর্যাদা এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। তৎকালীন অখ্যাত সাহিত্যিকও সে পুরস্কার সাহিত্যগৌরবে পেতেন।

ভবিষ্যৎকে অনুমান করার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একটি উদাহরণ দিই। আজকাল দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বিষণ্ণ। এই সংকলনে গান্ধীজির উপরে লেখা প্রবন্ধ দুটি তাঁদের পড়তে অনুরোধ করি। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা।

রেনেসাঁস কথাটা আমরা ব্যবহার করে থাকি। রেনেসাঁসের যাঁরা অংশীদার নানাবিষয়ে তাঁদের যোগাযোগ থাকে। বিদেশি এবং স্বদেশি উভয়ধারার একটি অপূর্ব সৃষ্টিসমৃদ্ধ সমন্বয় তাঁরা ঘটাতে পারেন। এই একজনকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখেছি যিনি প্রকৃত রেনেসাঁস পুরুষ ছিলেন। জ্ঞানের পরিধি ছিল অপরিসীম, কিন্তু সফল বহির্বিকাশ হত অত্যন্ত সংযমীভাবে। যা লিখতেন, যা বলতেন তা ছিল ঋজু অথচ সরস, গভীর অথচ সহজবোধ্য। এ লেখা যদি তিনি লিখতেন তা হলে লেখার দৈর্ঘ্য হত অর্ধেক, এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেত। তা যখন সম্ভব নয়, তখন তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই তাঁকে খুঁজতে হবে।

কাব্য জিজ্ঞাসা, জমির মালিক এবং ইতিহাসের মুক্তি বইগুলি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের অনুমতিক্রমে এই সংকলনে গৃহীত। এজন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রয়াত শোভন বসু গ্রন্থটির সংকলনের প্রাথমিক পর্বে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন।

অভিজিৎ গুপ্ত

সূচিপত্র

প্র ব ন্ধা ব লি

শিক্ষা ও সভ্যতা

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্বকথা প্রচলিত আছে, যাদের উদ্দেশ্য— কিছুই না বলিয়া, সমগ্র বিষয়টার একটা সর্বজনসম্মত সুগভীর মীমাংসা করা। এই সকল তত্ত্ববাক্যের মধ্যে একটি এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যথার্থ মানুষ তৈরি করা। মানব-শিশু যখন সচরাচর মানুষের শরীর ও মন লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়, এবং যেটি না-হয়, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও নিষ্ফল, তখন যথার্থ মানুষ কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বজ্ঞেরা অবশ্য উত্তরে বলিবেন— আদর্শ-মানবকে, অর্থাৎ অসাধারণ মনুষ্যকে। আদর্শ-মানব যে কী প্রকার জীব, সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও রূপ ধারণা না থাকাতে, জিনিসটা যে অতিশয় কাম্য এবং শিক্ষার দ্বারা অবশ্যলভ্য, এ বিষয়ে কাহারও কোনও দ্বিধা উপস্থিত হয় না; এবং একটা দুরূহ প্রশ্নের সহজ সমাধানে মনও প্রসন্ন হইয়া ওঠে। ইহার পরেও যদি কেহ জানিতে চায় আদর্শ-মনুষ্য কাহাকে বলে, তবে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন। তবে কোনও কোনও তত্ত্বজ্ঞ হয়তো অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, আদর্শ-মনুষ্য সেই, যাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি বা বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে ও পূর্ণরূপে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই শ্রেণির মানুষ গড়িয়া তোলা। এখন কথা এই যে, প্রথমত এহেন মানুষ চর্মচক্ষে দূরের কথা, কেহ কখনও মানস-নেত্রেও দেখেন নাই। পৃথিবীর কবি ও কল্পনাকুশল লোকেরা যে-সকল মহাপুরুষ ও অতিমানুষের আদর্শ-চিত্র আঁকিয়াছেন, সে সকলের কোনওটিই একাধারে সর্বশক্তিসম্পন্ন অসম্ভব মানুষের চিত্র নয়। সেগুলির কোনওটিতে দেখিতে পাই বহু-শক্তির একত্র সমাবেশ, কোনওটিতে বা দু'-একটি বৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ; কিন্তু তাহার প্রতিটিই রক্তমাংসের মানুষেরই চিত্র। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাক— দুই-চারিটি শক্তির একসঙ্গে একটু অসাধারণরকম স্ফূর্তির পরিচয় যাহার শরীরে আছে, এমন লোক হাজারে একজন মেলা কঠিন; অথচ শিক্ষা যে সকলের জন্যই প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তপস্বী বাল্মীকি যখন নারদকে বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, বিদ্বান প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকজ্ঞ নারদ সেই ত্রেতাযুগেও ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব রামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নাম করিতে পারেন নাই। এবং কোনও বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে রামচন্দ্র যে এই সকল গুণের আধার হইয়াছিলেন, এমন কথা নারদও বাল্মীকিকে বলেন নাই, বাল্মীকিও আমাদিগকে বলিয়া যান নাই। তৃতীয় কথা, যদি প্রকৃতই আদর্শ-মানব বা অতিমানুষ গড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা

থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষার ফলে পৃথিবীটা মানুষের পক্ষে বাসের উপযুক্ত থাকিত কি না, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সমাজ-বন্ধনের ভিত্তির উপর মানুষের সভ্যতার ইমারত গঠিত হইয়াছে, তাহার মূল এই যে, মানুষে মানুষে শক্তির প্রভেদ আছে, এবং সে প্রভেদ কোনও শিক্ষার সাহায্যে সম্পূর্ণ লোপ করা যায় না। এই পার্থক্য ও তারতম্য আছে বলিয়াই সমাজে শ্রমবিভাগ ও কার্যবিভাগ সম্ভবপর হইয়াছে, এবং এই বিভিন্নতার উপর মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে অদ্যাবধি সমস্ত পরিণতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। যদি শিক্ষার ফলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া সকলকেই সর্বশক্তিসম্পন্ন আদর্শ-মানুষে পরিণত করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত কাজের কল-কারখানা তখনই বন্ধ হইয়া যাইত।

মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। যদি শিক্ষার ফলে সকলেই আদর্শ-মানুষ, অর্থাৎ এক ছাঁচের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গ আমাদের নিকট এমনই অসহ্য বোধ হইত যে, মানুষ ঘর ছাড়িয়া বনে পালাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিত না। শেষ কথা, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক-একজন অতিমানুষের জন্ম হয়। তাহার ফলে কর্মের জগতে বা চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিলে সমাজ যদি কেবল অতিমানুষেরই সমাজ হইত তাহা হইলে ব্যাপারটা কী ঘটিত মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে।

অতএব তত্ত্ববেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ-মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরিও নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই, এবং যদি কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তাহার ফল অতি ভয়ংকর হইয়া উঠিত।

২

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকদের আর একটি মত এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত— ছাত্রের চরিত্রগঠন। চরিত্র জিনিসটা কী, তাহা লইয়া তর্ক না-ই তুলিলাম। ধরিয়া লওয়া যাক চরিত্র সেই সকল গুণের সমঞ্জসীকৃত সমষ্টি, যাহা মানুষের থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এই সকল গুণের তালিকা এবং সমষ্টির বিষয়, তাহাদের রূপ ও মাত্রা সম্বন্ধে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যে ছিল এবং আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভিন্ন দেশকালের প্রচলিত মত কিছু এক নয়। এই বিজ্ঞ বচনের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও শিক্ষাপ্রণালীই প্রকৃত কাজের বেলায় ছাত্রের চরিত্রগঠনকে তাহার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপে গ্রাহ্য করে নাই। যিনি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রগঠন বিষয়ে অতিমাত্র উদ্যোগী, তিনিও সাহিত্যের একশো পাতার মধ্যে দশ পাতা হিতোপদেশ থাকিলে ভাল হয়, এই কথাই বলেন, এবং ইস্কুলের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আধঘণ্টার জন্যেই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার কারণ এ নয় যে, মানুষের চরিত্র জিনিসটা সমাজের পক্ষে কিছু কম প্রয়োজনীয়; ইহার কারণ এই যে,

চরিত্র জিনিসটা সেরূপ শিক্ষণীয় নয়। মানুষের চরিত্র প্রধানত নির্ভর করে বংশানুক্রম এবং পরিবার ও সমাজের বিশেষ অবস্থার উপর। কেবলমাত্র শিক্ষকের শিক্ষার দ্বারা চরিত্রে যে পরিবর্তন করা যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য; এবং তাহাও আবার শিক্ষার গৌণ ফল। সোজাসুজি নীতিশিক্ষার দ্বারা চরিত্র গড়িবার চেষ্টা করিলে, সে শিক্ষা অতি নীরস হইয়া ওঠে— এবং তাহার ফলও প্রায়ই বিপরীত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন কালে গ্রিস দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্লেটো তাঁহার যে-সকল মত সক্রেটিসের নামে চালাইয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা মত এই যে, চরিত্র বা virtues জ্যামিতি ও অলংকার-শাস্ত্রের ন্যায়ই একটা শিক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এই মতের মূলে আছে তাঁহার আর একটি মত। প্লেটোর মতে ভালমন্দের জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়, এবং সেই জ্ঞান লাভ করিলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়। এই জ্ঞানবাদের—intellectualism-এর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক মনীষী আজ লেখনী ধরিয়াছেন; এবং বেদাধ্যয়নেও যে দুরাত্মার চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয় না, তাহা আমাদের দেশের উদ্ভট কবিতার অজ্ঞাত-নামা কবি অনেক পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটা ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া আমাদের কর্তৃপক্ষেরা এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব সর্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও শুনিয়া শুনিয়া বলি যে, বিলাতে ইস্কুল-কলেজে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়, আর আমাদের ইস্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রেরা কেবল কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কথাটা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাক। কিন্তু ইহাতে এ প্রমাণ হয় না যে, বিলাতের ইস্কুল ও ইউনিভার্সিটিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলেই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়। বরং আমাদের কর্তৃপক্ষেরা উলটো কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, সেখানকার ইস্কুল-ইউনিভার্সিটির life বা আবহাওয়াতেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া ওঠে অর্থাৎ সেখানকার ছাত্রদের চরিত্র সেখানকার বিদ্যালয়গুলির সামাজিক জীবনের ফল, শিক্ষার ফল নয়। সুতরাং সামাজিক অবস্থার গুণে যেটা আপনা হইতেই জন্মলাভ করে, সেটাকে শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের ছাত্রগণের কোনও হিতৈষী যেন তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে শেলির পরিবর্তে Smiles-এর আমদানি না করেন।

৩

এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আদর্শ-মানুষ গড়াও না হয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন করাও না হয়— তবে তাহার উদ্দেশ্যটা কী? এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে উত্তরও সকলেরই জানা আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর লজ্জিত হই। কেননা উত্তরটা অতি সাধারণ রকমের, এবং বড় কথা বলিয়া ও শুনিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি— সোজা কথা বলায় ও শোনায় আমরা সে-সুখে বঞ্চিত হই।

কথাটা এই যে— শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া; অর্থাৎ যার প্রথম সোপানকে সমস্ত বিষয়টার নামস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আমরা বাংলা কথায় বলি—লেখাপড়া শিখানো। কি পুরাতন, কি বর্তমান সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্যই যে এই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, তাহা টোল, পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই স্থূল বিষয়টা আর কাহারও চোখ এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্বকথা আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যই এই নিতান্ত সোজা কথাটাকে চাপা দেওয়া, যাহাতে তাহা নিজগুণে প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

তত্ত্বজ্ঞানীদের সমস্ত বচন উপেক্ষা করিয়া এবং বিজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, পৃথিবীর শিক্ষালয়গুলি যখন বরাবর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকেই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে, তখন ইহার মূলে যে নিছক বোকামি ছাড়া আরও কিছু আছে, তাহাতে অতি-বুদ্ধিমান ভিন্ন আর কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, বিদ্যাশিক্ষাই যে কার্যত শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে, কেবল তাহাই নহে, প্রকৃতপক্ষে উহাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, বিদ্যাশিক্ষা জিনিসটা মানবসমাজের যুগযুগান্তরসঞ্চিত সভ্যতার সহিত পৃথিবীতে নবাগত মানবসন্তানের পরিচয় করানো। এই পরিচয় শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব, এবং শিক্ষা ভিন্ন আর কোনওরকমেই হইবার উপায় নাই। আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু-আয়াসলব্ধ সভ্যতার ফল নানা বিদ্যারূপে সঞ্চিত আছে ও হইতেছে। শিক্ষা এই বিদ্যাগুলির সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধন করে। অতি সভ্যসমাজের শিশুও অসভ্য হইয়া জন্মায়, এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচয় লাভ না করিলে অসভ্য অবস্থাতেই বাড়িয়া উঠিত। অসভ্য অর্থ বুদ্ধিহীনও নয়, হৃদয়হীনও নয়, অসভ্য অর্থ বিদ্যাহীন। অসভ্যের সমাজ সেই সমাজ, যাহার প্রতিপুরুষের লোকের জন্য পূর্বপুরুষের ও পূর্বকালের এমন কোনওই সঞ্চিত বিদ্যা নাই, যাহা বিশেষ শিক্ষা ভিন্ন আয়ত্ত হয় না। সভ্যসমাজের লোক ইস্কুল-কলেজে শিক্ষা না পাইলেও বংশানুক্রমের ফলে এবং সামাজিক অবস্থার প্রভাবে মোটামুটি সভ্য সমাজোচিত বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করে; কিন্তু রীতিমতো শিক্ষা না পাইলে অতি বড় পণ্ডিতবংশের প্রতিভাবান সন্তানও মূর্খই থাকিয়া যায়। কেননা বিদ্যার বংশানুক্রম নাই। সকলরকম বিদ্যাই প্রতি যুগের লোককে নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। এবং এই ক্রমাগত নূতন চেষ্টার ফলেই মনুষ্যসমাজের লব্ধ বিদ্যা প্রালব্ধ না হইয়াও রক্ষিত হয়। যদি পৃথিবীর একপুরুষের সমস্ত লোক একবার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা হইতে বিরত থাকে, তবে মানুষের আদিকাল হইতে একাল পর্যন্ত সঞ্চিত সমস্ত বিদ্যা ও সভ্যতা একপুরুষেই লোপ পায়, এবং মানুষকে আবার প্রাচীন বর্বরতায় কাঁচিয়া বসিয়া সভ্যতার পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর জিনিস নয়। ইহার অর্থ—মানুষের বহুযুগের চেষ্টার ফলে *অর্জিত সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া, অসভ্য অন্তত ন-সভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টলব্ধ প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করা।*

কথাটা আরও পরিষ্কার করিতে হইলে একবারে অনেকটা গোড়ার কথা ধরা ছাড়া উপায় নাই।

মানুষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। সচরাচর কথাবার্তায় আমরা এই প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ করি, ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচীন। প্রাচীন সভ্যতার কথা উঠিলেই আমরা বৈদিক, ব্যবিলন, বা মিশরের সভ্যতার কথা তুলিয়া এমনভাবে কথা কই, যেন ওইগুলি মানবসভ্যতার আদিম অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে ওই সকল সভ্যতা অতি সুপরিণত এবং মানুষের সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অনেক বিষয়ে ওই সকল সভ্যতা যেস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহার পর হইতে একাল পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা সেদিকে আর বড় বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। এই কথা মনে না থাকায় আমরা যাহাকে আধুনিকতা বলি, প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হই, এবং এই সকল সভ্যতা হইতেও বহু প্রাচীন অথচ পরিপুষ্ট সভ্যতার বিবরণ আবিষ্কার হইলে আমরা অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করি।

মানুষের এই সুপ্রাচীন সুপরিণত সভ্যতা মানুষ যে সম্পূর্ণ অসভ্যতার হাত হইতে ক্রমশ উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই, এবং বর্তমানের অতি সুসভ্য মানুষ যে অতীতের নিতান্ত অসভ্য আদিম মানুষেরই বংশধর তাহাতেও সন্দেহ করিবাব কোনও কারণ দেখি না। মানুষ যে অসভ্যতা হইতে ক্রমশ সুসভ্যতায় উপনীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বর্তমান যুগের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে বড় একটা সংশয় নাই। তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন যে, ইহা ইভলিউশনের ফল। ইহার অর্থ কেবলমাত্র এই নয় যে, মানুষের সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে; কেননা এই ক্রমবিকাশের কথা তো অল্প-বিস্তর ঘটনারই বিবৃতি, তাহার ব্যাখ্যা নয়। এই ইভলিউশনবাদের সম্পূর্ণ অর্থটা এই যে, যে নিয়মে অতি নিম্নশ্রেণির জীবদেহ হইতে পৃথিবীতে অতি উচ্চশ্রেণির জীবশরীর ক্রমশ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রাণতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মেই মানুষের সভ্যতা অতি নীচ অবস্থা হইতে ক্রমশ উচ্চ অবস্থায় আসিযা পৌঁছিয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার এই মতটা খুব জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন এবং সেই প্রচারের কাজটা এতই সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পেন্সারের লেখার সহিত কোনও পরিচয় নাই, তাঁহাদেরও এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং বোধ হয় এই মতটা পোষণ করা আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াই শিক্ষিত-সমাজে গণ্য ও মান্য। কিন্তু মতটা আগাগোড়া মিথ্যা। পৃথিবীতে জীবশরীরের ক্রমবিকাশের নিয়মের সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই দুই ব্যাপারের নিয়ম ও প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক, এবং পৃথক বলিয়াই অসভ্য শিশুকে শিক্ষা দিয়া সুসভ্য মানুষ করা সম্ভব হয়, এবং পৃথক বলিয়াই সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা এতটা স্থান জুড়িয়া আছে। যদি সত্যই Organic Evolution-এর নিয়মে মানবসভ্যতার বিকাশ হইত তাহা হইলে মানুষের জীবনে শিক্ষার কোনও স্থান থাকিত না; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতালব্ধ সমস্ত বিদ্যা শিশুর মনে আপনিই স্ফুরিত হইত এবং যে হতভাগ্যের হইত না স্বয়ং ফ্রোবেলও সারাজীবন শিক্ষা দিয়া তাহাকে বর্ণ পরিচয় করাইতে পারিতেন না।

Organic Evolution-এর মূলে আছে Heredity। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, উদরসর্বস্ব জীবাণু হইতে যে পৃথিবীতে ক্রমে মানুষের জন্ম হইয়াছে ইহার গোড়ার কথা এই যে, জনক জননীর দেহের ও মনের ধর্ম সন্তানে সংক্রমিত হয়। ফলে যখন জনক জননীর শরীরে বা মনে নূতন কিছুর আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের সন্তান, অন্বয়ানুসারে সেই নূতনত্ব লাভ করে। যদি জীবন-সংগ্রামে এই নূতন কিছুর দ্বারা কোনও সুবিধা হয় তবে যাহাদের সেটা আছে তাহার সাহায্যে সেই শ্রেণির প্রাণীর মধ্যে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বংশ রাখিয়া যায়, বাকিগুলি নির্বংশ হইয়া মরে। এবং এইরূপে যুগের পর যুগ নানা বিভিন্ন অবস্থায় নূতনত্বের উপর নূতনত্ব পুঞ্জীভূত হইয়া সর্বেন্দ্রিয়হীন এক Cell-এর জীব হইতে পশুপক্ষী ও মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। এই হইল Organic Evolution সম্বন্ধে পণ্ডিতদের আধুনিক মত।

কেমন করিয়া জীবশরীরে এই নূতনত্বের আবির্ভাব হয় এবং কোন জাতীয় নূতনত্ব Organic Evolution-এর প্রধান ভিত্তি, এ সম্বন্ধে ত্রিশ বছর পূর্বে পণ্ডিতেরা যতটা একমত ও নিঃসংশয় ছিলেন এখন আর তেমন নহেন। তখনও ডারউইনের প্রচারিত ব্যাখ্যাই সকলে মান্য করিতেন। ওই ব্যাখ্যা অনুসারে জনক জননীর সহিত সন্তানের যে-সব ছোটখাটো জন্মগত বিভিন্নতা প্রতিদিনই দেখা যায়, যাহার ফলে ছেলেটা বাপের মতো হইয়াও ঠিক তাহার মতো হয় না, সেই নিত্যসিদ্ধ নূতনত্বই ইভলিউশনের প্রধান সহায়। আর এক সহায়, প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকালের মধ্যে বাহিরের চাপে ও ভিতরের চেষ্টায় তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়। কিন্তু ডারউইনের এই মতের আসন এখন টলিয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যে নূতনত্বের উপর ভর করিয়া unicellular জীব মানুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা প্রতিদিনকার আটপৌরে নূতনত্ব নয়। প্রাণীর শরীরে মাঝে মাঝে অতি দুর্জ্ঞেয় কারণে হঠাৎ এক-একটা বড়রকমের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। যদি তাহাতে জীবনযুদ্ধের কোনও সহায়তা হয় তবে তো কথাই নাই, অন্ততপক্ষে যদি নিতান্ত বিপত্তিকর না হয় তাহা হইলেই ওই পরিবর্তনটি স্থায়ী হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরই মত যে এই সকল হঠাৎ-উপস্থিত বড় রকমের নূতনত্বই Organic Evolution-এর প্রধান কারণ। প্রতি প্রাণীর জীবদ্দশায় বাহিরের প্রকৃতির চাপে ও ভিতরের শক্তির প্রয়োগে তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন বলিতেছেন যে, ওই-জাতীয় পরিবর্তন সন্তান-সন্ততিতে মোটেই সংক্রমিত হয় না। প্রাণীর শরীরে দুই রকমের মালমশলা আছে। এক শ্রেণির মালমশলায় তাহার শরীর গঠিত হয়, দ্বিতীয় রকমের মালমশলা বংশরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকে। বাহিরের চাপে বা ভিতরের চেষ্টায় যে পরিবর্তন তাহা ওই প্রথম শ্রেণির মালমশলাতেই আবদ্ধ থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণির মালমশলা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ফলে ওই স্বোপার্জিত পরিবর্তন সন্তান-সন্ততির নিকট পৌঁছে না। যখন দ্বিতীয় শ্রেণির মালমশলায় পরিবর্তন উপস্থিত হয়, সেই পরিবর্তনই বংশানুক্রমে চলে। এই পরিবর্তনের কারণ এখন পর্যন্তও একেবারেই অজ্ঞাত। এবং জীবশরীরে যে-সকল হঠাৎ বড় বড় পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া Organic Evolution-কে ধাপে ধাপে টানিয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ এই দ্বিতীয় রকমের মালমশলায় পরিবর্তন।

এই তো গেল সংক্ষেপে Organic Evolution-এর নিয়ম-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্তমান

মত। এখন ইহার সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সম্পর্কটা কী? মানুষের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত কিছুই তো মানুষের শরীরে দাগ কাটে না, বিশেষত শরীরের সেই মালমশলাগুলিতে যাহার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে। এগুলি বাহিরের বস্তু। মানুষ এগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এক পুরুষের শরীর হইতে আর এক পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হয় না। এক পুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষকে এগুলি সঞ্চিত ধনের মতো দান করিয়া যায়। ইহারা মানুষের heredity নয়, inheritance। এগুলির বংশানুক্রম নাই, আছে উত্তরাধিকার। এবং এ ধনের উত্তরাধিকারী একমাত্র অঙ্গজ নয়, সমগ্র মানবসমাজ।

তারপর ডারউইনের Survival of the fittest নিয়মেরও এখানে কোনও প্রভাব নাই। সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ ফল তাহার দ্বারা জীবনসংগ্রামে কোনও কাজই হয় না। Binomial theorem আবিষ্কার করিয়া Newton-এর জীবনযাত্রার এবং বংশরক্ষার যে কোন সুবিধা হইয়াছিল, ইহা তাঁহার জীবনচরিত লেখকেরা বলেন না, এবং যাঁহারা ওই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহারা যে নির্বংশ হন নাই ইহাও নিশ্চিত। কাব্য রচনার ফলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের কতটা সুবিধা হয় সে সম্বন্ধে দেশি বিদেশি ভুক্তভোগী কবিদের আত্মোক্তির অভাব নাই, এবং অকবি লোকও যে সংসারে টিকিয়া থাকে এবং বংশরক্ষা করিয়া তবে মরে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা সত্য যে, মন ও ইন্দ্রিয়ের যে-সব শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, ওই শক্তিগুলি Organic Evolution-এরই ফল। মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মানুভূতি এগুলি যে জন্মগত ইহা তো প্রতিদিন চোখেই দেখা যায়। এবং ওই শক্তিগুলিই যে জীবনযুদ্ধে মানুষের সহায় হইয়া তাহাকে পৃথিবীর রাজাসনে বসাইয়াছে তাহাও স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু ওই শক্তিগুলিকে যে-সব কাজে লাগাইয়া মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা Organic Evolution-এর চোখে একবারে বাজে খরচ, সম্পূর্ণ অপব্যবহার। Organic Evolution-এর ফলে মানুষ লাভ করিল তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, যেন শিকারের ও শিকারির মৃদু পদশব্দটিও কানে না এড়ায়, মানুষ সেই সুযোগে গড়িল সংগীতবিদ্যা। ইভলিউশনে মানুষ পাইল দশ আঙুলের সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি, যেন তাহার তিরের লক্ষ্যটা একেবারে অব্যর্থ হয়; সে বসিয়া গেল তাঁত পাতিয়া মলমল বুনিতে, আর তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতে। ইভলিউশন মানুষকে দিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কল্পনা যেন সে নানা ফিকিরে শরীরটাকে ভাল রকম বাঁচাইয়া বংশটা রাখিয়া যাইতে পারে, মানুষ গড়িয়া তুলিল কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন। ইভলিউশনে মানুষের কণ্ঠে আসিল ভাষা— যাহাতে তাহার পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া সহজ হয়, মানুষ সৃষ্টি করিয়া বসিল— ব্যাকরণ আর অলংকার। মোট কথা মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে প্রাণেব ঘরের চোরাই মাল মনের কাজে খরচ করিয়া। প্রাণের ঘরকন্নার জিনিস মনের বিলাসে ব্যয় করার নাম সভ্যতা।

মানুষের এই তহবিল তছরুপের একটা ফল এই যে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি Organic Evolution-এ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সেইখানেই থামিয়া আছে। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে এই সকল শক্তির কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। প্রাচীন

গ্রিক অপেক্ষা যে নবীন ফরাসির বুদ্ধি ও রূপজ্ঞান অধিক তাহার কোনও প্রমাণ নাই, এবং বৈদিক যুগের হিন্দুর অপেক্ষা আমাদের মানসিক শক্তি যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এমন কথা কি সবুজপন্থী কি সনাতনপন্থী কেহই বলিবেন না। তবে প্রাচীন কালের তুলনায় বর্তমান সভ্যতার অনেক বিষয়ে আশ্চর্যজনক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতের যাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বর্তমানের শিশুরাও তাহা হাতেখড়ির পরেই শেখে। তাহার কারণ সভ্যতা বাড়ে টাকার সুদের মতো। এক যুগের মানুষ যাহা সৃষ্টি করে, পরের যুগের মানুষ শিক্ষার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া আবার তাহার উপর নূতন সৃষ্টির আমদানি করে, এইরকমে প্রাচীন সৃষ্টির উপর নবীন সৃষ্টি জমা হইয়া মানুষের সভ্যতা বাড়িয়া চলে। প্রাচীন যুগে যাঁহারা সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মানসিক শক্তি যে আমাদের চেয়ে কিছু কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে খুব সামান্য বোধ হয় তাহার কারণ আমরা পাইয়াছি তাহার পরের শত যুগের চেষ্টার পুঞ্জীভূত ফল। এবং আমরা যে নূতন সৃষ্টি করি তাহা এই বহুযুগের সৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া। এই জমানো সভ্যতার পুঁজি যে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর খোয়া যায় না তাহা নয়; তখন আবার মানুষকে কাঁচিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এবং বুনিয়াদি ঘরের জমানো টাকার মতোই ইচ্ছা করিলে কিছুমাত্র না বাড়াইয়া দুই-এক পুরুষেই ইহাকে ফুঁকিয়া নিঃশেষ করিয়াও দেওয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বেশি দূরে যাইতে হইবে না।

৫

Organic Evolution-এর রাজ্যে বিদ্রোহী হইয়া তাহার রাজ্য লুটিয়া আনিয়া, মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফল সঞ্চিত হইয়াছে সাহিত্যে, কলায় এবং বিবিধ বিদ্যায়। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এইগুলির সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই সকল বিদ্যা ও কলা অতীতের নিকট হইতে বর্তমানের উত্তরাধিকার। শিক্ষার লক্ষ্য এই উত্তরাধিকারে মানুষকে অধিকারী করা। কেননা এ তো কোম্পানির কাগজের দান নয় যে ঘরে বসিয়া সুদ পাওয়া যাইবে। এ হইল কষ্টে গড়া ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার। কাজ শিখিয়া চালাইতে পারিলে তবেই লাভের সম্ভাবনা।

সভ্যতার এই ফলগুলি শিক্ষার দ্বারা মানুষকে আয়ত্ত করানো যায়, কেননা যে শক্তির প্রয়োগে ইহাদের সৃষ্টি সে শক্তি অল্প-বিস্তর মানুষ জন্ম হইতেই লাভ করে। সেই জন্য অসভ্য সমাজের শিশুও শিক্ষা পাইলে সভ্যসমাজের ছেলের মতোই সভ্যতার বিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সভ্যসমাজের ছেলেকেও শিক্ষা পাইয়াই এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচিত হইতে হয়। কেননা বিদ্যা তো মানসিক শক্তি নয়, উহা মানসিক শক্তির সৃষ্টি এবং সহস্র যুগের মানব-প্রতিভার সমবেত সৃষ্টি। প্রকৃতি যাহার কপালে প্রতিভার তিলক পরাইয়াছেন, যে কেবল সভ্যতার সৃষ্টিগুলিকে নিজস্ব করিতে পারে তাহা নয়, তাহার উপর নিজের সৃষ্টিও যোগ করিতে পারে, তাহাকেও

এই শিক্ষার দ্বার দিয়াই সভ্যতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কেননা এমন প্রতিভার কল্পনা করা যায় না, যাহা সভ্যতার কোনও সৃষ্টিকে আবার প্রথম হইতে একাই গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন সৃষ্টির উপর দাঁড়াইয়াই তবে নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্তমান যুগে আর একটি মত প্রচলিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞলোকের পাণ্ডিত্যের ফল নয়। সংসারের চাকা বর্তমান যুগের মানুষ ও জাতির হৃদয় পিষিয়া এই মতটা নিংড়াইয়া বাহির করিয়াছে। মতটি হইল এই যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য— মানুষকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা, যেন সে টিকিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। এই মতটির আবির্ভাব মানবসভ্যতার একটা tragedy। ইহা মনের উপর প্রাণের প্রতিশোধ। প্রাণের ঘরে ডাকাতি করিয়া মানুষ মনের ভোগের জন্য সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দু'-একটি সৃষ্টিকে আবার প্রাণের কাজে লাগাইতে গিয়া জীবনযাত্রাটা এমনই জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ প্রাণ রাখিতে যে কেবল প্রাণান্ত হইতেছে তাহা নয়, একেবারে মনান্ত হইতেছে। মনের যা কিছু শক্তি ও ক্ষমতা এক প্রাণ রাখার কাজেই ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া কোনও লাভ নাই। যাহা জীবন হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে কেবল মত দিয়া তাহাকে চাপা দেওয়া চলে না। এ হইল ভিড়ের ভিতর ঠেলার মতো; ব্যাপারটা কেহ পছন্দ করে না, কিন্তু পিছু হটিবারও কাহারও সাধ্য নাই।

বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে হয়তো এই জটিলতার হাত এড়ানো অসাধ্য। এবং হয়তো বাধ্য হইয়াই বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীকে জীবন-যুদ্ধের জন্য তৈরি করাটাই শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণের দাবির সুর যখন খুব চড়া হইয়া ওঠে তখন আর সব ফেলিয়া সেই দিকেই কান দেওয়া ছাড়া গতি নাই। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়াও না মনে করি যে এই বিসদৃশ ব্যাপারটাই হইল সভ্যতার উন্নতি। এ ভুলের আশঙ্কা আছে। কেননা মন আর ইন্দ্রিয়ের যে শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়াছে, আজ জীবনযাত্রার জটিলতায় সেই সব শক্তির উপরেই প্রাণ তাহার একাধিপত্যের দাবি পেশ করিয়াছে। ফলে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা, প্রতিভা ব্যয় হইতেছে অনেক, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য কেবল প্রাণ বাঁচানো ও জাত বাঁচানো। ইহা সভ্যতা নয়, এ হইল সভ্যতা যে পথে চলে তাহার একবারে বিপরীত পথ। প্রাণের কাজে যাদের প্রথম প্রকাশ, মনের ভোগে তাদের শেষ পরিণতি হইল সভ্যতা। প্রাণের ব্যাপারে সমস্ত মনটাকেই নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসভ্যতা না হইতে পারে কিন্তু সভ্যতা নয়।

ফাল্গুন ১৩২৩

অন্নচিন্তা

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটি পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে কি আর তাঁদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে! আজ এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্ত্বটি প্রাচীন আচার্যেরা জেনেছিলেন যোগবলে। কেননা সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতি সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ওই সভ্যতার আমদানির পূর্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না, এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে, কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্যেরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁরা যে তত্ত্বটি প্রচার করেছেন সেটি পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলির মতো, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মতো সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এইখানে তর্ক তুলবেন যে, বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation। আর পদার্থ মানে বস্তু নয়, বিলাতি দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্ত্বটির অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হল হিন্দু-দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মারবার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি, কোনও খাঁটি হিন্দু এ-সব তর্কে কান দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটি অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট-বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিনিদর্শনের বর্ণনা আছে, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে ব্যাকরণশাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন; ওই শাস্ত্রে পারদর্শী না হলে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ওই শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ। এমনকী একটি রসেশ্বর-দর্শন আছে, যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হয়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রসহৃদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে: এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুশি হবেন, যে শ্রুতি-প্রমাণটি আহৃত হয়েছে সেটি তাঁদের সুপরিচিত 'রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুথিতেও অন্নদর্শন বলে কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে, প্রাচীনকালে এদেশে অন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয়নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাকলে যে তার একটা দর্শনও থাকত, তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আব কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ করবেন না। এবং আমার এই যুক্তিটি যে সম্পূর্ণরূপে 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত' তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উচ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই

গোপন করলে চলবে না। অপ্রীতিকর হলেও সমস্ত কথাই প্রকাশ করে বলতে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে যে দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না এ বিষয়ে সর্বদর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বরুণের উপাখ্যান। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করলেন তখন বরুণ তাঁকে বলেন তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা করো। তবে সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফরমুলা' বলে দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে পিতার কাছে গেলে বরুণ তাঁকে আবার তপস্যা করতে বললেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায় ভৃগুর বোধ হল প্রাণই ব্রহ্ম। এইরকমে তৃতীয়বারে জানলেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থবারে বুঝলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌঁছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' ও ওইরকম সব দুর্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটি কেউ ধরতে পারেননি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাকলে তবেই শেষ পর্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই এবং একটু বিচার করে দেখলে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাকবে না। কেননা উপাখ্যানটি শেষ করেই শ্রুতি চারটি পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও 'ইকনমিস্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে উঠবে। প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটি পড়লেই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম বুঝতে পারেননি তার কারণও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বেই প্রমাণ করেছি যে ওই সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাঁদের যে-কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যাঁর ওই sense বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁহাদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্যরকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই করতে পারতেন না। ফলে বর্তমান কালে আমরা যে higher criticism বা 'উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনা'র বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একেবারে ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ওই সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা করবার মতো সৎ সাহস তাঁদের সকলেরই ছিল।

যাহোক পূর্ববর্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামাননি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং

কামসূত্রেরও অনাদর করেননি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ করছি আমরা, তাঁদের এ যুগের বংশধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশি, এবং কীসে ও বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটিরকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশানুক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা করতে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কী বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদেব বাংলাদেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙালির ছেলেকে ইস্কুল-কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে চটপট ব্যাবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরালো বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমানো টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেননা তাঁর যে বংশধর ওকালতি করবে কিন্তু উপার্জন করবে না তার জন্য সেটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে 'শিল্প-বাণিজ্যে না ঢুকে' 'লেখাপড়া শিখে চাকুরি খুঁজে বেড়ায় বলে' বাংলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষীদের গঞ্জনা শুনছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে সেটা তাদের দেখানো কেউ প্রয়োজন মনে করিনে। ভাবটা এই যে না-ই বা থাকল বাঙালির ছেলের মূলধন, না-ই বা থাকল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তারা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা গড়ে তোলে না, বড় রকম ব্যাবসার মালিক হয়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ওইরকম ব্যাপার করেছে, তা তো পুথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্নসমস্যার সমাধানের জন্য ইস্কুল-কলেজ সব তুলে দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে-হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে আসবার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙালির ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্তমানে ধনে-জনে যে জাতি পৃথিবীর মাথায বসে আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিতে হলে তাঁদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়েই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙালির ছেলের অবস্থাটা ঠিক উলটো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশি সজাগ ও উৎসাহান্বিত করতে হলে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনওই ফল পাওয়া যায় না। দেশি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা 'টারিফের' প্রাচীর মাত্র, 'পলিটিক্যাল ইকনমি' নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না, এবং বুঝলেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা যার বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মূক ছিল তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন, সেই কাহিনি। অথচ এরা যে হাতেকলমে কাজে লাগতে পারে না বা কাজ উদ্ধার করতে পারে না, এমন নয়। এরা অর্ধোদয়-যোগে দেশের দীনতমকেও

নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও 'ডিপার্টমেন্টের' বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটি যেমন করে নির্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্বের প্রধান বিষয়, সেই 'ডিপার্টমেন্টের' কর্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয়; জাতির একটা দুর্নাম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কির গুলিতে টাইগ্রিসের তীরে প্রাণ দিতে রাজি হয়, এবং তার শিক্ষানবিশিতে পুব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ তো অতি স্পষ্ট যে এ সকলই কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে, সংসারযুদ্ধে জয়ী হয়ে দশের এক হওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ানো হয় যাঁরা খুব হীন অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশিরকম ভাল করেছিলেন; এবং ইংরেজি হাতের লেখা লিখতে আরম্ভ করেই সময় আর টাকা যে একই জিনিস 'কপিবুক' থেকেই এরা সে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হলেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্মা পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্তমান এরা তাঁদের কোনও খবরই রাখে না, এমনকী তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উঁচু সম্মান পেলেও নয়। যারা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথতে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গতরকম হইচই করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উত্তেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ, অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও ওই চিন্তা আর ওই চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এইরকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাকতে হয়, ঔষধও গিলতে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হযে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে রোগের চিকিৎসাকেই সবচেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে তোলা সম্ভবপর নয়।

আমরা বাংলাদেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্বেই বলেছি এতে আমাদের দোষ কিছু নেই। দোষ পূর্বপুরুষদের যাঁবা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোনও স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেননি। এই দায়িত্বহীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও শুরু করেছি। কেননা জানি, বেফাঁস কথা যা কিছু বলব তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হয়ে চিন্তা করবার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেননি।

২

দেশের প্রাচীন আচার্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেননি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হলে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে ব্যাপক অথচ গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্নশাস্ত্রের শাস্ত্রী নন, তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ আচার্য, নাম চার্লস ডারউইন। ভৃগু-বরুণ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্নতত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডারউইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতরভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডারউইন পূর্বাচার্যদের কাছ থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজমন্ত্রটি পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণরক্ষার উপযোগী পর্যাপ্ত অন্ন বসুমতী জোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমেব সঙ্গে জপ করতে করতে পূর্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটেনি তাঁর সেই সিদ্ধি লাভ হল। অন্ন তাঁর অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ ডারউইনকে দেখালেন। তিনি দেখলেন স্থলে, জলে, আকাশে— অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে— অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্ছে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছ্বাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে নীরব রক্তশোষী প্রতিযোগিতার আকারে। কোনটা বেশি ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তাঁর মোহিনী মূর্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্তিতে সংহার করছেন। শেষ পর্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তাঁর সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্তে প্রাণের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দু'পাশের তপ্ত বালুতেই শুষে নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনওরকমে শেষ পর্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্তি দর্শন করে ডারউইন কাল জয় করে অমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চলতে চলতে একদিন মানুষে এসে ঠেকল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হতে হতে একদিন তা মানুষের মূর্তি নিয়ে প্রকাশ হল। কেমন করে হল সে কথা পণ্ডিতদের তর্ক-কোলাহলে অপণ্ডিত সাধারণের কানে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশি সবই যেন স্পষ্ট করে বলে দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে থাকবার নয়, এর জন্য একদিন সোনার

দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার তার এই মূর্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য এক ব্যাপার সংঘটিত হল। যে মন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, মানুষের মূর্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্যের মতন জ্বলে উঠল। তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারই রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন যেদিন এই মানুষও, রাজটীকা ললাটে নিয়ে, কাঙালের মতো তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হতে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে, পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে একটু সুস্থির হওযার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানাল, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজতে এক দেশ হতে আর এক দেশে চলতে চলতে তার পায়ে ব্যথা ধরে উঠল। এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহুযুগ কেটে গেল। শেষে এক দিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষ বলে উঠল আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব না, অন্নকে সৃষ্টি করব, স্বল্প অন্নকে বহু করব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেকবারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোনার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখল যে এখানে দাঁড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে তপস্যা করলে কালো মাটির বুক চিরে সোনার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হতে হয় না। মানুষ জানল, 'পৃথিবী বা অন্নম্', পৃথিবীই অন্ন। মাটির তলে জলের অফুরন্ত ধারার মতো মাটির মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকানো আছে; লাঙলের ফালে তাকে তুলে আনতে জানলে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডারউইন জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটির সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হল। মাটির টানে উদ্ভ্রান্ত বনচারী গৃহী হল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে উঠল, শিল্প বাণিজ্যের শুরু হল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোনার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে মানুষের এই যে যাত্রা, এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য অংশ, সেটির বিকাশ হল। মানুষ দেখল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই, তার পরিমাণ যতই অপর্যাপ্ত হোক, তার প্রকার যতই বিবিধ হোক। প্রাণের তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জানতে আরম্ভ করে মানুষ বুঝল যে তার স্বভাবে একটা কী আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে সে জানল

যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ, সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণীরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ-লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশি রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ির টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথাসর্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিঁড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনি। এই লোকে পৌঁছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারত তা হলে অন্নদাস হলেও মানুষের জীবনে তার সর্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও অপচয় হত না। সোনাব শিকলে অন্নকে বাঁধলেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরানো থাকত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুরতে হলেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চলতে হত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌঁছিতে জানলেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়। আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

৩

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হয়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দেব পথেব যাত্রী দেখে, মানবজীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে, অন্ন চিবদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে, তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহাত্ম্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষেব সভ্যতার যে যে মুক্তির কথা বলেছি সে হল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যখন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মতো এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে মানুষকে বন্দি করবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল অবস্থার পরিবর্তনে 'স্ট্র্যাটেজি'র প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয়নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপব কর্তৃত্ব করত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী হয়েছিল নিজেকে বিরল করে, আপনাকে দুর্লভ করে। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে এই উপায়টা ব্যর্থ করল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হত, তা হলে নামে প্রভু হলেও রোমের শেষ সম্রাটদের মতো মানুষ দাস-অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নের এখন চেষ্টার বিষয় হয়েছে

মানুষের সভ্যতার ওই বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংস করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মোহিনী মূর্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হতে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হয়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা জয়ী হয়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হয়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্তমান কল্পনার মতো এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়তো কেবল স্বপ্ন। হয়তো মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে চলতে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে, কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে যারা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে আনন্দের পথে চলতে পেরেছে। ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙালি সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের মাথায় বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্যরশ্মি বিজয়মাল্যের মতো এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষীদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা করে কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ করতে পারবে না।

'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ'; অন্নের নিন্দা করিনে। 'অন্নং বহুকুর্বীত'; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার বাহুল্যকেও বর্জন করা যায়। মহাকালের দর্শনেও ছিন্ন হতে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

এস নূতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! 'অথাতোঽন্ন জিজ্ঞাসা' বলে তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন মধ্যযান পথের পথিক হলে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্মলোক হতে ফিরে আসতে না হয় তার নির্ধারণ কর।

আশ্বিন ১৩২৪

রোম

জোর করে লেগে থাকলে দেখছি অসাধ্যও সাধন করা যায়। এভ্‌রিম্যানের অনুবাদে চার ভ্যলুম মমসেনের রোমের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। অবশ্য এ পুথির শেষে পৌঁছে দেখি গোড়ার দিককার অনেক কথা, মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে এসেছে। কেল্টজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার করুণ কাহিনি, স্যামনাইটদের রোমের নাগপাশ থেকে মুক্তির বৃথা প্রয়াসের ইতিহাসকে একরকম ঢেকে ফেলেছে। সিজারের জয়ধ্বনিতে, হ্যানিবালের স্তুতিগানও প্রায় ডুবে গেছে। সন তারিখের তো কথাই নাই। প্রথম থেকেই তার গোলযোগ শুরু হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত সব একাকার হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনারও লোপ ঘটেছে। মোট কথা, রোমের ইতিহাসে পরীক্ষা দিতে বসলে যে, সে পরীক্ষাতে ফেল হব এটা নিশ্চয়। তবুও ল্যাটিন জাতির বিজয়যাত্রার এই অধ্যায়গুলি, মমসেনের বর্ণনায় মনের মধ্যে যে দাগ কেটে গেছে, তা সহসা মুছে যাবে না। ভূমধ্যসাগরের চার পাশের যে ভূখণ্ডকে আধুনিক যুগের রোমের ঐতিহাসিকেরাও পৃথিবী বলেই উল্লেখ করেন, তার বহু রাজ্য ও বিচিত্র জাতিগুলির রোমের এক-রাট ও একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মনকে যে দোলা দিয়েছে, তার বেগ শেষ হতে কিছু সময় লাগবে।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মমসেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংবেজি অনুবাদের বাংলা তর্জমা করে দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই করব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বলতে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্নতত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য— এ দুয়েব অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়তে শুরু করেছেন তাঁরা হয়তো আর অগ্রসর না হলেই ভাল করবেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উলটে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা একবার শেষ পর্যন্ত পডবার চেষ্টা কবলেও করতে পারেন।
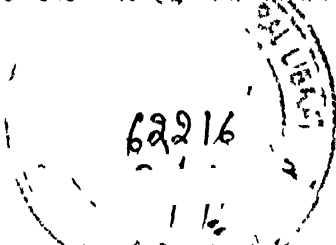
প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাস্টারমশায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাকতে তাঁরা যে কেমন কবে হিন্দুসভ্যতার মতো এমন দুর্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে বসলেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেমনি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানারকম সম্ভব-অসম্ভব, অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক', মতবাদের প্রচার করেছেন। গল্প আছে, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লস রয়েল সোসাইটির নতুন প্রতিষ্ঠা করে পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে, মাছ মরলেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে গলদঘর্ম হয়ে গেলেন। অবশেষে একজন বললেন, আচ্ছা দেখাই

যাক না ওজন করে, মাছটা মরলেই তা যথার্থ বেশি ভারী হয়ে ওঠে কি না। মমসেনের বিপুলায়তন পুথি শেষ করে এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমান-সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হালকা বলেছেন, 'সভ্যতা' বলতে তাঁরা কী বোঝেন? সভ্যতার কোন মাপকাঠিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমানসভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোখ ঝলসে গেছে, এ তো একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারই সাহায্যে উত্তরের ইট্রাসকানদের ধ্বংস করে ইতালির আর সকল জাতিগুলোকে পিষে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়ানের ওপারের প্রবল রাজ্যটি, সিসিলির সেতু পার হয়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কাতেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালির সাহায্যে তাকে সমূলে উচ্ছেদ; এবং কার্থেজের অধিনায়ক 'হ্যামিলকার বারকা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা শুরু করে বজ্র হয়ে রোমের মাথায় ভেঙে পড়েছিল বলে, শত্রুর শেষ রাখতে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্যবিস্তার। এমনি করে দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পুবের দিকে। গায়ে জোর থাকলে এ 'আশঙ্কা'র তো আর শেষ নাই! পুবে তখন ছিল আলেকজেন্ডারের ভাঙা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুকরো। ওরই মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল— ম্যাসিডন আর এশিয়া, তারা তখন রোমেরই মতো আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে রাজ্য ও বলবৃদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ করতে হল; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেঁটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি নড়াচাড়া না করে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হল। এমনকী সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর করলে না। ইতালিতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। তারই গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রিসের ছোট ছোট নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশিদিন খেলতে পারল না। কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হল— স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা করতে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রিসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে, ম্যাসিডনের আবার মাথা তুলবার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ করল, তখন এই পুবের দেশগুলির আধা স্বাধীনতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজাসুজি এদের করায়ত্ত করে নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাকল না। এর পর রোমান চোখের দিকচক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকি থাকল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হল না। অবস্থা দেখে তারা

আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা ঠেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠল তখন কাজে কাজেই তার 'বৈজ্ঞানিক চৌহদ্দি'রও খোঁজ পড়ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথরেডেটিস-এর রোমের শিকল ভেঙে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পুব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেকল এবং স্বয়ং জুলিয়স কেল্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলান্টিক পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও আবির্ভাব হতে খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। কেননা তিনশো বছর রাজ্যজয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হয়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিনশো বছর ধরে এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোনওরকমেই আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা করলেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটিজেনে'র অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাবজেক্ট'। উঁচু আশা ও বড় আকাঙ্ক্ষার তাড়না না থাকলে যে শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ করতে লাগল। ঘরকন্নার ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন-কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে উঠল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মতো রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর ছেড়ে আটলান্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় করল। তারই তীরে তীরে নবীন সব জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হল।

৩

এই যে ছয়-সাতশো বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিক্যাল ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনিরও এই হল অন্তত চোদ্দো আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কথা দূরে থাক, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নিচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের সামনে থাকতে নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগস্টাসের সভাকবি তাঁর যুগের আত্মবিস্মৃত রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলছেন, 'জানি আর আর সব জাতি আছে যারা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাস খুঁড়ে বের করতে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্তা এঁকে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেঁথে লোকের করতালি নিতেও তারা পটু, কিন্তু রোমান, এসব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হল— সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উঁচুমাথাকে যুদ্ধে নিচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান।' 'এনিড' যে

ইতিহাস নয়, কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানোর কথা বলে ভার্জিল বোধ হয় তারই ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যাহোক, লাতিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটি আধুনিক কালের রোমানতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও একরকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরই মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতে হলে জাতির মধ্যে যে বীর্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বললে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হতে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি, নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মমসেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীর সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাব গণনা করে চোখের সুমুখে যখনই যাকে প্রবল বা বর্ধিষ্ণু দেখেছে তারই বুকের উপর পড়ে তার জীবনের বল নিঃশেষে শুষে নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না করেই পারে না; খ্রিস্টান ও পারসি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রোমের এই প্রবল পলিটিক্যাল সভ্যতা, কেবল সমসাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে রাখেনি, কিন্তু উত্তরকালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে রেখেছে। প্রাণতত্ত্ববিদেরা হয়তো বলবেন মানুষ পশুরই বংশধর; শক্তির বিকাশ দেখলেই পূজা না করে থাকতে পারে না। মমসেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মতো রাষ্ট্র গড়তে পারেনি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খতা। কেননা গ্রিক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে, গ্রিসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রিসে জাতীয় একত্বের যখনই বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপিডিসের নাটক, এইসবই ছিল হেলাসের ঐক্য বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস কি আরিস্টফেনিসের জন্ম দেয়নি বলে রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্মমভাবে দমন করেছে। ফলে হয়তো ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে পড়েছে; কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও 'পেট্রিয়টিজম', গ্রিসের জীবনে যার কোনওদিন প্রবেশ ঘটেনি। এবং প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয়-ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হয়েছে। সেই জাতীয়-ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলিনিক জাতির উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হয়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে 'পুরুষের' শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই 'পরা গতি'। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানবসভ্যতার 'পুরুষ', তার 'কাষ্ঠা' ও 'পরা গতি'! এ প্রভুত্ব তো কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয়; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েকখানি নাটক রয়েছে। এগুলি তো কেবল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশশো বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মতো আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানবসভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হয়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান করবে। আর রোমের প্রভুত্ব?— সেটি রয়েছে— ওই মমসেনের পৃষ্ঠায়। এই যে প্রভেদ, এ তো মমসেনের চার ভল্যুমও মুছে ফেলতে পারে না। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে আপস-মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর-একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা বয়ে যাচ্ছে— কেবলই কালের মধ্য দিয়ে— জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নূতন জাতি, নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট করছে, কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংস নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে তো পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ চিরনূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্মাণে, শৌর্যে, বীর্যে, মহত্ত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। হোক না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপুর। কিন্তু মানুষ তো কেবল জীব নয়। সে যে মর-অমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হয়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তো চিরদিন সমান মধুর।

দুই সভ্যতার যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা করতে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই অক্ষয় ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপকাঠিতে মাপলে, রোমান সভ্যতা গ্রিক কি হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যত দিন তার সাম্রাজ্য ছিল, তত দিন তার বলের কাছে— সবারই মাথা নিচু করে থাকতে হয়েছে। কিন্তু উত্তরকালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্ভ্রমে নতশির হবে? তাদের জন্য তো সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে রেখে যায়নি। তার যা প্রধান দাবি, তার পলিটিক্যাল শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা তো তার সমসাময়িকেরা একরকম ষোলো আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবির জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চোদ্দো আনা হল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনি হলেও জীবন নয়, কেবলই কাহিনি। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসি পণ্ডিত রোমানদের

দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সেগুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মতো মনে হলেও যাদের জন্য সেগুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝতে হলে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে-সব মিলিয়ে পড়তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

৪

রোমের পলিটিক্যাল গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে যায়নি। সেই জন্য ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে কতটা ঋণী, মমসেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই— রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্তমান ইউরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্বপুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখত, তবে তারা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে তাকে ধ্বংস করেছিল, সে ঘটনাটি ঘটত আরও চারশো বছর আগে। এবং তা হলে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে— স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারেনিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে উঠত না। আর তার ফল হত এই যে, ওই অর্ধ-সভ্য জাতিগুলি ওই সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা কখনও গড়তে পারত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা একরকমে ঘটে গেছে, সেটা সেরকম না ঘটে অন্য রকম ঘটলে তার ফলাফল কী হত এ তর্ক নিরর্থক। তাতে 'স্বপ্নলব্ধ' ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্বিবাদেই দেওয়া যাক। কিন্তু এ তো রোমান সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনি নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চারশো বছর ধরে রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেননি! আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেননা রোম যদি আরও চারশো বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখতে পারত, তবে তো আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা আরও চারশো বছর পিছিয়ে যেত এবং হয় তো সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠতে পারত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চারশো বছর ধরে পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হল কী? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিক্যাল সভ্যতা— রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাসনের সভ্যতার উপর একটা বিস্তৃত ভাষ্য।

বিস্তীর্ণ বাগানের চার পাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নষ্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, কিন্তু বাগানে ফুলও ফুটল না, ফলও পাকল না।

৫

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের দিকেই টানবে। যেই যখন শক্তিশালী হয়ে উঠবে তারই মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভেরই পথ। এ যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মমসেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মমসেন এই বলে আরম্ভ করেছেন— 'যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার জো নেই তেমনি এও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হয়ে গড়ে উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস করবে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশীদের উচ্ছেদ করবে। এই নিয়মের বলে ইতালি জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণভাবে এবং কতটা বহিরাবরণের মতোই ছিল) পুবের গ্রিকদের, যাদের ধ্বংসের সময় পূর্ণ হয়ে এসেছিল, তাদের করায়ত্ত করতে, এবং পশ্চিমের কেল্ট জার্মনদের, যারা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন করতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।'

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবি হয়তো হেগেলের 'লজিকে'ও মিলবে না। সে যাই হোক এ 'নিয়ম' ও 'অধিকারের' মুশকিল এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাকতে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ 'অধিকার' প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বসতে পারলেই প্রমাণ হল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর তাই হল এ অধিকার প্রমাণের একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাকলেই যখন 'অধিকার' আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না করলে তো শক্তিটা ঠিক আছে কি না তা আগে থেকে অমনি জানবার উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ফেল হলেও 'হলে' ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে? গেল চার বছর ধরে এই পরীক্ষাটা সারা ইউরোপ জোড়া চলছে। মমসেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তাঁর প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয়নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্মনির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্মনির পক্ষে অগৌরবের কীসে? আজকাল পলিটিক্‌সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিক্যাল শক্তি ও সভ্যতার স্তুতিগান— এ মূলে হল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি 'অধ্যাস', —একের ধর্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে আসছে আর কোনও 'লিগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লিগের' একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যারা আসবে না তারা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের এজমালিতে দমন করা চলবে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়— পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়— ধ্বংসের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হল 'অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয়' হলে তো 'অধ্যাসে'রও উৎপত্তি হয় না।

আশ্বিন ১৩২৫

আর্যামি

আমাদের আদিম আর্য প্রপিতামহেরা ধরাপৃষ্ঠের ঠিক কোন জায়গা থেকে যাত্রারম্ভ করে যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন, সে প্রশ্নের একটি নিশ্চিত জবাব দেওয়া শক্ত। তাঁরা কি মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম দিকটায় ভেড়া চরাতেন, না নরওয়ের উত্তর-মাথায় মাছ শিকার করতেন, এ তর্কের কোনও মীমাংসা হয়নি। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যে যব তাঁরা সকলে মিলে নিঃসন্দেহই খেতেন, তা তাঁদের চাষ করে-পাওয়া, না ইউফ্রেটিসের তীরের বুনো যব, সে বিষয়েও মহা মতভেদ রয়েছে। তারপর তাঁদের সবারই মাথার প্রস্থের একশো গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যে কখনওই পঁচাত্তরের বেশি হত না, একথা আর এখন কোনও পণ্ডিতই হলপ করে বলতে রাজি নন। বরং শোনা যাচ্ছে যে, যেমন আমাদের বাঙালি ব্রাহ্মণেরা সবাই এক আর্যবংশাবতংস হলেও তাঁদের চেহারায় এ-মিলটা ধরার জো নেই, কেননা কেউ কটা কেউ কৃষ্ণ, কারও মাথা গোল কারও চেপটা, তেমনি আদিম আর্যদের মধ্যেও চেহারার এই গরমিলের দিকেই প্রমাণের পাল্লাটা নাকি বেশি ভারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকী একদল কালাপাহাড়ি পণ্ডিত এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছেন যে, আর্য বলে কোনও একটা বিশিষ্ট জাত, অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট জাত যাকে ওই এক নামে ডাকার কোনও বস্তুগত কারণ আছে, কোনওদিনই কোনওখানে ছিল না। ওটা একটা ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, 'ওয়ার্কিং হাইপথিসিস'।

যেমন গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে করে প্রাচীন ও আদিম আর্যজাতির অদৃষ্টে কী আছে বলা কঠিন। আসছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা বিধাতার সৃষ্টি বলে কায়েম হয়েও বসতে পারেন, আবার মানুষের কল্পনা বলে বাস্তব পদার্থের লিস্টি থেকে তাঁদের নামও কাটা যেতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আর্যজাতির কপালে যা-ই ঘটুক, তাঁরা বস্তু হয়ে চেপেই বসুন, আর অবস্তু হয়ে উড়েই যান, 'আর্যামি' বস্তুটির তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। যারা মনে করে, কারণ না থাকলেই আর তার কার্য থাকে না, তারা না পড়েছে দর্শনশাস্ত্র, না আছে তাদের লৌকিক জ্ঞান। 'নিমিত্ত' কারণ যে একটা কারণ, একথা আরিস্টটল থেকে অন্নভট্ট পর্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এবং ও-কারণটি নিজে ধ্বংস হলেও তার কার্য ধ্বংস হয় না। যেমন নিজের বোনা কাপড়খানির পূর্বেই তাঁতি বেচারির জীবনান্ত ঘটতে কিছুই আটক নেই। আর পুথি ছেড়ে সংসারের দিকে চেয়ে দেখলেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ চোখে পড়বে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু 'পাবলিসিটি বোর্ড' চলছে; জার্মনভীতি ঘুচে গেল অথচ 'রিফর্ম স্কিম' নিয়ে আমাদের তর্ক শেষ হয়নি; এমনকী বিলাতের কলের মজুরেরা যেমন যুদ্ধের মধ্যে দুবেলা পেটপুরে খেয়েছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি চলুক বলে হাঙ্গাম উপস্থিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত গোড়ার কথা এই যে, 'আর্যামি'র সঙ্গে 'আর্যের' আসলে কোনও কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আর্যজাতি পৃথিবীতে যতই প্রাচীন হন না কেন, 'আর্যামি' জিনিসটি যে মনুষ্য সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। ব্যুৎপত্তি দিয়ে বস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা করে শুধু এক বৈয়াকরণ; এবং ও-জাতটি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা সর্ববাদিসম্মত। 'আর্যামি' হল মানুষের সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ, বিলাতি পণ্ডিতদের মতে যাতে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ তফাত, অর্থাৎ তার 'সেল্‌ফ্ কনশাসনেস'; আর দেশিতত্ত্বজ্ঞদের মতে যার সম্পূর্ণ বিনাশ, অথবা যা একই কথা— চরম বিকাশই হচ্ছে পরামুক্তির পথ, অর্থাৎ অহংজ্ঞান। সমাজতত্ত্ববেত্তারা বলেন, মানুষ যে পরের মধ্যে নিজের সাদৃশ্য দেখে, তাতেই সে অপরের সঙ্গে সমাজ বেঁধে ঘর করতে পারে। এই সাদৃশ্যবোধ হল সমাজবন্ধনের একটা পোক্ত শিকল। কিন্তু সবাই জানে ভিন্ন জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্যজ্ঞানটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ হচ্ছে একইরকম জিনিসের মধ্যে থেকে তফাত বের করা। সুতরাং মানুষ যখন সূক্ষ্মবুদ্ধির জোরেই করে খাচ্ছে, তখন তার বুদ্ধির স্বাভাবিক ঝোঁকটা হল পরের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য নিয়ে খুশি না থেকে, এই মিলের মধ্যে অমিল কোন কোন জায়গায় তাই খুঁজে বের করার দিকে। আর এ খোঁজে কাকেও ব্যর্থ হতে হয় না। কেননা একে তো লাইবনিজ প্রমাণই করে গেছেন যে, সংসারে দুটি বস্তুর ঠিক একরকম হবার কোনও জো-ই নেই; আর লাইবনিজ ছিলেন একজন দিগ্‌গর্জ গণিতজ্ঞ লোক। তারপর সবাই নিজেকে জানে সাক্ষাৎভাবে, অন্য সকলকে পরোক্ষে। আমার বুদ্ধি আমার কাছে স্বপ্রকাশ, অন্যের বুদ্ধি আছে কি নেই, সেটা অনুমানের কথা। কাজেই আমি যে অন্য সকলের চেয়েই ভিন্নরকমের, এবং মোটের উপর এ-রকমটি আর হয় না, এ জ্ঞান যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। নিজের সম্বন্ধে এই মর্মগত বোধটা লোকে যখন প্রকাশ করে ফেলে, তখন তার নাম হয় 'অহংকার', দ্বিতীয় ভাগ থেকে বেদান্তগ্রন্থ পর্যন্ত সবাই যার

একটানা নিন্দা করেন। আর এ ভাবটি যখন একটা দলকে ধরে প্রকাশ হয়, তখন সেই বস্তুটিই হল 'আর্যামি'। কেবল দলের প্রকারভেদে নামের রকমভেদ ঘটে, যেমন আভিজাত্য, ব্রাহ্মণত্ব, পেট্রিয়টিজম, অ্যাংলো-স্যাকসনত্ব ইত্যাদি। এবং ভাট, চারণ, কবি, ঐতিহাসিক সকলে মিলে মানুষের সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এর জয়গান গেয়ে আসছে।

সংসারে এমন সব সরলবুদ্ধির লোকও আছে যারা প্রশ্ন করে বসে ব্যক্তির পক্ষে যেটা দোষের, সমাজ বা জাতি, অর্থাৎ ব্যক্তিসমষ্টির পক্ষে সেইটিরই বর্ধিত সংস্করণ বা 'এনলার্জড এডিশন' কেন প্রশংসার?— অবশ্য এর সোজা উত্তর এই যে, ব্যক্তি আর জাতি এক নয়, কেননা যদি তা হত, তা হলে ও-দুয়ের নাম এক না হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন! উক্তরূপ প্রশ্নকর্তাদের পাণ্ডিত্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা নেই; না হলে জার্মন, অ-জার্মন সবরকম পণ্ডিতের প্রাচীন নূতন নানা মত তুলে এ-ও দেখানো যেত যে, জাতি বা 'স্টেট' জিনিসটা মোটেই ব্যক্তির সমষ্টি নয়। কেননা ও-নিজেই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার একটা নিজস্ব গুণ, ইচ্ছা, অনুভূতি আছে, যা জাতি বা স্টেটের লোকদের গুণ, ইচ্ছা ও অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র, মোটেই তার সমষ্টি নয়। অর্থাৎ দেশের সব লোক দরিদ্র হলেও দেশটা ধনী হতে কোনও আটক নেই। আর এ-কথা যে ঠিক, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোককেই তা স্বীকার করতে হবে। এইসব সূক্ষ্ম অথচ প্রকাণ্ড তত্ত্ব যাদের বুদ্ধির অগম্য তাদের জন্য একটা সহজ ছোট উত্তর দেওয়া যাচ্ছে। কারু নিজের সম্বন্ধে অহংকার প্রকাশ করাটা যে, সমাজে নিন্দার কথা, তার কারণ ওই এক অহং-এর খোঁচা আর সকল অহং-এর গায়ে লেগে তাদের ব্যথিত করে তোলে। কিন্তু একটা গোটা দলকে ধরে যখন এটি প্রকাশ হয়, তখন দোষটা আর থাকে না। এবং এতে দলের সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশ্য একদলের অহংবোধটা অন্য আর একদলের গায়ে লাগেই লাগে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। কেননা আমাদের যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি, নিষেধ, সে সবই হল ছোট হোক বড় হোক কোনও একটা দলের লোকদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে লক্ষ্য করে। একদলের সঙ্গে আর একদলের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা এ-সব কোনও কিছুরই লক্ষ্য নয়! সেইজন্য লোকের সঙ্গে কথায় ও কাজে যে লোকের ভদ্রতার সীমা নেই, সেই লোকই একটা সমস্ত জাতির সম্বন্ধে কথায় বা ব্যবহারে কোনওরকম ভদ্রতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। যে লোক জীবনে কাকেও কোনওদিন কড়া কথা বলেনি, সেও দল বেঁধে একটা গোটা দেশকে পেষণে ও শোষণে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

আধুনিক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে 'ইন্টারন্যাশানাল ল' বলে যে আপসি ব্যবহারনীতির চলতি আছে, সকলেই জানে যে, তার গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের যে-সব নিয়মকানুন গড়ে উঠেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যবহারে সেইগুলিকে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ডাচ পণ্ডিত হুগো গ্রোসিয়াসকে এই আন্তর্জাতিক ধর্মশাস্ত্রের প্রবর্তক বলা চলে। এ সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেছেন তিনিই জানেন যে, রোমান ব্যবহারশাস্ত্রে লোক-ব্যবহারের যে নিয়মগুলি সর্বসাধারণ, সুতরাং স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়েছিল, গ্রোসিয়াস সেইগুলিকেই তাঁর মৈত্রীবিগ্রহ সংহিতার ভিত্তি করেছিলেন। ব্যক্তির নীতিকে সমষ্টির রীতি করে তোলার এই চেষ্টা কতদূর সফল

হয়েছে, ১৯১৪ সালে তার একটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, এবং ১৯১৮ সালেই তার শেষ হয়েছে এমন মনে করবার কোনও সংগত কারণ নেই।

একটা অবান্তর কথা দিয়ে 'আর্যামি'র এই উৎপত্তি পর্বের অধ্যায় শেষ করা যাক। ইংরেজ-দার্শনিক হব্‌স্ গ্রোসিয়াসেরই সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, আদিতে মনুষ্য-সমাজ রাষ্ট্রবদ্ধ ছিল না। এবং কাজেই পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মও চলতি ছিল না। সে ছিল একটা নিত্য বিগ্রহ বিবাদের যুগ, যখন প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু, এবং সবারই হাত তখন সবারই বিরুদ্ধে তোলা থাকত। এই ভয়ানক দুরবস্থাটা মোচন করবার জন্যই সবাই মিলে একটা 'স্টেট' গড়ে তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, এবং 'স্টেট' পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের আইন-কানুন বেঁধে দিয়ে বৈষম্যের জায়গায় শান্তি এনেছে। বহু পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন এবং এখনও করছেন যে, হব্‌সের এই কল্পনাটা একেবারে অনৈতিহাসিক। মানুষ কোনওদিনই সমাজ ছাড়া ছিল না, এবং কোনও রাষ্ট্র-গড়ার মজলিসের প্রসিডিং, কি পাথরে কি তামায়, এ পর্যন্ত কোনও পুরাতত্ত্ববিদই আবিষ্কার করতে পারেননি। কিন্তু একটা সন্দেহ মনে না এসে যায় না। মানুষের আদিম অবস্থার এই যে কল্পনাটা সেটা হব্‌স্ নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ থেকে। অর্থাৎ গ্রোসিয়াস চেয়েছিলেন, লোক-ব্যবহারের নীতি নিয়ে এই সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করতে, আর হব্‌স্ কল্পনা করেছিলেন, এই নীতি নিয়ম প্রচলনের পূর্বে লোকের সঙ্গে লোকের সম্বন্ধ ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধেরই মতো। পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে গ্রোসিয়াসের বিখ্যাত পুথির ছাব্বিশ বছর পরে হব্‌সের 'লিভিয়াথন' প্রকাশিত হয়।

২

আর্যামির জন্মরহস্যটা একবার প্রকাশ হলে তার জীবন-চরিতের হেরফেরগুলো বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

বড় হোক, ছোট হোক একটা দলের নাম দিয়ে নাকি এ জিনিসটিকে চালাতে হয়, তাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে অল্প-বিস্তর মোটারকম বাহ্যিক লক্ষণের উপরেই দাঁড় করানো ছাড়া উপায় থাকে না। গায়ের চামড়ার রং, মাথার খুলির মাপ, সাগরবিশেষের পশ্চিম পারে কি পর্বতবিশেষের উত্তর ধারে নিবাস স্থান, খাবার জিনিসে নাইট্রোজেনের প্রাচুর্য কি স্নেহ-পদার্থের আধিক্য, পূর্বপুরুষ ঘোড়ায় চড়ে বর্শা চালাতেন কি মাটিতে দাঁড়িয়ে তির ছুড়তেন, এইরকম যাহোক কিছু একটার উপরেই একটা প্রকাণ্ড অভিমানের ইমারত গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই চর্মাস্থি-বিদ্যা, ভৌগোলিক-তথ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার এর প্রত্যেকটিরই 'ইনুয়েন্ডো' বা ইঙ্গিত হচ্ছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির এক একটি লম্বা ফর্দ। এ-সব লক্ষণের সঙ্গে এ-সব গুণের কোনওরকম 'অন্যথা সিদ্ধিশূন্য' বা নিত্যসম্বন্ধ আছে কি না সে সন্দেহে আর্যামির অভিমানকে কখনও সংকুচিত হতে হয় না। কেননা লক্ষণগুলি হল

বাহ্যিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, আর গুণগুলি হল নিগূঢ় অর্থাৎ আনুমানিক। প্রত্যক্ষ নিয়ে তর্ক চলে না, আর তর্কের ভূমিই হল অনুমান। এবং তর্ক জিনিসটার সুবিধা এই যে, এ ব্যাপারে পরাজয় নির্ভর করে বিপক্ষের শক্তির উপর নয়, নিজের ইচ্ছার উপরে। নিজে স্বীকার না করলে তর্কে হার হয়েছে, এ অবশ্য কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কেননা সেইটিই হবে আবার একটা তর্কের বিষয়।

ব্যক্তির অহংকারের চেয়ে সমষ্টির অহংকারের একটা শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, একা একা যা নিয়ে কোনওরকমেই অহংকার করা চলে না, দল বেঁধে তাঁকেই একটা দুর্জয় অহংকারের কারণ করে তোলা যায়। এক যুগের ফরাসিরা সে যুগের ইংরেজদের বুদ্ধিসুদ্ধিতে বিশেষ মুগ্ধ না হয়ে, তাদের নাম দিয়েছিল 'জনবুল'। আজ ইংল্যান্ডের খবরের কাগজ লেখকেরা এই নামটাকেই একটা উৎকট জাতীয়-অভিমান প্রকাশের রাস্তা করে তুলেছে। এ-জাতির বুদ্ধি যে একটু মোটা বলে বোধ হয়, তার কারণ এ-বুদ্ধি হালকা নয়, গুরুতর রকমের ভারী; এতে যে বেশি ঢেউ খেলে না, এর অতলস্পর্শ গভীরতাই হল তার কারণ; এ জাত যে চট করে একটা 'থিয়োরি' কি 'আইডিয়েল' নিয়ে মেতে ওঠে না তার কারণ এদের স্থির 'প্র্যাকটিক্যাল' বুদ্ধি; ফরাসির মতো এদের সাম্য ও স্বাধীনতা এক দিনে কুড়িয়ে পাওয়া নয়, কারণ নজিরের পর নজির ধরে ক্রমশ এর আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে, সেইজন্য গতিটা একটু মন্থর। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, 'জনবুলত্বের' এত গুণব্যাখ্যান সত্ত্বেও কোনও ইংরেজ এটা স্বীকার করতে রাজি হবে কি না, তার নিজের বুদ্ধিটা আপাতদৃষ্টিতেও একটু মোটা, যতই গুরুত্ব এবং গভীরতা সে দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হোক না কেন। অর্থাৎ 'জনবুলত্বের' উপর জাতীয়-অভিমান অনায়াসে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে ওটাকে নিয়ে অহংকার দেখানো একটু শক্ত। বোধহয় ঠিক এই কারণেই আমাদের জাতীয়-চরিত্রের দুর্বলতাগুলিকে লজ্জা দিয়ে বিদায় করবার জন্য প্রবন্ধে, গানে, বক্তৃতায় যে-সব চেষ্টা হয়েছে, তাতে তেমন আশানুরূপ ফল দেখা যায় নাই। কেননা লজ্জা জিনিসটা মানুষে পায় কোনও কারণে দল থেকে তফাত হয়ে পড়তে হলে। সুতরাং সবাই মিলে দল বেঁধে লজ্জা পাওয়াটা বড় একটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বরং জাতীয়-জীবনের অবস্থা দেখে সবাই মিলে যে লজ্জা পাওয়ার চেষ্টা করছি এই ব্যাপারটিকেই একটা অহংকারের কারণ করে তোলা কিছুই কঠিন নয়।

৩

'আর্যামি' যত রকমের আছে, বলা বাহুল্য, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে জন্মগত 'আর্যামি'। এর কারণও খুব স্পষ্ট। জন্মকে ভিত করে 'আর্যামি'র অহংকার দাঁড় করানো যেমন সহজ, এর শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্ধাটাও হয় তেমনি গগনস্পর্শী। জন্মের উপর যে জীবের গুণাগুণ নির্ভর করে তা ঘোড়ার বংশে যখন ঘোড়া আর গোরুর বংশে গোরুই জন্মাচ্ছে তখন অস্বীকার করবার জো নেই। আর ভেদটা কেবল পৃথক-জাতীয় ভেদ নয়, স্বজাতীয় ভেদও বটে সে কথা নবীন

লেখক হাউস্টন চেম্বারলেইন ও প্রাচীন ঋষি বশিষ্ঠ[1] দু'জনেই তেজি ঘোড়ার উঁচু বংশের দৃষ্টান্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং জন্মের উপর শ্রেষ্ঠতার দাবিকে ভিত্তিহীন বলে সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না, এবং এ দাবি উপস্থিত করতেও এক জন্মানো ছাড়া আর কিছুই অপরিহার্য নয়। কোনও বিশেষ বংশের সঙ্গে বিশেষ গুণের যোগাযোগ আছে কি না সে তর্ক তোলা যায় বটে, কিন্তু এর মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা না থাকাতে কারও কোনও ভয়ের কারণ নেই। বর্তমান বংশধরদের মধ্যে গুণটা না থাকলেই যে সে গুণ বংশে নেই এটা একেবারেই প্রমাণ হয় না। কেননা বর্তমানে হয়তো ওটা 'লেটেন্ট' ভাবে রয়েছে, ভবিষ্যবংশীয়দের মধ্যে ঠিক ফুটে বেরোবে! 'অ্যাটেভিজম' যে একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তো ডাবউইনের পুথিতেই রয়েছে! 'জার্‌ম্‌ প্ল্যাস্‌ম্‌' জিনিসটি যে অমর, সে তথ্য বাইস-ম্যানই প্রমাণ করে গেছেন।

আর এই সহজ দাবিটির বহরই বা কী বিরাট। এ যে শ্রেষ্ঠত্ব, এ মিশে রয়েছে একেবারে রক্তের সঙ্গে, তৈজস-নাড়ির অণুতে অণুতে। যার সঙ্গে সে রক্তের সম্পর্ক নেই, সে সারা জীবন তপস্যাতেও এর কাছে ঘেঁষতে পারবে না। অথচ এই দুর্লভ মহত্ত্ব যারা পেয়েছে তারা পেয়েছে একবারে বিনা আয়াসে; মিতাক্ষরা বংশের ছেলের মতো কেবলমাত্র জন্মের জোরে ও জন্মের সঙ্গে। একে লাভ করতেও যেমন আয়াস নেই, বজায় রাখতেও তেমনি কষ্ট নেই। কেননা এ শ্রেষ্ঠত্বকে ঝেড়েও ফেলা যায় না, এর নষ্ট হবারও ভয় নেই। সহজ কথায় জন্মগত আর্যামিটি হচ্ছে দল বেঁধে প্রতিভা ও আরও কিছু উপরির দাবি। কেননা প্রতিভারও উত্তরাধিকার নেই।

এ-কথা বোধহয় আর না বললেও চলে যে, মিত্তির বংশের গৌরব ও নয়নজোড়ের বাবুয়ানা থেকে আরম্ভ করে কুলীনত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব, শ্বেতচর্মত্ব এবং অবশেষে আর্যত্ব পর্যন্ত সবই হল জন্মগত আর্যামিরই প্রকারভেদ। এর প্রতিটিই একটা-না-একটা আস্ত দলের পক্ষে অসাধারণত্বের দাবি। অবশ্য কোনও দল ছোট, কোনওটি মাঝারি, কোনওটি অতি প্রকাণ্ড। কিন্তু সর্বত্রই দলের লোকদের পরস্পর সম্বন্ধ হচ্ছে সপিণ্ড সম্বন্ধ, হয় বস্তুগত্যা, নয় কল্পিত। তবে এ সপিণ্ডত্বের সাত পুরুষে নিবৃত্তি হয় না। দরকার হলে একে ব্রহ্মার মুখ পর্যন্ত, কি আদি আর্যভূমির আদিম আর্য-দম্পতি পর্যন্ত অনায়াসে টেনে নেওয়া চলে। এবং যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা বোধহয় এর একটাকে আর একটার চেয়ে বড় বেশি অপ্রামাণ্য বলতে সাহসী হবেন না।

৪

জন্মগত আর্যামি এ পর্যন্ত যত রকমের দল ধরে প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দল হল আর্যত্বের দল। আর্যামি ও আর্যত্ব দুটি যে এক জিনিস নয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই প্রকারবিশেষ মাত্র, এতক্ষণের আলোচনায় এই কথাটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে; সুতরাং এর

(১) 'কুলোপদেশেন হয়োঽপি পূজ্য—
তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি ॥" (বশিষ্ঠ-সংহিতা)

পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই 'আর্যামি' বিশেষের দু'-একটি বিশেষত্বের আলোচনা না করলেই নয়। কেননা 'আর্যামি'র এই বিরাট প্রকাশটিকে একবার ধারণা করতে পারলেই আর্যামির স্বরূপ বুঝতে আর কিছু বাকি থাকবে না।

এই আর্যামির ছোটখাটো দাবিটি কতকটা এইরকমের— পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে যতসব জাতির আবির্ভাব হয়েছে, আর্যজাতি যে তাদের মধ্যে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ তা নয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব একবারে অতুলনীয়। আর্যেতর কোনও জাতির সঙ্গে শরীরে কি মনে তার কোনও তুলনাই চলে না। আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত মানব-সভ্যতার যা কিছু সৃষ্টি তা সবই হয়েছে আর্যজাতির কোনও-না-কোনও শাখার হাত দিয়ে। অন্য সব জাতির সামান্য যা দান, তা সফল ও সার্থক হয়েছে, কেবল আর্য-মহারাজ তা গ্রহণ করে নিজস্ব করেছেন বলে। এ জাতির যা আচার, ব্যবহার, ধর্ম, সমাজ তাই হল সদাচার, সধর্ম, শিষ্ট সমাজ, আর এর বাইরে সবই 'অনার্য' ও 'বার্‌বারিক'। সুতরাং পৃথিবীর আধিপত্যে আর্যজাতির যে দাবি সে খাঁটি ন্যায়ের দাবি। গ্রিক-আর্য আরিস্টটল বলেছেন যে হঠাৎ যদি পৃথিবীতে একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যারা কেবল শরীরের আয়তনে ও গড়নে দেবতাদের মতো আর সব মানুষের চেয়ে তফাত ও শ্রেষ্ঠ তবে সবাই নির্বিবাদে স্বীকার করবে যে, আর সমস্ত লোকের উপর তাদের আধিপত্যের ধর্ম ও ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে। এবং যদি কেবল সামান্য দেহের সম্বন্ধেই এ কথা ঠিক হয়, তবে মনে যারা অসাধারণ সাধারণ লোকের উপর তাদের আধিপত্যের অধিকারটা কত বেশি! এই কথাটাই খুব অল্পের মধ্যে প্রকাশ করে তিনি বলেছেন যে, 'এক জাতির লোক স্বভাবতই স্বাধীন, আর এক জাতির লোকের স্বভাবই দাসত্ব।' এই হচ্ছে সার সত্য। কেননা স্বাধীনতা জিনিসটা মনুষ্যত্বের সামান্য ধর্ম নয় যে সব মানুষেরই তাতে কোনও অধিকার আছে; কারণ এ তো খুব স্পষ্ট যে, সে অধিকার নির্ভর করে স্বাধীনতার মুল্যোপলব্ধির ক্ষমতার উপর, যার ভিত্তি হল দেহের ও মনের শক্তি। এ কথা খুব নির্ভয়েই বলা চলে যে, অনেক জাতির লোক রয়েছে স্বাধীনতার কল্পনাও যাদের অজ্ঞাত। সেইজন্য দাসত্ব কি প্রভুত্ব দুই অবস্থাই তাদের সমান। যতটুকু উন্নতি তাদের সম্ভব, অবস্থাভেদে তার কোনও প্রভেদ ঘটে না। ইহুদি, চিনা, সেমিটিক ও অর্ধসেমিটিক জাতিগুলি এর দৃষ্টান্ত।

উপরের বর্ণনায় আর্যজাতির আধিপত্য-দাবির অংশটা, অর্থাৎ এ ন্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি, প্রসিদ্ধ লেখক হাউস্টন চেম্বারলেইনের 'উনবিংশ শতাব্দীর ভিত্তি' নামক অপূর্ব গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে দিয়েছি। চেম্বারলেইন জাতিতে ইংরেজ, শিক্ষায় জার্মন; এবং তাঁর পুথি রচনা করেছেন জার্মনভাষায়। যাঁরা চেম্বারলেইন-এর মতামতের খুব সদয় সমালোচক নন তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হাতের কলম হল সোনার কাঠি। বস্তুত সে কলম যে সলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিচিত্র ইতিহাসের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। তাঁর গ্রন্থের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা থেকে যে রসজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ, শ্রদ্ধা ও ঘৃণা, অনুরাগ ও বিদ্বেষের তীব্র আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে অল্প-বিস্তর চোখ না ঝলসে যায় না। কিন্তু আর্যজাতির পক্ষে এই যে সর্বাধিপত্যের দাবি, যা তাঁর পুথিতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার উপস্থিত করা হয়েছে, এর কদর্যতা ও

ভীষণতা চেম্বারলেইন-এর কলমের কালিতেও একটুকুও ঢাকা পড়েনি।

কেননা এর পাণ্ডিত্যের পোশাক আর যুক্তির মুখোশ খুলে ফেললে যা বেরিয়ে পড়ে, সে হচ্ছে আদিম নগ্ন বর্বরতা, যা নিজের দলের বাইরে কাকেও শত্রু ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে না। এবং হয় মৃত্যু নয় দাসত্ব এ ছাড়া সে শত্রুতার আর কোনও অবসানও কল্পনা করতে পারে না। হয়তো মানুষের ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল যখন সমস্ত জাতি মানুষের দল, কি আর্য কি অনার্য, এই মনোভাব নিয়েই প্রতিবেশী অন্য সব দলের সঙ্গে কারবার করত। এবং এও সম্ভব যে এই নির্মম বিরোধের উষ্ণ রক্তের স্পর্শেই মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে; তার সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যবহারে প্রাণ ও গতিসঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই যে আদিম ভয় ও বিদ্বেষ, লোভ ও নিষ্ঠুরতা, এ হল প্রকৃতির অদম্য ও অন্ধ শক্তিরই রূপান্তর। এ তর্ক করে না, যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের দোহাই পাড়ে না, সুন্দরবনের বাঘের মতো শিকার দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। দামোদরের বন্যার ধ্বংসলীলার মতো ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণে এরও কোনও বিচার চলে না। কিন্তু যখনই তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে, ন্যায়-ধর্মের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে জাতির উপর জাতির আধিপত্যকে, দলের সঙ্গে দলের শত্রুতাকে খাড়া রাখতে হয় তখনই বুঝতে হবে যে, সে জাতি প্রকৃতির গোড়ার ধাপ ছাড়িয়ে উঠেছে। কারণ সে জাতির কাছে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়েছে যে জাতির সঙ্গে জাতির, দলের সঙ্গে দলের এক শত্রুতার সম্বন্ধ ছাড়া অন্য সম্বন্ধ সম্ভব, এবং সেই সম্বন্ধই নিত্য ও ঘনিষ্ঠ। এ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ধর্মকেই ধর্মের বিচারে আশ্রয় করলে ধর্মও এখন তাকে বিচার করবে। প্রস্তাবনা ও প্রথম অঙ্ককে সমস্ত নাটকের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টানতে চেষ্টা করলে কাব্যের সৌন্দর্য তাতে কেবল আঘাতই পাবে।

মানুষের সভ্যতায় আর্যজাতির দান অনেক, হয়তো অপূর্ব ও অতুলনীয়। কিন্তু মানুষের উপর তার আর্যামির আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। আর্য-রোম অনার্য-কার্থেজকে একবারে ধুলা না করে তৃপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ অন্য একটা সভ্যতাকে একবারে ধ্বংস না করে নিজের সভ্যতাকে বজায় রাখবার কোনও পথ সে খুঁজে পায়নি। যে হিন্দু আর্য ওষধি ও বনস্পতিতে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করেছে, 'দস্যু' ও 'রাক্ষসে'র প্রাণের উপর সেও কোনও মায়া দেখায়নি। আধুনিক ইউরোপীয় আর্য দুটি মহাদেশ থেকে সেখানকার অনার্য অধিবাসীদের একেবারে মুছে ফেলেছে, এবং আর একটা মহাদেশ থেকেও মুছে ফেলবার চেষ্টায় আছে। এ চেষ্টার সমর্থনে যুক্তির অবশ্য অভাব নেই। এই উচ্ছেদ ও ধ্বংস না হলে যে আধুনিক আর্য-সভ্যতার যে গৌরব, তারও বিকাশই হতে পারত না। এই গরীয়সী সভ্যতাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়াই হল ধর্ম। এবং যাদের রক্তের মধ্যে এই সভ্যতা রয়েছে তাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া ছাড়া এর অন্য কোনও উপায় নেই। তাতে যদি অন্য সব জাতিকে পৃথিবী ছেড়ে গিয়েও এর জায়গা করে দিতে হয় মানবজাতির পক্ষে সেও মঙ্গল। লক্ষ্মণের কাছে অগস্ত্য-ঋষির পরিচয় দিতে রামচন্দ্র তাঁকে 'পুণ্যকর্মা' বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা তাঁর ত্রাসে দক্ষিণ দিকে 'রাক্ষসে'রা পা বাড়াতে সাহস না করায় সে দিকটা 'লোকদের' বাসের উপযুক্ত হয়েছে। এবং এ যুক্তির উত্তর দেওয়াও কঠিন। কেননা যা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে যা ঘটেনি তাকে ওজনে তোলা চলে না। বর্তমান আর্য-সভ্যতা না গড়ে

উঠলে আর্য অনার্য মিশাল সভ্যতা কীরকমের হত, কি তেমন কোনও সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারত কি না এ তর্ক এখন তোলা একবারেই নিষ্ফল, কারণ এর কোনওরকম মীমাংসার সুদূর সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের উপর আধিপত্য ও উচ্ছেদের দাবিটাও যে কত অচল, মানুষের সভ্যতার গোটা ইতিহাসটাই তার প্রমাণ। এ দাবির গোড়ার কল্পনা হল এই যে, যে জাতি একবার বড় হয়ে উঠেছে সে চিরকালই বড় থাকবে, এবং আর কেউ বড় হয়ে উঠতে পারবে না। অথচ যেসব জাতির পর জাতি এতকাল ধরে মানুষের সভ্যতাকে কখনও ধীরে কখনও দ্রুত গড়ে তুলেছে তাদের কেউ কারও বংশধর নয়। আজই কি হঠাৎ মানুষের সভ্যতায় এই ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলা থেমে গেল! অথচ চিরকালই তো যে মাথায় উঠেছে সেই মনে করেছে সে একেবারে অচ্যুত। এবং পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ জাতির পতন হলেও তার যে কেন সেটা ঘটবে না তার কারণ খুঁজে বের করতে কারও কখনও কষ্ট হয়নি। প্রতিদিন জীব যম-মন্দিরে যাচ্ছে দেখেও অমরত্বের কল্পনা আশ্চর্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও বেশি আশ্চর্য এই কল্পনা যে, যারা বেঁচে আছে তারা যে কেবল অমর হবে তা নয়, আর নতুন কারও জন্মও হবে না।

৫

আর্যত্বের 'আর্যামি' এতক্ষণ যা বর্ণনা করেছি সে হল তার একটা মাত্র দিক। কেননা ব্রহ্মের যেমন দুইরূপ, এ আর্যামিরও তেমনি দুই মূর্তি; সগুণ ও নির্গুণ, ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয়। বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে এর প্রথমটির বিকাশ হয়েছে ইউরোপের আর্য-সমাজে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ-প্রকাশ আর্যভূমি ভারতবর্ষে। পশ্চিম শাখাটি দাবি করছে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বেশ্বরত্ব; তার ক্রিয়ার দাপটে আর সকলের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একরকম রুদ্ধ। আর পুবের শাখাটি 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং', 'অপ্রাণ' ও 'অমন'। সকলেই জানে যে সগুণত্বের সিঁড়ি দিয়েই নির্গুণত্বে পৌঁছিতে হয়। ভারতীয় আর্যেরাও অবশ্য তাই করেছেন। ক্রিয়াশীলত্বের সিঁড়ি দিয়ে নিষ্ক্রিয়ত্বের ছাদে এসে পৌঁছেছেন। এটা যে পরমার্থের অবস্থা তাতে সন্দেহ নেই, কেননা 'একরূপে অবস্থিত যে অর্থ' তাই হল পরমার্থ। যাঁরা এ অবস্থা থেকে ভারতের আর্য-সমাজকে আবার সচল অবস্থায় নিতে চান তাঁরা 'ইভলিউশনের' গতিবিধির কোনও খবরই রাখেন না।

যাহোক, আর্যামির এই সগুণ ও নির্গুণ প্রকাশের মধ্যে একটি আন্তরিক মিল রয়েছে, কেননা এ দুই হলেও মূলে এক। সে মিলটি হচ্ছে যে, দুয়ের পথই বিবেকানন্দ যাকে বলেছেন 'ছুঁৎমার্গ', বাইরের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করা। তবে পশ্চিমের ওদের পথ হল আর সবাইকে তাড়ানো, আমাদের কৌশল হল সবার কাছ থেকে পালান। শেষ পর্যন্ত কোনটায় বেশি ফল হয় বলা কঠিন।

মানুষে মানুষে চরিত্র ও মনের শক্তির যে তফাত, জাতির সঙ্গে জাতির সে তফাতের চেষ্টার কোনও অর্থ আছে কি না, এবং থাকলে সেটা ঠিক কোথায় সে তর্ক না-হয় নাই তোলা

গেল। মেনে নেওয়া যাক, এ তফাত আছে। কিন্তু প্রভেদমাত্রই উঁচু নিচুর সম্বন্ধ নয়, এবং বর্তমান পর্যন্ত কাজের পরিমাণও একটা জাতির শক্তিসামর্থ্যের শেষ প্রমাণ নয়। কেননা মানুষের ইতিহাস কিছু শেষ হয়ে যায়নি যে, এখনই লাইন টেনে হিসাব নিকাশ আরম্ভ করা যেতে পারে। আজ যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, তারা ট্যাসিটাসের জার্মনেরই বংশধর। তখন দাঁড়ি টেনেছিলেন বলে ট্যাসিটাসের ঠিকে যদি ভুল হয়ে থাকে, তবে এখন দাঁড়ি টেনে স্টুয়ার্ট চেম্বারলেইন-এর ঠিকই বা শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা কোথায়! আর শ্রেষ্ঠত্ব, তার অর্থ যাই হোক, যদি প্রভুত্বের নিয়োগপত্র হয়, তবে তার শেষ কোথায়? আর্যত্ব এমনকী ইউরোপীয় আর্যত্বের সীমায় এসেই বা তার গতিরোধ হবে কেন? শ্রেষ্ঠের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতমের দাবি কেনই বা না চলবে! কেননা, 'আর্যামি' ভেদেরই মন্ত্র, মৈত্রীর বন্ধন নয়। শোনা যাচ্ছে যে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরেই ফ্রান্সের নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রুশিয়ানরা মোটেই আর্য-জাতির লোক নয়, তারা ইউরোপের প্রস্তর যুগের অধিবাসীদের একবারে অবিমিশ্র বংশধর। এবং সে যুগের য়ে-সব মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বর্তমান কালের যে মাথার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মিল, সে হচ্ছে প্রিন্স বিসমার্কের মাথা।

মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁরা সবাই অসাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও বিশেষ বংশ, কুল বা জাতি থেকে তাঁরা আসেননি। এবং নিজের বংশ, কুল বা জাতির সঙ্গে তাঁদের যে মিল তার 'চেয়ে অনেক বেশি মিল পরস্পরের সঙ্গে। শুদ্ধোদন যখন শাক্যকুলের সিদ্ধার্থের ভিক্ষুবেশ দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন তখন ভগবান বুদ্ধ তাকে বলেছিলেন যে, এই তাঁর কুলধর্ম; তাঁর বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা তাঁর পূর্বপুরুষ। প্রকৃতির এই যে ইঙ্গিত, এই হল মানুষের মিলনের সত্য পথের ইঙ্গিত। বংশ, কুল, জাতি কিছুই অসত্য নয়, কিন্তু সে সত্য হল ব্যাবহারিক। এরা কাজ চালাবার উপায়, কিন্তু মৈত্রীর সম্বন্ধ কাজের সম্বন্ধ নয়। এই কাজ চালাবার দলকে ধরে মানুষের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেমনা দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধ সব সময়েই থাকবে কাজের সম্বন্ধ, সে 'অ্যালায়েন্স'ই হোক, 'আঁতাত'ই হোক, আর 'লিগ অব নেশন'ই হোক। তাতে শান্তি আসতে পারে কিন্তু মৈত্রী আসবে না। কেননা মৈত্রীর জন্য চাই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, দলের সঙ্গে দলের আদান-প্রদান নয়। এবং সে কেবল তখনই সম্ভব, যখন বংশ, জাতি, রাষ্ট্রের প্রাচীর মানুষের চেয়েও উঁচু হয়ে উঠে দৃষ্টিকে বাধা না দেয়; যখন নামরূপের মায়া যা এক, তাকে বহু করে দেখানোর কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়।

বৈশ্য

মনু উপদেশ করেছেন, শূদ্র সমর্থ হলেও ধনসঞ্চয় করবে না। কেননা বহু ধনের গর্বে সে হয়তো ব্রাহ্মণকেও পীড়া দিতে আরম্ভ করবে। অথচ এই ভৃগুসংহিতা যে-সমাজের ধর্মশাস্ত্র তার ধনসৃষ্টি ও ধনসঞ্চয়ের কাজটি ছিল বৈশ্যের হাতে। এ বর্ণটি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রকারের এমন আশঙ্কা হয়নি, সম্ভব তার কারণ বৈশ্য ছিল আর্য সভ্যতার ভিতরের লোক—দ্বিজ। শাস্ত্রের শাসন ছাড়াও তার মনে এই সভ্যতার বাঁধন ছিল, যার টানে কেবল ধনের জোরে বিদ্যা ও বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলার কল্পনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বিংশ শতাব্দীর বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্মশাস্ত্রের বালাই নেই; সভ্যতার বাঁধনকেও সে একরকম কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে, তোমার কাজ হল আমার কারখানার কল-কবজা গড়া, কাঁচামালকে কেমন করে সস্তায় ও সহজে তৈরি মাল করা যায় তার ফন্দি বাতলানো; না হয় আমার খবরের কাগজে আমার মতলবমতো প্রবন্ধ জোগানো। শূদ্রকে বলছে, এসো বাপু! তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে, লেগে যাও আমার কলের কাজে; পেট-ভাতার অভাব হবে না। আর জেনো এই হচ্ছে সভ্যতা, এতে অসূয়া করা মানে দেশদ্রোহ, একেবারে সমাজের ভিত ধরে নাড়া দেওয়া। ক্ষত্রিয়কে বলছে, হুঁশিয়ার থেকো যেন এই যে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের তৈরি আমার কলের মাল দিকে দিকে ছুটল, জলে স্থলে এর গতিকে অবাধ রাখতে হবে, তোমার কামান, বন্দুক, জাহাজ, এরোপ্লেন যেন ঠিক থাকে। বিদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, নিজে গুঁড়ো হয়ে তাকে গুঁড়ো করতে হবে। তাতে দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে তোমারও অক্ষয় কীর্তি লাভ হবে, আমারও গোলাগুলি, রসদ, হাতিয়ারের কারখানার মুনাফা বেড়ে যাবে। আর ঘরেও তোমার কাজের একেবারে অভাব নেই। আমার কলের মজুরেরা অতিরিক্ত বেয়াড়া হয়ে উঠলে তাদের উপর গুলি চালাতেও মাঝে মাঝে তোমার ডাক পড়বে।

এই যে বৈশ্যপ্রভুর ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এই তিন বর্ণের এক ধর্ম, চতুর্থ বর্ণ বৈশ্যের শুশ্রূষা, এরই নাম 'ক্যাপিটালিজম' বা মহাজন-তন্ত্র। এর নাগপাশ গত একশো বছর ধরে ইউরোপীয় সভ্যতাব প্রতি অঙ্গে পাকে পাকে নিজেকে জড়িয়ে এসেছে এবং আজ তার চাপে সে সভ্যতার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গত যুদ্ধের কামানের শব্দে ট্রেঞ্চের মধ্যে জেগে উঠে ইউরোপের সভ্যতা এ বজ্রবাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে ব্যাকুল চেষ্টা করছে তারই নাম কোনও দেশে 'সোভিয়েট', কোনও দেশে 'ন্যাশন্যালিজেশন'।

২

আধুনিক ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থায় যে করে বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার ইতিহাস বিস্ময়কর কিন্তু জটিল নয়। এর মূল ভিত্তি হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য উন্নতি, প্রকৃতির সকল কাজের শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব প্রসার এবং সে জ্ঞানকে মানুষের ঘরকন্নার কাজে লাগাবার চেষ্টার অপূর্ব সাফল্য। এর ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার স্থূলদেহ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে দেখতে দেখতে একেবারে নব কলেবর নিয়েছে। সে চেহারা ইউরোপের ও ইউরোপের বাইরের পূর্ব পূর্ব যুগের সমস্ত সভ্যতার চেহারা থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। বাষ্প আর বিদ্যুৎ এই দুই শক্তিকে লোহার বাঁধনে বেঁধে ইউরোপ যে শিল্প, কারু, কৃষি, বার্তা, ব্যাবসা, বাণিজ্য গড়ে তুলেছে তার কাজের ভঙ্গি ও সামর্থ্যের সঙ্গে কোনও যুগের কোনও সভ্যতার সে দিক দিয়ে তুলনা করাই চলে না। যেমন ফরাসি অধ্যাপক সেনোবো লিখেছেন— এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে আজকার ইউরোপের যে তফাত, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের তফাত তার চেয়ে অনেক কম। বলা বাহুল্য এ তফাত কলকারখানা, রেল স্টিমার, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে মূর্তিমান হয়ে রয়েছে। এবং আশা করা যায়, অল্পদিনেই মোটর, এরোপ্লেন সে মূর্তির অদল-বদল ঘটিয়ে এ তফাতকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু এই যে ইউরোপ কারখানায় কলে শিল্পসামগ্রী তৈরি করছে, রেলে স্টিমারে তার পণ্য পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিগ্রাফ টেলিফোনে দাম দস্তুর বেচাকেনা চালাচ্ছে, এর ভিতরের লক্ষ্য কিছুই নূতন নয়। সেটি অতি প্রাচীন, মানুষের সভ্যতার সঙ্গে একবয়সি। সে লক্ষ্য হল— কী করে মানুষের জীবনধারণের ও সে জীবনের শোভা সম্পদ বিধানের সামগ্রীগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে জোগান দেওয়া যায়। পশুপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রশ্নেরই উত্তর। কেবল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ তার শিল্প-বাণিজ্যের কৌশলে ও ব্যবস্থায় এ সমস্যার যে সমাধান করেছে, জিনিসের জোগান হিসাবে তা তুলনারহিত। যা মানুষের অসাধ্য ছিল তা সুসাধ্য হয়েছে; যা বহুদিন, বহুজন ও বহু আয়াসসাধ্য ছিল সামান্য লোকের নামমাত্র পরিশ্রমে তা মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করেছেন, আজ কলের তাঁতে একজনে যে কাপড় বোনে সেটা হাতের তাঁতের ত্রিশজন তাঁতির কাজ; হাতের চরকার এগারোশো জনের সুতো আজ কলের চরকায় একজন কেটে নামাচ্ছে।

কিন্তু এ নব শিল্প-বাণিজ্যের এই যে অদ্ভুত কর্মসামর্থ্য, একে চালনা করতে হলে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য। তার মধ্যে প্রধান হল বিপুল আয়তনের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা এবং তার জন্যে চাই বহু লোককে একত্র জড়ো করে তাদের নানারকম মজুরির সাহায্য। আধুনিক কলের দৈত্য, উপকথার দৈত্যর মতোই নিমেষে পর্বতপ্রমাণ কাজ করে ওঠে, কিন্তু সত্যিকার দৈত্য হওয়াতে সে চায় কাজের পরিমাণ মালের জোগান, আর মানুষের হাতের সাহায্য। সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের এই নূতন কৌশলকে কাজে লাগাতে হলে, চাই দেশ-বিদেশ থেকে

কাঁচামাল সংগ্রহ করে জমা করা, কল গড়ে কারখানা বসানো, আর সে কল-কারখানা চালাবার জন্য নানারকম বহু মজুর একত্র করা। এবং এ-সবারই জন্য চাই টাকা, অর্থাৎ— পূর্বসঞ্চিত ধন। যাতে মাল কেনা চলবে, কল-কারখানা তৈরি হবে, মজুরের মজুরি জোগাবে। এবং সে টাকা অল্পস্বল্প হলে চলবে না, একসঙ্গে চাই বহু টাকা। কেননা এ ব্যাপারের মূল কথাই হচ্ছে, যা পূর্বে নানালোকে নানা জায়গাতে অল্পেস্বল্পে এবং অল্পস্বল্প তৈরি করত, তাই করতে হবে এক জায়গায়, এক তত্ত্বাবধানে, বিদ্যুৎগতিতে আর হাজার গুণ বেশি পরিমাণে। ফলে ইউরোপ জুড়ে কল-কারখানা তারাই বসিয়েছে হাতে যাদের ছিল জমানো টাকা এবং কলের চাকার পাকে পাকে নামতার আর্যার মতো সে টাকা বেড়ে উঠেছে। আর টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলও বেড়েছে কারখানাও বড় হয়েছে। অর্থাৎ— টাকার অঙ্কটাও আর বেড়ে চলেছে। আর এও অতি স্পষ্ট যে এই কলের তৈরি মালের রাশিকে দেশ-বিদেশে কাটাতে হলে চাই বড় মূলধনী ব্যবসায়ী, যারা একদমে একে নিঃশেষ করে কিনে নিতে পারবে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে ধীরে-সুস্থে এ মাল কাটানোর চেষ্টা করা এ-সব কারখানার মালিকদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এমনি করে আজকার ইউরোপের যে বিরাট ধনসম্পদ তার একটা প্রকাণ্ড অংশ এসে জমেছে সংখ্যায় অতি অল্প একটি শ্রেণিবিশেষের হাতে— যারা কারখানার মালিক বা সেই কারখানার মালের ব্যবসায়ী। হিসাবে দেখা গেছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (যা ইউরোপের একখণ্ড 'ছিট' মাত্র) দেশের সমুদয় ধনের এক পঞ্চমাংশেরও বেশি রয়েছে লোক সংখ্যার ত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগের হাতে। ধনের গৌরব সব দেশে, সব কালেই ছিল ও থাকবে। সুতরাং এই অতি-ধনী বৈশ্য শ্রেণিটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

৩

কিন্তু এই মহাজন সম্প্রদায়টির ইউরোপে যা প্রভাব ও প্রতিপত্তি ধন গৌরবের উপর তার সামান্য অংশই নির্ভর করছে। যার টাকা নেই সে যার টাকা আছে তাকে দূরে থেকেই নমস্কার করতে পারে যদি না জীবিকার জন্য তার দরজায় দাঁড়াতে হয়। এইজন্য ইউরোপের পক্ষে তার মহাজন শ্রেণিটিকে কেবল টাকার খাতির দিয়ে দূরে রাখা সম্ভব নয়। কেননা এই শ্রেণিটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের অন্নদাতা। আর তা দু'রকমে। নূতন শিল্প ব্যবস্থায় দেশজুড়ে ধনসৃষ্টির যেসব ছোটখাটো ব্যবস্থা ছিল তা লোপ পেয়েছে। একমাত্র কৃষি ছাড়া ইউরোপের সমস্ত ধন প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হচ্ছে এই মহাজনদের বড় বড় কারখানায়। এবং কৃষি জিনিসটিও আজ ইউরোপের চোখে অতি অপ্রধান শিল্প। কারণ পশ্চিম ইউরোপ আবিষ্কার করেছে নিজের অন্ন দেশে জন্মানোর চাইতে কলের তৈরি শিল্প-সামগ্রী দিয়ে বিদেশ থেকে তা কিনে আনাই তার পক্ষে বেশি সহজ ও সুবিধার। এবং সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলভ্য কাঁচামালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা। ফলে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ

লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে মহাজনদের এই বড় বড় কারখানাগুলিতে ও তাদের অফিসে হাতে বা কলমে মজুরগিরি করা। অর্থাৎ— এই মহাশ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই এদের মনিব ও অন্নদাতা। আর পরোক্ষে ইউরোপের সবারই অন্নবস্ত্র এরাই জোগাচ্ছে। জীবনযাত্রার যা কিছু উপকরণ তা হয়ে আসছে এদের কারখানা থেকে, নয় তো এদেরই কারখানার কলে তৈরি মালের বিনিময়ে। যাদের হাতে জীবন-মরণের কাঠি রয়েছে তারা যে সর্বময় হয়ে উঠবে এতে আর বিস্ময় কী!

কিন্তু এ বৈশ্য-প্রভুত্বের সবচেয়ে যা প্রধান কথা তা হচ্ছে আধুনিক যুগের নূতন ব্যবস্থায় এই যে-সব অতিকায় শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এগুলি যত লোকের অন্ন জোগাচ্ছে এর পূর্বে ইউরোপের পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। আর অন্ন বাড়লে যে জীবও বাড়ে এটা প্রাণবিদ্যার একবারে প্রথম ভাগের কথা। ফলে গেল একশো বছরের মধ্যে ইউরোপের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। এবং এখন এ বিরাট জনসংঘের জীবিকা জোগাতে হলে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হলে চলবে না। এর আয়তন যদি একটু খাটো কি বেশ একটুকু মন্দা হয় তবে ইউরোপ তার সমস্ত লোকের মুখে আর অন্ন দিতে পারবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বাণিজ্যে যে লোক বেড়েছে, বিংশ শতাব্দীতে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর গতি নেই, এ যে কত সত্য জার্মন যুদ্ধের এক আঁচড়েই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের ধাক্কায় এ শিল্প-বাণিজ্যের কল যেই একটু বিকল হয়েছে অমনি ইউরোপ জুড়ে কলরব; ইংল্যান্ডে চিনি নেই, ফ্রান্সে কয়লা নেই, জার্মনিতে চর্বির জন্য হাহাকার, অস্ট্রিয়ায় দুধ না পেয়ে শিশু মরছে। আর একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে, গেল-যুদ্ধের ফলে মূলধনী মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রকম-সকমে। রুশিয়ার বোলশেভিক, জার্মনির সোস্যালিস্ট, কি ইংল্যান্ডের ন্যাশান্যালিজেশন পন্থী এমন কথা কারও মুখে ওঠেনি যে, এই যে আধুনিক ইউরোপের দৈত্যাকৃতি সব শিল্প-বাণিজ্য, যা কলের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেলছে, একে ভাঙা দরকার। কেননা ইউরোপ মর্মে মর্মে জানে যে, এই শিল্প-বাণিজ্যই তার প্রাণ। একে মারতে গেলে মরতে হবে। তাই এখন সবারই লক্ষ্য কী করে এই শিল্প-বাণিজ্যকেই বহাল ও সচল রাখা চলে, কিন্তু তার বর্তমান মালিক মহাজনদের ছেঁটে ফেলা যায়। এ চেষ্টা সফল হবে কি না তা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। কিন্তু যত দিন না হবে, ততদিন বৈশ্য ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায় চড়েই থাকবে। কেননা ইউরোপের মুখের অন্ন তার হাতের মুঠোয়।

বলা বাহুল্য ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের বেগ কেবল ইউরোপ বা ইউরোপিয়ান জাতিগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নেই; পৃথিবীময় সে নিজেকে জানান দিচ্ছে। কেননা ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রভু। এবং স্বভাবতই এ প্রভুত্বের প্রয়োগ হচ্ছে ইউরোপের প্রভু বৈশ্যের মারফত, তারই সুবিধা ও প্রয়োজনমতো। ইউরোপের বিজ্ঞান আজ বাহুবলে ইউরোপকে অজেয় ও

দুর্নিবার করেছে। এবং সমস্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইউরোপের জিত রাজ্য। কিন্তু এ জয় অশ্বমেধের রাজচক্রবর্তীর জয় নয়। যুদ্ধের উল্লাস কি জয়ের গৌরব এর লক্ষ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হল জিত দেশ ও পরাজিত জাতিকে ইউরোপের কারখানার কলের চাকায় জুড়ে দেওয়া। যে শিল্প-বাণিজ্য ইউরোপকে অন্নবস্ত্র দিচ্ছে ইউরোপের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ তার চাই-ই চাই। সেখানকার মাটির রস টেনেই ওরা বেঁচে রয়েছে। যে কাঁচামাল কলে-তৈরি শিল্পে পরিণত হবে, তা প্রধানত আসছে ইউরোপের বাইরে নন-ইউরোপিয়ান লোকদের দেশ থেকে। জীবনযাত্রার যে-সব উপকরণ, বিশেষ করে খাদ্য, যা ইউরোপের মাটিতে জন্মে না বা কলে গড়া চলে না, তাও বেশির ভাগ আনতে হবে ওখান থেকেই। অবশ্য এ দুই জিনিস ইউরোপ গায়ের জোরে কেড়ে নিতে চায় না। তার কারখানার তৈরি শিল্পের বিনিময়েই কিনতে চায়। কিন্তু এদের জোগান যাতে অব্যাহত, আর পরিমাণ যাতে প্রয়োজনমতো হয় সে ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। কেননা কারখানার কল একদিনও বসে থাকলে চলবে না। সুতরাং এ-সব গরম দেশের অলস লোকেরা যদি নিজের ইচ্ছায়, অথবা লাভের লোভে এ-সব জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করে সুবিধা দরে জোগান দিতে না চায় তখন ইউরোপকে বাধ্য হয়েই হাতে চাবুক নিতে হয়, সঙিনের খোঁচায় এদের কাজের ইচ্ছাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। এমনকী দু'-চারজনার হাত পা কেটে দিয়ে তাদের বাকি সঙ্গীদের হাত-পা'গুলো যাতে কলের চাকার বেগের সঙ্গে তাল রাখতে উৎসাহী হয় সে চেষ্টা থেকেও পশ্চাৎপদ হলে চলে না। জার্মন অধ্যাপক নিকলাই তাঁর 'যুদ্ধ ও জীবতত্ত্ব' নামের পুথিতে লিখেছেন যে, পৃথিবীর পঞ্চাশ কোটি ইউরোপিয়ান ও ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে-পড়া শ্বেত মানুষের হাতে এখনই এমন যন্ত্রপাতি আছে যে, আসছে বিশ বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর একশো কোটি নানা জাতির অ-শ্বেত মানুষদের একেবারে নির্মূল করে উচ্ছেদ করতে পারে। এবং ফলে সমস্ত পৃথিবীটা কেবলমাত্র, অন্তত নিজেদের চোখে, উন্নততর শ্বেত জাতিদেরই বাসস্থল হয়। এ বিশ বছরের পরে, অর্থাৎ— যখন চিন তার সমস্ত লোককে আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলবে এবং নিজের 'ড্রেডনট' ও কামান গোলা নিজেই তৈরি করতে শুরু করবে, যেমন এখন জাপান করছে, হয়তো এ আর সম্ভব হবে না। কিন্তু ইউরোপ যে এ-কাজে হাত দেবে না তা নিশ্চয়, কেননা ব্যাপারটা এমন ভয়ানক যে কল্পনায় তাকে ফুটিয়ে তুললেই পিছিয়ে আসতে হয়। এবং অধ্যাপক নিকলাই-এর মতে এ জেহাদ প্রচার করা মানে স্বীকার করা যে প্রকৃত জীবনযুদ্ধে, যেখানে জয়ী হতে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয়, নিজের বাঁচার শক্তিতে, শ্বেতের চেয়ে অ-শ্বেত শ্রেষ্ঠ। সুদূর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় এখানে একটা হাতের কাছের মোটাকথা চোখ এড়িয়ে গেছে। ইউবোপ যদি আসছে বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সব অ-শ্বেত জাতিগুলিকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয় তবে তার পরের দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আর বর্তমান ইউরোপ থাকবে না। তার কল-কারখানার বেশির ভাগই অচল হবে। তার শিল্প-বাণিজ্য সমাজ-রাষ্ট্র সব ব্যবস্থারই মূলে টান পড়বে। কারণ পৃথিবীজুড়ে শস্যক্ষেত্রে, মাঠে, অরণ্যে যে-সব কৃষ্ণ, তাম্র, পীত হাত দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ইউরোপের সভ্যতার স্থূল শরীরকে স্থূলতর করে তুলছে তার সবগুলিকে যদি সাদা হাত দিয়ে বদল করতে হয় তবে কারখানার কলে দেবার মতো

হাত ইউরোপে আর বেশি অবশিষ্ট থাকে না। ইউরোপের লোকসংখ্যার ইউরোপে বসে অন্নসংস্থান অসম্ভব হয়। যে-সব ভিত্তির উপর ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা প্রধান হল নন-ইউরোপিয়ান ও অ-শ্বেত লোকদের পরিশ্রমের ফল সহজে ও স্বল্পমূল্যে পাওয়া। প্রাচীন গ্রিক-রোমান পণ্ডিতেরা দাসের শ্রম বাদ দিয়ে নিজেদের সভ্যতার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারতেন না। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে পারেন তার কারণ নামরূপের বদল ঘটালে জানা-জিনিস চিনতে পণ্ডিতদের কষ্ট হয়; আর মনে যা ওঠে তা স্পষ্ট করে খুলে বলার অভ্যাস প্রাচীন পণ্ডিতদের যত ছিল আধুনিক পণ্ডিতদের তা নেই।

ইউরোপের বৈশ্য-প্রভুত্বের খোঁচা এমনি করে ইউরোপের বাইরে তাম্র কালো পীত সব রঙের লোকের গায়ে এসেই বিঁধছে। ইউরোপের বৈশ্য চায় এরা নিরলস হয়ে তার কারখানার কাজের উপাদান আর মজুরের খাদ্য জোগায়। কিন্তু এ ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। ইউরোপ যেমন এদের কর্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে এবং বিপথে না চলে। শিল্পের উপাদান জোগান এবং কৃষি পশু থেকে খাদ্য উৎপাদন, এতেই নিঃশেষ না হয়ে যদি এদের শক্তি ও বুদ্ধি নবশিল্পের নূতন বিদ্যা শিখে উপাদানকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করার দিকে চলে সেটা ইউরোপের চোখে অমঙ্গল। কেননা ইউরোপের আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের মোটকথা বাকি পৃথিবী উপাদান ও খাদ্য জোগাবে, আর ইউরোপ ওই উপাদান থেকে তৈরি শিল্পদ্রব্যের এক অংশ বিনিময়ে ফিরিয়ে দেবে। যদি এ ব্যবস্থা উলটে গিয়ে খাদ্য ও শিল্পসামগ্রী দুই-ই বাইরে থেকে ইউরোপের দরজায় উপস্থিত হয় তবে বদল দিয়ে এদের ঘরে নেবার মতো জিনিস ইউরোপের বড় বেশি থাকবে না। কেননা ইউরোপ যে শিল্প-বাণিজ্যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে সে তার দেশের প্রকৃতির গুণে নয়, লোকের প্রকৃতির গুণে। কিন্তু এ কথা যেমন গৌরবের তেমনি আশঙ্কার। যে-সব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকৃপণা, সে দেশের লোকের মনের পঙ্গুত্ব ও শক্তির খর্বতার উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব টিকে আছে। মন সচল হলেও যে ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্যের নূতন কৌশল শিখে শক্তি সঞ্চয়ে দেরি হয় না তার পরিচয় জাপান দিয়েছে। এবং যেখানেই এ পরিচয়ের আভাস পেয়েছে, ইউরোপ তার নাম দিয়েছে 'আতঙ্ক'। কারণ ইউরোপের বিশ্বপ্রেমিকেরা যা-ই বলুন-না, ধন ও শক্তিতে ইউরোপ এখন যেমন আছে তেমনি থাকবে, আবার বাকি পৃথিবীটাও ধনী ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এর কোনও সম্ভাবনা নেই। ইউরোপ প্রধান হয়েছে, আর সবাই ছোট ও খাটো আছে বলে। সে প্রাধান্য বজায় থাকবে — আর সবাইকে ছোট ও খাটো করে রাখতে পারলে।

৫

বৈশ্য-ইউরোপের চাপ পৃথিবীর যে-সব প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির উপর এসে পড়েছে তাদের সবারই মনে হয়েছে ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ওই বৈশ্যত্বকে ধার করে তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়া। কেননা চোখে দেখতে ইউরোপের বাহুতে বল দিচ্ছে তার সব অদ্ভুত কৌশলী কাজের সরঞ্জাম ও উপকরণের বিচিত্র বাহুল্য। আর এ সরঞ্জাম ও উপকরণ

সবই জোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্মব্যবস্থা। প্রাচ্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচ্য জাপান পাশ্চাত্যের এই কর্মকৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে। এবং ফলে পশ্চিম ইউরোপের প্রবল জাতিগুলির মতো ইউরোপের চোখে সেও একটা প্রধান জাতি। তারও কারখানার কলে ইউরোপের মতো মজুর খাটিয়ে শিল্প-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে; সেগুলো জাহাজে উঠে পৃথিবীর বাজারের যত ফাঁক জায়গা দরকারি, অদরকারি, সাচ্চা, ঝুঁটো, ভারী ও ঠুনকো মালে ভরে দিচ্ছে, এবং আর সবার মাল সরিয়ে নিজের জন্য কতটা জায়গা খালি করা যায় তার চেষ্টা দেখছে। মহাজনি-জাহাজের পেছনে তারও মানোয়ারি জাহাজ সেজে রয়েছে; এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য ইউরোপের আর পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মতো সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি তৈরি করে যাচ্ছে। বিশ্বহিতের বাণী তার মুখ থেকেও সমান তেজে ও সমান বেগেই বেরোচ্ছে; এবং মানবজাতির সভ্যতা রক্ষা ও বিস্তারের জন্য দুর্বল জাতির সুফলা দেশের গুরুভার বহনে তার পীত-স্কন্ধের ঔৎসুক্য কোনও শ্বেত-স্কন্ধের চেয়ে কম নয়। বৃদ্ধ চিন ডাইনে ইউরোপ ও বাঁয়ে জাপান দু'দিক থেকে খোঁচা খেয়ে ওই বৈশ্যত্বের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাচ্ছে। কিন্তু তার প্রাচীন সভ্যতার গভীর শিকড়, আর প্রকাণ্ড দেহের বিরাট বিপুলতা তাকে সোজাসুজি ইউরোপের বৈশ্যত্বের পাঠশালায় ঢুকতে দিচ্ছে না। ইউরোপের নবীন বিদ্যার বেগ তার প্রাচীন সভ্যতাকে একটা নূতন সৃষ্টির পথে নিয়ে যাবে, এশিয়া সেই আশায় তাকিয়ে আছে। এবং সমস্ত বাধা কাটিয়ে পাছে চিন নিজের বৈশ্যমন্ত্রে জাপানের মতোই সিদ্ধিলাভ করে সেই আতঙ্কে ইউরোপ মাঝে মাঝে চার দিক হলদে দেখছে।

আমাদের ভারতবর্ষে এ বৈশ্য-তন্ত্রের খাস তালুক। কেননা এ মহাদেশ ইউরোপের সেই দেশের অধীন রাজ্য যেখানে বৈশ্য-তন্ত্রের মূর্তি সবচেয়ে প্রকট, আর বৈশ্য-প্রভুত্বের মহিমা সবচেয়ে উঁচু। এবং 'কনস্টিটিউশন্যাল ল'র পুথিতে যাই থাকুক আমরা সবাই জানি ব্রিটেনের বৈশ্যরাজই আমাদের রাজা। স্বভাবতই প্রজার জাতির চোখে উন্নতি মানে রাজার জাতির মতো হওয়া। সেইজন্য আমাদের দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশার কথা যখনই ভাবি তখন সহজেই মনে হয় এর প্রতিকারের উপায় ভারতবর্ষকে বিলাতের মতো বড় বড় কারখানায় ভরে ফেলা; দেশের লোককে গ্রামের মাটি থেকে উপড়ে এনে শহরের কলে জুড়ে দেওয়া। এবং সেজন্য সর্বপ্রথম দরকার সকলে মিলে বৈশ্যকে দেশের মাথায় তোলা যাতে যার-ই মগজে বুদ্ধি আর মনে উৎসাহ আছে তার দু'চোখ এদিকে পড়ে। আমাদের সরকারি বে-সরকারি রাজপুরুষেরাও ভারতবর্ষের যে-জাতি বৈশ্যমহিমা যতটা আয়ত্ত করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে স্বীকার ও প্রচার করেন। এবং আমাদের বড়-ছোটর প্রমাণ যে তাঁদের হাতের মাপকাঠি সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে যে এ মাপে বাঙালির উন্নতির বহর বড় বেশি নয়। আরব সমুদ্রের তীরের দুই-একটি জাতির কাছে তো আমরা দাঁড়াতেই পারি না। এমনকী যাঁরা বাংলার বাইরে থেকে কেবল পাগড়ি কি টুপি নিয়ে এসে বাংলার বুকের উপর দিয়ে মোটর হাঁকাচ্ছেন, তাঁদের পাশেও আমরা নিতান্ত খাটো। আমাদের নিত্য দুঃখ-দৈন্যের চাপটা যখনই কোনও নৈমিত্তিক কারণে একটু বেড়ে ওঠে তখনই এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের

আন্দোলন, আলোচনা, ধিক্কার, অনুশোচনার সীমা থাকে না। কলেজ-ফেরত বাঙালির ছেলে নিরক্ষর অ-বাঙালির ব্যবসায়ে কেরানিগিরির উমেদার, এই উদাহরণ তুলে আমরা বাঙালির মতি গতি এবং সর্বোপরি আমাদের বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দুরবস্থা স্মরণ করে যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। এ শিক্ষা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়ে শিকল তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কেননা শিক্ষিত বাঙালির চেয়ে যে নিরক্ষর দিল্লিওয়ালা শ্রেষ্ঠ এর পরিচয় তো একের মোটরকার ও অন্যের ছেঁড়া জুতোতেই সুপ্রকাশ। কিন্তু বাঙালির মনের এমনই মোহ যে এর প্রতিকারে কেউ স্কুল কলেজ তুলে দেবার উপদেশ দেয় না। প্রস্তাব হয় এগুলিতে অন্যরকম শিক্ষা দেওয়া হোক। শিল্পবিদ্যালয় ও কারবার শেখার স্কুলে দেশটা ভরে ফেলা যাক। অথচ সকলেই জানি মোটরবিহারী দিল্লিওয়ালা কি শিল্প, কি সওদাগরি কোনও স্কুলেই কোনওদিন পড়েনি।

জার্মনযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে পৃথিবী-জোড়া দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা অতি সংকটের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। এ সংকট যে কত বড়, আর আমাদের দারিদ্র্যের ব্যাধি যে কত প্রবল তা আমরা এর যে-সব বিষ-চিকিৎসার ব্যবস্থা দিচ্ছি তা দেখলেই বোঝা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'সবাই মাড়োয়ারি হও; আর উপায় নেই।' এ কথা বেরিয়েছে তাঁর মুখ থেকে যাঁর সমস্ত জীবন বৈশ্যত্বের একটা প্রতিবাদ। ধনের গৌরব ও ক্ষমতার মোহ যাঁর কাছে প্রলোভনের জিনিসই নয়। যাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আর ঋষির তপস্যা বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতবর্ষেও জ্ঞানের তপোবন ও শিষ্যের মণ্ডলী গড়ে তুলেছে। যিনি বিদ্যা ও প্রতিভা দিয়েছেন দেশের সেবায়, নিজেকে লোপ করে। এ যুগে যিনি কারখানা গড়ে তুলেছেন নিজের পকেট নয় দেশের মুখ চেয়ে। আর 'মাড়োয়ারি হওয়া' ব্যাপারটি কী তা গেল-যুদ্ধের টানে সবার সামনে বে-আব্রু হয়েই দেখা দিয়েছে। মাড়োয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের কবন্ধ। ইউরোপের বৈশ্য পৃথিবীই লুট করুক, আর দেশের মাথায়ই চড়ে বসুক, দেশকে সে ঠিকই অন্ন জোগাচ্ছে। আজকের ইউরোপের ধনসৃষ্টির সে যে মূল উৎস তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু মাড়োয়ারিগিরি ধনসৃষ্টির পথ দিয়েই হাঁটে না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ওই উত্তমাঙ্গটি তার নেই। তার কাজ হল বিদেশের তৈরি জিনিস চড়া দরে দেশের মধ্যে চালানো, আর দেশের উৎপন্ন ধন সস্তা দরে বিদেশির হাতে তুলে দেওয়া। এবং এই হাত বদলানোর কারবার থেকে যত বেশি সম্ভব দেশের ধন, যার সৃষ্টিতে তার কড়ে আঙুলেরও সাহায্য নেই, নিজের হাতে জমা করা। সেজন্য যে তীব্র লোভ ও একাগ্র স্বার্থপরতা দরকার তার নাম ব্যাবসা-বুদ্ধি! এ ব্যাবসা-বুদ্ধি যে কত বড় নির্লজ্জ আর কতদূর হৃদয়হীন গেল-যুদ্ধের সময় পৃথিবীর সব দেশে তা প্রমাণ হয়েছে। দেশের নিতান্ত দুর্দশা ও সংকটের সময়ও দেশ-জোড়া দুরবস্থার ভিত্তির উপর নিজের ধনের ইমারত গড়ে তুলতে কোনও দেশের কোনও বৈশ্য কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করেনি। এবং এক রাজদণ্ডের শাসন ছাড়া এদের নিষ্ঠুরতা আর কোনও কিছুরই বাধা মানেনি।

ধনসৃষ্টির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক সওদাগরি ইউরোপেও যথেষ্টই আছে। কিন্তু সেখানে সেটা ধন উৎপাদন ও ধন বিতরণের আনুষঙ্গিক উপদ্রব। আর মাড়োয়ারিগিরি হল নিছক উপদ্রব।

জমিদারির সঙ্গে মোসাহেব থাকে জানি; কিন্তু জমিদারি নেই, আছে কেবল মোসাহেবের উৎপাত এটা যেমন হাস্যকর তেমনি সংকটজনক। দেশের কৃষক নিরন্ন বলে স্বল্পমূল্যে তার শ্রমের ফল হাতে জমা করে দেশের লোক নিরুপায় বলে চড়া দামে তা বিক্রি করার মধ্যে কোথায় যে দেশের ধনবৃদ্ধি ও উপকার আছে তা অর্থ-নীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার করতে পারবেন না। আর গলা যদি নেহাতই কাটা যায় তবে ছুরিটা বাঙালির না হয়ে অ-বাঙালির এতে এমনকী ক্ষুব্ধ হবার কারণ আছে। সম্ভাবনাটা সুদূর, কিন্তু যদি সত্যই বাংলার গোটা শিক্ষিত-সমাজটা 'মাড়োয়ারি'ই হয়ে ওঠে তবে নিশ্চয় জানি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই সবার আগে বলবেন এর চেয়ে বাঙালিজাতির না খেয়ে মরাই ভাল ছিল।

৬

ইউরোপের বৈশ্যত্ব বাংলার মাটিতে ভাল ফলেনি। অথচ ইউরোপের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ভারতবর্ষের সব জাতির চেয়েই বেশি। বাংলার বাইরে বাঙালি তো একরকম খ্রিস্টান বলেই পরিচিত। কথা এই যে, যে ইউরোপের সঙ্গে বাঙালির নাড়ির যোগ সেটা বৈশ্য ইউরোপ নয়, ব্রাহ্মণ ইউরোপ। কল-কবজা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের আধুনিক ইউরোপ ছাড়াও আর একটা আধুনিক ইউরোপ আছে, যে ইউরোপ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যে আধুনিক ইউরোপ মানুষের মনকে মুক্তি দিয়েছে; জ্ঞানের দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি উদার করেছে। যার কাব্য, সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডার জ্ঞান, সত্য, সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছে। এই ইউরোপের আনন্দলোকই বাঙালির মন হরণ করেছে, কলের ধোঁয়ায় কালো ইউরোপ নয়। সেইজন্য বাংলার মাটিতে এখনও জামসেটজি তাতা জন্মেনি, কিন্তু বাংলাদেশ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি। এখনও বড় কলওয়ালা কি ভারী সওদাগরের আমরা নাম করতে পারিনে, কিন্তু জগদীশ বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি জাতির মধ্যেই জন্মেছেন। বাঙালির নাড়িতে পশ্চিম থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ও মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা, দক্ষিণ থেকে দ্রাবিড় ও পূর্ব থেকে চিন সভ্যতার রক্ত এসে মিশেছে। ইউরোপীয় আর্য-সভ্যতার বিদ্যুৎস্পর্শে যদি এই অপূর্ব প্রয়াগ-ভূমিতে আমরা একটি অক্ষয় নূতন সভ্যতা গড়ে তুলে মানবজাতিকে দান করতে পারি তবেই আধুনিক বাঙালি জাতির জন্ম সার্থক। না হলে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কি মোটরগাড়িতে দৌড়াই, তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ সার্থকতার জন্য ইউরোপের যে উৎস থেকে জ্ঞান ও সৌন্দর্য উৎসারিত হচ্ছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে যেখানে তার কারখানায় মাল তৈরি হচ্ছে সেখানে দু'চোখ বন্ধ করে রাখলে চলবে না; বাঙালির মাড়োয়ারি হওয়া একেবারেই পোষাবে না।

বাঙালিকে অবশ্য আগে বাঁচতে হবে। কিন্তু সেজন্য চাই নূতন ধন সৃষ্টি করা, দেশের অন্নকে বহু করা। বেদের ঋষি অন্নের সৃষ্টির জন্য নিজের হাতে হাল ধরেছেন। আজ পৃথিবীর সেই দিন এসেছে যখন অন্নসৃষ্টির ভার কেবল বৈশ্য বহন করতে পারে না। তার ব্রাহ্মণের সাহায্য চাই। এই সাহায্য বাঙালির জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে দান করবে। যাঁর চোখ আছে

তিনিই এর আরম্ভ দেখতে পেয়েছেন। বৈশ্যত্বের নামে নয়, এই ব্রাহ্মণত্বের নামে ডাক দিলে তবেই নবীন বাঙালির সাড়া পাওয়া যাবে। এই ব্রাহ্মণত্বের ছায়ায় বাংলাদেশে এমন বৈশ্যত্ব গড়ে উঠুক যার হাতে ধন দেখে কি শাস্ত্রকার কি দেশের লোক কেউ ভীত হবে না। যে বৈশ্য প্রাচীন সংহিতার অনুশাসন মত 'ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্', ধর্মানুসারে দ্রব্যবৃদ্ধির জন্য উত্তম যত্ন করবে; 'দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ', এবং অতি যত্নে সর্বভূতকে পর্যাপ্ত অন্ন দান করবে।

শ্রাবণ ১৩২৭

সবুজের হিন্দুয়ানি

সম্পাদক মহাশয় শুনেছেন অনেকের আশঙ্কা, নবপর্যায়ের 'সবুজপত্র' নাকি হবে জীর্ণ হিন্দুয়ানির আতপত্র। কথা কী করে রটলো বলা যায় না, তবে এ কথা বলা যায় যে, ভয় একেবারে অমূলক নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বয়স হয়ে আসছে; আর প্রথম বয়সের ইংরাজি-পড়া তার্কিক যে শেষ বয়সে শাস্ত্রভক্ত গোঁড়া হিন্দু— এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কাজেই যাদের ভাবনা হয়েছে পুনরুদ্গত 'সবুজপত্র' আধুনিকতার প্রখর রশ্মি থেকে প্রাচীন হিন্দুত্বকে ঢেকে রাখবে, তাদের ভয়কে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মটা খাটে না। কারণ তিনি কেবল ইংরেজিনবিশ নন, ইউরোপের আরও দু'-একটা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যনবিশ; যার ফলে ইংরেজি মদের নেশা কোনওদিনই তাঁকে বেসামাল করতে পারেনি। আর হিন্দুশাস্ত্রচর্চাও তিনি শেষ বয়সে 'বঙ্গবাসী'র অনুবাদ মারফত আরম্ভ করেননি, তরুণ বয়স থেকেই শাস্ত্রকারদের নিজ হাতের তৈরি খাঁটি জিনিসে নিজেকে অভ্যস্ত করে এসেছেন। এখন আর ওর প্রভাবে ঝিমিয়ে পড়বার তাঁর কোনও সম্ভাবনা নেই।

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু হিন্দুত্ব ও হিন্দুশাস্ত্রের উপর চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি যে গোঁড়া গদগদ ভক্তি নয়, তার যথার্থ কারণ এ দুয়ের উপর তাঁর অসীম প্রীতি, কেননা ওখানে তাঁর নিগূঢ় মমত্ববোধ রয়েছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও চৌধুরী মহাশয়ের শরীরে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের রক্তের ধারা কতটা অক্ষুণ্ণ আছে, এ নিয়ে হয়তো শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তর্ক তুলতে পারেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও মনোভাব যে প্রাচীন আর্য শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি ও মনোভাবের অক্ষুণ্ণ ধারা, এতে আর তর্ক চলে না। শাস্ত্রকার মনু কি ভাষ্যকার মেধাতিথি, এঁদের সঙ্গে আজ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে তাঁরা অবশ্য চৌধুরী মহাশয়কে নিজেদের বংশধর বলে চিনতে পারতেন না; বরং পোশাক পরিচ্ছদ, চাল-চলনে প্রত্যন্তবাসী

কশ্চিৎ ম্লেচ্ছ বলেই মনে করতেন। কিন্তু দু'-চার কথার আদানপ্রদানে টপহ্যাট ও ফ্রক কোটের নীচে যে মগজ ও মন রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র তাঁরা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়কে এই বলে আশীর্বাদ করতেন—

'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদাং শতম্।'

'হে পুত্র! আমাদের আত্মাই তোমাতে জন্ম পরিগ্রহ করেছে। তুমি শত বৎসর পরমায়ু নিয়ে অযজ্ঞীয় ম্লেচ্ছপ্রায় বঙ্গদেশে ইস্পাতের লেখনীমুখে আর্যমনোভাব প্রচার ও তার গুণ কীর্তন কর।'

এই আর্যমনোভাব বস্তুটি কী, একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। কারণ প্রমথবাবু যদি 'সবুজপত্রে' হিন্দুয়ানি প্রচার করেন, তবে এই মনোভাবেরই প্রচার করবেন।

যে প্রাচীন আর্যেরা হিন্দুসভ্যতা গড়েছে, তাদের সকলের মনোভাব কিছু একরকম ছিল না। হিন্দুসভ্যতার জটিল বৈচিত্র্য দেখলেই তা বোঝা যায়। যারা উপনিষদ রচেছে ও যারা ভক্তিশাস্ত্র লিখেছে; পুরুষার্থ সাধন বলে যারা যাগযজ্ঞবিধির সূক্ষ্ম বিচার ও বিচারপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছে; ও যারা চতুরার্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ করেছে; যারা শ্রুতিকে ধর্মজিজ্ঞাসুদের পরম প্রমাণ বলেছে; ও যারা বলেছে বেদ লোকযাত্রাবিদদের লোকনিন্দা থেকে রক্ষার আবরণ মাত্র[১]; ন্যায়-দর্শন যাদের তত্ত্বপিপাসার নিবৃত্তি করেছে, ও যারা অখণ্ড অদ্বয়-বাদে না পৌঁছে থামতে পারেনি— তারা সবাই ছিল আর্য, এবং হিন্দুসভ্যতা গড়ার কাজে সবারই হাত আছে। একদল অনুশাসন দিয়েছে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ ও প্রজোৎপাদনে পিতৃঋণ শোধ দিয়ে তবে বানপ্রস্থী হয়ে মোক্ষ চিন্তা করবে, নইলে অধোগতি হবে; অন্য দল উপদেশ করেছে যেদিন মনে বৈরাগ্য জাগবে সেইদিনই প্রব্রজ্যা নেবে। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধির উপায় রাজাকে শেখাবার জন্য একদল 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেছে; অপর দল 'ধর্মশাস্ত্র' লিখে সে পথ দিয়ে হাঁটতে রাজাকে মানা করেছে। কেউ বলেছে পুত্রের জন্মমাত্র সে পৈতৃক ধনে পিতার মতোই স্বত্ব লাভ করে, কেউ বিধান দিয়েছে পিতা যতদিন বেঁচে আছে পুত্রের ততদিন কোনও স্বত্ব নেই। যে লৌকিক প্রবচন বলে, এমন মুনি নেই যাঁর ভিন্ন মত নেই, তার লক্ষ হিন্দু-সভ্যতা-স্রষ্টাদের এই মতবিরোধের বৈচিত্র্য।

এতে আশ্চর্য কিছু নেই, বিশেষত্বও কিছু নেই। যে-কোনও বড় সভ্যতার মধ্যেই এই বিরোধ ও ভেদ দেখতে পাওয়া যাবে। সভ্যতা হল মনের স্বচ্ছন্দ লীলার সৃষ্টি। বহু মনের লীলাভঙ্গি বিচিত্র না হয়ে যদি সৈন্যের কুচের মতো একেবারে একতন্ত্র হত, তবে সেইটেই হত অতি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও যদি জাতি-বিশেষের নামে কোনও সভ্যতার নামকরণ করি, যেমন হিন্দুসভ্যতা—তখন যে কেবল এই খবর জানাতে চাই যে, কতকগুলি বস্তুজগতের ও মনোরাজ্যের সৃষ্টি বংশপরম্পরাক্রমে মোটামুটি এক জাতির লোকের কাজ, তা নয়। প্রকাশ্য বা নিগূঢ়ভাবে এই ইঙ্গিত প্রায় সকল সময়ে থাকে যে, ওই সব বিচিত্র,

---

১ 'বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ, সংবরণ মাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।' (কৌটিল্য, ১/২)

বিভিন্ন, এমনকী বিরোধী সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের বাঁধন আছে, যে ঐক্য কেবল জন্মস্থান-সমতার ঐক্য নয়, ভাবগত ও রুচিগত ঐক্য। খুব সম্ভব এ ঐক্যের মূল ওই জন্মগত ঐক্য। কারণ ওই সৃষ্টিগুলির যারা কর্তা, তাদের শিরার রক্ত ও মাথার মগজের এক মূল জীব থেকে উৎপত্তি, এবং তাদের প্রাকৃতিক ও মানসিক পারিপার্শ্বিকও অনেক অংশে এক। অতিবড় প্রতিভাশালী স্রষ্টাও এর প্রভাব এড়াতে পারে না ও এড়াতে চায় না। ফলে তাদের সৃষ্ট সভ্যতা তার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও নানা পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও ভিতরের কাঠামোখানি প্রায় বাহাল রাখে। ঘরের চাল বদলে যায়, দরজা জানালার পরিবর্তন হয়, পুরনো বেড়া তুলে ফেলে নতুন বেড়া বসানো হয়, কিন্তু মাঝের 'ফ্রেম'টি বজায় থাকে। আর্যমনোভাব হিন্দু-সভ্যতার এই 'স্টিলফ্রেম'।

বলা বাহুল্য এ 'স্টিলফ্রেমে'র শলাকা চোখে দেখা যায় না। চুম্বকের 'লাইনস অব ফোর্সেস' শক্তিসঞ্চার পথের মতো সেগুলি অদৃশ্য। তাদের উপাদান কোনও বস্তুসমষ্টি নয়, এমনকী রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও নয়। চিন্তা বা মননের কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গি, ভাব ও অনুভূতির কয়েকটি বিশেষমুখী প্রবণতা দিয়ে এ 'ফ্রেম' তৈরি। সুতরাং আর্যমনোভাব জিনিসটিকে রূপরেখায় চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রত্যক্ষ পরিচয় হলে এ মনোভাবের যে সুস্পষ্ট ছবি মনে এঁকে যায়, ভাষায় তার মূর্তি গড়া সুদক্ষ শিল্পীর কাজ। সে অনধিকার চেষ্টায় উদ্বাহু না হয়ে সাদা কথায় তার দু'-একটা লক্ষণের কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র করব।

ইংরেজিতে যাকে 'সেন্টিমেন্টালিজম' বলে, আমরা তার বাংলা নাম দিয়েছি ভাবালুতা। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালিসমাজে বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছর ছিল এই ভাবালুতার পুরো জোয়ারের সময়। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ইংরেজি কাব্য ও সাহিত্যে তখন শিক্ষিত বাঙালির মন পুষ্ট হচ্ছিল, সে কাব্য সাহিত্য 'সেন্টিমেন্টালিজম'-এর রসে ভরা; সুতরাং তার প্রেরণায় বাঙালি যে সাহিত্য সৃষ্টি করছিল, তা ভাবালুতায় ভরপুর। এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মাত্র যে অংশের তখন শিক্ষিত বাঙালির উপর প্রভাব ছিল, সেই বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যও এই ভাবালুতার অনুকূল। এই মানসিক আবেষ্টনের মধ্যে বর্ধিত হয়ে প্রাচীন আর্যমনোভাবের যে লক্ষণ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চোখ ও মন সবচেয়ে সহজে ও সবলে আকর্ষণ করেছে, সে হচ্ছে 'সেন্টিমেন্টালিজম' বা ভাবালুতার অভাব; এবং কেবল অভাব নয়, বিরোধী ভাবের আধিপত্য। কারণ প্রাচীন হিন্দুর মনোভাবের এমন একটা ঋজু কাঠিন্য ছিল, যা কি শরীর কি মনের সমস্ত রকম নুইয়ে-পড়া ও লতিয়ে-চলার বিরুদ্ধ। কালিদাস আর্যরাজার মৃগয়াকর্ষিত শরীরের যে ছবি এঁকেছেন, সেটা প্রাচীন আর্যমনেরও ছবি।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি।"

'মেদহীন কৃশতা ঋজু দীর্ঘতায় কৃশ বলে লক্ষ্য হয় না। পর্বতচারী গজের মতো দেহ যেন কেবল প্রাণের উপাদানেই গড়া।' অথচ এই মেদশূন্য কৃশতা কল্পনা-অকুশল মনের বস্তুতান্ত্রিক রিক্ততা নয়। হিন্দুর বিরাট পুরাণ ও কথাসাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন গাথার বিপুলতা

ভারতীয় আর্যমনের অফুরন্ত কল্পনালীলার পরিচয় দিচ্ছে। এ কাঠিন্যও শুষ্কপেশি কঙ্কালসার কাঠিন্য নয়। ভাবের দীনতা, রসবোধ ও রসসৃষ্টির অক্ষমতা জাতির মনকে বিধিনিষেধ-সর্বস্ব যে শুষ্ক কঠিনতা দেয়, সে কাঠিন্য হিন্দুর কখনও ছিল না। বেদসূক্তের উষার বন্দনা থেকে ভর্তৃহরির শতকত্রয় পর্যন্ত ভাব ও রসের সহস্র ধারা তাকে পাকে পাকে ঘিরেছে। তার ভোগকে শোভন ও জীবনযাত্রাকে মণ্ডনের জন্য চৌষট্টি কলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্ত ভাব ও কল্পনা, রস ও কলাবিলাসের মধ্যে একটা সরল, কঠিন মেরুদণ্ড সব সময়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রাচীন আর্যমনে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা যাকে বলি 'ভাবে গলে যাওয়া', তার মাধুর্য সে মনের রসনা আস্বাদ করেনি। ভগবান বুদ্ধ লোকের জন্মজরামরণের দুঃখে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ ছেড়েছিলেন, কিন্তু চোখের জল ছাড়েননি।

পণ্ডিত লোকে এমনও বলেছেন যে, প্রাচীন আর্যজাতি মূলে ছিল যাযাবর লুণ্ঠতরাজের দল—'প্রিডেটারি নোমাডস'। অন্য ধ্রুবশীল সভ্যজাতির ঘাড়ে চেপে তাদের পরিশ্রমের অন্ন খেতে খেতে তাদেরই সংস্পর্শে তারা ক্রমে সভ্য হয়েছে। এই ধার-করা সভ্যতার বীজ উর্বরা জমিতে খুবই ফলেছে বটে, কিন্তু তার শিকড় আদিম যাযাবরত্বের প্রস্তরকঠিন অন্তর ভেঙে মাটি করতে পারেনি, ফুলপাতায় ঢেকে রেখেছে মাত্র। এ মতের ঐতিহাসিক মূল্য যতটা থাক না থাক, এটি স্পষ্টই প্রাচীন আর্যমনোভাবের একটা পৌরাণিক অর্থাৎ 'ইভলিউশনারি' ব্যাখ্যা। একটি ছোট উদাহরণ দিই। নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রাচীন হিন্দুর প্রিয়বস্তু ছিল। হিন্দু আলংকারিকেরা কাব্যের মধ্যে নাটককেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁদের শিল্পকলার সংখ্যাও গণনায় চৌষট্টি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র একযোগে বিধান দিয়েছে— কারুকর্ম ও কুশীলবের কর্ম শূদ্রের কাজ, আর্যের নয়।[1] উদাহরণে পুথি বেড়ে যায়। কিন্তু আর্যমনের এই কাঠিন্য যে কত কঠোর, তা তাঁরা নিজেদের জীবনে অপরাহ্নকালের জন্য যে দুটি আশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কথা একটু কল্পনা করলেই উপলব্ধি হয়।

'গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥' (মনুঃ, ৬/২)

'গৃহস্থ যখন দেখবে গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে আসছে, চুলে পাক ধরেছে, ও পুত্রের পুত্র জন্মেছে', অর্থাৎ বার্ধক্যের অপটু শরীরে গৃহের ছোটখাটো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পুত্র পৌত্রের সেবা ও শ্রদ্ধা সবচেয়ে কাম্য হয়ে এসেছে, 'তখন ঘর ছেড়ে বনে প্রস্থান করবে।' হতে পারে সে বন খুব বন্য ছিল না। কিন্তু পুরাতন প্রিয় গৃহ ও সমাজের সঙ্গে সমস্তরকম সম্বন্ধচ্ছেদের নির্মমতাতেই তা ভীষণ।

'ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ ॥' (মনুঃ, ৬/১৬)

১. 'শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলবকর্ম্ম চ'—(কৌটিল্য, ১/৩)

'ভূমিকর্ষণে যা জন্মেছে, পড়ে পেলেও তা আহার করবে না। আর্ত হলেও গ্রামজাত ফলমূল গ্রহণ করবে না।' এই বনবাসে উগ্র তপস্যায় নিজের দেহ শোষণ করাই ছিল বিধি।

'তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।' (মনুঃ, ৬/২৪)

কিন্তু মৃত্যুকে অভিনন্দন করে এ জীবনেরও সংক্ষেপ কামনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

'নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥' (মনুঃ, ৬/৪৫)

'মরণকেও কামনা করবে না, জীবনকেও কামনা করবে না। ভৃত্য যেমন ভৃতিপরিশোধের অপেক্ষা করে, তেমনি কালের অপেক্ষা করবে।'

বানপ্রস্থের উপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কতটা অনুরাগ আছে জানিনে, কিন্তু মনের যে বীর্য নিজের বার্ধক্যদশার জন্য এই বানপ্রস্থের বিধান করেছিল, সেই বীর্য তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আধুনিক হিন্দুর মনে প্রাচীন আর্যমনের এই বীর্য ফিরিয়ে আনতে চান। এবং বর্তমানের মধ্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা যদি reactionary হয়, তবে চৌধুরী মহাশয়কেও reactionary বলতে হবে।

হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য কালবশে কমে আসছিল, এবং মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে কমার বেগ ক্রমে দ্রুত হয়ে এখন প্রায় লোপের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের একটা কোমলতা, গুটিকয়েক রসে আবিষ্টতা ও ভাবে বিহ্বলতা, তার খালি জায়গা অনেকটা জুড়ে বসেছে। হিন্দুর সচল মন নিশ্চেষ্ট থাকেনি। এই নতুন মনোভাবের উপযোগী ধর্মসাধনা, কাব্য ও দর্শন গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এর সাধক শ্রীচৈতন্য, কবি চণ্ডীদাস, দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী। প্রমথবাবু যদি 'সবুজপত্রে' প্রাচীন হিন্দুয়ানি প্রচারও করতে চান, তবে এই নবীন হিন্দুয়ানির সঙ্গে তাঁকে লড়তে হবে। কারণ 'পুরুষ ব্যাঘ্র বনাম মানুষ মেষ'-এর মামলায় তিনি যে বেদখল বাদীর পক্ষে সরাসরি একতরফা ডিক্রি পাবেন, এমন মনে হয় না। প্রথম তো তামাদি দোষ কাটাতে বেগ পেতে হবে। তারপর সভ্যতার ইতিহাসে বাঘের চেয়ে মেষ হয়তো সভ্যতর জীব। এবং 'দাসমনোভাবে'র চেয়ে যে, 'প্রভুমনোভাব' শ্রেষ্ঠ, তাও বিচার সাপেক্ষ। যাহোক, এ-তর্ক যদি প্রমথবাবু সত্য সত্যই তুলতে পারেন, তবে বাংলাসাহিত্যে শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের একটা নতুন সংস্করণ অভিনয় হবে। কারণ অসম্ভব নয় যে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে প্রাচীন হিন্দুর কতকটা কাঠিন্য ও বীর্য বিকট ছদ্মবেশে লুকানো আছে।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমথবাবুর একমাত্র প্রতিমল্ল হবে না। বাঙালির ইংরাজি-শিক্ষিত মন আজকার দিনে অনেক রকম 'সমন্বয়' সাধন করেছে। বৈষ্ণব আচার্যেরা যে রসতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, সে রস ইক্ষুরস। সাংসারিক ভোগসুখ, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সমস্ত পিষে ফেলে তবে সে রস নিঙড়ে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের ইংরেজি শিক্ষায় 'একলেকটিক' মন ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের সঙ্গেও রসতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। অফিস, আদালত, শেয়ার মার্কেট, খবরের কাগজ, এ সব বাহাল রেখেই আমরা ও-রস ভোগ করছি। অর্থাৎ ও-রস এখন আর ইক্ষুদণ্ডে বন্ধ নেই, পেটেন্ট করে বোতলে পোরা হয়েছে। দিনের

কাজের শেষে, কি ছুটির দিনে, খুব সুখে ও সহজে ওকে ঢেলে সম্ভোগ করা চলে। প্রাচীন হিন্দুর পক্ষ নিলে এ 'সমন্বয়ে'র সঙ্গে প্রমথবাবুকে যুদ্ধ করতে হবে। এবং ধর্মশাস্ত্রকারেরা বর্ণসংকরের বিরুদ্ধ হলেও আধুনিক বিজ্ঞান নাকি তার সপক্ষ। সুতরাং এ যুদ্ধ জেতাও সহজ হবে না। মোট কথা প্রাচীন হিন্দুয়ানির যুদ্ধে লড়তে হলে, প্রাচীন হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্যের প্রয়োজন হবে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মনে ও-গুণ আছে বলেই জানি। সুতরাং তিনি এতে সাহসী হলেও হতে পারেন।

ভাদ্র ১৩৩২

ধর্ম-শাস্ত্র

পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন হিন্দুর বুদ্ধিটা ছিল ঘোলাটে। যে-সব জিনিস পরস্পর থেকে অতি স্পষ্ট তফাত, এরা তাদেরও ঘুলিয়ে এক করে ফেলেছে। যেমন ধর্ম আর আইন। এর একের সঙ্গে অন্যের কিছু সম্পর্ক নেই। এর একটি হল ইহলোকের, অন্যটি পরকালের। একটির স্থান ধর্মমন্দির, অন্যটির আদালত। একটির কর্মকর্তা পুরোহিত, ধর্মযাজক; অন্যটির জজ কৌঁসুলি। অথচ প্রাচীন হিন্দু বলে, তার আইন তার ধর্মেরই অঙ্গ। তার আদালত হচ্ছে ধর্মাধিকরণ, তার জজ-জুরি হল ধর্মপ্রবক্তা। উত্তরে আমরা নব্যহিন্দুরা বলি— ওই তো ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশেষত্ব। ওইখানেই হিন্দুর হিন্দুয়ানি। অন্য সব জাতির স্বর্গ ও মর্ত্য, ধর্ম ও সংসারের মধ্যে ভেদ আছে-- কিন্তু হিন্দুর নেই। হিন্দুর যা 'অমূত্র' তাই 'ইহ'। তার সংসারযাত্রার প্রতি খুঁটিনাটি ধর্মশাসিত। দাঁতমাজা থেকে ব্রহ্মধ্যান, সবই তাব ধর্মাচরণ। হিন্দু ধর্মৈকপ্রাণ, ধর্মসর্বস্ব।

গল্প আছে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস নবপ্রতিষ্ঠিত 'রয়্যাল সোসাইটি'র মুরুব্বি হয়ে তার সভ্যদের প্রশ্ন করেছিলেন— বাঁচা মাছের চেয়ে মরা মাছ ওজনে ভারী কেন? সমিতির পণ্ডিতেরা ভেবে চিন্তে নানা জনে নানা কারণ দর্শালেন, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই সকলের তেমন মনঃপূত হল না। শেষে একজন পণ্ডিত একটা বাঁচা মাছ এনে ওজন করে, মেরে তাকে আবার ওজন করলেন; ওজন বেশি দেখা গেল না। প্রাচীন হিন্দুকে নিয়ে পশ্চিমের পণ্ডিতের সঙ্গে নব্যহিন্দুর যে বিচার বিতর্ক, সেও এই ধরনের। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে-সব তথ্য প্রচার করেন, সেগুলি সত্য কি মিথ্যা, তা পরখ করে দেখা আমরা দরকার মনে করিনে। মনে মনে বিশ্বাস আছে, এ সম্বন্ধে তাঁদের বাক্য আপ্তবাক্য। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে সেই সব তথ্য থেকেই নানা তত্ত্ব বের করি, এবং তার বলে প্রমাণ করি, যে-সব কারণে তাঁরা হিন্দুসভ্যতাকে বলেন খাটো, ঠিক সেই কারণেই হিন্দুসভ্যতা সবচেয়ে

উঁচু। তাঁরা বলেন প্রাচীন হিন্দু যে ধর্ম থেকে আইনকে তফাত করতে পারেনি, তাতেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাদের সভ্যতা আদিম অবস্থা ছাড়িয়ে বড় বেশি দূর এগুতে পারেনি; কারণ সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ও-দুই জিনিস একসঙ্গেই মিশে থাকে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমে তাদের পৃথক করে নেয়। আমরা বলি প্রাচীন হিন্দুরা যে ধর্ম থেকে আইনকে তফাত করেনি, তাতেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাঁরা সভ্যতার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন; কারণ সভ্যতার চরম অবস্থায় মানুষ আইনের ধারা মানবে ধর্মবুদ্ধিতে, 'ল' যাবে 'মর‍্যালিটি'তে মিশে। এখন যদি প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন হিন্দুরা ধর্ম ও আইন মোটেই মিশিয়ে ফেলেনি, ও-দু'জিনিসকে খুবই তফাত করে দেখেছে, এমনকী, এত তফাত করে যে বিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের আইনেও ধর্ম ও আইনের তফাত তত বেশি নয়,* তবে মুশকিল হয় এই যে, তাতে কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আঘাত পায় না, নব্যহিন্দুর হিন্দুয়ানিতেও ঘা লাগে।

হিন্দুর আইন যে হিন্দুর ধর্ম থেকে পৃথক ছিল না, আর দন্তধাবন ও সত্যভাষণ দুই-ই যে তার ধর্ম— পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও নব্যহিন্দুর এই বিশ্বাসের মূল একটি প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। সে প্রমাণ হচ্ছে, প্রাচীন হিন্দু একই শাস্ত্রে আইন, দন্তধাবন ও সত্যভাষণের ব্যবস্থা দিয়েছে; এবং সে শাস্ত্রের নাম ধর্মশাস্ত্র। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে যা আছে তাই যে হিন্দুর ধর্ম, এতে আর কথা চলে না। এবং গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের এমন কোনও অবস্থা নেই, যার ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্রে নেই। সুতরাং হিন্দুর জীবনের প্রতি কাজ যে ধর্ম এতে আর সন্দেহ কী। তাই বঙ্কিমবাবু অনেক আগেই বলেছেন হিন্দুর 'ধর্ম' খ্রিস্টানের 'রিলিজিয়ন' নয়। হিন্দুর ধর্ম বড় ব্যাপক জিনিস। এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'ধর্ম' মানে 'কালচার' অর্থাৎ হিন্দুধর্ম মানে 'হিন্দু কালচার'। কিন্তু 'ধর্ম' কথাটা 'রিলিজিয়ন'-এর প্রতিশব্দ নয়, 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ, এই আভিধানিক তথ্য নিয়ে তো হিন্দু-সভ্যতার ভালমন্দ বিচারের কোনও তর্ক ওঠে না। তর্ক যে উঠেছে তার কারণ, এ কথার মধ্যে একটু ইঙ্গিত আছে; এর অভিধা ছাড়িয়ে একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে। হিন্দুর 'ধর্ম' 'রিলিজিয়ন' নয়, 'কালচার'; কিন্তু তার সমস্ত 'কালচার'টাই তার 'রিলিজিয়ন'। অর্থাৎ খ্রিস্টানের গির্জায় গিয়ে হাঁটুগাড়ার সঙ্গে যে মনোভাব রয়েছে, হিন্দুর শৌচাচারের সঙ্গে সেই মনোভাবেরই যোগ রয়েছে। হিন্দুর 'রিলিজিয়াস' ও 'সেকুলার'-এর মধ্যে ভেদ নেই, কারণ সমস্ত সাংসারিক কাজও তাকে করতে হবে 'রিলিজিয়াস' মনোভাব নিয়ে। হিন্দু-সভ্যতার যদি এই আদর্শ হয়, তবে সেটা ভাল কি মন্দ তা নিশ্চয়ই তর্কের বিষয়।

কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা। প্রাচীন হিন্দু 'সেকুলার' ও রিলিজিয়াস' ঐহিক ও পারত্রিক— এর মধ্যে প্রভেদ করেনি, এ তথ্য সম্পূর্ণ অমূলক, টীকাকারদের ভাষায় 'শশবিষাণের মতো অলীক'। ও দুয়ের মধ্যে যে ভেদের গণ্ডি তাঁরা টেনেছেন তা গভীর, যে প্রাচীর তুলেছেন তা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের নব্যহিন্দুদের যদি তা চোখে না পড়ে, সে আমরা চোখ বুজে আছি বলে। এবং চোখ চেয়ে দেখলে হয়তো বা মনঃক্ষুণ্ণ হব।

---

* জুলাই মাসের *The Visva Bharati Quarterly* পত্রিকায় The Spirit of Hindu Law প্রবন্ধে এ কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি।

ধর্মশাস্ত্রে 'ধর্ম' কথার অর্থ কী, এ আমাদের মাথা ঘামিয়ে বের করতে হবে না। ধর্মশাস্ত্রের প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা তা খোলাখুলিই বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'ধর্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যতাবচনঃ'[১], যা কর্তব্য, 'ধর্ম' শব্দ তারই বাচক। 'ধর্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যয়োর্বিধি প্রতিষেধয়োঃ...দৃষ্টপ্রয়োগঃ'[২] যা কর্তব্য এবং যা অকর্তব্য তার বিধি ও তার নিষেধ অর্থেই 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ধর্ম মানে কর্তব্য। মানুষের যত কিছু কর্তব্য— পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিগত ও 'রিলিজিয়াস'— এ সকলের সাধারণ নাম 'ধর্ম'। এ সব বিভিন্ন কর্তব্যের যে এক নাম, এবং এক শাস্ত্রে যে তাদের ব্যবস্থা, তার কারণ, ভিন্ন হলেও একই মানুষের ব্যক্তিত্বের অদ্বয় যোগ-সূত্রে তারা একসঙ্গে বাঁধা আছে। এ-সব কর্তব্যই একই মানুষের নানা সম্বন্ধ ও নানা সম্পর্কের কর্তব্য। কিন্তু যেমন তাদের ঐক্য আছে, তেমনি ভেদও আছে। সব কর্তব্যের মূল এক নয়, প্রমাণ এক নয়। সব কর্তব্যই 'রিলিজিয়াস' নয়, কারণ 'রিলিজিয়াস' কর্তব্য নানারকম কর্তব্যের মধ্যে একরকমের কর্তব্য মাত্র।

এই ভেদ সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রকারদের 'থিয়োরি' সংক্ষেপে এই— মানুষের যা সব কর্তব্য, তার দুটো ভাগ। একভাগ বেদমূল, অন্যভাগ ন্যায়মূল। যে কর্তব্যের মূল বেদ, তা অন্য কোনও প্রমাণে জানা যায় না। বেদের বাক্যই তা জানার একমাত্র উপায়। স্মৃতি বা সদাচার থেকে যে এরকম কর্তব্য জানা যায়, তারও মূল বেদ; কারণ স্মৃতির বচন থেকে বা সাধুদের আচার দেখে সেইরূপ বেদবাক্যের বা বিধির অনুমান করা যায়। কিন্তু মানুষের যে-সব কর্তব্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণে জানা যায়, যে-সব কর্তব্য বেদমূল নয়, ন্যায়মূল। সেখানে বেদের প্রসার নেই, কারণ তারা বেদের বিষয় নয়। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলছেন—'ধর্ম নামে মানুষের যে পুরুষার্থ অন্য কোনও প্রমাণ থেকে জানা যায় না, তাদের জানিয়ে দেয় বলেই বেদের নাম বেদ। এই ধর্ম শ্রেয়ঃসাধন করে বলেই মানুষের কর্তব্য, কিন্তু কেমন করে যে সে শ্রেয়ঃসাধন করে, তা প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না। আরও সব কাজ আছে যা শ্রেয়ঃসাধন করে বলে মানুষের কর্তব্য, যেমন কৃষি। কৃষি যে কেমন করে মানুষের শ্রেয়ঃসাধন করে, তা সাধারণ অন্বয়ব্যতিরেক প্রমাণেই (induction by agreement and difference) জানা যায়। এবং কেমন করে কৃষিসাধন করলে যে ফসল পাওয়া যাবে, তাও প্রত্যক্ষ ও অনুমানেই জানা যায়। কিন্তু যাগযজ্ঞ কেমন করে সাধন করতে হবে, এবং তার সাধনফলে পরকালে কী করে যজমানের সুখ কি স্বর্গলাভ হবে, সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক জ্ঞানের প্রণালী দিয়েই পাওয়া যায় না। এ ধর্ম কেবল জানা যায় বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বিধিবাক্য থেকে, এবং কচিৎ মন্ত্র অংশ থেকে।'[৩]

এই থিয়োরি' অনুসারে ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজধর্ম বা 'পলিটিক্স' বেদমূল নয়,

---

১. মেধাতিথি, ৭/১

২. মেধাতিথি, ১/২

৩. বিদন্ত্যনন্য প্রমাণবেদ্যং ধর্ম্মলক্ষণমর্থমস্মাদিতি বেদঃ। ..যৎ পুরুষস্য কর্ত্তব্যং প্রত্যক্ষাদ্যবগম্য বিলক্ষণ স্বভাবেন। শ্রেয়ঃসাধনং কৃষিসেবাদি ভবতি পুরুষস্য কর্ত্তব্যত্বস্য চ তৎসাধনস্বভাবোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে। যাদৃশেন ব্যাপারেণ কৃষ্যাদের্ব্রীহ্যাদিসিদ্ধিঃ সাপি প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যৈব। যাগাদেস্তু সাধনত্বং যেন চ রূপেণাপূর্ব্বোৎপত্তিব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যম্।... অয়ং ধর্ম্মো ব্রাহ্মণবাক্যেভ্যোঽবগম্যতে লিঙাদিযুক্তেভ্যঃ, ক্বচিচ্চ মন্ত্রেভ্যোঽপি। (মেধাতিথি— মনুভাষ্য, ২/৬)

ন্যায়মূল।[৪] আইন বা ব্যবহারস্মৃতি, তাও বেদমূল নয়—ন্যায়মূল।[৫] পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যদি অন্য কথা বলেন, এবং আমরা যদি সেই কথাকে আমাদের পূর্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বলে চালাই, তার দায়ী প্রাচীন হিন্দু নয়।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারদের এই 'থিয়োরি'তে অনেক নবীন হিন্দু খুব সম্ভব বেজার হবেন। কারণ এ 'থিয়োরি'তে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এবং বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, এ দুয়েরই পথ বন্ধ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যা অলৌকিক তা লৌকিক যুক্তি ও বিচার দিয়ে বুঝবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম; আর যা লৌকিক, তা লৌকিক যুক্তি বিচারেই বুঝতে হবে, তার মধ্যে অলৌকিককে টেনে আনা মূর্খতা। কিন্তু হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল অলৌকিককে লৌকিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা; আর বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হল লৌকিকের মধ্যে অলৌকিককে এনে ফেলা। হিন্দুধর্মের কোনও অংশের যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে, তবে ধর্মশাস্ত্রকারদের 'থিয়োরি' মতে সে অংশটা বেদমূল ধর্ম অর্থাৎ 'রিলিজিয়ন' নয়, ন্যায়মূল লৌকিক কর্তব্য মাত্র। তার ভালমন্দ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে, কারণ শাস্ত্রবাক্যের সেখানে প্রসার নেই। অর্থাৎ প্রত্যুষে ফুলতোলা ও একাদশীতে উপবাস যদি স্বাস্থ্যের জন্য হয়, তবে তার ব্যবস্থা নিতে হবে ভট্‌চাযের কাছে নয়, কবিরাজের কাছে। এবং এতে যার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, তার পক্ষে এ সব কর্তব্য নয়; এ নিয়ে শাস্ত্রের বচন তুলে ধর্মের দোহাই দেওয়া বৃথা। আর যাগযজ্ঞে মানুষের মঙ্গল হয়, শাস্ত্রের বচনে যদি এতে বিশ্বাস জন্মে— ভাল কথা। যদি না হয় তো ফুরিয়ে গেল। লৌকিক যুক্তি তর্ক দিয়ে তা আর প্রমাণ করা যাবে না।

যে মনোভাবের বশে ধর্মশাস্ত্রকারেরা অলৌকিককে লৌকিক থেকে একেবারে পৃথক করে দেখেছিলেন, সে 'র‍্যাশন্যালিজম' বা যুক্তিতন্ত্রতা প্রাচীন আর্যমনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ। যা চোখ মেললে স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ অর্ধেক বুজে তাকে ঝাপসা করে দেখা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যেটা যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্র, তাকে আধ্যাত্মিকতার মোহ, কি হৃদয়াবেগের কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে রাজি ছিলেন না; বুদ্ধির উজ্জ্বল সূর্যালোক সেখানে ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। ধর্মশাস্ত্রকার ও তার টীকাকারদের লেখার প্রতি পাতায় এই 'র‍্যাশন্যালিজম'-এর পরিচয় রয়েছে। যা বিচার ও যুক্তির ব্যাপার, সেখানে যুক্তি ও বিচার যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে পৌঁছতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভয় কি দ্বিধা ছিল না। বিচার-বিতর্ক আমরাও কিছু কম করিনে। কিন্তু তর্কে হেরে কে কবে নিজের ধর্ম ছেড়ে প্রতিবাদীর ধর্ম নিয়েছি, নিজের মতকে প্রকাশ্যে মিথ্যা স্বীকার করে প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্য হয়েছি? বরং এ কাজ যে করে, তাকে বলি কাণ্ডজ্ঞানহীন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর পণ্ডিতসমাজে এ ঘটনা যে নিত্য ঘটত, জনশ্রুতি তার সাক্ষী দিচ্ছে। প্রাচীন আর্যেরা যুক্তিকে কেবল মুখে নয়, জীবনে স্বীকার করতেন।

কিন্তু যুক্তিতন্ত্রতা ধর্মশাস্ত্রের প্রধান কথা নয়। আর্য-মন-যুক্তিতন্ত্রী বলে ধর্মশাস্ত্রেও তার ছাপ লেগেছে। ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে গঠন ও শাসনের শাস্ত্র। এখানে যে মনোভাবের মুখ্য পরিচয়, সে হচ্ছে শিল্পী ও শাসকের, organiser ও administrator-এর মনোভাব। ধর্মশাস্ত্রকারদের

৪ প্রমাণান্তবমূলা হ্যত্র ধর্ম্মা উচ্চ্যন্তে। ন সর্ব্বে বেদমূলাঃ। (মেধাতিথি —মনুভাষ্য, ৭/১)

৫ অন্যত্রাপি ব্যবহাবস্মৃত্যাদৌ যত্র ন্যায়মূলতা তত্র যথাবসবং দর্শযিষ্যামঃ। (মেধাতিথি, ২/৬)

চোখের সামনে ব্যক্তি ও সমাজের একটি স্পষ্ট ও পূর্ণ আদর্শমূর্তি ছিল। তাঁহাদের *বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে ঠিক সেই আদর্শের মতো মূর্তি দিয়ে গড়ে* তোলা। এবং এ কাজে তাঁদের সাহসের অন্ত ছিল না। মানুষের জীবনকে তাঁরা মনে করতেন শিল্পীর মূর্তিগড়ার উপাদান। সহস্র বিধিনিষেধের অস্ত্রে কেটে যে একে মনের আদর্শমূর্তির সঙ্গে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তাতে তাঁদের সন্দেহ ছিল না। এবং ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের কোনও অংশ অনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ অগঠিত থাকবে, তাঁদের মন ছিল এ মনোভাবের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে প্রাচীন আর্য-মন ছিল যাকে এখন আমরা বলি 'বুরোক্র্যাটিক' মন। ধর্মশাস্ত্রকারদের চেষ্টার ফলে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার হিত হয়েছে বেশি, না অহিত হয়েছে বেশি, এ অবশ্য তর্কের কথা। মানুষের জীবনকে কতটা হাতে গড়ে তোলা যায়, আর প্রাণবন্ত বলে কতটা ছাড়া রাখলে তবে সে নিজে গড়ে ওঠে— এ বিচারের হয়তো কোনও চরম মীমাংসা নেই। বাঁধনের বাধায়, ক্লিষ্ট হয়ে একবার সে চাবে মুক্তি, আবার ছন্দহীন মুক্তিতে হাঁপিয়ে উঠে খুঁজবে নতুন বন্ধন। সে যাহোক, জীবনের প্রাণপন্থা ও শিল্পপন্থার বিচারে প্রাচীন আর্যেরা ছিলেন শিল্পপন্থী। যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ, তারা যে বিধিনিষেধের এত শাসন মানবে না, ধর্মশাস্ত্রকারদের তা অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন আচার্য গৌতম বলেছেন, 'দৃষ্টো ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্', যাঁরা মহৎ তাঁদের সাহস আছে, তাঁরা ধর্মবিধিকে অতিক্রম করে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধি ও মনে যারা মধ্যবিত্ত, বিধিনিষেধ অতিক্রম করে চলার অধিকার তাদের দিতে ধর্মশাস্ত্রকারদের সাহস ছিল না। প্রাচীন হিন্দুরা ব্যাকরণের জটিল বন্ধনে ভাষাকে বেঁধেছিলেন। ঋষিদের বাক্য এ জটিলতাকে মানবে না, মহাকবিরা যে এ বন্ধন ছাড়িয়ে যাবেন, তা তাঁরা জানতেন। কিন্তু যারা ঋষিও নয়, কবিও নয়, তাদের স্বেচ্ছাচারকে তাঁরা অত্যাচার বলেই মনে করতেন।

কার্তিক ১৩৩২

চাষি

আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার ভিত খোঁড়া হয়েছে লাঙলের ফলায়। মানুষ যে আদিতে অসভ্য যাযাবর ছিল, তার কারণ স্থিতিশীল সভ্য হয়ে তার প্রাণে বাঁচবার উপায় ছিল না। অন্নের পশু ও পালিত পশুর অন্নের সন্ধানে তাকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিক্রম করতে হত। পরিচিত ভূভাগ স্বল্পপশু ও তৃণবিরল হয়ে উঠলে, অজ্ঞাত দেশের দিকে পা বাড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা চলত না। কৃষির রহস্য আয়ত্ত করে তবেই মানুষ এ ভবঘুরে অস্থিরতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। চাষের ক্ষেতকে কেন্দ্র করে তারই চারপাশে গ্রাম, নগর, স্বদেশ, স্বরাজ্য গড়ে

উঠেছে। এইসব স্থায়ী আবাসে চাষের অন্নের কৃপায় মানুষের মন, শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, শিল্প ও সৌন্দর্য, ভাব ও জ্ঞানের বিচিত্র সৃষ্টিতে রত হয়েছে। তার কর্মকুশলতা অজস্রধারায় সহস্র পথ কেটে চলেছে। এই সভ্যতার জন্মের সন তারিখ ঠিক জানা নেই। কিন্তু মানুষ যেদিন চাষের ক্ষেতের কারখানায় দ্যাবা-পৃথিবী থেকে অন্ন চুইয়ে নেবার সজীব কলের সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কার করেছে সেই দিনই এর জন্মদিন।

মাটির চাষ সভ্যতাকে বহন করে এনেছে, কিন্তু সে সভ্যতা চাষিকে বহন করতে পারেনি। চাষি চিরদিনই সভ্যতার ভারবাহী মাত্র হয়ে আছে। সে হচ্ছে সভ্যতার মূল। মাটির নীচে থেকে রস টেনে সে সভ্যতার ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে, কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সে কখনও জানবে না।

এর কারণ সভ্যতার জন্মকথার সঙ্গেই জড়ানো রয়েছে। মানুষের যাযাবর জীবন ছিল সাম্য ও স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য। জমিয়ে জমিয়ে অবাধে বাড়িয়ে তোলা যায়— ধনের এমন আকার ছিল না বলে, ধনী ও নির্ধনের উৎকট প্রভেদ তখন সম্ভব ছিল না। সমাজের এক ভাগ অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলের মোটা অংশ ভোগ করবে, এ ব্যবস্থার উপায় ও অবসর অতি সামান্য ছিল, এ জন্য সমাজের মধ্যে দাস-প্রভু সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারেনি। বহিঃপ্রকৃতির দাসত্ব সকলকেই এমন নিরবচ্ছিন্ন করতে হত যে, সে দাসের দলের এক ভাগের আর প্রভু হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। চাষের জ্ঞানের ফলে মানুষ সে-স্বর্গরাজ্য থেকে চ্যুত হয়েছে। মাটি যেদিন ধন হয়েছে, ও-স্বর্গরাজ্যও সেদিন মাটি হয়েছে। চাষের ফসলকে জীবনোপায় করার সঙ্গে সেই কৌশল মানুষের করায়ত্ত হয়েছে, যাতে একজন বহুজনকে অনাহারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে খাটিয়ে নিতে পারে। আর তার ফল ক্রমে জমা করে সে ক্ষমতাকে ক্রমে বাড়িয়ে চলতে পারে। যারা বলী ও কৌশলী, এ চেষ্টায় তাদের প্রলোভনও ছিল প্রচুর। যাযাবর জীবনে যারা অভ্যস্ত, চাষের পরিশ্রম তাদের কাছে বিস্বাদ ও অতিমাত্রায় ক্লেশকর। ক্ষুধার তাড়নায় গুরু শ্রম, আর তার শান্তিতে অখণ্ড আলস্য, এই ছিল যাযাবর জীবনযাত্রার সাধারণ ধারা। এর তুলনায় চাষির শ্রম কঠোরতায় লঘু, কিন্তু সে শ্রম প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রম, অনভ্যস্তের কাছে যা সবচেয়ে পীড়াকর। সে পরিশ্রম করতে হয় বর্তমানের ক্ষুধার তাড়নায় নয়, ভবিষ্যতের অনাহারের আশঙ্কায়। কারণ সে পরিশ্রমে বর্তমানের ক্ষুধানিবৃত্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুই আশ্চর্য নয় যে, এই চিরফলপ্রসূ, নিয়ত পরিশ্রমের গুরুভার বলবান ও বুদ্ধিমান লোকেরা চিরদিনই দুর্বল ও হীনবুদ্ধিদের কাঁধেই চাপিয়ে এসেছে।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এই উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে। সভ্য গ্রিসের রাজ্যগুলিতে চাষি ছিল ক্রীতদাস; আর এ ব্যবস্থা ভিন্ন সভ্যতা কী করে টিকে থাকতে পারে, গ্রিক পণ্ডিতেরা তা ভেবে পাননি। রোমান সভ্যতা সাম্রাজ্যের পথে পা দিতেই হাতের লাঙল তুলে দিয়েছিল দাসদের হাতে। ইউরোপের মধ্যযুগে ও রুশিয়াতে সেদিন পর্যন্ত চাষি ছিল নামে ও কাজে দাসেরই রূপান্তর। হিন্দুর শাস্ত্রে চাষের কাজ বৈশ্যের, অর্থাৎ আর্যের— যার বেদে অর্থাৎ বিদ্যায় অধিকার আছে। শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রের পুথিতেই লেখা আছে, কিন্তু সুদূর অতীত থেকে চাষের লাঙল ঠেলছে শূদ্রে, যে শূদ্রকে 'দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ

ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা'— স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তা দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মোট কথা, ধনতন্ত্রের যেমন দুই দিক— ধনসৃষ্টি ও ধনবিভাগ; সভ্যতার ও তেমনি দুই দিক— সৃষ্টি ও বিভাগ। শরীর ও মনের যা পুষ্টি ও সম্পদ, তার সৃষ্টির কাজে নানা সভ্যতার মধ্যে বড় ছোট, ভালমন্দ ভেদ আছে; কিন্তু বিভাগের কাজে সব সভ্যতার এক চাল। সভ্যতার সৃষ্টির বড় ও শ্রেষ্ঠ অংশ ভাগ হয় অল্প ক'জনার মধ্যে, যা অবশিষ্ট তাই থাকে বাকি সকলের জন্যে, যদিও শ্রমের ভাগটা তাদেরই বেশি।

যে সভ্যতা নিজেকে আধুনিক বলে গর্ব করে, তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান দাবি এই যে, বিভাগের এই উৎকট বৈষম্য সে ক্রমে কমিয়ে আনছে। জ্ঞান ও রসের সৃষ্টিকে অল্প ক'জনার জন্যে তুলে না রেখে, যার শক্তি আছে তারই আয়ত্তের মধ্যে এনে দেবার সে নানা পথ কেটে দিচ্ছে। শরীরের জন্য যে বস্তুসম্ভার, তাকে ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান এবং স্বল্পভাগ্য ও সাধারণবুদ্ধি লোকের মধ্যে কেবল প্রয়োজনের মাপে বেঁটে দেওয়া সম্ভব না হলেও, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে যাতে কেউ না বঞ্চিত হয়, সেদিকে তার চেষ্টার বিরাম নেই; এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শকেও সে ক্রমে উঁচু দিকেই টেনে তুলছে। পূর্বে যা ধনীর বিলাস ছিল, তাকে সে অল্পবিত্তের নিত্য ব্যবহার্য করেছে। তার জন্যে ধনীর ব্যসনের আয়োজনও পরিমাণ কমাতে হয়নি, তা বরং বেড়েই চলেছে। তবুও যে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, সে হচ্ছে বস্তুসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল সে আবিষ্কার করেছে, তারই প্রয়োগে। এই কৌশলের বলে স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে, অল্প লোকে, অতি সামান্য সময়ে প্রয়োজন ও বিলাসের যে বৃহৎ সামগ্রীসম্ভার উৎপন্ন করতে পারে, ইতিপূর্বে সমস্ত দেশব্যাপী লোকের বহুদিনের চেষ্টাতেও তা সম্ভব ছিল না। এই কৌশলের নাম 'ইনডাস্ট্রিয়্যালিজম'।

আধুনিক 'ইনডাস্ট্রিয়্যাল' সভ্যতার এই দাবি, তার জন্ম ও লীলাভূমি পশ্চিম ইউরোপে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। সেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও যতই পার্থক্য থাকুক, ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের প্রয়োজন ও বিলাসের উপকরণের জোগান যতই নগণ্য হোক, এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, পূর্ব পূর্ব যুগের তুলনায় 'ইনডাস্ট্রিয়্যাল' যুগের সভ্যতার ভারবাহীরা অনেক বেশি পরিমাণে সে-সভ্যতার ফলভোগী হয়েছে। এ সভ্যতার যারা মাথায় রয়েছে, এ যে তাদের উদারতায় ঘটেছে তা নয়। যারা ধনে ও বুদ্ধিতে প্রবল, তারা নিজেদের লাভের লোভেই 'ইনডাস্ট্রিয়্যালিজম'-এর গোড়াপত্তন করেছে। কিন্তু তার ফলে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে ভারবাহীদের দল বাঁধবার সুযোগ ঘটেছে, এবং দলের চাপেই তারা ও-ফল আদায় করেছে। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এর সম্ভাবনা ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। নূতন সৃষ্টিকৌশলে জোগানের পরিমাণ যদি না বেড়ে যেত, তবে ধনিকের ভাণ্ডার খালি না করে শ্রমিকের থলি ভরানো কিছুতেই চলত না।

কিন্তু 'ইনডাস্ট্রিয়্যাল' দেশগুলিতে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, চাষিকে নিয়ে প্রাক-'ইনডাস্ট্রিয়্যাল' সভ্যতার যা সমস্যা, 'ইনডাস্ট্রিয়্যালিজম' তার কোনওই সমাধান করতে পারেনি; সমস্যাটিকে এক পা দূরে হটিয়ে রেখেছে মাত্র। পূর্ব যুগের সভ্যতা যে গোঁজামিল দিয়ে এর মীমাংসার চেষ্টা করত, 'ইনডাস্ট্রিয়্যাল'-সভ্যতা খুব ব্যাপকভাবে সেই গোঁজামিলই চালাতে চাচ্ছে।

সভ্যতার নিত্য সমস্যা হচ্ছে, জীবনের পুষ্টি ও আনন্দের যা উপকরণ আবিষ্কার হয়েছে, কী করে তা যথেষ্ট উৎপন্ন করে সমাজের মধ্যে এমন করে বেঁটে দেওয়া যায়, যাতে প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে কেউ বাদ না পড়ে, অথচ উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগের আকর্ষণেরও অভাব না হয়; আর প্রকৃতি যাদের নূতন সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে জন্ম দিয়েছে, তাদের সেই শক্তিপ্রয়োগের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের কী করে ব্যবস্থা করা যায়। এর একটির উপর নির্ভর করে সভ্যতার স্থিতি, অন্যটির উপর তার বৃদ্ধি। এ পর্যন্ত কোনও সভ্যতা এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সব সভ্যতা তার বোঝা চাপিয়েছে সমাজের একটা অংশের উপর, যাতে বাকি অংশটা ওই পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে সভ্যতার ভোগ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট উপকরণ ও অবসর পায়। সব সভ্যতার অন্তরেই এই ভয় যে, ওই পরিশ্রমের ভার সমাজের এক অংশের মাথা থেকে লাঘবের জন্য সকলের উপর ভাগ করে দিলে, সভ্যতা সমাজের সকলের পক্ষেই বোঝা হয়ে উঠবে। ওর ভোগের উপাদান কারও ভাগ্যে জুটবে না, ওর বৃদ্ধির সুযোগ ও অবসর কারও ঘটবে না। কাজেই সভ্যতার স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য বলে হোক, ছলে হোক, সমাজের একদল লোককে তার ভারবাহী করতেই হবে, এবং খুব সম্ভব সে-দল লোক হবে সংখ্যায় সবচেয়ে বড় দল।

'ইনডাস্ট্রিয়াল'-যুগের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক সভ্যসমাজে সভ্যতার এই ভারবাহীর দল ছিল চাষি। কারণ কৃষিই ছিল প্রতি সমাজের জীবিকার মূল উৎস। 'ইনডাস্ট্রিয়ালিজম' হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, কৃষিকে বাদ দিয়ে এক নূতন ধরনের কারুশিল্পে সমাজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম নিয়োগ করলে তার ফল ফলে বেশি। কৃষি জীবিকার যে উপকরণ উৎপন্ন করে, সমান পরিশ্রমে এতে তার অনেক গুণ বেশি পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হলে দেখা গেল যে, এই সমাজব্যবস্থায় সভ্যতার ভারবাহীদেরও অনেক পরিমাণে তার ফলভোগী করা কৃষিসভ্যতার তুলনায় সহজসাধ্য। কারণ এতে যে অল্প সময়ের পরিশ্রমে অনেক বেশি ফল লাভ হয় কেবল তাই নয়, এ ব্যবস্থায় কৃষির জন্য দেশের অধিকাংশ লোককে দেশময় বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে থাকতে হয় না, স্থানে স্থানে অল্প জায়গার মধ্যে তাদের সংঘবদ্ধ হতে হয়। অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী না থেকে নগরবাসী হয়; এবং গ্রাম্য হল সভ্যতার বোঝাবাহী বর্বর, আর নাগরিক তার ফলভোগী বিদগ্ধজন। শহরের দলবদ্ধ লোকের শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য যা সহজসাধ্য, সারা দেশে ছড়ানো চাষির জন্য সে ব্যবস্থা অতি দুঃসাধ্য।

'ইনডাস্ট্রিয়ালিজম'-এর এই পরিণতিতে ইউরোপের অনেক সমাজহিতৈষী ভাবুক স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁরা বলছেন এখন যদি ধনীর লাভের লোভ ও বিলাসের দাবি কমানো যায়, এবং কাউকেও অলস থেকে পরের পরিশ্রমের ফলভোগ করতে না দিয়ে পরিশ্রমের ভার সকলের মধ্যে ভাগ করা যায়, তবে প্রত্যেক লোকের প্রতিদিন অল্প সময়ের পরিশ্রমেই সমাজের সকলের প্রয়োজন ও অল্পস্বল্প বিলাসের উপযোগী ধন উৎপন্ন হতে পারে। আর সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল, সৃষ্টি-কৌশলীদের তার সৃষ্টির এবং অন্য সকলের তার রসগ্রহণের শিক্ষা, সুযোগ ও অবসরের ব্যবস্থা হয়। সভ্যতার ভারবাহী হতভাগ্যের দল সমাজ থেকে লোপ পায়।

বিনা আগুনে এই অন্নপাক কী করে সম্ভব হবে? উত্তর অতি সহজ, পরের আগুনের উপর পাকপাত্র চাপিয়ে। ইনডাস্ট্রিয়্যাল-সমাজ চায় কৃষির পরিশ্রম ও তার আনুষঙ্গিক সমাজব্যবস্থার অসুবিধা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। অথচ ইনডাস্ট্রিয়্যালিজমের আদি ও অন্ত চাষির পরিশ্রমের উপর নির্ভর করছে। তার শিল্পের উপাদানও জোগাবে কৃষি, বিনিময়ও জোগাবে কৃষি। সুতরাং 'ইনডাস্ট্রিয়্যাল' সমাজ থেকে কৃষির পরিশ্রম দূর করার অর্থ— অন্য সমাজের উপর সেই পরিশ্রম দ্বিগুণ করে চাপানো, প্রতি সমাজে চাষির যে সমস্যা ছিল, কতকগুলি সমাজ থেকে তা সরিয়ে অন্য কতকগুলি সমাজের ঘাড়ে তুলে দেওয়া; পৃথিবীর প্রতি সভ্যদেশের একদল লোককে তার সভ্যতার ভারবাহী না করে, কতকগুলি সভ্যদেশের সভ্যতার ভার অন্য কতকগুলি দেশকে দিয়ে বহন করানো; যে ছল ও বল প্রত্যেক সভ্যসমাজের এক ভাগ লোক অন্য ভাগের উপর প্রয়োগ করত, সেই ছল ও বল আত্মীয়তার বাধা নিরপেক্ষ হয়ে মনুষ্যসমাজের একভাগের উপর প্রয়োগ করা।

যাযাবর মানুষের সঙ্গে স্থিতিশীল কৃষিসভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বড় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এই সংঘর্ষেই রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে, বোগদাদের মুসলিম সভ্যতার বিলোপ ঘটেছে। 'ইনডাস্ট্রিয়্যালিজম' সেই সংঘর্ষেরই আর এক মূর্তি। চাষের পরিশ্রম অস্বীকার করে এও চাষির পরিশ্রমের ফল লুটতে চায়। যে ধন ও ধনী একে চালনা করছে, তারাও মুখ্যত যাযাবর। এক দেশ থেকে অন্য দেশে, পৃথিবীর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে প্রয়োজনমতো চলে বেড়াতে তাদের কিছুতেই বাধা নেই। এবং এর হাতে বিনিময়ের বাটখারা থাকলেও, অন্য হাতে যাযাবরের শাণিত অস্ত্র বহাল রয়েছে।

সভ্যতার যা সমস্যা, 'ইনডাস্ট্রিয়্যালিজম' তার মীমাংসা নয়; কারণ ও ব্যবস্থা মানুষের সমাজকে এক করে দেখে না এবং দেখতে পারে না। মানুষের এক অংশকে ভারবাহীতে পরিণত না করে, সভ্যতাকে কেমন করে বাঁচানো ও বাড়ানো যায়, সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে 'ইনডাস্ট্রিয়্যালিজমে'র এর কোনও উত্তর নেই। মানুষের সভ্যতার চরম সমস্যা হচ্ছে চাষি। যেদিন চাষিকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে ফলভোগী করা সম্ভব হবে, কেবল সেইদিন সভ্যতার সমস্যার যথার্থ মীমাংসা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রমাণ হবে গ্রিকপাণ্ডিত্যের কথাই সত্য, দাসের শ্রম ভিন্ন সভ্যতার চাকা অচল।

ফাল্গুন ১৩৩২

ভারতবর্ষ

হালের ভারতবর্ষ নিয়ে আমাদের ইংরেজ সরকারের যে মুশকিল হয়েছে তার বিশগুণ বিপদে পড়েছি আমরা ভারতবাসীরা প্রাচীন ভারতবর্ষকে নিয়ে।

বর্তমান যাহোক অনেকটা চোখের সামনে রয়েছে। ওর ভিতরে কি আছে না আছে আশঙ্কা হলে সঙিন দিয়ে খুঁচিয়ে দেখা যায়; ওর ধড়ফড়ানি লাঠি পিঠে ঠান্ডা করা চলে; ওর মুখরতার মুখ বন্ধের জন্য মোয়া লাড্ডু, রাহা খরচ আছে। কিন্তু অতীতকে নিয়ে কী করা যায়। ওকে না যায় চোখে দেখা, না চলে চেপে ধরা। অথচ অবস্থার গতিকে এমনি দাঁড়িয়েছে যে, আজকার দিনে ভারতবর্ষের অতীত ছাড়া অন্য দিকে চোখ ফিরাতে গেলেই গালে চড় পড়ে; ওর বোঝার চাপে পিঠ বাঁকা হওয়ার নামই মুক্তি নয় এ বলার জো'টি নেই। কারণ আমরা দশে মিলে ভোটে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি যে ভারতবর্ষের অতীতই তার বর্তমানের পথের আলো; ও-আলো আমাদের পেছন থেকে সামনে ছায়া না ফেলে কেবল আলোই ছড়াচ্ছে। আর এতেও আমাদের সন্দেহ নেই যে ওই অতীতকে পিঠে সোয়ার করতে পারলেই সে আমাদের সোজা গম্য অর্থাৎ কাম্য স্থানে পৌঁছে দেবে। জাতি যখন তার বর্তমানের হীনতা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, পঙ্গুতা পরিহার করে এগিয়ে চলার বল সংগ্রহ করে, তখন নিজের অতীত থেকে শক্তি লাভের চেষ্টা কিছু নূতন নয়। সামনে এগিয়ে চলাকে পিছনে ফিরে যাওয়া বলে কল্পনার মধ্যেও নূতনত্ব কিছু নেই। এ-সব ঘটনা মানুষের ইতিহাসে নানা জাতির মধ্যে বার বার ঘটেছে। এর কারণ কোনও সভ্যতার গতিই একটানা নয়। দৌড়ে বসে জেগে ঘুমিয়ে, উঠে পড়ে এমনি করেই সভ্যতা চলছে ও চলবে। সেই জন্য কোনও আপাত-স্থবির জাতির মধ্যে যখন নব-জীবনের স্পন্দন আসে এক অর্থে সেটা তার পুনর্জন্ম। তার অতীতের যে-সব অংশে প্রাণের প্রাচুর্য ছিল তার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। নবজাগ্রত জাতির চোখের সম্মুখে প্রাণে ভরপুর ভবিষ্যতের যে ছবি থাকে প্রাণহীন বর্তমানের চেয়ে প্রাণবন্ত অতীতের সঙ্গে তার মিল ঢের বেশি। এই জন্য ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে মনে হয় অতীতের দিকে ফিরে চলা। কিন্তু মুখে যাই বলুক, জাতির অন্তরাত্মা যা' চায় তা' অতীতকে মকসো করতে নয়, নিজের প্রাণে অতীতের প্রাণের সেই স্পর্শ পেতে যার বেগে অতীত তার বর্তমানকে ছাড়িয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

আজকে আমরা ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা পূরণে যে তার অতীতকে ডাক দিচ্ছি, তারও নিশ্চয় এই অর্থ। আমরা ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের সেই সব যুগের সঙ্গে মনের যোগ ঘটাতে চাচ্ছি যার প্রাণের বেগ ও গতি আমাদের বর্তমান চেষ্টা ও ভবিষ্যৎ আদর্শের অনুকূল ও অনুরূপ। না হলে কোনও জাতিরই সমস্ত অতীতটা তার গৌরবের নয়; ভারতবর্ষেরও নয়। সুতরাং এ প্রশ্নটা উঠে পড়ে, আমাদের এই বাঞ্ছিত অতীত ভারতবর্ষের বিচিত্র ও দীর্ঘ ইতিহাসের কোন অতীত? ভারতবর্ষের প্রাণ মনের বিকাশের কোন ছবিটা বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে রাখা সবচেয়ে দরকারি। সকলেই জানে এর এক কথায় উত্তর 'আধ্যাত্মিকতা'। আর এ উত্তরের সুবিধা এই যে সংক্ষিপ্ত হলেও ওর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ উত্তর যাঁরা দেন তাঁরা বলেন ও বস্তু অনুভূতিগম্য, কথায় বোঝানোর

জিনিস নয়। ওর স্বরূপ অবাচ্য; কেবল ও কী নয় তাই কতকটা নেতি নেতি করে বলা যায়। এবং তা বলতে গেলে যা দাঁড়ায় সে হচ্ছে ও পদার্থ সমাজতত্ত্ব নয়, রাজনীতি নয়, অর্থনীতি নয়; ধর্ম-ব্যবহার, শিল্পকলা নয়; কাব্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন—কিছু নয়। অর্থাৎ মানুষের প্রাচীন ও নবীন আর সমস্ত সভ্যতা যা গৌরবের জিনিস বলে জানে তার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই। আর ওই বস্তু হল ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতা, যাকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ-দীনতার অবসান হবে। সোজা কথায় ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ছিল একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিস, যার সঙ্গে বাকি পৃথিবীর কোনও যোগ ছিল না। বর্তমানে আমাদের হতে হবে কিম্ভূতকিমাকার জাতি, যার সঙ্গে আর কারওর কোনও মিল থাকবে না।

মন বেজার হলেও সত্যের খাতিরে স্বীকার কবতে হবে, প্রাচীন ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক সভ্যতার ছবি আমরা আঁকিনি। এঁকেছে একদল ইউরোপীয় পণ্ডিত, যাদের বলে 'ওরিয়েন্টালিস্ট'— প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। এদেরই ক'জন মিলে এই উপন্যাসটি রচনা করেছে যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা একটা অদ্ভুত জিনিস ছিল। অন্য সব সভ্যতার সঙ্গে তার মিলের চেয়ে গরমিল বেশি। আর আর সভ্যতা বাস করে ইহলোকে, ও-সভ্যতা বাস করে পরলোকে; আর সবাই চায় জীবন, ও চাইত মৃত্যু; আর সবার চোখ ছিল চেয়ে দেখবার জন্য, ওর ছিল বুজে ধ্যান করবার জন্য? এই উপন্যাসটি মুখস্থ করেই আমরা জোর গলায় প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার বক্তৃতা উদ্‌গিরণ করছি। এর এক প্রধান কারণ আমাদের বর্তমান প্রভুদের উপর অভিমান। তাঁরা নাকি আমাদের বুটের তলায় চেপে রেখেছেন, তাই আমরা সেখান থেকেই বলছি, 'আছি বটে নীচে পড়ে কিন্তু তোমরা বুঝবে না আমাদের বাস কত উঁচুতে। তোমরা যা' সবের গৌরব কর ও-সব তো কিছুই নয়। আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা ও-সবকে সভ্যতার উপকরণ বলেই গণনা করতেন না। তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক; আমরাও তাঁদেরই বংশধর।' নইলে এ-সব কথা বোঝা শক্ত যে, যে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস হল মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ছিল মনুসংহিতা, যার অর্থশাস্ত্রের আচার্য কৌটিল্য, যার মোক্ষশাস্ত্র ছিল গৃহীর অপাঠ্য, আর বাৎস্যায়নও যার ঋষি, তার ছবি আমরা আধ্যাত্মিকতার একরঙা তুলিতে কেমন করে এঁকে তুলি। তবে এ কথাও ঠিক, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বক্তৃতা দিতে তার যা সব নিদর্শন আছে তার সঙ্গে পরিচয়ের কোনও প্রয়োজন নেই; মনের খুশিতে কল্পনা করে নিলেই হল। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, বাল্মীকির রামায়ণের উপর তাঁর অগাধ ভক্তি তিনি সব সময়ে প্রচার করতেন। কথাপ্রসঙ্গে সন্দেহ হল ও-বই তিনি কখনও চোখে দেখেননি। জিজ্ঞাসায় বললেন, বাল্মীকির রামায়ণ মূলে কি অনুবাদে তিনি কখনও পড়েননি বটে কিন্তু তুলসীদাসের রামায়ণের ইংরাজি অনুবাদ অনেকটা পড়েছেন। একদিন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড থেকে বর্ষায় রামের বিরহ বর্ণনা তাঁকে পড়ে শোনালে দেখলেম তিনি বড় মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর জন্য ও-রকম বিলাপ একালের কলেজের ছেলেদের ফ্যাশান; কিন্তু রামচন্দ্রের পক্ষে— স্পষ্ট বুঝলুম রামায়ণের রামসীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর মনে কল্পনার যে-ছবি ছিল রামায়ণ বইটা তাতে একটা জবর ঘা দিল।

কিন্তু আজ যখন আমরা কল্পনার জাল বোনা ছেড়ে জীবনের জাল নিয়ে বসেছি তখন এ

কথা জোর করে স্পষ্ট করে বলার সময় হয়েছে, কি ভারতবর্ষের অতীত, কি তার বর্তমান কিছুই পৃথিবী-ছাড়া সৃষ্টিছাড়া নয়। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতা অবশ্যই ছিল, কারণ দুটো সভ্যতা দূরে থাকুক, এক গাছের দুটো পাতাও ঠিক একরকম নয়। ঠিক একই ছাঁচের বহু জিনিস বের হয় কল থেকে, জীবন থেকে নয়; কিন্তু এই বিশিষ্টতার যা ভিত্তি তা মানব-সভ্যতার সাধারণ ভিত্তি। ইমারতের গড়ন আলাদা কিন্তু তার মালমশলা একই। প্রাচীন পৃথিবীর যেগুলি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে তাদের বৈষম্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি। যেমন মানুষে মানুষে তফাতের চেয়ে মিলই বেশি। ইংরেজ টেবিল পেতে কাঁটা চামচে দিয়ে খায়, আমরা পাতা পেতে হাত দিয়ে খাই। এর মধ্যে তফাতের চেয়ে এই মিলই নিশ্চয়ই ঢের বেশি যে, শরীর ধারণের জন্য ইংরেজকেও খেতে হয়, ভারতবাসীকেও খেতে হয়। আজকার চিত্তবিভ্রমের দিনে এই সহজ কথা আমাদের মনে করা দরকার হয়েছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত, সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত, দুর্ভিক্ষে লোক মরত, কবিরা প্রেমের কবিতা লিখত, উৎসবে মোহমুদ্গর পাঠ হত না। এবং আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে তুলব তারও বিশিষ্টতা থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু চারপাশের সভ্যতার সঙ্গে সে একটা খাপছাড়া কিছু হবে না। তারও রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবহার দরকার হবে। সে-ও হবে মানুষের সভ্যতার বিচিত্র লীলার একটা প্রকাশ। এ নাস্তিকতা মন থেকে দূর করতে হবে, যে, ভগবান সমস্ত পৃথিবীকে বঞ্চিত করে শ্রেষ্ঠ যা কিছু তা ভারতবর্ষের উপরেই বর্ষণ করবেন।

এখন মনে হচ্ছে, এই যে তর্ক করছি এও বিশিষ্টতার দাবি শুনে শুনে একটু বিভ্রান্ত হয়ে। ভাবটা প্রকাশ করছি যেন এ দাবির মধ্যে একটা বিশিষ্টতার কিছু আছে। কিন্তু ভেবে দেখছি ওই বিশিষ্টতার দাবি সব সভ্যজাতিই করেছে। 'আমরা আর কারু মতো নই' এ কথায় সবাই আর সবার মতো; বিশেষ করে যে-সব জাতি ঘা খেয়ে পড়ে আবার উঠতে যাচ্ছে। নেপোলিয়নের মার খেয়ে প্রুশিয়া যখন শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল, তখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের কাছে দার্শনিক ফিক্তে ঠিক এই বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। "আমরা জার্মান জাতি বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি। মানুষের ভবিষ্যৎ আমাদের উপরেই নির্ভর করছে। আমরা যে সভ্যতা গড়ব সে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।"

এতক্ষণ যা বললুম তা এই কল্পনা করে যে বর্তমান ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর ভারতবর্ষ। অতীত থেকে যা কিছু আলো চাই সে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার আলো। কিন্তু সবাই জানি এটা কেবলই কল্পনা। বর্তমান ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর ভারতবর্ষ নয়। অন্তত্তপক্ষে হিন্দু মুসলমান এ দুয়ের ভারতবর্ষ। এবং যে অতীত হিন্দুর গৌরবের তাতে মুসলমানের স্পর্শ নেই। আর যে অতীত মুসলমানের গৌরবের তা ভারতবর্ষের অতীত নয়। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের গড়ে তুলতে হবে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সন্দেহ মাত্র নেই, এই ব্যাপারে আমরা যেই খেলা ছেড়ে কাজে লাগব অমনি বর্তমানের ঘষায় প্রাচীন গৌরবের খোঁচাগুলি পালিশ হয়ে যাবে। হিন্দুর যাবে, মুসলমানেরও যাবে। এবং বিধাতার কৃপায় আমাদের হয়তো সেই ভূমিতেই যেয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে মানুষের বিভিন্ন সভ্যতা গোঁড়ামি ছেড়ে নির্বিরোধে মিশতে পারে।

তুতান্-খামেন্

হাজার তিনেক বছর হল মিশরের এই রাজাটি জীবনযাত্রার চেয়ে বেশি আড়ম্বরে মরণ-যাত্রা করেছিলেন। খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, গন্ধ-অলংকার— সেগুলি ভরে নেবার নানারকম শৌখিন বাক্স-পেটরা, খাট-পালঙ্ক, চৌকি-সিংহাসন, যান-বাহন, এমনকী বৈতরণীর খেয়া পারের নৌকো পর্যন্ত সঙ্গে ছিল। তিন ঘর বোঝাই এইসব আসবাবপত্র এপার থেকে ওপারের পথ কতটা সুগম করেছিল জানার জো নেই, কিন্তু ওগুলো যে মহারাজকে ওপার থেকে এপারে তিন হাজার বছরের ব্যবধান নিমেষে পার করে এনেছে তাতে সন্দেহ নেই। মহারাজকে তো এ season-এ ইউরোপের leader of fashion বললেই চলে। তাঁর পোশাকের cut-এ লন্ডনে জামা কাটা হচ্ছে, তাঁর কোমরবন্ধের কায়দায় প্যারিতে মেয়েদের কোমরবন্ধ তৈরি হচ্ছে। আশা করা যায়, কলকাতার রাস্তায়ও 'তুতান্-খামেন্ চটিজুতা'র বিজ্ঞাপন শীঘ্রই দেখা যাবে।

মিশরের সভ্যতার প্রকাণ্ড দীর্ঘ ইতিহাসে তুতান্-খামেন্ খুব প্রাচীন রাজা নন। ঐতিহাসিক জ্ঞান বর্তমানে যে রাজবংশে গিয়ে ঠেকেছে বলে তাকে বলা হয় প্রথম রাজবংশ, মিশরের সেই রাজবংশের রাজারা এখন থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেকার লোক— অর্থাৎ তাঁদের সময় থেকে তুতান্-খামেনের সময়ের ব্যবধান, তুতান্-খামেনের ও বর্তমান কালের মধ্যের ব্যবধানের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। আর তুতান্-খামেনের কবরে জিনিসপত্র, ছবি, মূর্তি যা-সব পাওয়া গেছে, বিস্ময়ের প্রথম চমক কেটে গেলে হয়তো প্রমাণ হবে, ওদের সোনার পালিশ আর মণি-মাণিক্যের দ্যুতি ইতিহাসের অন্ধকারকে বড় বেশি আলো করেনি— মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ওরকম সব নিদর্শন বেশির ভাগই ইতিপূর্বেই আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এ-সব নাস্তিকতার কথা আজ নয়। আজ 'জয় মহারাজ তুতান্-খামেনের জয়'। রয়টারের বিদ্যুৎ সবাইকে ধাক্কা দিয়ে জানাচ্ছে, মানুষের সভ্যতা কিছু সেদিনকার বস্তু নয়; ও-জিনিসটি প্রাচীন ও বুনিয়াদি। চেয়ে দেখ তিন হাজার বৎসর আগেকার মিশরের ঐশ্বর্য, শিল্প-কলা, বিলাস, ব্যসন। যা নিতান্ত আধুনিক হালফ্যাশান ভেবেছিলে তাও গ্রিস জন্মাবার হাজার বছর আগে মানুষের সমাজে চলতি ছিল।

কিন্তু কেবল কথায় খুশি না থেকে কাগজওয়ালাদের ছবি ছাপতে বললে কে? তাদের ছবিতে কি সোনার রং ওঠে, না মণি-জহরতের জ্যোতি ফোটে? ও-ছবিতে তো দেখছি তুতান্-খামেনের পেটা-সোনার সিংহাসন আর তাঁর আবলুশ কাঠের বেড়াবার ছড়ি দুয়ের একই কালো কালির রং। তাঁর সোনার লতা-কাটা গজদন্তের আসনকে আমার সেগুন কাঠের চেয়ারখানার জ্ঞাতি-ভাই বলেই মনে হচ্ছে। যাহোক এ-সব আসবাবপত্রের ছবি তবুও ছিল একরকম। কালির কালো আঁচড়কে শিল্পীর সোনালি রেখা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু তুতান্-খামেনের কবরে পাওয়া ছবি ও ভাস্কর্যের ফটোগুলো নির্বিচারে কেন ছাপানো? ওই মহারাজ তুতান্-খামেন্ দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিজয়ী বীরের দৃপ্ত ভঙ্গিতে। বেশ; দেখে মন খুশি হল। কিন্তু ওই ওরা আবার কারা? ওই যাদের ঘাড়ের বোঝার ভারে কোমর নুইয়ে পড়েছে। প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্যে ওদের অংশটা কী সে খবর তো রয়টার দেয়নি।

দেশ-বিদেশের দ্রব্যসম্ভার ওরা রাজপ্রাসাদে বয়ে নিয়ে আসছে? বাঃ, তবে তো দেখছি মানুষের সভ্যতার সবটাই সুপ্রাচীন। তুতান্‌-খামেনের রাজ-ঐশ্বর্যও প্রাচীন, আজকের রাজপথের কুলি-মুটেও সমান প্রাচীন। যারা তুতান্‌-খামেনের দিনে ঘাড়ে বোঝা বইত, আর যারা আজকের দিনে মাথায় মোট বয় তাদের মধ্যে তো কোনও তফাত নেই। সেই কটিতে কৌপীন, শরীরে ক্লান্তি, মনে দীনতা— সবই এক। মানুষের সভ্যতা দেখছি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' শ্মশানের মতো, 'ঈশা বল, মুশা বল, রামমোহন রায় বল, এমন সাম্য-সংস্থাপক জগতে আর নাই।' যেখানে ওর প্রকাশ সেখানেই ওই এক মূর্তি। বহু মানুষের নৈপুণ্যের সৃষ্টি, বহুলোকের পরিশ্রমের ফল ওই দু'-একজন ভোগ করছে, অপব্যয় করছে, নষ্ট করছে, তুতান্‌-খামেনের মতো নিজের মরা শরীরের সঙ্গে মাটির নীচে কবর দিচ্ছে। তিন হাজার বছর আগেও যা, তিন হাজার বছর পরেও তাই। মানুষের সভ্যতার গোমুখী থেকে আজ পর্যন্ত ওই একই ধারা চলে এসেছে। কোনও ভগীরথের শঙ্খ ওকে নতুন খাদে বহাতে পারবে, না ওই খাদ দিয়ে চলেই ওকে মহাসাগরে বিলীন হতে হবে, তা মানুষেও জানে না, দেবতাও জানে না।

কান দিয়ে মন যে নেশা করেছিল তা চোখ দিয়ে ছুটে গেল— কাগজওয়ালাদের ছবির দোষে। তুতান্‌-খামেনের কবরের খবরে প্রাচীন মিশরের ঐশ্বর্য-বর্ণনা শুনে ভেবেছিলাম যাহোক, বাংলার বাইরেও একদিন একটা সোনার বাংলা ছিল; সেখানে সকলেরই গোলাভরা ধান, অর্থাৎ যব, গম, গোয়ালভরা গোরু, মুখভরা হাসি । কিন্তু তুতান্‌-খামেনের ছবির কালি দেখছি দুই সমুদ্র তিন নদী পার হয়ে সোনার বাংলার সোনাতেও এসে লাগল। 'বাংলা ছিল সোনার বাংলা' তা তো বটেই। কিন্তু কবে ছিল? কল-কারখানা, ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় আসবার পূর্ব পর্যন্ত কি? সেই সময়েই তো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তাতে নাকি সোনার বাংলার এক পোয়া লোকের উপর না খেয়ে মরেছিল! মোগল পাঠানের আমলে বোধ হয়? বিদেশিদের বর্ণনা, আবুল ফজলের গেজেটিয়ার, মুকুন্দরামের কবিতা রয়েছে। গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু অবশ্যই ছিল— এখনও আছে। কিন্তু এখনকার মতো তখনও সে গোলা আর গোয়ালের মালিক অল্প ক'জনাই ছিল। সোনার বাংলার অনেক সোনার ছেলে তখন চটের কাপড় পরত এমনও আভাস আছে। তবে হিন্দুযুগে নিশ্চয়। কিন্তু সে যুগেও কি এখনকার মতো দেশে শূদ্রই ছিল বেশি? তাদের Standard of living তো মনু বেঁধে দিয়েছেন—

> 'উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
> পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥'

ঋষি গৌতমেরও ওই ব্যবস্থা— 'জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসঃ— কূর্চ্চাণ্যুচ্ছিষ্টাশনং'। পুরনো জুতো, ভাঙা ছাতা, জীর্ণ কাপড় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, ছেঁড়া মাদুর তাদের আসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন তাদের আহার । 'পুলাক' কথাটার অর্থ ধানের আগড়া; টীকাকারদের ভাষায় 'অসার ধান'। দেশে গোলাভরা ধান থাকলেও দেশবাসীর বেশির ভাগের কপালে কেবল খুদকুঁড়ো জুটতে কোনও আটক নেই।

যাক, এসব 'আনপেট্রিয়টিক' খবর চাপা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু মহারাজ

তুতান্-খামেন্ একটা বিষয়ে বড় নিরাশ করেছেন। তাঁর নাড়ি-ভুঁড়ির চারপাশে বাক্স সিন্দুক যা সব সাজিয়েছিলেন তাতে যদি কেবল কাপড়-চোপড় টুকিটাকি বোঝাই না দিয়ে তাঁর 'পেপিরাসের' লাইব্রেরিটাও পুরে নিতেন তা হলে long journey-তে তাঁরও bored হবার ভয় থাকত না, আমরাও চিরকৃতজ্ঞ থাকতাম। তুতান্-খামেনের দিনে মিশরের কবিরা 'নীল' নদের জোয়ার-ভাঁটার যে গান গেয়েছিল, নদী-তীরের কুটিরবাসীদের সুখ, দুঃখ, প্রণয়, বিরোধের যে কাহিনি রচেছিল, সে-যুগের জ্ঞানীরা জীবন-মৃত্যুর রহস্য কোন চাবি দিয়ে খুলতে চেয়েছিলেন, তার পণ্ডিতদের চোখে পৃথিবীর চেহারা কেমনতর ছিল, মহারাজ যদি আমাদের এগুলি জানাবার ব্যবস্থা করতেন তবে তাঁর তিন হাজার বছরের মরা যুগ আজকের দিনে সজীব হয়ে উঠত— তারের খবরে নয়, দরদি লোকের মনে। আমরা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেম— সেই তিন হাজার বছর আগেকার মানুষ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ। খবর এসেছে, সমাধির ঘরে গোটা কয়েক 'পেপিরাস'-এর গোলাও পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে যে মহারাজের বীর্য ও বিজয়ের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু আছে এমন ভরসা নেই। সুতরাং মনের আপসোস মনেই থেকে যাবে।

এক বন্ধু খবর দিলেন, লুক্সরে যে কবর আবিষ্কার হয়েছে তা তুতান্-খামেন্-ফামেন্ কারও নয়। মিশরতত্ত্বজ্ঞ ফরাসি পণ্ডিতরা নাকি বলেছেন ওটা একটা ডাকাতের আড্ডা, 'bandit's den'— রাজ-রাজড়াদের কবর লুটে, লুটের মাল ডাকাতরা একটা সুবিধামতো কবরে লুকিয়ে রেখেছে। এবং ওরকম সব 'ডেন' নাকি এর পূর্বেও আরও আবিষ্কার হয়েছে। ফরাসি পণ্ডিতদের এ-চালাকি চলছে না। আমরা সবাই বুঝেছি তাঁদের এ-সব কথা কেবল হিংসা ও ঈর্ষার কথা। ব্রিটিশ আর আমেরিকান মিলে এই আবিষ্কারটি করেছে, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজা 'তোদন ক্ষম' নাম ভাঁড়িয়ে হয়েছিলেন 'তুতান্-খামেন্' এটা প্রমাণ হয়-হয় হয়েছে, এই শুনেই তাঁরা এ-সব সন্দেহ রটাচ্ছেন। ইংরেজ-বাঙালি কো-অপারেট করে হয় কালীঘাটে, নয় ডালহাউসি ইনস্টিটিউটে এখনই প্রতিবাদ সভা ডাকা উচিত।

বৈশাখ ১৩৩০

গণেশ

সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা বলে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজাপার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসংঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসংঘের উপর অশেষ ভক্তি ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সংঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন! 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ করতে পারে না, চাষির ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশে'র অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে; এবং গণেশের যে পূজা, তা ছিল এই ভয়ংকর দেবতাটিকে শান্ত রাখার জন্য; তিনি কাজকর্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণ-শক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্তাদের মনোভাব কী ছিল, তা গণেশের নর-শরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ-মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসংঘকে 'লম্বোদর গজানন' বলেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হলে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা, ওর মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা করে এসেছে। সেইজন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোশামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল' খেলা এ-দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে— 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা', 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী', 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ', 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক' ইত্যাদি। এবং সকলেই 'লম্বোদর গজেন্দ্রবদনের' সৌন্দর্যবর্ণনায় শ্লোক রচনা করে তাকে তোষামোদে খুশি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোশামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে চায় না, চায় ওই দেবতাটির নিজের হিত— তাদের এ কথা মেনে নেওয়াই ভাল যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খসেছে সে ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত করবে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ খোশামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতির মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে-দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসংঘকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী করতে হলে, প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্যকারণজাল; কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান। আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ; ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুত জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে উঠছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সংঘবদ্ধ করে বুদ্ধিমান লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হলেও , জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ওইসব সাময়িক উত্তেজনার দল, সংঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙে যায়; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ওই পরামর্শদাতাদের ক্রীড়নক হয়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিনতে শেখানো কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ওই দীর্ঘ ঘোরানো পথ ছেড়ে, খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সংঘবদ্ধ করে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করিয়ে দিতে কোন জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ-লোভ দমন করতে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড় দলও চক্ষুষ্মান মানুষের ছোট দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্প-সংখ্যক লোক জনসাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে করে তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান লোক। এদের সঙ্গে লড়তে হলে, ভেবে না বুঝলে একদিন ঠেকে শিখতে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমনকী প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আনতে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা-সব অমূল্য সৃষ্টি— তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার কাব্যকলা— তার মূল্য জানতে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত বলে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এইসব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হলেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে-সব দেশে আজ জনসংঘ মাথা তুলছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে

আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য-মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা সত্য আছে তা যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙে পড়বে। উদরসর্বস্ব গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাত বলেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আসবে, সেদিন তার বিজয়যাত্রার পথ কেউ রুখতে পারবে না।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

কাব্যজিজ্ঞাসা

ধ্বনি

ইহুদি ও খ্রিস্টানের ধর্মপুথিতে বলে, বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্ক্ষার বলে দ্যৌঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন, এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে সে-সৃষ্টি অতি চমৎকার। ওই পুরাণেই বলে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তৈরি করেছেন তাঁর প্রতিরূপ করে, আর নিজের নিশ্বাসবায়ুতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টিরহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া; অথবা, যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব-আয়ত্তের আর কোনও চাবি মানুষের হাতে নেই। বাইবেলের বিধাতার মতো মানুষ অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার চালনায় যা সৃষ্টি করে তার চমৎকারিত্ব তার নিজেকেই বিস্মিত করে দেয়। বাহিরের বিশ্বের স্বরূপ ও সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কারে যেমন মানুষের বুদ্ধির বিরাম নেই, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ও কৌশলের জ্ঞানেও তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। কেননা সে-সৃষ্টিও মানুষের বুদ্ধির কাছে বাইরের বিশ্বের মতোই রহস্যময়।

'রামায়ণে' কাব্যের জন্মকথার যে কাব্যেতিহাস আছে, তাতে মানুষের সৃষ্টির এই তত্ত্বই কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগের শোকে যখন বাল্মীকির মুখ থেকে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল তখন—

> তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
> শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ॥

'বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম— এ কী!' তখন নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগলেন—

> চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্।

এবং শিষ্যকে বললেন- -

> পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
> শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥

'এই বাক্য পাদবদ্ধ, এর প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রীলয়ে এ আন্দোলিত; আমি শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক।'

রামায়ণকার আদিকবির মুখ দিয়ে যে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, সেটি কাব্যরসিক

মানবমনের সাধারণ কৌতূহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই-যে অপূর্ব মনোহর শব্দগ্রন্থনের সৃষ্টি করে, 'কিমিদম্'— এ কী বস্তু। এর স্বরূপ কী। তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলংকারশাস্ত্র। সে শাস্ত্রের প্রধান কথা কাব্যজিজ্ঞাসা। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়। কোন গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়। আলংকারিকদের ভাষায়, কাব্যের আত্মা কী।

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য— অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। সুতরাং কাব্যদর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী, তাঁবা বলেন, ওই বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়, অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য। কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।[১] এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। এবং যেমন অধিকাংশ লোক মতে না হলেও জীবনে লোকায়ত মতের অনুবর্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু আছে তাদের জীবনযাত্রা তার কোনও প্রমাণ দেয় না, তেমনি, মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্যপাঠক কাব্যবিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদেব কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলংকারের আস্বাদন। এবং সেইজন্য অনেক লেখক, যাদের রচনা অলংকৃত বাক্য ছাড়া আর-কিছু নয়, তারা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবি লাভ করেছে।

অলংকারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলংকারিকেরা বলেছেন, কাব্য যে অলংকৃত বাক্য নয় তার প্রমাণ, শব্দ ও অর্থ দু-রকম অলংকারই আছে অথচ বাক্যটি কাব্য নয়, এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায়; আবার সর্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার কোনও অলংকার নেই, এরও উদাহরণ আছে। অর্থাৎ সমালোচকদের ন্যায়ের ভাষায় কাব্যেব ও-সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্ট। যেমন 'সাহিত্যদর্পণ'-এর একজন টীকাকার উদাহরণ দিয়েছেন—

তরঙ্গনিকরোন্নীততরুণীগণসংকুলা।
সরিদ্ বহতি কল্লোলব্যূহব্যাহততীরভূঃ ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বলবে না। বাক্য অনলংকৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য, এর উদাহরণে সাহিত্যদর্পণকার কুমারসম্ভবের অকালবসন্ত-বর্ণনা থেকে তুলেছেন—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥

১ বামন

এর এখানে-ওখানে যে একটু অনুপ্রাসের আমেজ আছে, তরঙ্গ-নিকরোন্নীত-তরুণীগণের কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না, আর এর অর্থ একেবারে নিরলংকার। অকালবসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যকপ্রাণীদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনও অলংকারে সাজাননি। অথচ মনোহারিত্বে পাঠকের মনকে এ লুঠ করে নেয়। অলংকারবাদীরা বলবেন, এখানেও অলংকার রয়েছে— যার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার। প্রতিপক্ষ উত্তরে বলবেন, ওই নামেই প্রমাণ— অলংকার ছাড়াও কাব্য হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া ও রূপের অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্য, সেখানে নেহাত মতের খাতিরে ছাড়া সেই বর্ণনাকেই আবার অলংকার বলা চলে না।

অলংকারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর-এক দল আলংকারিক বলেন, অলংকৃত বাক্য মাত্রেই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও কাব্য হতে পারে, তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রীতি'। রীতিরাত্মা কাব্যস্য।[২] 'রীতি' হল পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।[৩] অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল 'স্টাইল'। স্টাইলের গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল। ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য ও গদ্য-লেখক এই স্টাইলের গুণে বা নবীনত্বে আর্টিস্ট বা কবি নাম পেয়েছেন। অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়বসংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়বসংস্থান।

রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে অন্য আলংকারিকেরা বলেন, নির্দোষ অবয়বে ভূষণ যোগ করলেই সৌন্দর্য আসে না, শরীরেও নয় কাব্যেও নয়।

> প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
> যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥[৪]

'রমণীদেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি, এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু।' এই 'অতিরিক্তবস্তু'ই কাব্যের আত্মা।

এ 'বস্তু' কী। উত্তরে বস্তুবাদী আলংকারিকেরা বলেন, এ জিনিসটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। "তরঙ্গনিকরোন্নীত" ইত্যাদি যে কাব্য নয় তার কারণ, ওর বাচ্য কিছুই নয়, ওর বক্তব্য বিষয় অকিঞ্চিৎকর। অন্য বাক্যের মতো কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে, কোনও বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ওই বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের

২ বামন, ২।৬
৩ বামন, ২।৭
৪ ধ্বন্যালোক, ১।৪

বস্তু ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন, ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতই মনোহারী— চন্দ্রচন্দনকোকিলালাপভ্রমরঝংকারাদয়ঃ। অনেক ভাব, যেমন— প্রেম, করুণা, বীর্য, মহত্ত্ব, মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এইসব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন; এবং তাঁদের বিশিষ্ট পদরচনাভঙ্গি, শব্দ ও অর্থে যথোচিত অলংকারের সমাবেশ, তাঁদের বাচ্য ভাব ও বস্তুকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তোলে। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকার, এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ-সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে আর ধর্মান্তর নেই। যেমন বার্হস্পত্যেরা বলেছেন— রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার আবির্ভাব হয়; মন নামে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই।

যে-সব আলংকারিক বস্তুবাদীদের মতে মত দিতে পারেননি, তাঁদেরও স্বীকার করতে হয়েছে, অধিকাংশ কবির কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকারের গুণেই কাব্য। এমনকী, মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধেরও অনেকাংশে এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে তাঁদের ভাব ও বস্তুর চমৎকারিত্ব হয়তো বেশি, তাঁদের রচনা ও প্রকাশভঙ্গি আরও বিচিত্র, তাঁদের অলংকার অধিকতর সংগত ও শোভন। কিন্তু তবুও যে এই আলংকারিকেরা কাব্যবিচারে এখানেই থামতে পারেননি, তার কারণ, তাঁরা দেখেছেন, যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থমাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়, সেই কথাবস্তু কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হত, তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে, তারই কাব্যের আস্বাদন হত, কিন্তু তা হয় না।

> শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
> বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্ ॥[5]

'কাব্যের যা সার অর্থ, কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জানতে পারেন।'

> যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ।

'কাব্যার্থ যদি কেবল বাচ্যরূপ হত, তবে বাচ্যবাচকের স্বরূপজ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত।'

> অথ চ বাচ্যবাচকরূপলক্ষণকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখানাং
> স্বরশ্রুত্যাদিলক্ষণমিবাপ্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ।[6]

'অথচ দেখা যায়, কেবল বাচ্যবাচক-লক্ষণের জ্ঞানলাভেই যারা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের আস্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচর থাকে; যেমন গানের লক্ষণমাত্র যারা জানে তাদেরই সংগীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না।' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'।

---

৫ ধ্বন্যালোক, ১।৭
৬ ধ্বন্যালোক ১।৭ বৃত্তি

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥[৭]

'যেখানে, কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই "ধ্বনি" বলেছেন।' এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলংকারিক পরিভাষা হল 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেন, এই ধ্বনি বা 'ব্যঙ্গ্য' হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।

কিন্তু গোড়াতেই তাঁরা সাবধান করেছেন যে. কাব্যের 'ধ্বনি', উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি সে-সব অলংকার তার বাচ্যবাচকের— অর্থ ও শব্দের— চারুত্ব সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিস।

বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপমাদিভ্যোঽনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব।[৮]

কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন সুকৌশলে, এ-সব অলংকারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ওই অলংকার বুঝি কবিতাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু কাব্যরসিকেরা জানেন, শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে 'ধ্বনি' তা সেখানে নেই। কারণ, সেখানেও বাচ্যই প্রধান; ধ্বনির আভাস যেটুকু আছে, তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে 'ধ্বনি', তাই তার প্রধান বস্তু।

ব্যঙ্গস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে ॥
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ ॥

'ব্যঙ্গ্য যেখানে অপ্রধান এবং বাচ্যার্থের অনুযায়ীমাত্র, যেমন সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচ্যালংকার, ধ্বনি নয়। ব্যঙ্গ্য আভাসমাত্রে থাকলে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হলে তাকে ধ্বনি বলে না; কারণ, ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয়। যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গ্যতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয়; সুতরাং সংকরালংকার আর ধ্বনি এক নয়।'

এখানে যে দুটি অলংকারের বিশেষ করে নামোল্লেখ আছে, তার মধ্যে সমাসোক্তি অলংকারে বর্ণিত-বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ওই ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকে না; বর্ণিত-বস্তুর কার্যবর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই

৭ ধ্বন্যালোক, ১।১৩
৮ ধ্বন্যালোক, ১।১৩, বৃত্তি
৯ ধ্বন্যালোক, ১।১৪, ১৫, ১৬

এমন ইঙ্গিত থাকে, যা তাদের সূচিত করে। এতে শব্দের প্রয়োগ খুব সংক্ষেপ হয় বলে এর নাম সমাসোক্তি। আনন্দবর্ধন খুব একটা জমকালো উদাহরণ তুলেছেন—

> উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
> যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্ গলিতং ন লক্ষিতম্ ॥

'উপগত সন্ধ্যারাগে আকাশে যখন তারকা অস্থিরদর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হল, অমনি পূর্ব দিকের সমস্ত তিমিরযবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হল তা লক্ষ্যই হল না।' এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে, নায়িকা ও নায়কের ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রচনায় শিল্পকৌশলের চাতুর্য যথেষ্ট। ওর প্রতি শব্দটি শ্লিষ্ট; রাত্রি ও চন্দ্রের কথাও বলছে, আবার নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারও ইঙ্গিত করছে; উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং— সন্ধ্যার অরুণিমা আকাশের তারা অস্থিরদর্শন, আবার উপচিত অনুরাগে চঞ্চল চক্ষুতারকা। গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্— চন্দ্রোদয়ে আভাসিত রাত্রির প্রারম্ভ আবার মুখ অর্থে বদন, গৃহীত মানে ধৃত পরিচুম্বিত। সমস্তং তিমিরাংশুকং— এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট; কিন্তু একটু কারিকুরি আছে। অংশুক মানে শুধু কাপড় নয়, সূক্ষ্ম বস্ত্র— যা নায়িকোচিত, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারও গাঢ় নয়— পাতলা অন্ধকার। পুরঃ— অর্থ পূর্ব দিক, আবার সম্মুখে। রাগাদ্ গলিতং— আলোকরাগে অপসৃত, আবার অনুরাগের আবেশে স্খলিত। ন লক্ষিতং— রাত্রির প্রারম্ভ লক্ষিত হল না, আবার অনুরাগের আবেশে অজ্ঞাতেই নীলাংশুক স্খলিত হল। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আনন্দবর্ধন বলছেন— এখানে ধ্বনি নেই, কেননা এখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামী মাত্র— ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে। রাত্রি ও চন্দ্রে নায়িকানায়কের ব্যবহার সমারোপিত হয়েছে, এই বাক্যার্থ ছাড়িয়ে এ কবিতা আর বেশি দূর যায়নি— সমারোপিত-নায়িকানায়কব্যবহারয়োর্নিশাশশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ। নায়ক-নায়িকা-ব্যবহারের যে ব্যঞ্জনা, সেটি বাচ্যার্থেরই বৈচিত্র্য সম্পাদক মাত্র।

দ্বিতীয় অলংকারটি হচ্ছে সংকরালংকার। ওর নাম সংকর; কারণ, ওতে একাধিক অলংকার মিশ্রিত থাকে। যেমন এক অলংকারের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেটি আবার অন্য একটি অলংকারকে সূচিত করে। লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটা বিখ্যাত শ্লোক উদাহরণ দিয়েছেন—

> প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
> তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥

'বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মতো সেই আয়তলোচনার চঞ্চল দৃষ্টি, সে কি হরিণীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, না, হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে, তা সংশয়ের কথা।' এখানে বক্তব্য হল— যৌবনারূঢ়া পার্বতীর দৃষ্টি হরিণীর দৃষ্টির মতো চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি স্পষ্ট না বলে একটি সন্দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এরকম কবিকল্পিত সংশয়কে আলংকারিকেরা বলেন সন্দেহালংকার। সুতরাং এখানে বাচ্য হল সন্দেহালংকার, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি উপমা। কিন্তু এ ব্যঞ্জনা 'ধ্বনি' নয়। কারণ,

এ কবিতার যেটুকু মাধুর্য, তা ওই ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই, ব্যক্ত সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। উপমাটি বরং ওই সন্দেহের অভ্যুত্থানের সহায়তা করে তার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সন্দেহেই পর্যবসিত হয়েছে।

> অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্যোপমা যদ্যপি ব্যঙ্গ্যা, তথাপি বাচ্যস্য সা সন্দেহলাংকারস্যাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদ্ গুণীভূতা। অনুগ্রাহ্যত্বে তর্হি সন্দেহে পর্যবসানম্।[১০]

অর্থাৎ, অভিনবগুপ্তের মতে মহাকবির এই বিখ্যাত কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, বর্ণনাকৌশলে মনোহারী মাত্র।

সমাসোক্তি ও সংকরালংকারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা যে কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' নয়, এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বাক্যে যে-কোনও ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয় না। বিশ্বনাথ অবশ্য সোজাসুজি বলেছেন, তা হলে প্রহেলিকাও কাব্য হত। কিন্তু এই-সব অলংকার প্রযুক্ত হলে, তাদের কৌশল ও মাধুর্য তাদের ব্যঞ্জনাকে 'ধ্বনি' বলে ভ্রম জন্মাতে পারে, এইজন্য এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে সাবধান করা প্রয়োজন। সমাসোক্তিতে যে ব্যঞ্জনা, তা হচ্ছে এক বস্তুর বর্ণনা দিয়ে অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা। সংকরালংকারের ব্যঞ্জনা এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা। সুতরাং যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা নয়। যে 'ধ্বনি' কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলংকারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়।

কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, মহাকবির কথা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়— এ-সব উক্তি যেমন একালের, তেমনি সেকালের বস্তুতান্ত্রিক লোকের কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হয়েছে। প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকেরা বলেছেন— কাব্যের বাচ্যও নয়, তার গুণ-অলংকারও নয়, অথচ 'ধ্বনি' বলে অপূর্ব এক বস্তু, এ আবার কী। ও-জিনিস হয় কাব্যের শোভা, তার গুণ ও অলংকারের মধ্যেই আছে, নয়তো ও কিছুই নয়, একটা প্রবাদ মাত্র; খুব সম্ভব শব্দ ও অর্থের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলংকারিকেরা বর্ণনা করেননি এমন একটি বৈচিত্র্যকে একজন বলেছে 'ধ্বনি', আর অমনি একদল লোক অলীক সহৃদয়ত্বভাবনায় মুকুলিতচক্ষু হয়ে 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলে নৃত্য আরম্ভ করেছে—

> কিং চ বাগ্‌বিকল্পানামানন্ত্যাৎ সংভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণ-বিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনির্ধ্বনিরিতি তদলীকসহৃদয়ত্বভাবনামুকুলিত-লোচনৈর্নৃত্যতে।... তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ।[১১]

ধ্বনিবাদের মুখ্যাচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বাক্য তুলেছেন, যা নিশ্চয়ই একালের বস্তুতান্ত্রিকদের মনোরথ পূর্ণ করবে—

১০ ধ্বন্যালোকলোচন, ১।১৩
১১ ধ্বন্যালোক, ১।১, বৃত্তি

যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন্ জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ ॥

'যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচনবিন্যাসে যা রচিত নয় এবং অর্থ যার অলংকারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের প্রীতিতে (অর্থাৎ ফ্যাশানের খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য ব'লে প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে "ধ্বনি"র স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করেছে, এ তো জানা যায় না।'

এ সমালোচনায় ধ্বনিবাদীরা বিচলিত হননি। তাঁরা স্বীকার করেছেন কাব্যের 'ধ্বনি', তার বাচ্যার্থের মতো এত স্পষ্ট জিনিস নয় যে, ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি থাকলেই তার প্রতীতি হবে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, যার কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে, তাকেই হাতেকলমে প্রমাণ করে দেখানো যায় যে, কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'ধ্বনি', বাচ্যাতিরিক্ত এক বিশেষ বস্তুর ব্যঞ্জনা। কারণ, বাচ্য বা বক্তব্য এক হলেও এই 'ধ্বনি'র অভাবে এক বাক্য কাব্য নয়, আর 'ধ্বনি' আছে বলে অন্য বাক্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, এ সহজেই দেখানো যায়। ধ্বনিবাদীদের অনুসরণে দু'-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

'বিবাহ প্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানতমুখী হলেও পুলকোদ্গমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়'— এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে—

কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ ॥

কোনও কাব্যরসিক এ শ্লোককে কাব্য বলবে না। ঠিক ওই কথাই কালিদাস পার্বতীর সম্বন্ধে কুমারসম্ভবে বলেছেন, যেখানে নারদ মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে হিমালয়ের কাছে এসেছেন—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥

এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু কেন? কোথায় এর কাব্যত্ব? এর যা বাচ্যার্থ, তা তো পূর্বের শ্লোকের সঙ্গে এক। কোনও অলংকারের সুষমায় এ কাব্য নয়; কারণ কোনও অলংকারই এতে নেই। ধ্বনিবাদীরা বলেন, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্রগণনা— তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরের— পূর্বরাগের লজ্জাকে ব্যঞ্জনা করছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব।

> অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং.. অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি।[১২]

১২ ধ্বন্যালোক ২।২৩ বৃত্তি

নারীর সৌন্দর্যের উপমান যে জল স্থল আকাশের সর্বত্র খুঁজতে হয়, এ একটি অতিসাধারণ কবিপ্রসিদ্ধি। নিম্নের শ্লোকে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসংভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা ॥

'আকাশের চন্দ্রের মতো মুখ, নীলপদ্মের মতো চক্ষু, শুভ্র কুন্দফুলের মতো দশনপঙ্ক্তি— গগনে জলে স্থলে হৃদ্য যা-কিছু আছে, তার আকার দিয়ে বিধাতা তাকে নির্মাণ করেছেন।' এ কবিতাকে কাব্য বলা চলে কি না, সে সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ওই কবিপ্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় করে কালিদাস যখন প্রবাসী যক্ষকে দিয়ে বলিয়েছেন—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহ্ভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি ॥

তখন তাতে কাব্যত্ব এল কোথা থেকে? ধ্বনিবাদীরা বলেন, অলংকারগুলি তাদের অলংকারত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রবাসীর বিরহব্যথাকে ব্যঞ্জনা করছে বলেই এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর বাচ্য কতকগুলি উপমা, কিন্তু এর 'ধ্বনি' প্রিয়াবিরহীর অন্তর-ব্যথা। এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমস্ত বিশ্বময়— এই ভাব নিম্নের কবিতা দুটিতে বলা হয়েছে।

স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্ ॥

'সেই এক কুসুমায়ুধ তিন লোক জয় করে। শম্ভু তার দেহ হরণ করেছেন, কিন্তু বল হরণ করতে পারেননি।'

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে ॥

'দগ্ধ হলেও কর্পূরের মতো প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে, অবার্যবীর্য সেই কুসুমধনু মদনকে নমস্কার।'

অভিনবগুপ্ত বলেছেন (১।১৩)— এ কবিতা-দুটিতে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এরা কাব্য নয়। প্রথম কবিতাটি এই ভাবমাত্র প্রকাশ করেই শেষ হয়েছে যে, মদনের শক্তির কারণ অচিন্ত্য— ইয়ং চাচিন্ত্যনিমিত্তেতি নাস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সম্ভাবঃ। দ্বিতীয়টি কর্পূরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনাতেই পর্যবসিত হয়েছে— বস্তুস্বভাবমাত্রত্বে পর্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসম্ভাবশঙ্কা। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের

পর' কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে—

> পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী!
> বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
> ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি,
> অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

অভিনবগুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে। এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনবগুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ওই একই কথা তিনি তাঁর আলংকারিকের ভাষায় বলতেন যে, এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর 'করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনি'।

এই যে তিনটি উদাহরণেই দেখা গেল কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জনা', কথা নয়, 'ধ্বনি'— এ ব্যঞ্জনা কীসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কীসের ধ্বনি? ধ্বনিবাদীদের উত্তর— 'রস'-এর। তাঁরা দেখিয়েছেন, বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি। তিনটি উদাহরণেই কবিতার বাচ্য রসের ব্যঞ্জনা করছে বলেই তা কাব্য। এই রসের যোগেই পরিচিত সাধারণ কথা নবীনত্ব লাভ করে কাব্যে পরিণত হয়েছে।

> দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
> সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥[১৩]

'পূর্বপরিচিত অর্থও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ করে বসন্তের নবকিশলয়খচিত বৃক্ষের মতো নূতন বলে প্রতীয়মান হয়।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' বলে যাঁরা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা 'রস' বলে তাঁরা উপসংহার করেছেন। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।[১৪] কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য, 'রস' যার আত্মা।

কোহয়ং রসঃ। এ 'রস' জিনিসটি আবার কী?

পাঠকেরা যদি ইতিমধ্যেই নিতান্ত বিরস না হয়ে থাকেন, তবে পরের প্রস্তাবে প্রাচীন আলংকারিকদের রসবিচারের পরিচয় পাবেন। লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনও দেশে, কোনও কালে, আর কেউ বলেনি।

---

১৩ ধ্বন্যালোক, ৪।৪

১৪ সাহিত্যদর্পণ, ১/৩

রস

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' নামে গল্পের অশরীরী নায়িকাটি তার জীবিতকালের শরীরাবশেষ কঙ্কালটিকে নিয়ে বড়ই লজ্জায় পড়েছিল! অস্থিবিদ্যার্থী ছাত্রকে সে কী করে বোঝাবে যে, ওই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর তার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন "এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিনকোমল নিটোল পরিপূর্ণতা" নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল যে, সে-শরীর থেকে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যেতে পারে তা অতিবড় শরীরবিদ্যাবিদেরও বিশ্বাস হত না। কাব্যের রসাত্মা যদি কাব্যরসের তত্ত্বালোচনা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে তাঁকেও নিশ্চয় এমনি লজ্জা পেতে হত। কারণ, কাব্যের তত্ত্ববিচার কাব্যের কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচাড়া। রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্ব মাত্র। ধর্মপিপাসুর কাছে 'থিয়লজি' যে বস্তু, কাব্যরসিকের কাছে কাব্যের রসবিচারও সেই জিনিস। তবুও এ বিচারের দায় থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। যা মুখ্যত বুদ্ধির বিষয় নয়, তাকেও বুদ্ধির কোঠায় এনে বুদ্ধির যন্ত্রপাতি দিয়ে একবার মাপজোখ করে না দেখলে, মানুষের মনের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে 'থিয়লজি' থাকবেই, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে অলংকারশাস্ত্র গড়ে উঠবেই। কেবল ও-শাস্ত্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলেই বিপদ।

কাব্যের রসবিচারে মানুষকে কাব্যরসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদি লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিস। আলংকারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। তত্ত্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলংকারিকেরা বলেন, কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাহিরে রসের আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ, ওই আস্বাদই হচ্ছে রস। যখন বলা হয় 'রসের আস্বাদ', তখন রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ অঙ্গীকার করে কথা বলা হয়।[১] যেমন আমরা কথায় বলি 'ভাত পাক হচ্ছে',[২] যদিও পাকের যা ফল, তাই ভাত। তেমনি, যদিও কথায় বলি 'রসের প্রতীতি বা অনুভূতি', কিন্তু ওই প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে রস। সহৃদয় লোকের, অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়,[৩] এমন দরদি লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতিবিশেষের নামই 'রস'। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়— সহৃদয় কাব্য-পাঠকের মন।

কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্।

রস যখন এক-রকমের মানসিক অবস্থা, তখন স্বভাবতই তার পরিচয়ের প্রথম কথা— কী করে মনে এ অবস্থার উদয় হয়। মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে কান্ট দেখিয়েছেন যে, তাতে দু-রকমের উপাদান— মানসিক ও বাহ্যিক । বাইরের উপাদান

১ রসঃ স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্মকর্তরি বা প্রয়োগঃ।– সাহিত্যদর্পণ, ৩।২, বৃত্তি

২ ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ। —অভিনবগুপ্ত, ২।৪

৩ যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্‌বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে স্বহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ। —অভিনবগুপ্ত ১।১

ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের তখনই উদয় হয়, যখন মনের কতকগুলি তত্ত্ব ওই বাহ্যিক উপাদানের উপর ক্রিয়া করে তাকে এক বিশেষ পরিণতি ও আকার দান করে। এই-সব তত্ত্ব মন বাইরে থেকে পায় না, নিজের ভিতর থেকে এনে বাইরের জিনিসের উপর ছাপ দেয়। রৌদ্রের তাপে যে মাথা গরম হয়, এ জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান রৌদ্র এবং পূর্বের ঠান্ডা ও পশ্চাৎ গরম মাথা— ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়েই মনে আসে; কিন্তু রৌদ্র ও গরম মাথার সম্বন্ধটি, অর্থাৎ ওদের কার্যকারণসম্বন্ধ মনের নিজের দান। এই কার্যকারণ-তত্ত্বের প্রয়োগেই ওই বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। অথবা, উল্টো বলাও চলে, ওই বাহ্যিক উপাদানই মনোগত সাধারণ কার্য-কারণতত্ত্বকে বিশেষ কার্যকারণের জ্ঞানে পরিণত করে। এবং জ্ঞান অর্থই বিশেষ জ্ঞান। বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব, এ দুয়ের সংযোগ হলে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এর দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি অন্ধ, ও প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি কেবল পঙ্গু নয়, একেবারে শূন্য।

রসের বিশ্লেষণে আলংকারিকেরাও এই দুই উপাদান পেয়েছেন— মানসিক ও বাহ্যিক। রসের মানসিক উপাদান হল মনের 'ভাব' নামে চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন'-গুলি। আর ওর বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মতো, বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না, আসে কবির সৃষ্টি কাব্যের জগৎ থেকে। আলংকাবিকেরা বলেন, কাব্যজগতের ওই বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের 'ভাব' রূপান্তরিত হয়ে রসে পরিণত হয়; সুতরাং আলংকারিকদের মতে রস জিনিসটি লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে-সব 'ভাব' রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্য লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতেই তাদের অস্তিত্ব, এবং সেই জগতের সঙ্গেই তাদের কারবার। কিন্তু এই 'ভাব' বা 'ইমোশন' রস নয়, এবং মানুষের মনে যাতে এই 'ভাব' জাগিয়ে তোলে তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা 'ইমোশন'। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয় এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনই পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, তা চোখে জল আনলেও মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যার আছে, সেই জানে। যদিও প্রমাণ করে দেখানো কঠিন। কাবণ—

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥[৪]

'করুণ প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব সুখ জন্মে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি।' তবু এ কথাও আলংকারিকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, করুণ রস যদি দুঃখেরই কারণ হত তবে রামায়ণ প্রভৃতি করুণ রসের কাব্যের দিকেও কেউ যেত না।

---

৪ সাহিত্যদপণ ৩।৩

কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥[৫]

কিন্তু করুণ রসের আনন্দ কাব্যরসিক মানুষকে নিয়তই সেদিকে টানছে। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought। আলংকারিকেরা বলবেন, 'ঠিক কথা। কিন্তু মনে থাকে যেন, *tell* of saddest thought। যে বাস্তব ঘটনা মনে সোজাসুজি sad thought আনে, তা sweetও নয়, songও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought এর কথা বলেন, তখনই তা sweetest song হয়।'

ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাবজগতের, এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলংকারিকেরা বলেন রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যাবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনওটি সুখের, কোনওটি দুঃখময়। কিন্তু ওই-সকল লৌকিক ভাব ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে পাঠকের মনে ওই-সব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা 'বাসনা' আছে, তাদের এক অলৌকিক বস্তু— 'রস'-এ— পরিণত করে। রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও তার পরিণাম যে 'রস', তা নিত্য আনন্দের হেতু। কারণ, লৌকিক দুঃখের অলৌকিক পরিণতি আনন্দময় হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

হেতুত্বং শোকহর্ষাদে-
গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে
জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিকবিভাবত্বং
প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ
সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ ॥[৬]

২

কবি যে কাব্যের মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন, তার কৌশলটি কী? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবশ্য অসম্ভব। কারণ, এ প্রশ্ন হচ্ছে নিখিল কবিপ্রতিভার নিঃশেষ পরিচয় দাবি করা। কিন্তু প্রতি কবির প্রত্যেক কাব্যের নির্মাণকৌশল অন্য-সকল কাব্য থেকে অল্প-বিস্তর স্বতন্ত্র। কারণ,

৫ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৪, ৫
৬ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৬

প্রত্যেক কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি, কলের তৈরি জিনিস নয়। সুতরাং কাব্যতত্ত্ব সে কৌশলের যে পরিচয় দিতে পারে, সে পরিচয় সকলকাব্যসাধারণ কাব্যকৌশলের কঙ্কালমাত্রের পরিচয়। এ কাজ সম্ভব; কারণ দেহের রূপের ভেদ সত্ত্বেও, কঙ্কালের রূপ প্রায় এক।

আলংকারিকেরা বলেন, কাব্যনির্মাণকৌশলের তিন ভাগ। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

'বিভাব' কি।—

রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।[৭]

'লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই "বিভাব" বলে।' যেমন—

যে হি লোকে রামাদিগত-রতি হাসাদীনামুদ্‌বোধকারণানি সীতাদয় স্ত
এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তঃ বিভাব্যন্তে আস্বাদ্যাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাব-
যোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি-ভাবাঃ, এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।

'লৌকিক জগতে যে সীতা ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধের কারণ, তাই যখন কাব্য ও নাট্যে নিবেশিত হয়, তখন তাকে বিভাব বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনে রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে যে তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।'

'অনুভাব' বলে কাকে—

উদ্‌বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ-
র্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোঽ-
নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥[৮]

'মনে ভাব উদবুদ্ধ হলে, যে-সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই-সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকের অনুভাব।'

দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।

"মিলন-মধুর লাজে"র এই কাব্য-ছবিটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি অনুভাব।

৭ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩২
৮ সাহিত্যদপণ, ৩।১৪

৩

এইখানে আচার্য অভিনবগুপ্ত যে এক দীর্ঘ সমাসবাক্যে কাব্যরসের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে। বিনা ব্যাখ্যাতে এখন তার অর্থবোধ হবে।

শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত-প্রাঙ্ নিবিষ্টরত্যাদি-
বাসনানুরাগসুকুমার-স্বসং বিদানন্দচর্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ।[৯]

'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদ-রূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনাদ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাব'-এর কারণ ও কার্য কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সম-বাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য-পাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে।'

অভিনবগুপ্ত বিভাব ও অনুভাবকে বলেছেন— 'সকল হৃদয়ে সম-বাদী।' কারণ, যে লৌকিক ভাবের তারা রসমূর্তি, সে লৌকিক ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়।

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ
সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্যস্য রত্যাদে-
রুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ ॥[১০]

'প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্‌বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক, সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে "সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী" অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্যচিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়—

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।[১১]

যার ফলে—

পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।[১২]

---

৯ অভিনবগুপ্ত, ১।৪
১০ সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭
১১ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৯
১২ সাহিত্যদর্পণ, ৩।১২

'কাব্য-পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনও ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।'

কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী, তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের মতো তা একটি abstract জিনিস। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা বর্ণরূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ concrete ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই নিখিল সহৃদয় জন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।

এইজন্যই কবি যখন কাব্যের ভাবকে রসের মূর্তিতে রূপান্তর করেন, তখন তিনি ভাবে লৌকিক পরিমিতত্বকে ছাড়িয়ে ওঠেন। লৌকিক ভাবের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ও অভিভূত থাকলে যেমন কাব্যরসের আস্বাদ হয় না, তেমনি কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না। ধ্বন্যালোকের একটি কারিকা আছে—

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥[13]

'সেই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। যেমন, পুরাতনী কথায় বলে, আদিকবির ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগজনিত শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল।'

কারিকাটিতে রঘুবংশের একটি শ্লোকের কাব্যকে তত্ত্বের রূপ দেওয়া হয়েছে।[14] এই কারিকার প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন— 'এ কথা মানতেই হবে যে, এ শোক মুনির নিজের শোক নয়। যদি তা হত, তবে ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি দুঃখিত হয়েই থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হত না। কারণ, কেবল দুঃখসন্তপ্তের কাব্যরচনা কখনো দেখা যায় না।'

> ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসংতপ্তস্যৈষা দশেতি।

অভিনবগুপ্ত বলেন, এখানে যা ঘটেছে তা এই— 'সহচরীবিয়োগকাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদন করুণ স্বরূপ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি ক'রে ওই রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে।'

> সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্যধ্বংসনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ... স এব... আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিদ্রুতিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ .. সমুচিতচ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিতশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ।

---

১৩ ধ্বন্যালোক, ১।৫

১৪ নিশাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ। - রঘুবংশ, ১৪।৭০

আলংকারিকদের আবিষ্কৃত, লৌকিক ভাবকে কাব্যের রসে রূপান্তরের এই তত্ত্বটি, ইতালিয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচে অনেকটা ধরেছেন। তাঁর 'কাব্য ও অকাব্য' নামক গ্রন্থে ক্রোচে লিখেছেন—

> What should we call the blindness of a poet? The incapacity of seeing particular passions in the light of human passion, aspirations in the fundamental and total aspiration, partial and discordant ideals in the ideal which shall compose them in harmony : what at one time was called incapacity of 'idealizing'. For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts.[১৫]

ক্রোচের "poetic idealization" আলংকারিকদের 'ভাব' ও তার কারণ কার্যের, "সকলহৃদয়সংবাদী" বিভাব অনুভাবে পরিণতি। ক্রোচের "passage from troublous emotion to the serenity of contemplation," আলংকারিকদের লৌকিক ভাবকে আস্বাদ্যমান রসে রূপান্তর। "Serenity of contemplation" হচ্ছে দার্শনিকসুলভ মননবৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলা। আলংকারিকদের 'রসচর্বণ' কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশি ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, Poetry "takes its origin from emotion recollected in tranquility", সেটি আলংকারিকদের এই 'রূপান্তরবাদের'ই অস্পষ্ট অনুভূতি ও অস্ফুট বিবৃতি।

আজকের দিনে লিরিক কাব্যের যুগে, যখন কবির নিজের মনের ভাবই কাব্যের উপাদান, তখন এ ভ্রম সহজেই হয় যে, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই বুঝি কাব্যের লক্ষ্য। এবং যে কবির হৃদয়ের ভাব যত তীব্র ও যত আবেগময় তাঁর কাব্যরচনাও তত সার্থক। কিন্তু লিরিক কিছু আলংকারিকদের কাব্যবিশ্লেষণের বাইরে নয়। ভাব যদি না কবির মনে রসের মূর্তি পরিগ্রহ করে, তবে কবি কখনও তাকে সে বিভাব ও অনুভাবে প্রকাশ করতে পারেন না, যা পাঠকের মনেও সেই রসের রূপ ফুটিয়ে তোলে। মনে যাতে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাই যদি কাব্য হত, তবে আজ বাংলাদেশে যে-সব হিন্দু মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণির কাব্য হত। কারণ অনেক হিন্দু-মুসলমানের ক্রোধই তাতে জাগ্রত হচ্ছে। অভিনবগুপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন— 'তোমার পুত্র জন্মেছে' এই কথা শুনে পিতার যে হর্ষ তা রস নয়, এবং ও-বাক্যটিও কাব্য নয়।

১৫ *European Literature in the Nineteenth Century* নামে ইংরেজি অনুবাদ, পৃ ৫২

'পুত্রস্তে জাতঃ' ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা; নাপি লক্ষণয়া; অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়সংবাদবলাদ্‌বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ...সিদ্ধস্বভাবসুখাদি-বিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি।—১।৪

'কিন্তু কবি সমুচিত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা, সহৃদয় পাঠকের সমবাদী তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত মনে ওই হর্ষকেই, স্বভাবসিদ্ধ সুখ থেকে বিভিন্ন লক্ষণ, আস্বাদ্যমান রসের রূপে পরিণত করতে পারেন।' যেমন কালিদাস রঘুর জন্ম শ্রবণে দিলীপের 'হর্ষ'কে করেছেন—

জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে ॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্‌গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ॥

তবুও যে ভাবোদ্‌বেল কবির আবেগময় কাব্য কাব্যরস থেকে বঞ্চিত নয়, তার কারণ, ভাব "শব্দে সমর্পিত" হলেই ব্যক্তিগত লৌকিকত্বের গণ্ডি থেকে কতকটা মুক্ত হয়। কেননা ভাষা জিনিসটিই সামাজিক। কিন্তু লিরিক যত ভাব-ঘেষা হয় ততই যে শ্রেষ্ঠ হয় না, তা যে-কোনও শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদাহরণ নিলেই দেখা যায়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম'—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।...

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

এর সঙ্গে যদি হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে", কি নবীনচন্দ্রের "কেন দেখিলাম" তুলনা করা যায়, তবেই কাব্যে রস ও ভাবের উচ্ছ্বাসের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হবে।

আলংকারিকেরা বিভাব ও অনুভাব ছাড়া সঞ্চারী নামে কাব্য-কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন, তার পরিচয় দিতে হলে, ভাবের যে মনোবিজ্ঞানের উপর আলংকারিকেরা তাঁদের রসতত্ত্বের ভিত্তি গড়েছেন, তার একটু বিবরণ দিতে হয়।

মানুষের মনের ভাব বা ইমোশন অনন্ত। কারণ ইমোশন শুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদদের ভাষায় ইমোশন হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ ইমোশন বা ভাবের সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলি idea বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বিদ্যমান থাকে। এই আইডিয়াপুঞ্জের কোনও অংশের কিছু পরিবর্তন ঘটলেই ইমোশন বা ভাব নামক মানসিক অবস্থাটিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। আইডিয়ার সংখ্যা অগণ্য এবং তাদের পরস্পর যোগ-বিয়োগের প্রকার অসংখ্য। সুতরাং ভাব বা ইমোশন সংখ্যাতীত। এবং কোনও ভাব অন্য ভাবের সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। কিন্তু তবুও, যেমন মনোবিজ্ঞানবিদ তেমনি আলংকারিক, কাজের সুবিধার জন্য, অগণ্য স্বলক্ষণ ভাবের মধ্যে কয়েক প্রকারের ভাবকে, সাদৃশ্যবশত কয়েকটি সাধারণ নামে নামাঙ্কিত করে পৃথক করে নিয়েছেন। আলংকারিকেরা এইরকম নয়টি প্রধান ভাব স্বীকার করেছেন— রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ ॥

এই নয়টি ভাবকে তাঁরা বলেছেন, 'স্থায়ী ভাব'। কারণ,

বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং
যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ।[১৬]

'ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয় সেইটি স্থায়ী ভাব।' আলংকারিকদের মতে এই নয়টি ভাব, কাব্যের বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে, যথাক্রমে নয়টি রসে পরিণত হয়— শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ ॥

কিন্তু এই নয়টি ছাড়াও অবশ্য মানুষের মনে বহু ভাব আছে, এবং তার মধ্যে অনেক ভাব, কাব্যের বিভাব ও অনুভাবে আলংকারিকদের কথায়, আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়। আলংকারিকেরা নির্বেদ, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ প্রভৃতি এরকম তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন এবং তা ছাড়াও যে আরও অনেক ভাব আছে, তা স্বীকার করেছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদিতি ন্যূনসংখ্যায়া ব্যবচ্ছেদকং ন ত্বধিকসংখ্যায়াঃ।

১৬ অভিনবগুপ্ত, ৩।২৪

এই-সব ভাবকে আলংকারিকেরা বলেছেন সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। তাঁদের থিয়োরি হচ্ছে যে, এই-সব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না; কোনও-না-কোনও স্থায়ী ভাবের সম্পর্কেই মনে যাতায়াত করে সেই স্থায়ী ভাবের অভিমুখে মনকে চালিত করে। এইজন্য এদের নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী।[১৭] ভাবের এই থিয়োরি থেকে স্বভাবতই রসের এই থিয়োরি এসেছে যে, কাব্যে সঞ্চারী ভাবের স্বতন্ত্র রসমূর্তি নেই; তাদের আস্বাদ্যমানতা স্থায়ী ভাবের পরিণতি নয়টি রসকেই নানা রকমের পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। সুতরাং যদিও কাব্যের নব রসের রসত্ব অনেক পরিমাণে এই সঞ্চারীর আস্বাদের উপর নির্ভর করে, তবুও অনেক আলংকারিকই স্বাতন্ত্র্যের অভাবে, সঞ্চারী ভাবের পরিণতিকে রস বলতে রাজি নন। অভিনবগুপ্ত বলেছেন—

স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ শেষাস্তু সংচারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে।
ন তু রসানাং স্থায়িসংচারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতোক্তা।

'স্থায়ী ভাবের পরিণতিই রস, বাকিগুলিকে বলে সঞ্চারী। রসের মধ্যে আবার স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস এইভাবে অঙ্গী ও অঙ্গের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।' এবং তাঁর মতই অধিকাংশ আলংকারিকের মত। কিন্তু স্থায়ী ও সঞ্চারীর এই প্রভেদ কিছু মূলগত প্রভেদ নয়; এবং সঞ্চারী ভাবের স্বতন্ত্র রসে পরিণতি সম্ভব নয়, এও একটু অতিসাহসের কথা। সেইজন্য আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও প্রচলিত ছিল যে, সঞ্চারীও রস, কেবল রসের পরিপুষ্টিসাধক নয়। অভিনবগুপ্ত ভাগুরি নামে এক আলংকারিকের মত তুলেছেন—

তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসানামপি স্থায়িসংচারিতাস্তি ইত্যাক্ষি-
প্যাভ্যুপগমেনৈতদবোচৎ বাঢ়মস্তীতি।

'রসেরও কি আবার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ আছে? এর উত্তরে ভাগুরিও বলেছেন, অবশ্য আছে।' এবং সকল আলংকারিককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই ভেদটি আপেক্ষিক। কারণ, এক কাব্যপ্রবন্ধে যখন নানা রস থাকে তখন দেখা যায় যে, তার মধ্যে একটি রস প্রধান, এবং স্থায়ী ভাবের পরিণতি অন্য রস তার পরিপোষক হয়ে সঞ্চারীর কাজ করছে।

রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি।[১৮]

'এক রস অন্য রসের ব্যভিচারীর কাজ করে।'

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা।[১৯]

---

১৭ স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামাভিমুখ্যেন চরণাদ্‌ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে। —সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৪৬, বৃত্তি

১৮ ধ্বন্যালোক, ৩।২৪

১৯ ধ্বন্যালোক, ৩।২১

'এক কাব্যপ্রবন্ধে নানা রস একত্র থাকলেও দেখা যায়, কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটি রসকেই প্রধান করেন।' এবং বাকি রসগুলি তার পরিপোষক বা সঞ্চারী। এই সঞ্চারী কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও চলতি হয়েছিল যে, সঞ্চারী দিয়ে পরিপুষ্ট না হলে রসের রসত্বই হয় না।

পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্।[২০]

কবিরাজ বিশ্বনাথ যে কারিকায় রসের উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন, 'সাহিত্যদর্পণ'-এর সেই কারিকাটি এখন উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।

বিভাবেনানুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ
স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্ ৷৷

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, (কাব্যের) বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে, রসে পরিণত হয়।' আশা করা যায়, এর আর এখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

৫

আলংকারিকদের রসের তত্ত্ব একটা উদাহরণে বিশদ করা যাক।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন, দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে কিছুই ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রণাসভায় স্থির হল, শ্রীকৃষ্ণকে দূত করে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের কাছে পাঠানো হোক। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে সকলেই মত দিলেন, যুদ্ধ না করে শান্তিতেই যাতে বিবাদ মীমাংসা হয়, সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'যাতে শান্তি স্থাপন হয়, সেই চেষ্টা কোরো; দুর্যোধনকে উগ্র কথা না বলে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ো।' শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'ভীমের এই অক্রোধ অভূতপূর্ব। এ যেন ভারহীন পর্বত, তাপহীন অগ্নি।' কেবল সহদেব ও সাত্যকি সোজাসুজি যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন। তখন—

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
কৃষ্ণা দাশার্হমাসীনমব্রবীচ্ছোককর্ষিতা ৷৷
সুতা দ্রুপদরাজস্য স্বসিতায়তমূর্ধজা।
সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ সাত্যকিঞ্চ মহারথম্ ৷৷
ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা বাক্যমুবাচেদং যশস্বিনী ৷৷...

২০ ধ্বন্যালোক, ৩।২৪, বৃত্তি

কানু সীমন্তিনী মাদৃক্‌, পৃথিব্যামস্তি কেশব ॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী ॥
আজমীঢ়কুলং প্রাপ্তা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চেন্দ্রসমবর্চসাম্‌ ॥...
সাহং কেশগ্রহং প্রাপ্তা পরিক্লিষ্টা সভাং গতা।
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ত্বয়ি জীবতি কেশব ॥
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেষ্বথ বৃষ্ণিসু।
দাসীভূতাস্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা ॥...

ধিক্‌ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্‌ বলম্‌।
যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি ॥
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
ধার্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্‌ ॥
ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্‌।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্বগন্ধাধিবাসিতম্‌ ॥
সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসম।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা ॥
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥
অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ।
স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥
যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥
পঞ্চ চৈব মহাবীর্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্‌।
যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥
ত্রয়োদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে।
নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিব পাবকম্‌ ॥
বিদীর্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্‌শল্যপীড়িতম্‌।
যোঽয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্মমেবানুপশ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা বাষ্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়তলোচনা।
রুরোদ কৃষ্ণা সোৎকম্পং সস্বরং বাষ্পগদ্‌গদম্‌ ॥[২১]

২১ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব

'ঘোরকৃষ্ণ-আয়ত-কেশা, যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী ধর্মরাজের ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করত অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে কেশব, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার তুল্য নারী আর কে আছে? আমি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদীসমুত্থিতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ়কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও পঞ্চ ইন্দ্রের তুল্য পাণ্ডবগণের মহিষী। সেই আমি, তুমি, এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণে পরিক্লিষ্টা হইয়াছি, পাপপরায়ণ ধার্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছি। পার্থের ধনুর্বিদ্যা ও ভীমসেনের বলে ধিক যে দুর্যোধন এখনও জীবিত আছে। হে কৃষ্ণ, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।"

'অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র, সুদর্শন, ঘোরকৃষ্ণ, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাপ বামহস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই কেশকলাপ স্মরণ করিয়ো। হে কৃষ্ণ, যদি ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিকামী হয়েন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, পাংশুগুণ্ঠিত না দেখিলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধকে স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া বাষ্পগদ্‌গদস্বরে, কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।'

ব্যাসের এই মহাকাব্যখণ্ডের কাব্যত্ব সম্বন্ধে কোনও কাব্যরসিককে সচেতন করতে হবে না। ওর কাব্যের দ্যুতি মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো স্বপ্রকাশ; এখন আলংকারিকদের কাব্যবিশ্লেষণ ওতে প্রয়োগ করে দেখা যাক।

আলংকারিকেরা বলবেন, এ কাব্যের আত্মা হচ্ছে কয়েকটি রস; কিন্তু কাব্যটি "নানারসনিবদ্ধ" হলেও কবি একটি রসকেই প্রধান করেছেন। সে রস 'রৌদ্র' রস। রৌদ্র রসের লৌকিক ভাব-উপাদান হচ্ছে ক্রোধ। বাস্তব জীবনে ক্রোধ মনোহারী জিনিস নয়। কিন্তু মহাকবির প্রতিভার মায়া দ্রৌপদীর ক্রোধকে অপূর্ব রসমূর্তিতে পরিণত করেছে। রৌদ্র রসের বিভাব হচ্ছে লৌকিক জগতে যাতে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় তার শব্দে সমর্পিত হৃদয়সংবাদী চিত্র। দুর্যোধন, দুঃশাসন ও তাদের নিদারুণ অপমানের সেই চিত্র এখানে সামান্য কয়েকটি রেখায় ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কারণ, সভাপর্বে তার অত্যুগ্র, উজ্জ্বল ছবি সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে পূর্ব থেকেই ক্রোধের রৌদ্ররাগে রক্তিম করে রেখেছে।

কিন্তু রৌদ্র রসই যদি এ কাব্যের একমাত্র রস হত, তবে এর কাব্যত্বের শতাংশও অবশিষ্ট থাকত না। আলংকারিকেরা বলবেন, কয়েকটি সঞ্চারী এর রৌদ্র রসকে আশ্চর্য সরসতা ও

পরম উৎকর্ষ দিয়েছে। নব রসের দুটি প্রধান রস, বীর ও করুণ, এবং কয়েকটি ব্যভিচারী— বিষাদ, গর্ব, দৈন্য— রৌদ্রের রক্তরাগকে অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর শোকবর্ষিত, অশ্রুলোচন, বিষাদমূর্তিতে কাব্যের আরম্ভ হল। তার পর দ্রৌপদীর পিতৃকুল পতিকুল ও মিত্রসৌভাগ্যের যে গর্ব, তা শোকের করুণ রসকেই গভীর করেছে আর শোকের অন্তরে ক্রোধ তার রৌদ্রের রক্তিম দ্যুতি করুণ রসের অশ্রুজলে রক্তের রামধনু ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার মুহূর্তেই রৌদ্রের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায়ায় মিলিয়ে গেছে।

মহাভারতকার যে দুটি শ্লোকে দ্রৌপদীর মহাভুজঙ্গের মতো দীর্ঘ বেণীর ছবি এঁকেছেন, সেই বেণী, যা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করবে, আলংকারিকেরা তাকেই বলেন কাব্যের বিভাব। এ কাব্যের সমস্ত রসের অবলম্বন হচ্ছে দ্রৌপদী। সুতরাং সেই-সব রসের অনুগত দ্রৌপদীর ও তার চেষ্টার ছবি—

কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা।
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী ॥

এ কাব্যের বিভাব। বলা বাহুল্য, এর মতো বিভাব মহাকবিতেই সম্ভব। অন্য কবির হয় এ ছবি কল্পনায় আসত না, না-হয় বেণীর বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক চলত।

এর পর দ্রৌপদীর বাক্য করুণ ও রৌদ্রের এক অপরূপ মিশ্রণ নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। "হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি কখনও সন্ধির কথা মনে হয়, দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই বেণীর কথা মনে কোরো।" এবং এই মিশ্র রস বীর-পিতা বীর-ভ্রাতা ও বীর-পুত্র ক্ষত্রিয়নারীর বীর রসের তাপে তপ্ত হয়ে রৌদ্রের বহ্নিরাগে দপ করে জ্বলে উঠেছে। এবং অভিমান ও শোকের অশ্রুজলে কাব্য শেষ হলেও, সে করুণ রস মুখ্য রৌদ্র রসকে নির্বাপিত না করে তাকে পরিপুষ্ট ও স্থায়ী করেছে। যে শোকের ছবিতে কাব্য সমাপ্ত, সে ছবি কয়েকটি অনুভাব দিয়ে আঁকা। লৌকিক শোক যা দিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়, ও ছবি তারই কাব্যে সমর্পিত রসমূর্তি।

এ কাব্যে রসের বিবরণ এখনও শেষ হয়নি। কারণ, এ রৌদ্র, বীর, করুণ, সমস্ত রসের অন্তরালে আর-একটি রসের মূর্তি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ কাব্যের ক্রোধ, বীরত্ব, শোক— সকলই যে তেজস্বিনী সুন্দরী নারীর ক্রোধ, বীর্য ও শোক, কবি এ কথা বিস্মৃত হতে দেননি। সমস্ত কাব্যের মধ্যেই সে-স্মৃতির উদ্‌বোধ ছড়িয়ে রেখেছেন। মধুর বা শৃঙ্গার রসের বিভাব সুন্দরী নারীর সংস্পর্শ এর রৌদ্র, বীর, করুণ, সমস্ত রসের উপরেই একটা মাধুর্যের রশ্মিপাত করেছে।

এ কাব্যে রৌদ্র ও বীর রস পাশাপাশি রয়েছে। একটু অবান্তর হলেও এদের প্রভেদটা একটু স্পষ্ট করা বোধ হয় নিরর্থক নয়। রৌদ্র রসের ভাবের উপাদান হল ক্রোধ, কিন্তু বীর রসের ভাবের উপাদান হচ্ছে উৎসাহ। যাত্রার বীর রস যে হাস্যাস্পদ, তার কারণ যাত্রাওয়ালা রৌদ্র রসকে বীর রস বলে ভুল করে। তার মনে ধারণা যে, বীর রসের উপাদান ক্রোধ। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে"— আলংকারিকদের

মতে বীর রসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।"— কবি বীর রসের কবিতা মনে করে লিখলেও আলংকারিকেরা ওকে কখনোই বীর রস বলতে রাজি হতেন না। কারণ, ওটি 'উৎসাহে'র রসমূর্তি নয়।

আলংকারিকদের এই কাব্যবিশ্লেষণ যে আধুনিক constructive criticism, 'গঠনমূলক' সমালোচনায় অভ্যস্ত পাঠকের মনে ধরবে না তা বেশ জানি। কিন্তু আলংকারিকেরা কাব্য নিয়ে কবিত্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাব্যের গাঢ় রাগকে সমালোচনার ফিকে রঙে এঁকে কার কী হিত হয়, তা তাঁদের বুদ্ধির অতীত ছিল। অধিকাংশ constructive criticism হয় কাব্যের রসকে রসহীন বাক্যের জল মিশিয়ে পাতলা করে পাঠকদের সামনে ধরা, না-হয় কাব্যের ইমোশনকে সমালোচনার sentimentalism-এর একটা উপলক্ষ করা। আলংকারিকেরা বুঝেছিলেন, কাব্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ রসজ্ঞের বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস দরকার হলে পাতলা করে পাঠককে গিলিয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ও কাজে কেউ কখনও সফলকাম হতে পারবে না। আলংকারিকেরা জানতেন, কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে। সমালোচকের 'কবিত্ব' পড়ে কাব্যের রসাস্বাদনের আধুনিক তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল না। সমালোচনার কবিত্ব কাব্যের রস মনে সঞ্চার করতে পারে যদি সমালোচক হন একাধারে সমালোচক ও কবি। এ যোগ দুর্লভ! আলংকারিকেরা জানতেন, তাঁরা কাব্যতত্ত্ববিৎ সহৃদয় মাত্র।

কথা

তত্ত্বজ্ঞেরা বলেছেন, আত্মাকে জানতে হলে নেতি নেতি করে আরম্ভ করতে হয়। বুঝতে হয়, আত্মা দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়, তবেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপের প্রতীতি হয়। কাব্যের আত্মার সন্ধানে আলংকারিকেরাও এই নেতির পথ নিয়েছেন। কাব্যের আত্মা তার শব্দার্থময় কথা-শরীর নয়, তার বাচ্যের বিশিষ্টতা নয়, তার রচনারীতির চমৎকারিত্ব নয়, অলংকারের সৌকুমার্য নয়। কাব্যের আত্মা এ সবার অতিরিক্ত আনন্দস্বরূপ বস্তু, অর্থাৎ রস। কিন্তু এ আত্মা নির্গুণ নিরুপাধিক আত্মা নয় যেখানে পৌঁছলে "নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি", দেখার, শোনার, কি জানার আর কিছু থাকে না, দগ্ধকাষ্ঠ আগুনের মতো সব নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। কাব্যের রস সেই সগুণ সক্রিয় আত্মা, "সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো, নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", যা নানা রূপের সৃষ্টি করে তাকে নামের গড়নে বেঁধে, নিজের সেই সৃষ্টির মধ্যেই আবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে। কবির কাজ পাঠকের চিত্তে রসের উদ্‌বোধন। কিন্তু রস কবির মন থেকে পাঠকের মনে সোজাসুজি উপায়নিরপেক্ষ সঞ্চাবিত হয় না। শব্দ ও অর্থের, বাচক ও বাচ্যের উপায়কে আশ্রয় করেই কবি এই উদ্দেশ্য

সাধন করেন। সুতরাং যদিও কবির চরম লক্ষ্য পাঠকের মনের ভাবকে রসে রূপান্তর করা, তাঁর কাব্য-সৃষ্টি হচ্ছে এই উপায়ের সৃষ্টি।

> আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
> তদুপায়তয়া তদ্‌বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥[১]

'লোকে আলো চায়, কিন্তু তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথাবস্তু।' এই কথাবস্তু যদি সহৃদয় পাঠকের মনে অভিপ্রেত রসসঞ্চারের উপযোগী হয়, তবেই কবির কাজ শেষ হল। এর অতিরিক্ত তাঁর সাধ্যের অতীত। কারণ, কাব্য কোনও পাঠকবিশেষের মনে রসের উদ্রেক করবে কি না, তা কেবল কাব্যের উপর নির্ভর করে না, পাঠকের মনের উপরেও নির্ভর করে। কবি যে ভাবকে রসমূর্তি দিতে চান, যদি পাঠকের মন সে ভাব সম্বন্ধে কতকটাও কবির মনের সমধর্মী না হয়, তবে সে পাঠকের কাছে কাব্য ব্যর্থ। এই কারণেই কবি বররুচি অরসিকের কাছে রসনিবেদনের দুঃসহ দুঃখ থেকে ইষ্টদেবতার কাছে মুক্তি চেয়েছেন; আর ভবভূতি অনন্ত কাল ও বিপুল পৃথিবীতে সমানধর্মা পাঠকের কাছে একদিন-না-একদিন কাব্য পৌঁছবে, এই ভরসায় আশ্বস্ত হয়েছেন। কাব্যে কেন সকল লোকের মনে রসের অভিব্যক্তি হয় না, আলংকারিকেরা বলেছেন, তার কারণ ভাবের 'বাসনা'র অভাব।— ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।[২] বাসনা হচ্ছে অনুভূত ভাব বা জ্ঞানের সংস্কারলেশ, যাকে আশ্রয় করে পূর্বানুভূতির স্মৃতি মনে জাগ্রত হয়। এই বাসনা আছে বলেই কাব্যের ভাবচিত্র মনে রসের সঞ্চার করে। আর এ বাসনা নেই বলেই বালকের কাছে চণ্ডীদাসের কাব্য নিষ্ফল। কাব্য যে-ভাবকে রসে পরিণত করতে চায়, যে-পাঠকের মনে তার বাসনা নেই, তার বয়স যতই হোক, সে-কাব্যসম্পর্কে সে শিশু; অর্থাৎ ও কাব্য তার জন্যে নয়। ভাবের অনুভূতি, সুতরাং বাসনা আছে, কিন্তু তার রসের আস্বাদন নেই— এরকম লোক অবশ্য অনেক আছে। আলংকারিকেরা বলেন, তার কারণ 'প্রাক্তন', অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল। 'রসাস্বাদনশক্তির স্বাভাবিক অভাব' বললে ভাষাটা আধুনিক শোনায় বটে, কিন্তু কথা একই থেকে যায়।

কাব্যের লক্ষ্য রস; শব্দ, বাচ্য, রীতি, অলংকার, ছন্দ— তার উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য ও উপায়ের যে বিশ্লেষণ, সে হচ্ছে বুদ্ধির কাব্যপরীক্ষার বিশ্লেষণ। কবির কাব্যসৃষ্টিতে ও সহৃদয়ের কাব্যের আস্বাদে, রস ছাড়া এ-সব উপায়ের স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কি আস্বাদন নেই। কারণ, কাব্যের বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলংকার— এই-সব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র হয়ে কাব্যের রসকে সৃষ্টি করে না। রসই নিজেকে মূর্ত করে তোলার আবেগে কাব্যের এই-সব অঙ্গের সৃষ্টি করে। যেমন নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে জীবশরীরে প্রাণের সৃষ্টি হয়নি, প্রাণশক্তিই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করে নিজেকে তার মধ্যে প্রকাশ করেছে। সুতরাং কাব্যের এ-সব অঙ্গ তার রসের বহিরঙ্গ নয়, তারা রসেরই অঙ্গ।— তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ।[৩]

---

১ ধ্বন্যালোক, ১।৯
২ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৮
৩ ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি

অর্থাৎ রসবাদী আলংকারিকেরা হচ্ছেন কাব্যমীমাংসায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। চেতনাচেতন এই জগৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নয়, কিন্তু তা থেকে ভিন্নও নয়। কাব্যের এই-সব অঙ্গ কাব্যের আত্মা, রস নয়, কিন্তু রস থেকে ভিন্নও নয়। কারণ, কাব্যের রস এই-সব কাব্যাঙ্গ থেকে পৃথগ্‌ব্যপদেশানর্হ, পৃথগ্‌ভাবে নির্দেশের অযোগ্য। এই আপাতবিরুদ্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ কী করে সম্ভব হয়, তা তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়; তত্ত্বদর্শী ও কাব্য-রসিকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু।

রসবাদীদের এই সিদ্ধান্ত যে কাব্যের ভূমি ছেড়ে তত্ত্বের আকাশে উধাও হওয়া নয়, তার প্রমাণে তাঁরা বলেন, মহাকবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই দেখা যাবে যে, তার ভাষা কি অলংকার অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য, অর্থাৎ তার জন্য কবির কোনও পৃথক যত্ন করতে হয়নি।[৪] কারণ—

> রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ।
> একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ ॥[৫]

'কাব্যের রসবস্তু ও তার অলংকার মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়,' কেননা যদিও বিশ্লেষণবুদ্ধির কাছে তাদের রচনাভঙ্গি ও অলংকারপ্রয়োগের কৌশল-নিরূপণ দুর্ঘট ও বিস্ময়াবহ, কিন্তু প্রতিভাবান কবির রসসমাহিত চিত্ত থেকে তারা ভিড় করে ঠেলাঠেলি বেরিয়ে আসে :

> অলংকারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ
> প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি।[৬]

> Canst thou not minister to a mind diseas'd;
> Pluck from the memory a rooted sorrow,
> Raze out the written troubles of the brain;
> And with some sweet oblivious antidote
> Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
> Which weighs upon the heart?[৭]

এই কাব্যাংশের অদ্ভুত কবিকর্ম, এর পরমাশ্চর্য নৈপুণ্য ও কৌশল, এর ভাষা ও অলংকারের বিস্ময়কর প্রকাশশক্তি, যা প্রতি ছত্রে দুটি-একটি কথায় উদ্দিষ্ট আইডিয়ার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছে— রসজ্ঞ সমালোচক এগুলির প্রতি যে বিশ্লেষণবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন, কবিকেও যদি তেমনি বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হত, তবে এ কাব্যের সৃষ্টিই হত না।

---

৪ রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥
—ধ্বন্যালোক, ২।১৬

৫ ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি

৬ ধ্বন্যালোক, ২।১৭

৭ ম্যাকবেথ

কবির দৃষ্টি সমাহিত ছিল তাঁর নাটকের নায়কের হৃদয়শোষী যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট চিত্তের নিদারুণ চিত্রের দিকে; আর তাঁর মহাপ্রতিভা তার কাব্যোপকরণ আপনি উপহার এনেছে, বুদ্ধি দিয়ে অন্বেষণ করে তাকে আনতে হয়নি।

আনন্দবর্ধন বলেছেন, এমনটি যে ঘটে, তার কারণ, কবি তাঁর কাব্যের বাচ্য দিয়েই রসকে আকর্ষণ করেন; এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা ও অলংকার তার বাচ্য থেকে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তারা বাচ্যেরই অঙ্গ।

> যুক্তং চৈতৎ। যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলংকারাঃ।

কালিদাসের উপমার যে খ্যাতি, তার কারণ এ নয় যে, সেগুলির উপমান ও উপমেয়ের মিলের পরিমাণ ও চমৎকারিত্ব খুব বেশি। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, সেগুলি কাব্যের বাচ্যকে সাজানোর জন্য কটককুণ্ডলের মতো বাইরে থেকে আনা অলংকার নয়। সেগুলি বাচ্যের শোভা— যৌবন যেমন দেহের শোভা। বাচ্য থেকে তাদের প্রভেদ করা যায় না, কিন্তু কাব্যের বাচ্যকে তারা রস-আকর্ষণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেয়।

> অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
> অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ৷৷

এর বাচ্য ও উপমার মধ্যে কোনও ভেদরেখা টানা যায় না। এর বাচ্যই উপমা, উপমাই বাচ্য। এবং ফলে শম্ভুর চিন্তাতেও যে-অধৃষ্য রূপ, যা দেখে মদনের হাত থেকেও ধনু ও শব খসে পড়েছিল, তার দীপ্তগম্ভীর রসে পাঠকের চিত্ত ভরে যায়।

সব শ্রেষ্ঠ কাব্যের অলংকারের এই এক ধারা। মহাভারতের বিদুলার উপাখ্যানে বিদুলা তাঁর শত্রুনির্জিত, দীনচিত্ত, নিরুদ্যম পুত্রকে উত্তেজিত করছে—

> অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি হি জ্বল।
> মা তুষাগ্নিরিবানর্চির্ধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ ৷৷
> মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতম্ চিরম্।

'তিন্দুকের[৮] অঙ্গারের মতো এক মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠো; প্রাণের মায়ায় শিখাহীন তুষের আগুনের মতো ধূমায়মান থেকো না। চিরদিন ধূমায়িত থাকার চেয়ে মুহূর্তের জন্য জ্বলে ভস্ম হওয়াও শ্রেয়।' এর বাচ্য ও অলংকারে ভেদ নেই, সেই অভেদ এই দেড়টি শ্লোককে রসোদ্‌বোধনের আশ্চর্য শক্তি দিয়েছে। রামায়ণে হেমন্তের নিষ্প্রভ চন্দ্রের বর্ণনা—

> রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারাবৃতমণ্ডলঃ।
> নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ৷৷

'তুষারাবৃত আকাশে নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের মতো চন্দ্র প্রকাশহীন।'— এ উপমা একটা উদাহরণ

৮ গাবগাছ

নয়; হেমন্তের বিলুপ্তজ্যোতি চন্দ্রের সমস্তটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পঁচিশে বৈশাখ'—

আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এর বাচ্য ও অলংকারে প্রভেদ করবে কে? কারণ, এর অলংকার এর বাচ্যের শোভা নয়, রূপ। আর তাতেই এ কবিতার বাচ্যের পেয়ালা থেকে কাব্যের রস উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে।

২

আলংকারিকেরা যখন বলেন, কাব্যের 'বাচ্য' তার দেহ, 'রীতি' যেন অবয়বসংস্থান, 'অলংকার' কটককুণ্ডলাদির মতো আভরণ[৯]— তখন তাঁরা নিম্ন অধিকারীর জন্য কাব্যের বাহ্যতত্ত্ব বলেন, নিগূঢ় চরমতত্ত্ব নয়। কারণ, কাব্যে তার বাচ্য রীতি অলংকারের কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই, তারা একান্ত রসপরতন্ত্র। রীতি অলংকার যদিও বাহ্যত বাচ্যের ভঙ্গি ও আভরণ, বস্তুত তাদের ভঙ্গিত্ব ও আভরণত্ব হচ্ছে কাব্যের রসের সম্পর্কে। যেমন অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'উপমা কাব্যের বাচ্যার্থকেই অলংকৃত করে, কিন্তু বাচ্যার্থের তাই হচ্ছে অলংকার যা তাকে ব্যঙ্গ্যার্থের অভিব্যঞ্জনার সামর্থ্য দেয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা অর্থাৎ তার রসধ্বনিই হচ্ছে অলংকার্য। কটককেয়ূরাদি যে শরীরে পরানো হয়, তাতেও নিজের চিত্তবৃত্তিবিশেষের ঔচিত্যসূচক বলে চেতন আত্মাই অলংকৃত হয়। সেইজন্যই চেতনাহীন শবশরীর কুণ্ডলাদির যোগে শোভাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, সেখানে অলংকার্য বস্তুর অভাব। গৃহত্যাগী যতির শরীরে কটকাদি অলংকার শোভা নয়, হাস্যাবহ। কারণ সেখানে অলংকরণের ঔচিত্যের অভাব। কিন্তু দেহের তো ঔচিত্য-অনৌচিত্য কিছু নেই, সুতরাং বস্তুত আত্মাই হচ্ছে অলংকার্য।'

> উপময়া যদ্যপি বাচ্যোঽর্থোঽলংক্রিয়তে তথাপি তস্য তদেবালংকরণং যদ্ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি। বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈবালংকার্যঃ। কটককেয়ূরাদিভি-রপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্যসূচনাত্ম-তয়ালংক্রিয়তে। তথাহ্যচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি।

৯ অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ, দেহদ্বারেণেব শব্দার্থদ্বারেণ তমেব কাব্যস্যাত্মভূতং রসমুৎকর্ষয়ন্তঃ কাব্যস্যোৎকর্ষকা উচ্যন্তে।—সাহিত্যদর্পণ. ১।৫ বৃত্তি

অলংকার্যস্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি। অলংকার্যস্যানৌচিত্যাৎ। ন চ দেহস্য কিংচিদনৌচিত্যমিতি বস্তুত আত্মৈবালংকার্যঃ।[১০]

অর্থাৎ, কাব্যের যা কিছু, তার একমাত্র মাপকাঠি কাব্যের রস। কাব্যের 'গুণ' অর্থে, যা তার রসকে উৎকর্ষ দেয়। কাব্যের 'দোষ' আর কিছু নয়, যা তার রসের লাঘব ঘটায়। কাব্যের ভাষা বাচ্য রীতি ও অলংকারের যে দোষগুণ বলা হয়, সেটা উপচার মাত্র।

অপি ত্বাত্মভূতস্য রসস্যৈব পরমার্থতো গুণা মাধুর্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শব্দার্থয়োঃ।[১১]

'মাধুর্য প্রভৃতি যে গুণ, তা পরমার্থতঃ কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসেরই গুণ। শুধু ব্যাবহারিকভাবে তাদের শব্দ ও অর্থের গুণ বলা হয়।'

সুতরাং কাব্যের ভাষা রীতি বা অলংকারের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম অসম্ভব। কেননা, রস ছাড়া এদের আর কোনও নিয়ামক নেই। পূর্বতন কবিদের কাব্যপরীক্ষায় যদি তাঁদের ব্যবহার থেকে কোনও সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারও করা যায়, নবীন কবির কাব্যপ্রতিভা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চলে সমান রসোদ্‌বোধক কাব্যের সৃষ্টি করবে। কাব্যে বাচ্য বা বিষয় সম্বন্ধেও ওই এক কথা। কোন শ্রেণির বিষয়কে অবলম্বন করে কবি তার কাব্য রচনা করবে, তার গণ্ডি এঁকে দেওয়া সম্ভব নয়। কবির প্রতিভা, অভিনবগুপ্ত যাকে বলেছেন 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা', সে যে কোন অপূর্ব কথাবস্তুর সৃষ্টি করে রসকে আকর্ষণ করবে, আগে থেকে কে তা নির্ণয় করতে পারে? সেইজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন—

তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্‌বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে।[১২]

'এমন বস্তু নেই যা রসতৎপর কবির ইচ্ছায় তাঁর অভিমত প্রকাশোপযোগী অঙ্গত্ব না ধারণ করে।' কারণ—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।

বস্তুর জগতের মতো কাব্যের জগৎও সীমাহীন, এবং এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হচ্ছেন কবি। সৃষ্টির কাজে নিজের প্রতিভার নিয়ম ছাড়া আর কোনও নিয়ম তাঁর উপর চলে না।

ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।

কাব্যে কবির ব্যবহার স্বাধীন, কেননা, এখানে তিনি স্বতন্ত্র, বাইরের কোনও কিছুর পারতন্ত্র্য তাঁর নেই।

১০ ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৫
১১ ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৮
১২ ধ্বন্যালোক, ৩।৪২ ৪৩, বৃত্তি

৩

কবিকে নিজের প্রতিভার যে নিয়ম মানতে হয়, সুতরাং কাব্যবিচারের যা একমাত্র নিয়ম, আলংকারিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'ঔচিত্য' অর্থাৎ অভিপ্রেত রসের উপযোগিত্ব।

বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
রসাদিবিষয়েণৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ ॥[১৩]

'মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হচ্ছে রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী করে কাব্যের বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধন।' সুতরাং কাব্যের কথা ও রীতি, ছন্দ ও অলংকার, এদের বিচারের অদ্বিতীয় বিধি হচ্ছে— কাব্যের রসসৃষ্টিতে কার কতটা দান, তার বিচার করা; আলংকারিকদের ভাষায়, এদের রসের 'অনুগুণত্বে'র পরিমাণ নির্ণয় করা। এ ছাড়া আর কোনও নিক্তি এখানে অচল ও অপ্রাসঙ্গিক।

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা ॥[১৪]

'অনৌচিত্য ছাড়া কাব্যের রসভঙ্গের আর কোনও কারণ নেই। এই ঔচিত্যবন্ধই রসের উপনিষৎ, কাব্যতত্ত্বের পরা বিদ্যা।'

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সম্প্রতি বাংলাদেশে তর্ক উঠেছে, শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ থেকে কতকাংশে ভিন্নচরিত্রের কল্পনা করে চিত্রিত করবার অধিকার কোনও আধুনিক কবির আছে কি না। একদল পণ্ডিত বলছেন, ও অধিকার নেই; কারণ, শ্রীরামচন্দ্রকে হিন্দুরা দেবতাবোধে পূজা করে; সে চরিত্রের বিকৃত অঙ্কনে হিন্দুর মনে, অর্থাৎ তাদের ধর্মভাবে, আঘাত লাগে। প্রাচীন হিন্দু আলংকারিকেরা বলতেন, কাব্যবিচারে ও-যুক্তি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। কাব্যের কোনও চিত্র বা চরিত্র কারো ধর্মবিশ্বাসে ঘা দেয় কি না, কাব্যত্বের বিচারে সে প্রসঙ্গের কোনও মূল্য বা প্রসার নেই। হতে পারে সেটা সামাজিক হিসাবে দূষ্য। এবং আঘাতপ্রাপ্ত ধর্মের ধার্মিক লোকের গায়ে জোর যদি বেশি হয়, তবে তারা কবির মুখ বন্ধ করেও দিতে পারে; যেমন রাজনৈতিক হিসাবে দূষ্য বলে রাজা কাব্যবিশেষের প্রচার বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তা দিয়ে কাব্যের কাব্যত্বের ভালমন্দ কিছু বিচার হয় না। এ মতকে প্রাচীন আলংকারিকদের মত বলছি, কেবল তাঁদের কাব্যবিচারের সূত্র থেকে অনুমান করে নয়। কারণ, ঠিক এই প্রশ্নই তাঁরাও তুলেছেন এবং মীমাংসা করেছেন; কেননা, আদিকবির পর বহু সংস্কৃত কবি রামচন্দ্রকে নায়ক করে কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের তর্ক ও মীমাংসা, এ দুয়েরই ধারা নবীন বাঙালি হিন্দুর তর্ক ও মীমাংসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন আলংকারিকদের বিচারের ফল একটি পরিকরশ্লোকে সংক্ষেপ করা আছে—

১৩ ধ্বন্যালোক, ৩।৩২
১৪ ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি

সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ।
কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী ॥[১৫]

'রামায়ণ প্রভৃতি যে-সব কাব্য সিদ্ধরসতুল্য, তাদের কথাতে এমন কথা যোগ করা চলে না যা তাদের রসের বিরোধী।' সিদ্ধরস কাব্য কাকে বলে, তা অভিনবগুপ্ত বুঝিয়েছেন— সিদ্ধ আস্বাদমাত্রশেষো ন তু ভাবনীয়ো রসো যেষু— 'যে কাব্যের রস রসসৃষ্টির উপায়কে অতিক্রম করে পাঠকের মনে আস্বাদমাত্রে পরিণত হয়েছে।' অর্থাৎ যে কাব্য লোকসমাজে এতই প্রচলিত ও পরিচিত যে, তার রসের আস্বাদ যেন তার কথাবস্তুনিরপেক্ষ পাঠকের মনে লেগে আছে। তার কাব্যকথা পাঠকের মনের রসের তারে যে গভীর ঘা দিয়েছে, তার বিশেষ সুর পাঠকের মনে বেজেই আছে। নূতন কাব্যের কোনও কথায় যদি সে সুরের বেসুর কিছু বাজে, তবে তার রসভঙ্গ অনিবার্য। সুতরাং তেমন কথা ঔচিত্যের ব্যতিক্রম। কিন্তু এ 'ঔচিত্য' রসের ঔচিত্য— সমাজ বা ধর্মের ঔচিত্য নয়।

আধুনিক কালের আর-একটা তর্ক— 'রিয়ালিজম' ও 'আইডিয়ালিজম', বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্রের বিবাদকে আলংকারিকেরা ঔচিত্যের বিধি দিয়ে বিচার করেছেন। কাব্যের লক্ষ্য রস। রস ভাবের পরিণতি। কিন্তু ভাব নিরালম্ব জিনিস নয়, বস্তুকে আশ্রয় করেই জন্মায় ও বেঁচে থাকে। কবি ভাবের এই বস্তুকে কথাশরীর দিয়েই রসের উদ্‌বোধন করেন। সুতরাং কাব্যের কথাবস্তু যদি ভাবের প্রাকৃত বস্তুর যথাযথ চিত্র না হয়, তবে রসোদ্‌বোধের বাধা ঘটে। আলংকারিকেরা একে বলেছেন, 'ভাবৌচিত্য' বা 'প্রকৃত্যৌচিত্য'। আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'সেইজন্য লৌকিক মানুষ নিয়ে যে কাব্য, তাতে সপ্তার্ণবলঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যাপারের অবতারণা বর্ণনামহিমায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন হলেও কাব্যত্ব হিসাবে নীরস। এবং তার হেতু হচ্ছে "অনৌচিত্য"।'—

> তথা চ কেবলমানুষস্য রাজাদের্বর্ণনে সপ্তার্ণবলঙ্ঘনাদিলক্ষণা ব্যাপারা উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভৃতোঽপি নীরসা এব নিয়মেন ভান্তি। তত্র ত্বনৌচিত্যমেব হেতুঃ।[১৬]

ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'বর্ণনা এমন হবে, যেন তাতে পাঠকের প্রতীতিখণ্ডন না হয়।'

যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্‌ বর্ণনীয়ম্‌।

কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, মায়ার জগৎ— এ কথা সত্য। কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ মায়া হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণ অবাস্তব কাব্য অসম্ভব। এবং কাব্যের কথাবস্তুর বস্তুপরতার লাঘব যদি তার রস-আকর্ষণ-শক্তির হীনতা ঘটায়, তবে সে লাঘব কাব্যের দোষ। কিন্তু কথাবস্তুর লক্ষ্য বস্তু নয়, রস। কাব্য যে বস্তুকে চিত্রিত করে, সে তার বাস্তবতার জন্য নয়, রসাভিব্যক্তির জন্য। কাজেই উপায় যদি উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যায়, তবে ঠিক বিপরীত অনৌচিত্যের দোষে

১৫ ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪ বৃত্তি
১৬ ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি

কাব্যের রসভঙ্গ হয়। বস্তুর বাস্তবতা অনন্ত। কোনও কবিই তার সবটাকে কাব্যের কথাবস্তুতে স্থান দিতে পারেন না। যদি পারতেন, তবে ফলে যা সৃষ্টি হত, তা আর যাই হোক— কাব্য নয়। সুতরাং ওই বাস্তবতার কতটা কোন কাব্যে স্থান পাবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের উপর, ও কবির প্রতিভার প্রকৃতির উপর। বস্তুর বাস্তবতার যে অংশ কাব্যের রসকে অভিব্যঞ্জিত বা পরিপুষ্ট না করে, সে অংশ কাব্যের অঙ্গ নয়, কাব্যের বোঝা। আলংকারিকেরা বলেছেন—

যস্মিন্ রসো বা ভাবো বা তাৎপর্যেণ প্রকাশতে
সংবৃত্যাভিহিতৌ বস্তু যত্রালংকার এব বা।[১৭]

'শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসই প্রধান হয়ে ব্যক্ত হয়, তার বস্তু ও অলংকার যেন গোপন থাকে।' অর্থাৎ, আলংকারিকদের মতে, কাব্যে অলংকারের আতিশয্য ও বাস্তবতার আতিশয্য একই শ্রেণির দোষ। কারণ, দুই আতিশয্যই উদ্দিষ্ট রসকে প্রধান না করে উপায়কেই প্রধান করে তোলে।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র রসসৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। কোন কবি কোন কাব্যকৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর—

কবিস্বভাবভেদনিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থানভেদঃ।[১৮]

'কবিপ্রতিভার স্বভাবের ভিন্নত্বের ফলেই কাব্যের প্রস্থান বা রীতির ভেদ হয়।' এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকেও কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসন দেবার অধিকারী নয়। এক আস্বাদের রসভোগে অরুচি হলে, হয়তো কিছুদিন কাব্যপাঠকের অন্য আস্বাদের রসে একান্ত রুচি দেখা যায়। এই রুচি-পরিবর্তন দিয়ে কাব্যের কাব্যত্ব বিচার হয় না। শকুন্তলার বিদূষক বলেছিল, পিণ্ডখর্জুরে অরুচি হলে তেঁতুলের দিকে রুচি যায়।

ফল

হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্ আবিষ্কার করেছিলেন যে, মানুষের চক্ষু, যাকে লোকে প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশলের একটা চূড়ান্ত উদাহরণ মনে করে, সেটি যন্ত্রহিসাবে দোষ ও ত্রুটিতে ভরপুর। আলোকরশ্মিকে গুছিয়ে এনে রেটিনার পর্দায় ছায়া ফেলার জন্য চোখের যে সামনে-পিছনে উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে গতি আছে, তার সীমা অতি সামান্য। ফলে একটু বেশি দূরের জিনিসও দৃষ্টির বাইরে থাকে, একটু বেশি কাছের জিনিসও দেখা যায় না। চোখকে তাজা

১৭ ধ্বন্যালোক, ৩।৪২-৪৩, বৃত্তি
১৮ বক্রোক্তিজীবিত, ১।২৪ বৃত্তি

রাখার জন্য যে-সব নাড়ি তাতে রক্ত সরবরাহ করে, তারাই আবার অবিচ্ছিন্ন আলো প্রবেশের বাধা। দু-চোখের দৃষ্টি যাতে দু-মুখো না হয়ে একমুখীন হয়, তার যন্ত্রপাতির মধ্যেও নানা গলদ। মোটের উপর এরকম একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যদি কেউ হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস্‌কে বেচতে আসত, তবে কেনা দূরে থাক, তিনি তাকে বেশ কড়া দু-কথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মানুষের চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ। কারণ, তার নিত্য ঘরকন্নার কাজ ওতেই বেশ চলে যায়; ও-সব দোষত্রুটিতে কোনও বাধা হয় না। কেননা, সেগুলি ধরা পড়ে বীক্ষণে নয়, অণুবীক্ষণে। চোখের মতো কাব্যকেও সমালোচনার 'অপ্‌থাল্‌মস্‌কোপ্‌' দিয়ে দেখলে, শ্রেষ্ঠ কাব্যেও নানা দোষত্রুটি আবিষ্কার করা যায়। বিশ্বনাথ বলেছেন, 'নির্দোষ না হলে যদি কাব্য না হত, তবে কাব্যপদার্থটি হত অতি বিরল, এমন-কি, নির্বিষয়; কারণ সর্ব রকমে নির্দোষ কাব্য একান্ত অসম্ভব।'[১]

কিন্তু চোখের কাজ যেমন নির্দোষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হওয়া নয়, মানুষকে রূপের জ্ঞান দেওয়া, কাব্যের কাজ তেমনি দোষহীন শব্দার্থের রচনা নয়, রসের সৃষ্টি করা। সুতরাং দোষত্রুটি সত্ত্বেও যে প্রবন্ধ রসসৃষ্টিতে সফল, তা কাব্য; আর সেখানে যা নিষ্ফল, তার রচনার দোষগুণ কাব্যের দোষগুণ নয়, কারণ কাব্যত্বই সেখানে নেই। আনন্দবর্ধন কাব্যের দোষ দু-ভাগে ভাগ করে কথাটা বিশদ করেছেন। দ্বিবিধো হি দোষঃ— কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোঽশক্তিকৃতশ্চ।[২] 'কাব্যের দোষ দু-রকমের— কবির অব্যুৎপত্তিকৃত ও কবির অশক্তিজনিত।' ছোটখাটো অসংগতি ও অনৌচিত্য, ভাষার কাঠিন্য, ছন্দের অলালিত্য— কবির অব্যুৎপত্তিকৃত এ-সব দোষ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক নয়। কারণ—

অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স ঝটিত্যবভাসতে ॥[৩]

'অব্যুৎপত্তিকৃত যে দোষ, কবির রসসৃষ্টির শক্তি তাদের সংবরণ করে রাখে। অর্থাৎ শক্তিতিরস্কৃত হয়ে তারা এক-রকম অলক্ষ্যই থেকে যায়।[৪] কিন্তু কাব্যের দোষের মূল হচ্ছে কবির রসসৃষ্টিশক্তির লাঘব, সহৃদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহূর্তেই প্রতিভাত হয়।' এবং এই দোষই কাব্যের যথার্থ দোষ। নইলে 'ব্যুৎপত্তি'র— অভিনবগুপ্ত যাকে বলেছেন— তদুপযোগিসমস্তবস্তুপৌর্বাপর্যপরামর্শকৌশলম্‌, কাব্যের সমস্ত বস্তু উদ্দিষ্ট রসের উপযোগী কি না তার পৌর্বাপর্যবিচার করে প্রয়োগ-কৌশল— তার অভাব মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধেও মাঝে মাঝে দেখা যায়; কিন্তু, যেমন অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'এমনি তাঁদের কবিপ্রতিভা যে, তাঁদের কাব্যের প্রতি বর্ণিত বিষয় চিত্তকে সেখানেই বন্দী করে রাখে, পৌর্বাপর্য বিচারের অবসর দেয় না। কেমন, যেমন অতিপরাক্রমশালী পুরুষের অনুচিত বিষয়েও যুদ্ধের বিক্রম

১ এবং কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং নির্বিষয়ং বা স্যাৎ। সর্বথা নির্দোষস্যৈকান্তমসম্ভবাৎ।
—সাহিত্যদর্পণ, ১।২, বৃত্তি

২ ধ্বন্যালোক, ৩।৬

৩ ধ্বন্যালোক, ৩।৬, বৃত্তি

৪ তত্রাব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্তিতিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে।—ধ্বন্যালোক, ৩।৬

দেখে সাধুবাদ দিতে হয়, পৌর্বাপর্যবিচারের দিকে মন থাকে না।"[৫] বিপুল-রসনিস্যন্দী, এবং প্রতি কাব্যাঙ্গ সে রসকে উপচিত ও প্রগাঢ় করছে, এমন কাব্য খুব বেশি সৃষ্টি হয়নি। সেইজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'কাব্যের সংসার অতি বিচিত্র কবিপরম্পরাবাহী বটে; কিন্তু মহাকবি বলতে কালিদাস প্রভৃতি দু তিন পাঁচ জনকেই গণনা করা চলে।'[৬] সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের দিকে তাকালেও আনন্দবর্ধনের কথা বেশি বদল করতে হয় না। কালিদাস যখন বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকে সমগ্রবিধ গুণের পরাঙ্মুখী বলেছিলেন, তখন কবিপ্রতিভার সৃষ্টির কথাও নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল।

কাব্যের সঙ্গে কাব্যের বড়-ছোটর যে ভেদ, সে ভেদ রসের তারতম্য নিয়ে। কাব্য ও অকাব্যের প্রভেদ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কাব্যের রসসৃষ্টির যা-সব উপকরণ— কথা, ভাষা, অলংকার, ছন্দ— সেই মালমশলা দিয়ে যে রচনা, অথচ কাব্যের আত্মা 'রস' যাতে নেই, তাই হচ্ছে 'অকাব্য'। আলংকারিকেরা এ শ্রেণির রচনার নাম দিয়েছেন 'চিত্রকাব্য'। চিত্র যেমন বস্তুর অনুকরণ, কিন্তু বস্তু নয়, এও তেমনি কাব্যের অনুকরণ, কিন্তু কাব্য নয়।[৭] এ-রকম অকাব্য বা চিত্রকাব্যের যে রচনা হয়, তার নানা কারণ। প্রধান কারণ, রসসৃষ্টির প্রতিভা যার নেই, তার কাব্যরচনার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বেগে যা রচনা করা চলে, তা স্বভাবতই কাব্য হয় না, হয় কাব্যের বাহ্যিক মূর্তি মাত্র। এইজন্যই প্রতিভাশালী কবির অকবি সমসাময়িক কবিযশঃপ্রার্থীরা তাঁর ভাষা ছন্দ ও ভঙ্গির যথাসাধ্য অনুকরণ করে থাকে। কারণ কাব্যরসের ওই মূর্তিই তখন তাদের চোখের সামনে সবচেয়ে দেদীপ্যমান। এবং তাদের মনের ভরসা এই যে, কতকটা ওই-রকমের মূর্তি গড়তে পারলেই, তার মধ্যে প্রাণ আপনি এসে যাবে। আনন্দবর্ধন লিখেছেন যে, রসতৎপরতাশূন্য বিশৃঙ্খলবাক লেখকদের কাব্যরচনার প্রবৃত্তি দেখে তিনি 'চিত্রকাব্য' নামটির পরিকল্পনা করেছেন।[৮] কিন্তু আনন্দবর্ধন এ শ্রেণির লেখকদের উপর অবিচার করেননি। সূক্ষ্ম বিচার করে এদের যেটুকু পাওনা, তা তাদের দিয়েছেন। এদের রচনাকে যে নীরস বলা হয়, তার অর্থ এ নয় যে, রস তাতে একেবারেই নেই, কারণ, বস্তুসংস্পর্শহীন রচনা হয় না। এবং জগতের সব বস্তুই কোনও-না-কোনও রসের অঙ্গত্ব ধারণ করতে পারে। রস হচ্ছে বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তিবিশেষ। এমন কোনও বস্তু নেই যা কাব্যের আকারে গ্রথিত হলে কিছু-না-কিছু এ-রকম চিত্তবৃত্তির জন্ম দেয় না। যদি থাকে, তবে সে বস্তুকে চিত্রকাব্যের লেখকেরাও তাদের রচনার বিষয় করে না।[৯] কিন্তু অকবির কাব্যাকার বাচ্যসামর্থ্যবশে যে রসের সৃষ্টি হয়,

---

৫ অসৌ বর্ণিতস্তথা প্রতিভানবতা কবিনা যথা তত্রৈব বিশ্রান্তং হৃদয়ং পৌর্বাপর্যপরামর্শং কর্তুং ন দদাতি যথা নির্ব্যাজপরাক্রমস্য পুরুষস্যাবিষয়েঽপি যুধ্যমানস্য তাবত্তস্মিন্নবসরে সাধুবাদো বিতীর্যতে ন তু পৌর্বাপর্যপরামর্শো তথাত্রাপীতি ভাবঃ। —অভিনবগুপ্ত, ধ্বন্যালোকলোচন, ৩।৫

৬ অস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তে। —ধ্বন্যালোক, ১।৬

৭ কেবলবাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপনিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্। ন তন্মুখ্যং কাব্যম্। কাব্যানুকারো হ্যসৌ। —ধ্বন্যালোক, ৩।৪২, ৪৩

৮ এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যৈব কাব্যপ্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্। —ধ্বন্যালোক, ৩।৪১, ৪২

৯ যস্মাদবস্তুসংস্পর্শিতা কাব্যস্য নোপপদ্যতে। বস্তু চ সর্বমেব জগদ্গতমবশ্যং কস্যচিদ্রসস্য চাঙ্গত্বং প্রতিপদ্যতে। বিভাবত্বেন চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ, ন চ তদস্তি বস্তু কিংচিৎ যন্ন চিত্তবৃত্তিবিশেষমুপজনয়তি, তদনুৎপাদনে বা কবিবিষয়তৈব তস্য ন স্যাৎ। —ধ্বন্যালোক, ৩।৪১, ৪২

তার প্রতীতি অতি দুর্বল। এবং এই দুর্বল রসরচনাকেই নীরস চিত্রকাব্য বলা হয়।

> বাচ্যসামর্থ্যবশেন... তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্‌ভবন্তী পরিদুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি প্রকারেণ নীরসত্বং পরিকল্প্য চিত্রবিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে।

অর্থাৎ যে-কোনও রস যা-কিছু পরিমাণে থাকলেই কাব্য হয় না। সহৃদয় কাব্যরসিকের চিত্তের রসপ্রতীতির প্রথম ধাপেও যা না পৌঁছে, তা কাব্য নয়, চিত্রকাব্য।

শক্তিহীন লেখকের রসসৃষ্টির প্রয়াস চিত্রকাব্য-রচনার একমাত্র কারণ নয়। অনেক নিবন্ধ কাব্যের আকার দিয়ে লেখা হয়, রসসৃষ্টি যাদের লক্ষ্যই নয়। যাদের উদ্দেশ্য উপদেশ দেওয়া, প্রচার করা, মানুষের বুদ্ধির কাছে কোনও সত্যকে প্রকাশ করা। যেমন পোপের 'এসে অন্ ম্যান্' কি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সম্ভাবশতক'। এ-সব রচনাকে কাব্যের আকারে গড়াতে এদের মধ্যে যে দুর্বল রসাভাসের সৃষ্টি হয়, তার উদ্দেশ্য বাচ্য বা বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ সরস করা মাত্র। রস এখানে উপায়, বক্তব্যই লক্ষ্য। মহাকবিরাও খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে এ-রকম চিত্রকাব্য রচনা করেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'।

> কানাকড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে,
> 'তুমি ষোলো আনা মাত্র, নহ পাঁচ সিকে।'
> টাকা কয়, 'আমি তাই, মূল্য মোর যথা—
> তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।'

এর যা আবেদন, তা মানুষের চিত্তের কাছে নয়, মানুষের বুদ্ধির কাছে। কেবল বক্তব্যের চমৎকারিত্বে ও বাক্যের নিপুণতায় একে কাব্য বলে ভ্রম হয়। কিন্তু কবি যখন লিখলেন—

> প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
> ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
> ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
> সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই?'

তখন বাচ্য স্পষ্টই বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে রসের ধ্বনিতে চিত্তকে ঘা দিলে। অকবির কাব্যসৃষ্টির প্রয়াস চিত্রকাব্যের রচনা করে। মহাকবির চিত্রকাব্য নিয়ে খেলাও কাব্য হয়ে ওঠে।

২

রসের জোগান যথেষ্ট না থাকলে কাব্য হয় না, সে কথা ঠিক, কিন্তু রস কি কাব্যের চরম লক্ষ্য? অনেক লোকের মন এ কথায় সায় দেয় না। তাঁরা বলেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তার রসের ব্যাপকতা ও গভীরতায় নয়; ওই রসসৃষ্টির ভিতর দিয়ে কবি যে মহত্তর ও বৃহত্তর জিনিস মানুষকে দান করেন, তারই মধ্যে। সে জিনিস কী, সে সম্বন্ধে মতের ঠিক

ঐক্য নেই। কেউ বলেন, কবি রসের তুলিতে মঙ্গলকে মানুষের চিত্তে এঁকে দেন; কেউ বলেন, কবি সত্যকে রসের মূর্তিতে প্রকাশ করেন। তবে এ-সব মতেরই মনের কথা এই যে, রসবস্তুটির নিজের ওজন খুব বেশি নয়। এবং ওই হালকা জিনিসই যদি কাব্যের চরম বস্তু হত, তবে কাব্য হত ছেলেখেলা, জ্ঞানীর উপাদেয় নয়। অর্থাৎ কাব্যের সুন্দরের আড়ালে সত্য ও শিব আছে বলেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

সভ্যতার সকল সৃষ্টিই সম্ভব হয়েছে, সমাজবন্ধন মানুষকে পশুত্ব থেকে যে মুক্তি দিয়েছে সেই মুক্তির জোরে। মানুষের কতকগুলি চিত্তবৃত্তির বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উপর সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাব্যরসের মধ্য দিয়ে যাঁরা মঙ্গলকে চান, একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, তাঁরা চান যেন কাব্য এই-সব সামাজিক চিত্তবৃত্তিগুলির দিকে পাঠকের মনকে অনুকূল করে। কাব্যের কাছে সভ্যতার মূল ভিত্তির এই দাবি আলংকারিকেরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁরা কাব্যরসকে 'লোকোত্তর' বলেছেন সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক বস্তু লৌকিক জগতের কোনও হিতেই লাগে না, সমাজের বুকে থেকে এত বড় অসামাজিক কথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থারম্ভে অনেক আলংকারিক প্রমাণ করেছেন যে, কাব্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি হয়।[১০] কাব্য কবিকে যশ ও অর্থ, সুতরাং সকল কাম্যবস্তু দান করে। কাব্যে যে-সব দেবতাস্তুতি থাকে, তারা ধর্মের সহায়, আর ধর্মের শেষ ফল মোক্ষ। কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে— রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ, রামের মতো পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া উচিত, রাবণের মতো পরদারহরণ অনুচিত।[১১] তবে এ উপদেশ নীরস শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ নয়, কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে[১২]— কান্তার উপদেশের মতো সরস, অর্থাৎ অম্লমধুর উপদেশ।

কাব্যরসের এই ফলশ্রুতি যে আলংকারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপসের কথা, তার প্রমাণ, ও-সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না। সেখানে তাঁরা বলেন—

বাগ্ধেনুর্দুগ্ধ একং হি রসং যল্লাভতৃষ্ণয়া
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ ॥[১৩]

'কাব্যের বাগ্‌ধেনু থেকে যে রসদুগ্ধ ক্ষরিত হয়, যোগীরা যে তত্ত্বরস দোহন করেন সেও তার সমান নয়।' অভিনবগুপ্ত রসের আস্বাদকে বলেছেন, পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ[১৪]— 'পরব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য আস্বাদ।' রসের স্বরূপ বলতে গিয়ে আলংকারিকেরা বলেছেন—

১০ চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি। কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে। —সাহিত্যদর্পণ, ১।২

১১ চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিব দত্যাদি-কৃত্যাকৃত্য-প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব। —সাহিত্যদর্পণ, ১।২

১২ কাব্যপ্রকাশ ১৩ ভট্টনায়ক ১৪ ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৪

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়।
বেদান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ॥[১৫]

'রস এক ঘন-আনন্দ-স্বরূপ চেতনা; কোনও বিষয়ান্তরের সংস্পর্শে এর প্রবাহ বিচ্ছিন্ন নয়; যে রজঃ মানুষের কামনা ও কর্মপ্রবৃত্তির মূল, যে তমঃ তার চিত্তকে লোভ ও মোহে বদ্ধ ও আবৃত রাখে— তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত করে সত্ত্বরূপে এর আবির্ভাব হয়। সুতরাং এর আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর।'

বলা বাহুল্য, উপনিষদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনার অনুকরণে আলংকারিকেরা রসের আস্বাদের এই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা যে কাব্যরসিকের রসের আস্বাদকে যোগীর পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারের তুল্য বলেছেন, তার অর্থ শুধু এই নয় যে, রস অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের আর কোনও অন্য ফল নেই। ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভে কী লাভ হয়— এটা প্রশ্ন নয়, প্রলাপ। কারণ, আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে —আত্মলাভের পর আর কিছু নেই। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ— পরমপুরুষের সাক্ষাৎকারের পর কিছুই নেই; সীমার সেখানে শেষ, গতির সেখানে নিবৃত্তি। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে রসের আস্বাদের তুলনা করে আলংকারিকেরা এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে, রসের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ। আর কোনও কিছুর উপায় হিসাবে রসের মূল্য নয়। যেমন ব্রহ্ম সম্বন্ধে তেমনি রসের সম্বন্ধে 'ততঃ কিম্' এ প্রশ্ন অর্থহীন। ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভে মানুষের সামাজিক জীবনের উপকার কী হয় এ অনুসন্ধানও যেমন, কাব্য সংসার ও সমাজের কতটা কাজে লাগে এ জিজ্ঞাসাও তেমনি। কাব্যকে উপদেষ্টার পদে দাঁড় না করিয়ে যাঁরা তার মূল্য দেখতে পান না, 'দশরূপক'-এর সাহসী লেখক তাঁদের বলেছেন 'অল্পবুদ্ধি সাধুলোক'।

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায় ॥[১৬]

'আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও যাঁরা ইতিহাস প্রভৃতির মতো সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি মাত্র বলেন, সেই-সব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার। রসের আস্বাদ কী, তা তাঁরা জানেন না।'

১৫ সাহিত্যদর্পণ, ৩।২
১৬ দশরূপক, ১।৬

৩

আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজবন্ধন ও সমাজব্যবস্থা খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব সৃষ্টির ওই হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ওই বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ-দেড়েক বছর হল পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কল-কৌশলকে আয়ত্ত করে মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছে— তাতেই এ মনোভাবের জন্ম। এর আশ্চর্য সফলতায় সমাজ ও জীবনযাত্রার কাম্য থেকে কাম্যতর পরিবর্তনের এক অবাধ ও সীমাহীন আদর্শের ছবি মানুষের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। লোকের ভরসা হয়েছে এই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা একদিন, এবং সেদিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখলেশহীন সকল রকম সুখসৌভাগ্যের অধিকারী করে দেবে। এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তন্ মন ধন'-এর উপর এদের দাবিও তত বেড়েছে। কবির রসসৃষ্টির শক্তি এই সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করেই সার্থক হয়, এ কথা আর অসংগত মনে হয় না।

প্রাচীন আলংকারিকদের সামনে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার জ্ঞানী লোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জানতেন। একে মন্থন করে যে দু'-এক পাত্র অমৃত উঠেছে, তার অমৃতত্ব যে আবার ওই সংসারের মঙ্গলসাধনে— এ কথা তাঁরা মানতে চাননি। কাব্যের রসকে তাঁরা সংসারবিষবৃক্ষের অমৃত ফল বলেই জানতেন। আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে দুঃখ পাই, তবুও এ কথা কী করে অস্বীকার করা যায় যে, গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতাবৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও-গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে। এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্যয় না ঘটলে, মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টিসাধন করে যা মুকুলেই ঝরে যায়।

লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তু সে ফল ওই জীবনের পুষ্টিতে নয়, তা থাকে মানুষের মুক্তিতে। লৌকিক জীবনের লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিসিঞ্চিত করে।

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসারধূলিজালে।...
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়

আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তার পরে ছুটি নিব।

'পুরস্কার'-এর কবির এই কবি-কথা আলংকারিকদের মনের কথা।

কিন্তু কবি তো কেবল কাব্যস্রষ্টা নন, তিনিও সামাজিক মানুষ। মানুষের যে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা প্রণয়-হিংসা তাঁর কাব্যের বিষয়, তাদের কেবল রসসৃষ্টির উপাদানরূপে দেখা সব সময়ে তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় না। কবির মধ্যে যে সামাজিক মানুষ আছে, সে মানুষের সামাজিক ভালমন্দ আশানিরাশার বিচার থেকে কাব্যকে একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না। রসসৃষ্টির যেখানে চরম অভিব্যক্তি সেখানে কবির এই সামাজিকতা ঢাকা পড়ে যায়, যেমন শেকসপিয়রের নাটকে। যেখানে কবির সামাজিকতা প্রবল, কিন্তু রসসৃষ্টির প্রাচুর্যকে ব্যাহত করে না, সেখানে ওই সামাজিকতাকে একটা উপরি-পাওনা হিসাবে গণ্য করা চলে, যেমন টলস্টয়ের 'বিগ্রহ ও শান্তি'। যেখানে উৎকট সামাজিকতাকে রসসৃষ্টির শক্তি সংবরণ করে রাখতে পারে না, সেখানে তা রসের প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে কাব্যত্বের লাঘব ঘটায়, যেমন রম্যাঁ রলাঁর 'জ্যঁা ক্রিস্‌তফ'।

৪

কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্তি দেওয়া— এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার এবং ওই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একটা গৌণ ফল। বিজ্ঞান তখন নানা দিকে যে-সব বিচিত্র সত্যের আবিষ্কার করেছে ও তার কতকগুলিকে ঘরকন্নার কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার যে নূতন ভঙ্গি দিয়েছে, তাতে সত্য ও সত্যানুসন্ধানের উপর মানুষের অসীম শ্রদ্ধা জন্মেছে। সত্যের এই 'প্রেস্টিজ' দিয়ে সকল রকম মানসিক সৃষ্টির 'প্রেস্টিজ' বাড়ানোর ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক এবং ওই ইচ্ছা কাব্যরসিকদের মগ্ন— সুতরাং মূল— চৈতন্যের মধ্যে কাজ করে এই মতটির সৃষ্টি করেছে। কবি কীটস সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিকযুগের কবি-প্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তুনিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্যদৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের এই সত্যসম্বন্ধে লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন এ কথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে এও তেমনি অসত্য। শিল্পী তার মূর্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা কেউ বলে না।

কিন্তু কবি কাব্যের মধ্য দিয়ে সত্যের বিকাশ করেন, এ কথা যে কাব্যরসিকেও বলে তার কারণ— এই বৈজ্ঞানিক যুগে সত্যের আইডিয়াকে ঘিরে মানুষের মনের 'ভাবে'র সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই 'ভাব'কেই রসমূর্তি দিয়ে অনেক কবি কাব্য রচনা করেছেন। এ ভাব ও রস নূতন। এবং নূতনের প্রথম আবির্ভাবে তাকে মন জুড়ে বসতে দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক মনোধর্ম।

৫

যুগে যুগে মানুষের মনে এই যে-সব নূতন ভাবসৃষ্টি, কবিরা তাঁদের কাব্যে সেই-সব যুগভাবকে রসে রূপান্তর করেন। মানবমনের যেগুলি চিরন্তন 'স্থায়ী' ভাব, সকল যুগের কাব্যের তারাই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যে-সব 'সঞ্চারী' কাব্যের রসকে গাঢ় করে, মানুষের বিচিত্র জীবন-প্রবাহ তাদের নব নব সৃষ্টি করে চলেছে। যুগে যুগে যে-সব 'সঞ্চারী ভাব' জন্মলাভ করে, প্রতি যুগের কাব্যরসিকের মন তাদের রসমূর্তির জন্য উন্মুখ থাকে। যে কবির কাব্যে এই নবীন ভাব নূতন রসে পরিণত হয়, তিনিই সে যুগের 'আধুনিক' কবি। পুরাতন রসও এই নূতন অনুপানে নবত্ব লাভ করে।

কাব্যের বাণী তাতেই প্রাচীন হয়েও পুরাতন হয় না। যুগের পর যুগ রসের নূতন সৃষ্টি চলতে থাকে।

> অতো হ্যন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা।
> বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্বয়বত্যপি ॥[১৭]

'পূর্বতন কবিদের প্রাচীন বাণীও নূতন ভঙ্গিমার আভরণে নবীনত্ব লাভ করে।' জীবন যে-সব নূতন 'ভাবে'র জন্ম দিচ্ছে, তাদের রসের মূর্তি গড়ার শিল্পীর যদি অভাব না হয় তবে নূতন কাব্যসৃষ্টিরও বিরামের আশঙ্কা নেই।

> ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ।[১৮]

কারণ—

> বাচস্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
> নিবদ্ধাপি ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥[১৯]

"যেমন জগৎপ্রকৃতি কল্পকল্পান্তর বিচিত্র বস্তুপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে চলেছে, তবুও তার নূতন সৃষ্টির শেষ নেই, তেমনি সহস্র সহস্র বাণী-সম্রাট কবির রসসৃষ্টিতেও রসের নূতন সৃষ্টি শেষ হয় না, কেননা, মানবমনের 'ভাবে'র সৃষ্টির শেষ নেই।"

১৭ ধ্বন্যালোক, ৪।২
১৮ ধ্বন্যালোক, ৪।৬
১৯ ধ্বন্যালোক ৪।১০

কিন্তু জীবন যেমন নূতন 'সঞ্চারী ভাবে'র সৃষ্টি করে, পুরাতন 'সঞ্চারী ভাবে'র তেমন ধ্বংসও করে। যে-সব ভাব মনের মৌলিক উপাদান নয়, জটিল যৌগিক সৃষ্টি— জীবনের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাদের জন্ম হয় এবং তার পরিবর্তনে এদের বিলোপ ঘটে। এরা হচ্ছে মনের 'আন্‌স্টেব্‌ল্ কম্‌পাউন্ড'। সেইজন্য প্রাচীন কবিদের কাব্যের অনেক অংশ আমাদের মনের রসের তারে ঠিক তেমন ঘা দেয় না, যা তা প্রাচীনদের মনে নিশ্চয় দিত। যে ভাবের উপর সে রসের প্রতিষ্ঠা ছিল, আমাদের মন থেকে সে ভাব একেবারে লোপ না হলেও ঠিক তেমনটি নেই। এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে, মধ্যযুগের খ্রিস্টান কাব্যরসিক দান্তের 'ডিভাইন কমিডি'তে যে রস পেতেন এ যুগের খ্রিস্টান অখ্রিস্টান কোনও কাব্যরসিক ঠিক সে রস পান না। ও কাব্যে যেটুকু 'স্থায়ী ভাবে'র রসে রূপান্তর, মাত্র সেইটুকুর আস্বাদই আমরা পাই। ওর যে 'সঞ্চারী'র আস্বাদ মধ্যযুগের কাব্যপাঠকেরা পেত, তা থেকে আমরা বঞ্চিত।

যেমন প্রাচীন যুগের অনেক কাব্য আমাদের মনে আর রস জোগায় না, তেমনি আমাদের নবীন যুগের অনেক কাব্যও আমাদের যে রস দেয়, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা তা থেকে ঠিক সে রস পাবে না। কারণ তাদের ভাবজগৎ ঠিক আমাদের ভাবজগৎ থাকবে না। একটা চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

* * *

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

এই অদ্ভুত কাব্য আধুনিক কাব্যরসিকের চিত্তের প্রতি অণুকে যে রসের আবেশে আবিষ্ট করে, তার একটা প্রধান উপাদান— 'গতি' ও 'বেগ' এ যুগের লোকের মনে যে 'ভাবে'র আবেগের সৃষ্টি করেছে। 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' যে আজ কবিকে 'উতলা' করেছে— তার মূলে আছে এ যুগের মানুষের মনে বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিশেষ রূপকল্পনা। এ ভাব ও কল্পনা যে মানুষের মনে চিরস্থায়ী হবে, তা মনে করার কারণ নেই। বিশ্বপ্রকৃতিকে আজ মানুষ যে চোখে দেখছে, সে দেখার যখন বদল হবে তখন এ ভাব ও কল্পনারও বদল হবে। 'বলাকা'র 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' পাখার ধ্বনিতে আমাদের চিত্তে যে রসের বিস্ময় জাগছে, সেদিনের কাব্যরসিকেরা তার অর্ধেকেরও আস্বাদ জানবে না। আমাদের অনাস্বাদিত কোন কাব্যরসের আস্বাদ তারা পাবে, তা নিয়ে তাদের হিংসা করব না। এ কাব্যের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি তাদের পূরণ হবে কি না, কে জানে।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য

সভাপতির অভিভাষণ রংপুর সারস্বত সম্মেলন ফাল্গুন ১৩৪৭

উপনিষদের গল্পে আছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেবার ইচ্ছায় নিজের ধনসম্পত্তি তাঁর দুই পত্নীকে ভাগ করে দেবার সংকল্প জানালে এক পত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমি পাই, তাতে কি অমৃতত্ব লাভ করব? ঋষি উত্তর দিলেন— না, অন্য সম্পত্তিশালী লোকের মতো সুখে জীবন কাটাবে, বিত্ত দিয়ে তো কখনো অমৃতত্ব পাওয়া যায় না। মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত প্রত্যুত্তর সকলের জানা আছে— যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্— যা দিয়ে অমৃতত্ব না পাব, তাতে আমার কী প্রয়োজন। ঋষির অন্য *পত্নী কাত্যায়নী স্বামীর প্রস্তাবে কী বলেছিলেন না-বলেছিলেন,* উপনিষদে তার খবর নেই। নিশ্চয় অমৃতত্ব পাওয়া যায় না বলে ধনসম্পত্তি তুচ্ছ, এ কথা তিনি মনে করেননি।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী মানুষের সভ্যতার দুই মূর্তির প্রতীক। পৃথিবীর অন্য-সব জীবজন্তুর মতো শরীর ও মন নিয়ে মানুষ। এবং তাদের মতোই মানুষের মনের বড় অংশ ব্যয় হয় শরীরের প্রয়োজনে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি তার বেশির ভাগ এবং অনেক সভ্যতার প্রায় সমস্তটা শরীরের প্রয়োজন ও বিলাসের দাবি মেটাবার কৌশল। ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, রেল-স্টিমার, মোটর-এরোপ্লেন, টেলিফোন-রেডিয়ো, কলকব্জা, কৃষি-বাণিজ্য— মুখ্যত এই কৌশল ছাড়া কিছু নয়। এদের আবিষ্কারে মানুষের যে বুদ্ধি অর্থাৎ মন কাজ করেছে, তার শক্তি ও জটিলতা বিস্ময়কর। কিন্তু তার লক্ষ্য সেই-সব প্রেরণার লক্ষ্য থেকে ভিন্ন নয়, যাতে পাখিরা বাসা বাঁধে, মাকড়সা শিকার ধরার আশ্চর্য কৌশল দেখায়, হাঁসের দল প্রতি শীতে উত্তর-ইউরোপ থেকে বাংলার পদ্মার চরে পথ না ভুলে পৌঁছে যায়। কিন্তু সভ্যতার এই কাত্যায়নী-মূর্তি তার সমগ্র চেহারা নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব আজও অজ্ঞাত রহস্য। তার চেয়ে গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টিতে মন যে পরম সহায় এবং সে কাজে তার চেষ্টা যে ব্যাপক ও বিচিত্র— এ অতি স্পষ্ট। এবং মনকে প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা করে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্যও স্পষ্ট যে, প্রাণের কাজে ব্যয় হয়েই মন নিঃশেষ

হয় না। মানুষের এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণির সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে তাই যদি হয় লৌকিক, মনের এ সৃষ্টি অলৌকিক। সে প্রয়োজন মেটাবার যে চেষ্টা তাই যদি হয় কাজ, মনের এ সৃষ্টি খেলা মাত্র। লীলা নাম দিলে হয়তো ভদ্র ও গভীর শোনায়, কিন্তু স্বরূপের বদল হয় না।

খেলাই হোক আর লীলাই হোক, সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী-মূর্তি তার অন্য মূর্তির মতোই স্বাভাবিক। শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের মনের যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, তাকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে সৃষ্টি, তাকেও সমান স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কোনও বাধা নেই। মনের এই খেলার বীজ পশুপক্ষীর মধ্যেও আছে। আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে পশুপক্ষীদের গতিবিধি সবই তাদের শরীরের প্রয়োজনে নয়। তাদের এমন-সব চেষ্টা আছে, যার ফল কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দ। পশুপক্ষীর মনের তুলনায় মানুষের মন বিরাট; সুতরাং সে মনের লৌকিক সৃষ্টিও যেমন বিশাল, অলৌকিক সৃষ্টিও তেমনি বিচিত্র।

২

আমরা যাকে সাহিত্য বলি, তা সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী-মূর্তির এক দিক। যেমন তার অন্য নানা দিক— ছবি, ভাস্কর্য, সংগীত, কর্ম-গন্ধহীন শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা। সাহিত্যের এই জন্মকথা স্মরণে রাখলে তার স্বরূপ ও আদর্শ নিয়ে যে-সব বিচারবিতর্ক, তার আলোচনা ও সমাধানের সুবিধা হয়। আধুনিক কালে নানা আকারে এ প্রশ্ন উঠেছে যে, সাহিত্যের কী লক্ষ্য। সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও মঙ্গল কি তার লক্ষ্য, না, তার কাজ কেবল মনকে একরকম আনন্দ দেওয়া, যার নাম সাহিত্যিক আনন্দ? আর, যদি তাই হয় তবে সে বস্তুর মূল্য কী। প্রাচীন কালেও যে এ তর্ক ওঠেনি তা নয়। আমাদের দেশের আলংকারিকদের একদল বলেছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোককে কর্তব্য-অকর্তব্যের উপদেশ দেওয়া, যেমন রামায়ণ উপদেশ দেয় যে, রামের মতো হবে, রাবণের মতো নয়। কিন্তু কাব্যের উপদেশ গুরুমহাশয়ের শুষ্ক উপদেশ নয়, কান্তার উপদেশের মতো মধুর উপদেশ। আশা করা যায় এই সৌভাগ্যবান আলংকারিকদের প্রিয়বাদিনী কান্তারা সব সময় মধুর বাক্যেই উপদেশ দিতেন। যা হোক, এঁদের কথা এই যে, কাব্য স্মৃতিশাস্ত্রের মতো উচিত-অনুচিত জানিয়ে দেয় না, এমন চিত্র ও চরিত্রের সৃষ্টি করে যাতে পাঠকের মন মঙ্গলের দিকেই উন্মুখ ও অমঙ্গলের দিকে বিমুখ হয়। এবং সেই কাজই কাব্যের লক্ষ্য। এ মতকে উপহাস করে অন্য-দল আলংকারিক, যেমন দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয় বলেছেন যে, যাঁরা অমৃতনিস্যন্দী কাব্যেও উপদেশ খোঁজেন তাঁরা সাধুলোক, কিন্তু অল্পবুদ্ধি। অর্থাৎ কাব্যের লক্ষ্য— পাঠককে কাব্যপাঠের যে বিশেষ আনন্দ সেই আনন্দ দেওয়া, আর কিছু নয়।

এই মতবিরোধের আলোচনায় প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার, যা স্বতঃসিদ্ধ,

কিন্তু এ প্রসঙ্গে যা সব সময় মনে থাকে না। সাহিত্য কি কাব্য, মতবাদীদের কল্পিত কোনও বস্তু নয়। সাহিত্যিক ও কবির প্রতিভা যা সৃষ্টি করে এবং সাহিত্য ও কাব্য বলে বিদগ্ধসমাজে যা গ্রাহ্য হয়, সেই বস্তুর প্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়েই আলোচনা। এ কথা মনে রেখে বিচার করলে সহজেই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও কাব্য বলে যা স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য যার মধ্যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামায়ণ কি মহাভারতের কবির লক্ষ্য ছিল সমাজের মঙ্গল, এ তর্ক তোলা কঠিন নয়। রঘুবংশ কি শকুন্তলায় এ লক্ষ্য আবিষ্কার করাও হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু ঋতুসংহার ও মেঘদূতও তো কাব্য। ভরসা করা যায়, এ কথা কেউ বলবে না যে, যক্ষের বিরহবর্ণনায় কালিদাসের উদ্দেশ্য ছিল উপরওয়ালার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার থেকে লোকদের নিবৃত্ত করা, এবং মেঘদূত-পাঠের ফল সেই উপদেশ-লাভ। কাদম্বরী কি Alice in Wonderland-এর কী উপদেশ। 'My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense,' 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে'— কোন উপদেশ বা মঙ্গল এদের লক্ষ্য? মোট কথা, সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য সমাজহিত, তবে খুব মনোরম ছলে, এ মত সত্যিকারের কাব্যপরীক্ষার ফল নয়; তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে একটি মনগড়া তত্ত্ব।

এর উত্তরে বলা চলে যে, এগুলি ব্যতিক্রম। হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু মনোহরণের কৌশলটা খুব সার্থক হলে তার জোরেই রচনা কাব্য ও সাহিত্য বলে চলে যায়; মধুর আধিক্যে ভিতরে যে ঔষধ নেই, সে দিকে লক্ষ থাকে না। এই হিতবাদ, যাঁদের বলে প্রাচীনপন্থী তাঁদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য; আর তিনি যদি হন পরিবর্তন বা গতির পক্ষে, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি-সাহিত্য। কিন্তু স্থিতিবাদী ও গতিবাদী সাহিত্যবিচারে দু-জনার দৃষ্টিভঙ্গি এক— 'যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয়, তা যথার্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়'।

সুতরাং এ প্রশ্ন তুলতেই হয়, মানুষের মনের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য কেন হবে সমাজের মঙ্গলসাধন। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক মঙ্গল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীর ও প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টি। শরীর ও প্রাণের প্রতি যে মায়া, আমাদের মীমাংসকদের ভাষায়, তা রাগপ্রাপ্ত— অর্থাৎ তা স্বভাবতই আছে, কোনও যুক্তি ও উপদেশের তা ফল নয়। পশুপক্ষী ও মানুষে তা সমান। এই মায়ার প্রেরণায় মানুষের মনের যা-সব সৃষ্টি, তার চরম মূল্য-স্বীকারে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই। কারণ, সেই সৃষ্টিতেই মানুষের সভ্যজীবনযাপন সম্ভব হয়েছে। মনের অন্য কোনও সৃষ্টির যদি মূল্যও থাকে, এ সৃষ্টির ভিত্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে বনে যাওয়া চলে, কিন্তু কাত্যায়নীকে ছেড়ে ঘরকন্না চলে না। কিন্তু মানুষের মন যে কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দের জন্যই সৃষ্টি করে, এও তো স্বাভাবিক; কারণ, এ-রকম সৃষ্টি মানুষ করেছে ও করছে। তবে বলতে হয়, যেমন সভ্য সমাজের মঙ্গলের জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই মঙ্গলের জন্যই এই আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।

এই মতকে প্রচ্ছন্ন জড়বাদ কি দেহসর্বস্ববাদ নাম দিয়ে হেয় করার চেষ্টায় লাভ নেই। কিন্তু প্রাণের উপর স্বাভাবিক মায়ায় তার মঙ্গলের উপায়ের নিঃসংশয় মূল্যবোধ ছাড়া এ মতের অন্য কোনও ভিত্তিও নেই। সামাজিক মঙ্গল কেন কাম্য সে প্রশ্ন এ তোলে না, মেনে নেয়। তাই কেন একমাত্র কাম্য সে প্রশ্নও তোলে না, মেনে নেয়। অর্থাৎ উপায় নিয়ে তর্ক চলে. উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। কোনও কিছু অন্য-কিছুর সদুপায় কি না এটা তর্কের কথা; কারণ, প্রমাণের বিষয়। কিন্তু কোনও জিনিস তার নিজের জন্যই কাম্য কি না এটা প্রমাণের বিষয় নয়, রুচির কথা। অন্য উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক আনন্দ কাম্য কি না, তা যার মন কাম্য বলে জেনেছে, তার কাছেই কাম্য— যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। সে বোধ যার মনে নেই, তার কাছে প্রমাণ করা যাবে না। সাহিত্যিক আনন্দ যে সেই আনন্দে শেষ হয়েই অমূল্য, আলংকারিকদের ভাষায়, মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ সম্ভব নয়— সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।

৩

এ আলোচনায় তর্কের মুখ যদি বন্ধ হয়, মনের সংশয় কিন্তু ঘোচে না। তার কারণ, সাহিত্যিক সৃষ্টি ও সামাজিক জীবন, সব সময়ে এদের ভেদ মনে রাখা কঠিন। লৌকিক ও সামাজিক জীবনই সাহিত্যের সৃষ্টির উপকরণ। সুতরাং সাহিত্যিক সৃষ্টি চলে লৌকিক মন ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি। এবং সে সৃষ্টির প্রভাব যে মন ও জীবনের উপর মাঝে মাঝে পড়বে তা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের হিন্দুর সামাজিক মনের উপর রামায়ণের কাহিনি ও চরিত্রের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। এ যুগের শিক্ষিত বাঙালি নরনারীর মন ও সমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব স্বীকার করতে হয়। এবং সাহিত্যিকরা কেবল সাহিত্যিক নন, তাঁরাও সামাজিক মানুষ। সমাজের সুখদুঃখ আশানিরাশা উপকরণরূপে তাঁদের সাহিত্যিক মনকেই কেবল উদ্‌বুদ্ধ করে না, তাদের সামাজিক মনকেও নাড়া দেয় এবং এই সামাজিক মনের প্রভাব অনেক সাহিত্যে ও কাব্যে তার ছাপ রেখে যায়। যাদের মনের সাহিত্যবোধ প্রখর নয়, এবং যাদের মনের সামাজিকতা অত্যন্ত প্রখর, তারা সাহিত্যের এই-সব গৌণ ফলকেই তার মূল লক্ষ্য মনে করে; যে সাহিত্য থেকে এই সামাজিক ফল লাভের সম্ভাবনা নেই, অবসর-বিনোদনের সাহিত্য নাম দিয়ে প্রমাণ করে জিনিসটা হালকা। অবসর বস্তুটা কেন খারাপ, আর তার বিনোদন কেন দোষের, কাজের লোকের সে প্রশ্ন মনে আসে না। মার্কসপন্থীরা হয়তো বলবে, নিচু শ্রেণি যাতে অসূয়া না করে উঁচু শ্রেণির জন্য ভূতের বেগার খেটে যায়, তার অনুকূলেই এ মনোভাবের সৃষ্টি।

সমাজ ও সাহিত্যের এই যোগাযোগ সাহিত্যবিচারে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে। আধুনিক কালে সাহিত্যসমালোচনায় একটা কথা চলতি হয়েছে— escapism, যার বাংলা অনুবাদ হয়েছে 'পলায়নী বৃত্তি'। বর্তমান সমাজের দুঃখ দৈন্য অসংগতিতে পীড়িত হয়ে এবং তার প্রতিকারে হতাশ হয়ে অনেক কবি ও সাহিত্যিক নাকি এমন সাহিত্য তৈরি করছেন, মানুষের

সামাজিক মন ও জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, যার উপকরণ সম্পূর্ণ তাঁদের কল্পনা। সামাজিক জীবনের মাটি তাঁরা ছুঁচ্ছেন না, আশ্রয় নিয়েছেন কল্পনার হস্তিদন্তসৌধে, অর্থাৎ 'আইভরি টাওয়ার'-এ। এ-রকম পলায়ন যে ভীরুতা, 'এস্কেপিজ্‌ম্' নামের মধ্যে আছে সেই বিচার। কিন্তু এ বিচার কবির সামাজিক মন ও কর্তব্যবুদ্ধির বিচার, না, তাঁর কাব্যের বিচার, সব সময় বোঝা যায় না। বর্তমান কালে ভাবী সমাজের বিজয়দুন্দুভি বাজানো কি তার তালে পা ফেলা যদি সকলের কর্তব্য হয়, তবে সেটা সামাজিক কর্তব্য, সাহিত্যিক নয়। যদিও যে বিজ্ঞানী 'রিলেটিভিটি' কি 'কোয়ান্টাম' নিয়ে দিনরাত মেতে আছে সে কেন কৃষির ফলন ত্রিগুণের চেষ্টা করে না, এ দোষারোপ করিনে। কারণ, প্রতিভার সৃষ্টি যা মানুষের সভ্যতাকে গড়ে তোলে, অনেক সময়েই তা নগদবিদায় নয়। 'এস্কেপিজ্‌ম্' যদি সাহিত্যিক দোষ হয় তবে তার কারণও সাহিত্যিক, সামাজিক নয়। লৌকিক মন ও জীবন থেকে যে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন, তার ধারা হয় ক্ষীণ। সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখদুঃখের খাত ছাড়া বয় না। এইজন্য পৃথিবীর যা বড় সাহিত্য, মানুষের লৌকিক মন ও জীবন তার উপকরণ। এবং খুব বড় যে সাহিত্যিক সৃষ্টি, এই মন ও জীবনের বহু দিক ও বহু মূর্তি তার বিচিত্র উপকরণ— যেমন মহাভারতে, গ্রিক ট্র্যাজিডিতে, শেকসপিয়রের নাটকে, টলস্টয়ের উপন্যাসে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সামাজিক জীবনের এই বিচিত্র উপকরণসম্ভার বিভ্রম জন্মায় যে, সাহিত্যের লক্ষ্য সমাজে ও জীবনে প্রভাববিস্তার। সামাজিক জীবন সাহিত্যের উপকরণ— সামাজিক প্রেরণায় নয়, সাহিত্যিক প্রয়োজনে। যে কবির কাব্য 'এস্কেপিস্ট', তার মূল কারণ নয় বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কবির বিতৃষ্ণা ও হতাশা। তার কারণ, এব বিশাল ও জটিল উপকরণে সাহিত্যসৃষ্টি-প্রতিভার অভাব, অথবা অন্য রকম সৃষ্টির দিকে প্রতিভার ঝোঁক। শক্তিতে যা কুলোয় না তার চেষ্টা না করা ভীরুতা নয়, সুবুদ্ধি— কি জীবনে কি সাহিত্যে। 'এস্কেপিস্ট' কাব্য যদি 'আইভরি টাওয়ার'-এ উঠেও কাব্য হয়, তবে তা সার্থক, হোক-না তার ধারা শীর্ণ। বড় চেষ্টার ব্যর্থতা যে ছোট সাফল্যের চেয়ে বড়, সাহিত্যে সে কথা বলা চলে না। আর সাহিত্যের চেহারা তো এক নয়, সে বহুরূপী। লক্ষ্মী কেন দশভুজা হল না এ আপসোস বৃথা।

বিদেশে ও দেশে অনেক আধুনিক কবি সমাজে ও জীবনে ও সৃষ্টিতে যে অসংগতি ও কুশ্রীতা, তার তিক্ততাকে কাব্যের উপচার করছেন। এ অসংগতি ও কুশ্রীতা, যখন সৃষ্টির অংশ, তখন একে কাব্যের রূপ দিতে পারলে সে কাব্য যে হবে সার্থক কাব্য তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু যে-সব সমালোচক সাহিত্যের শ্রেণিভাগ ও নাম-কারণের ব্যাবসা করেন, তাঁদের বলতেই হবে যে, এ কাব্যও এস্কেপিস্ট কাব্য; আর এ কাব্য চরম রিয়ালিজম নয়, পরম সেন্টিমেন্টাল। জীবনে ও সৃষ্টিতে সবই কুশ্রী নয়, সৌন্দর্যও আছে। এ কাব্য তা থেকে পলায়ন। দোষের কিছু নয়, বিশেষ মুডের কাব্য রচনায় এ-রকম পলায়ন কবিকে করতেই হয়। কিন্তু এ কাব্যের সুরে আছে জীবন ও সৃষ্টি যে-রকম সে-রকম কেন হল, তাই নিয়ে নালিশ। শরীরের সুষমা যে কঙ্কালকে ঢেকে রেখেছে, নরনারীর প্রেমের মূলে যে কাম, তার পীড়া এ কাব্যের ধ্বনি। কুশ্রী ও সুন্দর, বীভৎস ও মধুর, নিষ্ঠুর ও মৈত্র— সৃষ্টির এই বিষামৃতের বিস্ময় এ কাব্যে নেই। সমস্ত সৃষ্টি কেন প্রেমিকের স্বপ্ন নয়, এ কাব্যে সেই অভিযোগ।

একদিন ছিল, যখন মানুষ মনে করত তার এ পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যমণি। সূর্য চন্দ্র তারা তাকেই ঘিরে রয়েছে। বিশ্বের সকল গতিবিধি হচ্ছে পৃথিবীর রাজা মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের মন্ত্রণা। সে দিন এ অভিমানের হয়তো অর্থ ছিল— বিশ্বসৃষ্টি মানুষের মনের মতো নয় কেন। আজ মানুষ জেনেছে তার এ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের একান্ত শূন্যে সমুদ্রের বালুতীরের এক কণা, পুরো বালুও নয়। তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড় শতলক্ষ পৃথিবীর এক কোণে সে রয়েছে; সেখান থেকে মুছে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যতা যে কিছু বাড়ল, তা লক্ষ্যও হবে না। এই পৃথিবীতে মানুষ এসেছে অল্পদিন। থাকবেও না চিরদিন। যেদিন তাপহীন ও বায়ুশূন্য হয়ে তার গতিপথে পৃথিবী ঘুরবে, তার অনেক আগে এখান থেকে মানুষ লোপ হবে। সৃষ্টি কেন মানুষের মনোমতো নয় এ অভিযোগ আজ নিদারুণ পরিহাস। সৃষ্টি যা আছে তাই। কেন এ-রকম সে প্রশ্নের অর্থ নেই। এর সবই যে নিষ্ঠুর ও বীভৎস নয় সে আমাদের সৌভাগ্য। কঙ্কালকে ঘিরেও যে থাকে শরীরের সুষমা, কামের পাঁকেও যে প্রেমের পদ্ম ফোটে, কৃতজ্ঞ মনে তাই স্মরণ করতে হবে— কাব্যে না হোক, জীবনে।

নদীপথে

'মিঙ্গিন' স্টিমার
২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪
সোমবার। সন্ধ্যা

শনিবার রাত দশটায় ছেলেরা স্টিমার থেকে নেমে গেলে অল্পক্ষণ পরেই শুয়ে পড়া গেল। রাত দুটোয় একবার উঠেছিলাম। চার দিকে আলো। স্টিমার পুল খোলার প্রতীক্ষা করছে।

রবিবার প্রাতে উঠে স্টিমার কতদূর এল খোঁজ নেবার জন্য বাইরে এসে দেখি, সামনেই জগন্নাথ ঘাটের স্টিমারের গুদাম ও আপিস। ব্যাপার কী? সারেং এসে খবর দিল যে, শনিবার শেষরাত্রে পুল খোলার সময় বিলাতি ডাক এসে পড়ায় তখন পুল খোলা যায়নি, এবং পরে আর খোলা সম্ভব ছিল না, সুতরাং রবিবার শেষরাত্রের পূর্বে স্টিমার ছাড়বে না।

আবার বাড়ি যাওয়া ও ফিরে আসার হাঙ্গামা মনে করে রবিবার সমস্ত দিন ও রাত জগন্নাথ ঘাটের সামনে গঙ্গার মাঝে কাটিয়ে দেওয়া গেল— যখন তোমরা মনে করছিলে যে আমি বহু দূর চলে গেছি। কলকাতার নীচের গঙ্গার উপর যে একটা বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রতিদিন চলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। ভোর হতেই নদী জুড়ে নানারকম নৌকার ও নানা চেহারার বাষ্পীয় জলযানের ব্যস্ত গতায়াত আরম্ভ হয়— লোক নিয়ে, মাল নিয়ে এবং বাহ্যদৃষ্টিতে অকারণে। দুপুরের পর এ গতি কিছু মন্দা হয়ে আসে; আবার বিকাল হতে-না-হতেই নদী যেন গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে আলস্য ভেঙে ওঠে। নৌকার দলের গতি দ্রুত হয়, বাষ্পীয় যানগুলি গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ আওয়াজ করতে করতে জলচর প্রাণীর মতো উজান ভাটিতে ছুটতে থাকে। মধ্যাহ্নের জনবিরল নদী লোকসমাগমে ভরে ওঠে। একটা দিন এই দেখে কাটল।

রবিবার রাত সাড়ে চারটেয় হাওড়া-পুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্টিমার ছেড়েছে। একখানা ফ্ল্যাট বাঁ পাশে প্রথম থেকেই বাঁধা ছিল। সোমরা সকাল ছ'টায় বজবজে ডান দিকেও আর-একখানা ফ্ল্যাট বাঁধা হয়েছে। দু'দিকে দুই ফ্ল্যাট নিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে আমাদের স্টিমার চলেছে। স্টিমারখানি ভাল ও নূতন। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জল ও পাট দিয়ে প্রতিদিন ডেক মাজা হচ্ছে। আমিই একমাত্র যাত্রী। সুতরাং সবগুলি কেবিন যদৃচ্ছ ব্যবহার করছি।

সারেংটির বাড়ি নোয়াখালি। মাথায় একটু ছিট আছে। পঁয়ত্রিশ বছর স্টিমারে কাজ করছে, এখন মাইনে একশো আশি টাকা। আমাকে জানালে যে, চামড়া কালো বলে মাইনে এত কম; সাদা চামড়া হলে পাঁচ-ছশো হত। এবং এই চামড়ার তফাতের জন্যই নাকি, যদিও তার স্টিমারে একজন ভারী বাবু যাচ্ছে, তবুও স্টিমার-কোম্পানি সামনের ডেকে একটাও

ইজিচেয়ার দেয়নি, দুটো বেতের কুর্সি দিয়েই সেরেছে। আগের বছর এই স্টিমারেই এক সাহেব গিয়েছিল, বিশেষ ভারী নয়; তখন ইজিচেয়ার, পরদা এবং পাঁচ মন বরফ ছিল। পাঁচ মন না হলেও বরফ এবারও আছে। সেই বরফে তরিতরকারি তাজা রাখা হচ্ছে। এই যে দু'দিকে দুই ফ্ল্যাট বেঁধে দেওয়া, সারেঙের মতে এও একটা সাদা-কালোর ভেদবুদ্ধির ব্যাপার। আমাদের স্টিমারের সঙ্গে আরও একখানা সুন্দরবনগামী স্টিমার ছেড়েছে। বজবজের ফ্ল্যাটখানি নাকি তারই নেবার কথা। কিন্তু তাতে তিন-চারটি সাহেব যাচ্ছে বলে এই উলটো ব্যবস্থা হয়েছে।

বেলা সাড়ে দশটায় ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়েছি। সেখান থেকেই নদী বেশ প্রশস্ত। স্টিমার বাঁ পাড় ঘেঁষে এসেছে। ঢালু পাড়; অনেক জায়গায় প্রায় জল পর্যন্ত ঘাস ও ছোট ছোট গাছ-গাছড়া কোথাও কাছে, কোথাও দূরে লোকের বসতি। অন্য পাড়ে গাছের ঘন সবুজ সরু রেখা ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

বেলা প্রায় চারটেয় স্টিমার বড় নদী ছেড়ে একটি সরু খালে ঢুকেছে। খালের নাম 'নামকানা' খাল। এত সরু যে, দুই ফ্ল্যাটসমেত আমাদের স্টিমার তার প্রায় সবটাই জুড়ে থাকে। এই খাল দিয়ে অতি আস্তে আস্তে চলে ঘণ্টাখানেক পরে একটি মোটের উপর প্রশস্ত নদীতে পড়া গেল, নাম 'সপ্তমুখী'। কিন্তু এমন অগভীর যে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্টিমার নোঙর করতে হল। জোয়ার এলে তবে চলবে। নামকানা খালই সুন্দরবনের আরম্ভ। কিন্তু খালের দুই পাশে এবং সপ্তমুখী নদী যতটা এসেছি তার পাড়ে এখন আর বন নেই। চাষ-আবাদ ও লোকালয়। সারেং বললে, আরও চার ঘণ্টা চলার পর সুন্দরবনের বন আরম্ভ হবে।

শীত যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন কিছু নয়। আজ সমস্ত দিন স্টিমার দক্ষিণে চলেছে, সুতরাং উত্তরের হাওয়া লাগেনি। সামনের ডেকে সারাদিন রোদ। আরামে চলে এসেছি।

জোয়ার এসেছে। নোঙর তুলে স্টিমার চলতে আরম্ভ করল। রাত প্রায় আটটা। খুলনা পৌঁছনো পর্যন্ত রাতদিন স্টিমার চলবে, কোথাও থামবে না।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৪

মঙ্গলবার। সন্ধ্যা

আজ ভোর থেকে এবং কাল রাত্রে যখন ঘুমিয়ে ছিলুম নিশ্চয়ই তখন থেকেই স্টিমার চলেছে আঁকাবাঁকা সব ছোট ছোট নদী দিয়ে। মাঝে মাঝে বেশ প্রশস্ত নদী পাওয়া যাচ্ছে। [illegible] চোখ চলে ডালপালা-বিরল সোজা সরু গাছ ও আগাছার ঘন জঙ্গল। [illegible] ও জনমানবের চিহ্ন নেই। আকাশে পাখি নেই, কাকও নয়। মাঝে [illegible] চিল উড়ে যাচ্ছে; আর দুটো-একটা বক জলের ধারে স্তব্ধ তন্ময় [illegible] মৎস্যচিন্তা করছে। বনের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট সব খাল এসে

নদীতে পড়েছে। আমরা যে-সব নদী দিয়ে যাচ্ছি তা ছাড়া বহু ছোট-বড় নদী চারদিকে বয়ে চলেছে। কোনও জায়গায় একখণ্ড বনে ঢাকা জমির তিন দিকেই নদী— দেখতে চমৎকার। এ-সব নদী-নালার মধ্য দিয়ে পথ চিনে স্টিমার চালানো অভ্যাসের কাজ। সারেং বললে যে, এ পথ সম্বন্ধে সারেংদের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। বনের ধারে ধারে টিনে সাদা রং দিয়ে পথের চিহ্নও অনেক জায়গায় দেওয়া আছে।

বেলা আন্দাজ সাতটায় সুন্দরবন ডেসপ্যাচ-সার্ভিসের একখানা কলকাতাগামী স্টিমারের সঙ্গে দেখা হল। নাম 'বুরানওয়ালি'। দু'খানা ফ্ল্যাট দু'দিকে নিয়ে চলেছে। সেখানে নদী এত ছোট যে আমাদের স্টিমার একপাশে দাঁড় করিয়ে তাকে পথ দিতে হল।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় একখানা ছোট নৌকা দেখা গেল। বোঝা গেল লোকালয় কাছে এসেছে। অল্পক্ষণ পরে নদীর ধারে গাছের তলায় কয়েকটা বানরের দেখা পাওয়া গেল। শুনলুম অনেক ভাগ্যবান লোক আমার মতো সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে স্টিমারে যেতে হরিণের দল ও রয়্যাল বেঙ্গল বাঘ দেখতে পেয়েছে। আমার ভাগ্য বানরের উপর আর উঠল না।

মুসলমানদের এটা রোজার মাস। স্টিমারের দোতলার পিছনের ডেকে যেখানে মাল বোঝাই আছে তার কতকটা পরিষ্কার করে তেরো-চোদ্দোজন স্টিমারের খালাসি ও কর্মচারী সূর্যাস্তের পর নমাজ পড়ে। একসারে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ওঠাবসা করে; দেখতে বেশ। এর অনেকটাই যে আমাদের পূজা-অর্চার মতোই বাহ্যিক কসরত মাত্র তা মনে করতে ঠিক এখন ইচ্ছা হচ্ছে না। নমাজের পর সকলে গোল হয়ে বসে রোজা ভাঙে অর্থাৎ খেতে আরম্ভ করে। এক-এক থালায় দু'-তিনজন খাচ্ছে। খাদ্য ডাল ভাত এবং একটা কিছু তরকারি। এরা সমস্ত দিন উপবাসী থেকে স্টিমারের খালাসির হাড়ভাঙা খাটুনি মুখ বুজে সমানে খেটে যাচ্ছে। পূর্ব-বাংলার এই মুসলমান খালাসিদের দেখে বাঙালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু ভরসা হয়।

সারেং বলছে, আজ রাত আন্দাজ দশটা-এগারোটায় স্টিমার খুলনা পৌঁছবে। তারপর খুলনা থেকে বরিশাল যাবে চার-পাঁচ জায়গায় থেমে মাল নামাতে নামাতে। স্টিমারের কেরানিবাবু (নোয়াখালি জিলার ভদ্রলোক) বললেন যে, বৃহস্পতিবারের পরে বরিশাল পৌঁছলে যাবে না। আমার রবিবার কলকাতা পৌঁছতেই হবে। সুতরাং এবার আর গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়া হল না। বরিশাল থেকেই বরিশাল-খুলনা এক্সপ্রেস স্টিমারে খুলনা হয়ে কলকাতা ফিরব।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বুধবার। ভোর ৭টা

কাল রাত দশটায়, যখন খুলনা পৌঁছতে মাত্র ঘণ্টা দুই দেরি, তখন কুয়াশার জন্য স্টিমার নোঙর করতে হল। কুয়াশা কিছু বেশি নয়; জ্যোৎস্নায় নদীর পারের গাছপালা বেশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কুয়াশার জন্য সার্চলাইটের আলো ভাল না খোলায় শেষে নৌকা চাপা পড়ে এই ভয়ে সারেং স্টিমার নোঙর করে রাখে। আজ ভোররাত্রে ছেড়ে এই মাত্র খুলনা পৌঁছল। বেলা বারোটা আন্দাজ বরিশাল রওনা হবে। এখন নেমে তোমাদের একটা টেলিগ্রাম করতে ও এই চিঠি পোস্ট করতে যাচ্ছি। এ-সব কাজ স্টিমারের লোকেরাই করত, কিন্তু শহরটা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছা।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বুধবার। সন্ধ্যা

বেলা দশটার মধ্যেই স্টিমার খুলনা ছেড়ে রওনা হল। এখন চলেছি মানুষের ঘরকন্নার সাথি ছবির মতো ছোট নদী দিয়ে। দুই পাড়ে ধানক্ষেত। ধান কাটা শেষ হয়েছে। বাদামি রঙের ফাঁকা মাঠ; গোরু চরছে। মাঝে মাঝে চৌকো সরষেক্ষেত, হরিত-কপিশ— সব ফুল এখনও ফোটেনি। একটু পর-পরই লোকালয়; খোড়ো ঘর, ঢেউ-তোলা টিনের ঘর— আম, নারকেল, কলাগাছে ঘেরা। ক্বচিৎ একটা পাকা বাড়ি, সম্ভব জমিদাববাবুদের। স্নানের ঘাটে লোকের ভিড়; পাড়ের উপর ছাগলছানা লাফাচ্ছে। কোথাও নদীর ধারে হাটের জায়গা; বেড়াহীন ছোট ছোট টিনের চালা, গোটাকয়েক টিনের চাল টিনের বেড়ার ঘর— স্থায়ী দোকান ও মহাজনদের গুদাম। উজান-ভাটিতে নৌকা চলেছে নানা ধরনের— পাল তুলে, দাঁড় টেনে, লগি ঠেলে। পাড়ের উপর দিয়ে লোক-চলাচলের পথ; নানা বেশের লোক চলেছে— কারও মাথায় ছাতি, কারও কাঁধে মোট। নদীর দুই পারে দূর দিয়ে চলেছে শ্যামল গাছের সার। এ নদীর যারা নাম দিয়েছিল মধুমতী, তাদের রুচির প্রশংসা করতে হয়।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে গেল। স্নানের ঘাট সব খালি হয়ে এসেছে। এক-এক জন লোক তাড়াতাড়ি এসে চট করে দুটো ডুব দিয়ে তখনই উঠে যাচ্ছে।

আমাদের সারেং রহমত আলির নৌকা চাপা দেবার ভয় অত্যন্ত বেশি। বোধহয় কোনওদিন ও কাজ করে বিপদে পড়েছিল। কিন্তু খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে। বেলা যখন দুটো, আর স্টিমার এসেছে কালিয়া গ্রামের কাছাকাছি, তখন স্টিমারের বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের সঙ্গে একখানা বড় পাট-বোঝাই নৌকার একটা মৃদু-রকম ঠোকাঠুকি হল। ফলে নৌকাখানি হল কিঞ্চিৎ জখম, তবে বেশি কিছু নয়। দোষ কাকেও বড় দেওয়া যায় না। দুই ফ্ল্যাট সমেত আমাদের স্টিমারের এই ছোট নদীতে ঘোরাফেরা একটু সময়সাধ্য, আর জোর বাতাস

থাকাতে চেষ্টা করেও নৌকাখানা সময়মতো সরে যেতে পারেনি। এরকম ঘটনা ঘটলে সারেংকে নিকটবর্তী পুলিশ-থানায় রিপোর্ট পাঠাতে হয়। স্টিমারের লোকজনদের মধ্যে অনেক জেলার লোক ছিল— চাটগাঁ, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা, ময়মনসিং। দেখলুম সকলে একমত যে, এ অঞ্চলের লোক বড় সহজ নয়; তিলকে তাল করে তোলার মতো কল্পনার জোর নাকি এদের প্রচুর আছে। সারেঙের ইচ্ছা, তার রিপোর্টটা ইংরেজিতে লেখা হয়। স্টিমারে চলনসই ইংরেজি লেখকের অভাব, সুতরাং ঘটনার রিপোর্টটা লিখে দিতে হল। কালিয়া স্টেশনে স্টিমার থামিয়ে স্টেশনমাস্টারবাবুকে সেই রিপোর্ট দেওয়া হল থানায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাঁর মুখে শুনলুম, এখানে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে যে, স্টিমার একখানা পাঁচশো-মনি বোঝাই নৌকা চাপা দিয়ে একবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। কালিয়া ছাড়বার অল্পক্ষণ পরে স্টিমারের কেরানিবাবু এলেন একটা লেখার খসড়া নিয়ে। তিনি নাকি স্টিমারের নিবপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি; এরকম ঘটনার একটা রিপোর্ট তাঁকেও লিখে রাখতে হয়। যা লিখেছেন তা তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না। লেখার উপর চোখ বুলিয়েই কারণটা বুঝলাম। সেটা আমার লেখা সারেঙের রিপোর্টেব হুবহু নকল। কী করা যায়— ওকেই অদল-বদল করে নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তির রিপোর্ট করে দেওয়া গেল।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বৃহস্পতিবার

খুলনা ছাড়িয়ে এখন বরিশাল জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আজ ভোর থেকেই নদীর দুই পাড়ে নারকেল-সুপারির সার চলেছে অবিচ্ছেদে। কিন্তু নদীর চেহারা গেছে বদলে। দুই পাড়ের সুস্পষ্ট সীমারেখার মধ্যে বহতা নদীর যে সুষমা এ নদীর তা নেই। খুলনার নদীর চেয়ে এ নদী প্রশস্ততর, কিন্তু এর দুই পাড়ই ঢালু, আর সে পাড় বালুর নয়. কাদার। নদীতে স্নানের ঘাট বড় দেখছিনে। গ্রামগুলি সব নদীর থেকে দূরে দূরে। কালকের খুলনার নদী ছিল তরুণী কলহাসিনী গৃহলক্ষ্মী, আর এ যেন ঈষৎস্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া গৃহিণী— সিঁথিতে সিন্দূর, পরনে চওড়াপাড় শাড়ি, কিন্তু কপোলে কপালে কর্কশ বলিরেখা দেখা দিয়েছে।

আমাদের সারেঙের মতে বরিশালের লোকের মতো সুখী লোক কোথাও নেই। এদের সকলেরই যথেষ্ট ধানের জমি আর নারকেলের বাগান আছে, যাতে ধান ও নারকেল ফলে অসম্ভব রকম। এদের নাকি ধারকর্জ নেই। আর প্রায় সকলের বাড়ির কাছ দিয়েই নদী কি নালা গিয়েছে, তাতে মাছের যেমন ভাবনা নেই, যাতায়াতেরও তেমনি সুবিধে। যে বাড়ির পাশ দিয়ে নদী কি নালা যায়নি সে বাড়িতে নাকি লোকে সহজে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। এই সঙ্গে সারেং আরও একটা খবর জানালে। খুলনার মেয়েরা নাকি লঙ্কামরিচ বাটে না; তাদের রান্না যে কী করে হয় তা রহমত আলির বুদ্ধির অতীত।

আমাদের এ স্টিমার সব স্টেশনে থামে না; যেখানকার মাল আছে কেবল সেখানেই

থামে। আর একশো মনের চেয়ে কম হলে সে স্টেশনের মাল এ স্টিমারে বোঝাই হয়নি। কিন্তু যে স্টেশনে থামছে সেখানেই দেরি হচ্ছে অনেক। কারণ স্টিমারকে স্টেশনে ভিড়তে হচ্ছে আগে ফ্ল্যাট-দু'খানি মাঝ-নদীতে খুলে রেখে; আবার যাবার মুখে ও-দু'খানিকে দু'পাশে বেঁধে নিতে হচ্ছে। এইরকম কসরত করতে করতে বেলা দশটার পর পৌঁছলুম হুলার হাট স্টেশনে। স্টেশনটি একটু বড় এবং এর মালও আমাদের স্টিমারে আছে যথেষ্ট।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৪
বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা

সাড়ে-তিনশো মন মাল নামিয়ে হুলার হাট ছাড়তে বেলা বারোটা বেজে গেল। বেলা প্রায় দেড়টার সময় পৌঁছলুম কাউখালি বলে এক স্টেশনে। ছোট স্টেশন, মালও নামল অল্প। আর সৌভাগ্যক্রমে এবারে ফ্ল্যাট নিয়েই স্টিমার পাড়ে লাগতে পারল। ভাবলুম কাউখালি ছেড়ে রওনা হতে দেরি হবে না। এমন সময় সারেঙের অ্যাসিস্ট্যান্ট এক ছোকরা জানালে যে, স্টিমার এখন এইখানেই নোঙর করে থাকবে যতক্ষণ না ভাটা আরম্ভ হয় আর খুলনাগামী বরিশাল এক্সপ্রেস স্টিমার পাস না করে— অর্থাৎ রাত প্রায় সাড়ে আটটায়। সারেং এসেও সেই খবর দিল। এখান থেকে বরিশাল যেতে, কতক দূর যেতে হয় একটা সরু খাল দিয়ে। সেইজন্য নিয়ম যে, ফ্ল্যাটগ্রস্ত স্টিমারগুলি বরিশালের দিকে যাবে ভাটার সময়, আর বরিশাল থেকে আসবে যখন জোয়ার।

কাউখালির স্টেশনমাস্টারবাবু দেখা করতে এলেন। পরিচয় দিলেন তিনি আমার স্বজাতি। অবশ্য সারেঙের কাছে উপাধিসমেত আমার নামটা শুনেছেন। তাঁর বাড়ি এই জেলাতেই ঝালকাটির কাছে; গ্রামের নামটা ভুলে গেছি। এখানে পাঁচ বছর আছেন। স্টেশনের লাগাও কোয়ার্টার্স, গোলপাতার। কাছেই একটা বন্দর, স্টিমার থেকে দেখা যায়। কাছাকাছি লোকজন অনেক আছে। কিন্তু এ জায়গায় নাকি খাবার জিনিসের ভারী অসুবিধা। বাঙালির খাবার দুধ আর মাছ; তা এ নদীতে মাছ বেশি পাওয়া যায় না; আর দুধের সের যখন অন্য সব জায়গায় পাঁচ-ছ' পয়সা তখন এখানে, ঠিক কত বললেন মনে নেই, তবে তিনি আনার কাছাকাছি একটা মারাত্মক সংখ্যা। নেমে গিয়ে চারটে ডাব পাঠিয়ে দিলেন। একটা খেয়ে দেখলুম অতি চমৎকার মিষ্টি জল। রোজা ভাঙার পর শরীর ঠান্ডা করবার জন্য সারেংকে একটা দিলুম। সে বলছে তার মন ভাল নেই। তিনজন খালাসির জ্বর, একজনের হাতে চোট লেগেছে। শর্ট হ্যান্ডে কাজ চালাতে হচ্ছে। বোধহয় কালকের কালিয়ার কাছের ব্যাপারটারও মন খারাপের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে।

স্টেশনের কিছু পুবে পশ্চিম-মুখ হয়ে স্টিমার নোঙর করল। এই নদীর নাম কাউখালির খাল। বয়ে যাচ্ছে এখানে পুবে-পশ্চিমে। অল্পদূর পুবে নদীটি দু'ভাগ হয়ে এক ধারা গেছে উত্তরে বানরিপাড়ার দিকে, আর দক্ষিণে সরু ধারাটি পার হয়ে আমরা যাব বরিশাল। ডাইনে

সুপারি-নারকেলের দেয়ালে ঘেরা অর্ধচন্দ্রাকৃতি দুটি ধানক্ষেত। সব ধান কাটা হয়নি, বোধহয় শুকিয়ে গেছে; কেমন একটা শুষ্ক নিষ্ফল চেহারা। বানরিপাড়ার বাঁকের কাছটিতে গাছপালাগুলি ঝুঁকে পড়ে নদীর আয়নায় মুখ দেখছে। তার উলটো দিকে নদীর ঠিক পাড়ের উপরেই একটা বড় সুপারি-বাগান। নদীর ধার দিয়েই রাস্তা, বোধহয় যাচ্ছে বন্দরের দিকে। বড় বড় নৌকা গুণ টেনে চলেছে সেই রাস্তা দিয়ে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলতে আরম্ভ করেছে। ডেক রৌদ্রে ভরা। সামনের নদীর জল গলানো সোনা, চোখ ঝলসে যায়।

বেলা পড়তে শুরু হল। নদীর পাড়ের রাস্তাটি দিয়ে লোক-চলাচল আরম্ভ হয়েছে। খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে অনেকগুলি ছেলে জুটে হাডু-ডু খেলছে। ছোট ছেলেদের এক দল, আর তার চেয়ে বড়দের এক দল। তাদের চেয়ে বড় চার-পাঁচটি ছেলে খেলছে না; নানা রঙের র‍্যাপাব গায়ে, দাঁড়িয়ে গল্প করছে ও খেলা দেখছে। এরা সম্ভব মাতব্বর বনে গেছে।

সুপারি-নারকেল বনের ওপারে সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিম-আকাশে আর নদীর জলে গোলাপি আভা। ক্রমে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছে। উত্তর-পারে খানচারেক বড় নৌকা এক সার বেঁধে নোঙর করল। দক্ষিণের রাস্তায় একজন একটা হ্যাসাক জ্বালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বন্দর থেকে বোধহয় গ্রামের দিকে। আমাদের স্টিমারের পিছনের ডেকে নমাজের আজান দিচ্ছে। চারদিক ক্রমে স্তব্ধ অন্ধকার হয়ে এল। কেবল মাঝে মাঝে নৌকার দাঁড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৪
শুক্রবার

কাল রাতে এক্সপ্রেস স্টিমার চলে গেলে রাত দশটায় আমাদের স্টিমার নোঙর তুলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু কয়েকশো গজ গিয়েই বানরিপাড়ার বাঁকের মুখটার অল্প দূরে আবার নোঙর করল। কুয়াশায় সার্চলাইট খেলছে না। সেখানেই সারারাত কাটল, সকালটাও কেটে যাচ্ছে। কারণ বরিশাল-খুলনা মেল স্টিমার পাস না করলে যাবার জো নেই। সে স্টিমার এখানে পৌঁছবার কথা সকাল ন'টায়, কিন্তু দশটা বেজে গেলেও তার দেখা নেই। খুলনা থেকে বরিশাল এক্সপ্রেস স্টিমার এখান দিয়ে রাত তিনটেয় যাওয়ার কথা, গেল বেলা প্রায় ন'টায়। কুয়াশার খেলা। 'আলোরে যে লোপ করে খায় সেই কুয়াশা সর্বনেশে।'

বাটলার, উপেন আর স্টিমারের কেরানিবাবু নৌকা করে কাউখালি স্টেশনের বাজারে গেল মাছ কিনতে। স্টিমার যেখানে নোঙর করে আছে তার কাছেই বাজার। সূর্যোদয়ের কিছু পর থেকেই বহু ছোট নৌকা বাজারের দিকে চলেছে পসরা নিয়ে। তরিতরকারির নৌকা, বোধহয় অল্প মাছের নৌকা, আর বেশির ভাগ নৌকার জিনিস হচ্ছে ধান ও খেজুরের রস। খেজুরের রস নৌকা করে স্টিমারে বিক্রি করতে এনেছে।

বাটলার ও উপেন মাছ কিনে ফিরল। একটা ছোট রুই মাছ ও একটা ইলিশ মাছ এনেছে। মাছ নাকি বাজারে বেশি নেই। কাউখালির স্টেশনমাস্টারবাবু কালই সে অভিযোগ করেছিলেন।

সাড়ে দশটা পর্যন্ত মেল স্টিমারের জন্য অপেক্ষা করে করে বেলা এগারোটায় আমাদের স্টিমার সরু খালটিতে ঢুকল। খালের নাম বারুণী কি বারণী তা নোয়াখালি জেলার সারেং ও চাটগাঁ জেলার তার অ্যাসিস্ট্যান্টের উচ্চারণে ঠিক বোঝা গেল না। যা হোক, ফ্ল্যাটসমেত স্টিমারের পক্ষে খাল যে বারণী তাতে সন্দেহ নেই। খালে ঢুকেই এতে চলাফেরায় এত বিধি-নিষেধের কারণ বোঝা গেল। খালটি এত সরু যে দু'-ফ্ল্যাট-সুদ্ধ আমাদের স্টিমার তার প্রায় সবটাই জুড়ে চলেছে। খালে ঢোকার অল্প পরেই খুলনা-যাত্রী মেল স্টিমারের সঙ্গে দেখা। আমাদের স্টিমার দাঁড় করিয়ে কোনও গতিকে তাকে পথ দেওয়া হল।

লোকালয়ের ভিতর দিয়ে খালটি বেঁকে বেঁকে চলেছে। বরিশালের সব জায়গার মতো দু'ধারে নারকেল খেজুর সুপারির বন। ঘরের চালে লাউ-এর লতা, আশেপাশে কলাগাছ। খাল থেকে সরু সরু সব নালা বেরিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেছে। তাদের উপর বাঁশের বাঁকানো উঁচু সাঁকো, ক্বচিৎ কাঠের পুল।

খাল যখন এসে বড় নদীতে পড়ল তখন বেলা প্রায় একটা। সেই বড় নদীর একরকম মুখেই ঝালকাটির স্টেশন ও বন্দর। এই ঝালকাটি স্বদেশির যুগে যে খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল তা সম্ভব মনে আছে। ফ্ল্যাট দু'খানি খুলে রেখে স্টেশনে লাগতে লাগতে প্রায় দুটো বাজল। এ স্টিমার বরিশাল পৌঁছতে রাত প্রায় ন'টা-দশটা হবে। বরিশাল থেকে এক্সপ্রেস স্টিমার ছেড়ে আসে সন্ধ্যা ছ'টায়। সুতরাং এবার আমার বরিশাল-দর্শন বরিশালের সৌভাগ্যে হল না। ঝালকাটিতেই নেমে পড়া গেল। বরিশাল থেকে খুলনা এক্সপ্রেস স্টিমার এখানে রাত আটটায় পৌঁছবে। ততক্ষণ ঝালকাটিতেই অপেক্ষা করব।

স্টিমারের লোকের ও স্টেশনের লোকের উপদেশে এখানকার ডাকবাংলায় এসে উঠেছি। সারেং ও স্টিমারের পাঁচ-ছ'জন খালাসি সঙ্গে এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। এখানকার স্টিমার-আপিসের লোকেরাও খোঁজ-খবর নিচ্ছে। এইমাত্র একজন মুসলমান কর্মচারী ডাকবাংলায় এসে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে কি না, এবং বলে গেলেন সময়মতো আমার জিনিসপত্র নিতে লোক পাঠিয়ে দেবেন, আমি যেন কোনও চিন্তা না করি।

ডাকবাংলাটি স্টিমার-ঘাট থেকে বেশি দূর নয়। দু'কামরা টিনের ঘর, বাঁশের সিলিং ও বেড়া। মেঝে সিমেন্ট করা। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে এই চিঠি লিখছি। সামনে রাস্তাব ওপারেই একটা বড় ধানক্ষেত। ধান পেকেছে, এখনও কাটা হয়নি। তারপর নদী। নৌকার চলমান পাল দেখা যাচ্ছে। ওপারের সুপারি-নারকেল-বনের নীচ দিয়ে চলন্ত বড় নৌকার ছই দেখতে পাচ্ছি। উত্তর দিকটায় নদীর জল অনেকটা দেখা যাচ্ছে— রৌদ্রে গলা ইস্পাতের মতো ঝকঝক করছে। তার এক পাশে স্টেশনের ফ্ল্যাটের কুশ্রী দেহটা।

ডাকবাংলার সামনের ছোট মাঠটায় দুটি খঞ্জন নেচে বেড়াচ্ছে। রোগা একটা বাছুর ঘাস খাচ্ছে। সামনে রাস্তার পাশে চারটে ঝাউগাছ। একটার গা ঘেঁষে এক খেজুরগাছ; হাঁড়ি বাঁধা রয়েছে। একটা কাক হাঁড়ির মুখে গলা ঢুকিয়ে রসাকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করছে। ডাকবাংলার উত্তর ঘেঁষে এক ঘোলা জলের ডোবা। তার ওপারে মিউনিসিপ্যাল আপিস, তার পর পুলিশের থানা। তারপরে বাজারের সব টিনের চাল দেখা যাচ্ছে। ছ'দিন জল-প্রবাসের পর ডাঙার জীবের ডাঙা মন্দ লাগছে না।

'মুলতানি' স্টিমার
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৫
সন্ধ্যা

এবারে কাল যখন স্টিমার ঝালকাটি পৌঁছল তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়েছে। দু'খানা ফ্ল্যাটের একখানাকে এখানেই খুলে রাখা হল; ওতে নাকি কাছাড়ের মাল আছে, অন্য স্টিমারে টেনে নিয়ে যাবে। আমাদের এ স্টিমার কলকাতা থেকে বরাবর কোথাও না-থেমে এসেছে; কেবল খুলনাতে আড়কাঠি তুলে নেবার জন্য নদীর মধ্যেই অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আমার বাটলারের এবং স্টিমারের লোকজনদের কাঁচা রসদের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং তা সংগ্রহের চেষ্টা ঝালকাটিতে স্টিমার লাগানো হল। এ অসময়ে তরিতরকারি কিছু পাওয়া গেল না। বাটলার মাছ ও মুগের ডাল কিনে আনল। পথে আমার খাদ্য সংগ্রহের জন্য স্টিমার-কোম্পানি কিছু-কিঞ্চিৎ অবশ্য বাটলারের হাতে দিয়েছিল। সেটাকে উপেক্ষা করে বাটলারের নামবার সময় সে জন্য তাকে কিছু দিয়ে দিয়েছিলুম। মনে হচ্ছে বুড়ো বাটলারের কর্মে উৎসাহ ও সেলামের বহর দু-ই বেড়েছে।

ফ্ল্যাট খোলার জন্য আমাদের স্টিমার যেখানে থেমেছিল সেখানে 'মরভি' নামে একখানা স্টিমার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। আমাদের সারেং ডাকাডাকি করে তথ্য সংগ্রহ করলে যে, সে স্টিমার চাঁদপুর হয়ে ঢাকা যাবে। আমাদের এ স্টিমারে গুটি-পনেরো-ষোলো যাত্রী আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন যাবে চাঁদপুর। মরভি স্টিমারের সারেঙের সঙ্গে কথা বলে চাঁদপুর-যাত্রীদের ওই স্টিমারে তুলে দেওয়া হল। বন্দোবস্তটি সম্ভব ঘরোয়া; স্টিমার-কোম্পানির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।

এবারেও এখন রোজা চলছে। এই যাত্রীরা দিনের উপবাসের পর সন্ধ্যায় নমাজের শেষে কোনওদিন চিঁড়েভাজা, কোনওদিন ছোলাভাজা দিয়ে রোজা ভাঙে। রাত একটু হতে-না-হতেই খাওয়া শেষ করে— ভাত, ডাল, একটা কিছু ভাজা কি তরকারি। সকলে সার দিয়ে বসে যায়, একজন পরিবেশন করে। রাত একটু গভীর হলেই সমবেত কণ্ঠে ধর্মসংগীত গাওয়া হয়। গানের মধ্যে 'আল্লা রসুল' এই কথাটা মাত্র ধরতে পেরেছি। কাল আর গান হল না; বোধহয় মূল গায়েন চাঁদপুরের যাত্রী ছিল।

স্টিমার বরিশাল পৌঁছেছিল রাত প্রায় বারোটায়, আজ ভোরে সারেঙের মুখে শুনলুম। সেখানে স্টিমার বাঁধেনি। সারেং নবাব আলির বাড়ি চট্টগ্রাম, খাস শহর চট্টগ্রামে। এ কথা নবাব আলি একটু গর্বের সঙ্গে প্রথম দিনই আমাকে জানিয়েছিল। স্টিমারে আর যারা সব চট্টগ্রামের লোক আছে তাদের কারও বাড়ি শহরে নয়; শহর থেকে অন্তত বিশ-পঁচিশ মাইল

দুর দূর। নবাব আলি লোকটির বয়স বছর-পঞ্চাশ হবে। বেশ গোলগাল চেহারা। খাবার হজম হয়, এবং অধিকাংশ খাদ্যকে চর্বিতে পরিণত করার রাসায়নিক ব্যবস্থা শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

বরিশাল ছাড়িয়ে কিছু পরেই কুয়াশার জন্যে স্টিমার নোঙর করে রাখতে হয়েছিল। সকালেও এমন ঘন কুয়াশা ছিল যে, বেলা প্রায় আটটার আগে স্টিমার রওনা হতে পারেনি।

দুপুরের আগে থেকেই নদী প্রশস্ত হতে আরম্ভ করেছে। দুপুর যখন গড়িয়ে গেল তখন নদী বেশ চওড়া, আকাশের অনেকখানির ছায়া জলের মধ্যে পড়েছে। খুলনা-বরিশালের মানুষের ঘর-গৃহস্থালির সঙ্গে মিশে-থাকা ছোট সব নদী ছাড়িয়ে এসেছি; এ নদীতে উদার পদ্মার মুক্তির ডাক এসে পৌঁছেছে। এক পাড় উঁচু, ভাঙন-ধরা। মাঝে মাঝে ছোট-বড় চর। সেখানে কলাগাছ-ঘেরা মানুষের বসতি। যেতে যেতে ডাইনে বাঁয়ে এঁকেবেঁকে সব নদী বেরিয়ে চলেছে; নৌকার পালে অনেক দূর পর্যন্ত তাদের গতিপথ বোঝা যাচ্ছে। নদীতে ভারী হালকা বহুরকমের নৌকা। এক-একখানা ছোট নৌকার গড়নে ছবির রেখার সুষমা। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড সব ফ্ল্যাট টেনে স্টিমার চলেছে । কচিৎ একখানা প্যাসেঞ্জার স্টিমার।

বেলা তিনটেয় স্টিমার মাদারিপুর ছাড়াল। নদী থেকে দেখা গেল, ঢেউ-তোলা টিনের ঘর ও অল্প গুটিকয়েক পাকা বাড়ির সমষ্টি।

বরিশাল এক-ফসলের দেশ। ধান কাটা শেষ হয়েছে, কাজেই নদীর পাড়ের মাঠ সব ফাঁকা, কেবল সুপারি-নারকেলের শ্যামলতায় প্রসন্ন। মাদারিপুরের পর থেকে নদীব পাড বিচিত্র। একটু পরে পরেই হলদে সবুজ সরষেক্ষেতের সার চলেছে। মাঝে মাঝে অল্প আখের চাষ। আর তিসির ক্ষেতের চিকন ঘন সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। কাছে দূরে সব গ্রাম, আম জাম ও বাঁশের কুঞ্জে ঢাকা।

বিকেল বেলা স্টিমারের কেরানি এলেন আমার টিকিটের পরিচয় তাঁর খাতায় টুকে নিতে। বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক, কৃষ্ণলেশহীন শুভ্র শ্মশ্রু; রোমান সেনেটারের চেহারা। তেত্রিশ বছর স্টিমার-কোম্পানির কেরানিগিরি করছেন। বাড়ি সিরাজগঞ্জ। ভদ্রলোকটির একটু আইনের পরামর্শ দরকার। বাড়ির কাছে একখানি জমি কিনেছেন। এখন প্রকাশ হচ্ছে যে, সাধু বিক্রেতাটি ও-জমি ও অন্য জমি পূর্বেই একজনের কাছে রেহান দিয়েছিল, আর সে কথা ফাঁস না করে ভদ্রলোককে ও অন্যান্য লোককে সেই রেহানি জমিগুলি বিক্রি করেছে। এখন রেহানদার রেহানি দলিলটি ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করতে রাজি আছে, তাঁর কেনা উচিত কি না এবং কিনলে কীরকম নালিশ রুজু করতে হবে। ব্যাপারটি কিছুই অসাধারণ নয়; এ রকম হামেশা ঘটছে। ভদ্রলোককে তাঁর করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া গেল।

আটটা বেজে গেছে, আমার খাবার তৈরি। এ রাত্রে স্টিমার যখন পদ্মায় পড়বে তখন সম্ভব ঘুমিয়ে থাকব। আর যদি জাগি-ও, অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না। আজ অমাবস্যা।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫

খুব ভোরে কেবিন থেকে বেরিয়েই পদ্মার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আকাশ নীলাভ ধূসর, পুবে অল্প লাল রং; ভোরের অস্পষ্ট আলোতে তার সমস্তটার ছায়া পদ্মার জলের উপর রহস্যের যবনিকার মতো কাঁপছে। স্টিমার ডান পাড় ঘেঁষে চলেছে; বাঁয়ে চক্রাকারে শীতের পদ্মার প্রশান্ত বিস্তার, বহুদূরের তরুশ্রেণির আবছায়া কালো রেখায় সীমানা টানা। কুয়াশা প্রায় নেই। নৌকার চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সামনে কিছু দূরে একখানা নোঙর-করা স্টিমার দেখা যাচ্ছে।

সূর্যোদয়ের পর থেকেই কিছু কিছু কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে। বেলা সাতটার পর সাদা কুয়াশা এতটা ঘন হয়ে এল যে, বাঁ পাড়ে একটা জায়গায় স্টিমার বাঁধতে হল। উঁচু পাড়। সামনেই একটা ছোট বসতি। খান সাত-আটেক খড়ের ঘর; দু'খানা টিনের। কয়েকটা খড়ের গাদা। গোটা-দশেক গোরু গোল হয়ে খুব নিবিষ্টমনে জাব খাচ্ছে। নদী আর বসতির মাঝের জমিটুকুতে দুটি কলাঝোপ, ছোট একখানি সরষেখেত আর অল্প গোটা-কয়েক তামাকের চারা। কয়েকজন ছেলেমেয়ে ও দু'-তিনটি বয়স্ক লোক স্টিমার দেখতে দাঁড়িয়ে গেল, যদিও স্টিমারের যাতায়াত এখানকার নিত্য বহুবারের ঘটনা।

স্টিমারের পাশ দিয়ে ক্রমাগত জেলে-নৌকা চলেছে। স্টিমারের লোকেরা মাছ কেনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। 'হালদার', 'মশায়' প্রভৃতি অনেক সম্মানের সম্বোধনে জেলেদের ডাকা হল; কিন্তু কারও নৌকাতেই নেই, তারা সবে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। হালের কাছে এক-একজন জেলের আত্মসমাহিত গম্ভীর মুখ দেখে, শেকসপিয়রের কোন একটা সংস্করণে 'কোরিয়লেনাস'-এর এক ছবি দেখেছিলাম, তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

বেলা আন্দাজ ন'টায় কুয়াশা কেটে গেলে স্টিমার চলতে শুরু করল। দু'পাশে দূরে কাছে অসংখ্য নৌকা চলেছে— জেলে-ডিঙি, যাত্রীর নৌকা, বোঝাই কিস্তি। দু'-তিনখানা নামজানা যাত্রী-স্টিমার বেগে বিপরীত দিকে চলে গেল।

মাঝে মাঝেই লম্বা নিচু কাঁচি চর জলের ওপর ভেসে উঠেছে। কতক বালু ভেজা, ধূসর, কতক সাদা ধবধবে— ভোরের রৌদ্রে চিকচিক করছে। অল্প পরেই গোয়ালন্দের স্টিমার-ঘাট দেখা গেল। স্টিমারের সার তিন-চার থাকে ঘাটে লেগে আছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ধোঁয়া উঠছে। বড় বড় ফ্ল্যাট মাঝ-নদীতে ছেড়ে দেওয়া। এক পাশে নৌকার সার। পাড়ের উপর গোয়ালন্দ-চরের বাজারের হালকা ছাউনি ও ততোধিক হালকা বেড়ার দোকানঘর; আর সেই রকমেরই রেলের টিকিট আপিস ও পোস্ট-টেলিগ্রাফ আপিস— বাবুদের কোয়ার্টার্স-সমেত।

নেয়ে-খেয়ে স্টিমার থেকে নামার সময় বাটলার মৌলা বক্স অনুনয় জানালে যে, মাছ-তরকারি কেনার পয়সা যে আমি দিয়েছি এটা যেন স্টিমার কোম্পানির কর্তৃপক্ষ না জানে। তাকে অভয় দিলুম।

'দোয়ারি' স্টিমার
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬
শুক্রবার

ঢাকা মেল ভোর পাঁচটায় গোয়ালন্দ পৌঁছল অর্থাৎ তখনও ভোর হয়নি, বেশ অন্ধকার। নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের যাত্রীদের হাঁকডাক আরম্ভ হল, কিন্তু আমার তাড়া নেই। যদিও স্টিমার-কোম্পানির জগন্নাথ ঘাটের সাহেব জানিয়েছিল, তাদের যে স্টিমার ১৯শে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে সুন্দরবন ঘুরে তার ২৩শে গোয়ালন্দ পৌঁছবার কথা, কিন্তু আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতুম, ২৪শে পর্যন্ত যে স্টিমার পৌঁছলেই মঙ্গল। সুতরাং পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করছি, এমন সময় তোমার চাকর অনন্ত নিজেকে রাস্তাঘাটে চটপটে প্রমাণ করার জন্য, আমি নেমে না-ডাকতেই বিছানা বাঁধতে হাজির। তার এই অভূতপূর্ব কর্মপ্রবণতায় বাধা না দিয়ে উঠে পড়া গেল। বেশ ফরসা হলে গাড়ি থেকে নামব এবং নেমে দিনটা এবং সম্ভব রাত ও তার পরদিন দুপুর পর্যন্ত কোথায় কাটাব ভাবছি, এমন সময় দুটি টিকিট-চেকার ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন, একটি হিন্দু অন্যটি মুসলমান। টিকিট দেখানো গেল, কিন্তু তখনই বুঝলুম টিকিট দেখা একটা অছিলা মাত্র। মুসলমান ভদ্রলোকটি একটি খাজনার মোকদ্দমা প্রথম আদালতে হেরেছিলেন কিন্তু আপীলে জিতেছেন; প্রতিপক্ষ হাইকোর্ট করেছে। মোকদ্দমার হাইকোর্টে ফলাফল সম্বন্ধে আমার মতটা জানলে বাধিত হবেন। অবশ্য অনন্তের কাছে আমার ব্যবসায়ের পরিচয়টা সংগ্রহ হয়েছে। শুকনো ডাঙায় মাছ ও আরও একটা জিনিসের লোভ সামলানো কঠিন— কবিকঙ্কণ বলেছেন; উকিল দেখলে মোকদ্দমার পরামর্শ লিস্টে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

এঁদের কাছে জানলুম, গোয়ালন্দে দিন-রাত কাটাবার ও স্নানাহারের প্রশস্ত জায়গা হচ্ছে চাঁদপুর মেল স্টিমার। চাঁদপুরগামী স্টিমারখানি ঘাটে লেগেই আছে, বেলা একটার আগে ছাড়বে না। এবং সেখানি রওনা হবার অল্প সময়-মধ্যেই কলকাতাগামী চাটগাঁ মেলের যাত্রী নিয়ে চাঁদপুর থেকে স্টিমার পৌঁছবে এবং পরদিন বেলা একটায় ছাড়বে। নিশ্চিন্ত হয়ে বেলা সাতটা আন্দাজ চাঁদপুর মেল স্টিমারে গিয়ে ওঠা গেল। যে ফ্ল্যাট দিয়ে ওঠার পথ সেখানেই ঘাট-সুপারভাইজারবাবুর আপিস। তাঁর কাছে যেতেই তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা দেখালেন এবং জানালেন, আমার আগমনবার্তা পূর্বেই হেড-আপিস থেকে পেয়েছেন। আমার স্টিমার 'দোয়ারি' এখনও পৌঁছয়নি। পৌঁছনোমাত্র আমাকে খবর দেবেন।

চাঁদপুর মেল স্টিমারগুলি, যা ঢাকা মেল স্টিমারও বটে, বেশ আরামের। এ স্টিমারখানির নাম 'গুর্‌খা'। দুপুরের খাবার অর্ডার দিয়ে স্টিমার থেকে নেমে পড়া গেল। অভিপ্রায়, মেঠো

রাস্তা দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণ ও কিঞ্চিৎ কবিত্ব করা। একটা রাস্তা ধরে অনেকটা দূর যাওয়া গেল, কিন্তু রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে দু'-এক জায়গায় সরষে ফুল ফুটলেও চার দিকে কেমন একটা অগ্রাম্য নীরস ভাব। গোয়ালন্দের নদীর ধারের যাত্রী ও মাল-চলাচলের ক্ষিপ্র জীবন ও তার আনুষঙ্গিক দরমার-বেড়া-দেওয়া টিনের চালের বাজার তার পিছনের গ্রাম্য প্রকৃতির রস শুষে নিয়েছে। বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে বাজারে ঢোকা গেল। অগ্রাম্য গ্রামের চেয়ে বাজারের জীবনচাঞ্চল্য অনেক ভাল। মনে হল একটি নাপিত পেলে নিজের হাতে কামানোর দায় থেকে একটা দিন রেহাই পাওয়া যেত। লুঙ্গিপরা চেকদার কোট গায়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম এখানে নাপিত পাওয়া যায় কি না। লোকটি বোধহয় গোয়ালন্দের অধিবাসী; তার 'পেট্রিয়টিজমে' আঘাত লাগল। বিজ্ঞ তাচ্ছিল্যের ভাবে জানালে, গোয়ালন্দ শহরে আবার নাপিতের ভাবনা। একটা দিক দেখিয়ে বললে, সেদিকে অনেক নাপিত দেখতে পাব। গিয়ে দেখি দু'জন নাপিত রয়েছে; একজন নিজ ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত, অন্যটি যন্ত্রপাতি শানাচ্ছে। বেকার নাপিতটিকে স্টিমারে এনে ক্ষৌরি হওয়া গেল। লোকটির বাড়ি মুঙ্গের জেলায়, বাইশ বছর গোয়ালন্দে নাপিতি করছে। নাপিত-ভাবনাহীন গোয়ালন্দ শহরে কোনও বাঙালি নাপিত চোখে পড়েনি।

নেয়ে-খেয়ে গুর্‌খা স্টিমারে বসে বসে গোয়ালন্দের শীতের পদ্মা দেখছি। সামনে একটা প্রকাণ্ড চর পড়েছে। ওপারের জল দেখা যাচ্ছে না, দূর-গাছের কালো রেখায় তার প্রসারটা অনুমান করছি। দুপুরবেলা স্টিমার-নৌকার চলাচল অনেকটা কম। ক্রমে গুর্‌খার ছাড়বার সময় হল; কলকাতা থেকে চাটগাঁ মেল এসে পৌঁছেছে। স্টিমার থেকে নেমে সুপারভাইজারবাবুর ফ্ল্যাটে মালপত্র রেখে, উপরে এক টুকরো ঘাসের জমি ছিল সেখানে আস্তানা করা গেল। চাঁদপুর থেকে স্টিমার পৌঁছল বেশ একটু দেরি করে। খুব ভিড়। সাদা সাহেব ও পোশাকি কালো সাহেবদের সংখ্যাও কম নয়। লোকজন নেমে গেলে ধীরে সুস্থে সে স্টিমারে ওঠা গেল। নাম 'এমু', অর্থ যা-ই হোক। কেবিনে মালপত্র রেখে সেখানেই রাত কাটাব স্টিমারের লোকজনদের জানাচ্ছি, এর মধ্যে সুপারভাইজারবাবুর লোক এসে খবর দিল, আমার স্টিমার 'দোয়ারি' এসে ঘাটে লেগেছে এবং আমাকে নেবার জন্য তারা এখনই স্টিম-লঞ্চ আনছেন। একটু পরেই 'হাতি' নামধেয় লঞ্চ 'এমু'র পাশে এসে লাগল। এ লঞ্চখানিকে ইতিমধ্যে বহুবার উজান-ভাটি করতে দেখেছি। হাতি-আরোহণ যে আমার ভাগ্যেও ছিল তা তখন মনে করিনি। দু'-চার মিনিটের মধ্যেই হাতি আমাকে দোয়ারিতে পৌঁছে দিলে। দূর অতি সামান্য, এর জন্য স্টিম-লঞ্চ আনবার কোনও দরকার ছিল না। স্টিমার-কোম্পানির অতিরিক্ত সৌজন্যে তাদের শুভকামনা না করে পারছি না। তাদের ব্যাবসা বর্ধিত হোক। যত কমে হয় তারা যেন এদেশি লোকদের খাটিয়ে নিতে পারে। এখানে ওখানে ছোটখাটো দেশি স্টিমার-কোম্পানি গড়ে উঠে তাদের মুনাফার অঙ্কে যেন ঘাটতি না ঘটায়।

২

'দোয়ারি' বেশ বড় স্টিমার। উঠে সামনের ডেকে আসতেই জানা গেল, আমার এ বাহনটি বড় কেউকেটা নয়। সেলুনের সামনে এক পিতলের ছোট প্লেট আঁটা, তাতে খোদা রয়েছে যে, যুদ্ধের সময়, ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল, এ স্টিমার নিজের স্টিমে ('under her own steam') ৩৪২৬ মাইল চলে বসরা পৌঁছে টাইগ্রিস নদীতে 'rendered invaluable transport service'— সৈন্য ও মাল টানার অমূল্য কাজে নিজেকে লাগিয়েছিল; এবং যুদ্ধশেষে নিজ বাষ্পবলেই আবার কলকাতায় ফিরে আসে। সুতরাং যে সেলুনে বসে আমি খাচ্ছি ও লেখাপড়া করছি, সার্জেন্ট-মেজর ও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট প্রমুখ বীরেরা ছোট বড় 'পেগ' পার করে নিশ্চয়ই তাকে ধন্য করেছেন, এবং তাদের কেউ কেউ কুট-আল-আমারায় তুর্কিদের হাতে ধরাও বোধহয় পড়েছিলেন। স্টিমারটির উপর সম্ভ্রম জন্মাল।

বাটলার সাদের আলির বয়স কম, হাসিমুখ ও চটপটে। লোকটিকে দেখে খুশি হলুম। বাড়ি বিক্রমপুর। অসমে চা-কর সাহেবদের বাটলারি অনেকদিন করেছে। বছরখানেক নানা সাংসারিক গোলযোগে বাড়ি বসেছিল। স্টিমার-কোম্পানির বাবুরা গোয়ালন্দ থেকে তাকে আমার জন্য জুটিয়েছেন, কারণ সে নাকি দেশি ও ইংলিশ খানা দুই-ই রাঁধতে ওস্তাদ। পরীক্ষায় দেখছি সার্টিফিকেটটা ভুয়ো নয়। লোকটা রাঁধে ভাল। কোম্পানির এক বাবু এসে আমার তদবির করে গেলেন এবং যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে স্টিমারের লোকদের সতর্ক করলেন।

চারটে-আন্দাজ বেলায় দোয়ারিতে উঠেই শুনলুম, স্টিমার এখনই ছাড়বে। ছাড়তে ছাড়তে হল সন্ধ্যা সাতটা। দু'খানা ফ্ল্যাট দু'দিকে বেঁধে রওনা হওয়া গেল। আশা ছিল ভূত-পূর্ব তারিণীগঞ্জ স্টেশনের ঝাউগাছের সার ও তেওতা ইস্কুলের নদীর ধারের বোর্ডিং দেখতে পাব। কিন্তু রওনা হওয়ার আগেই রাত্রি এসে গেল, চোখে আর কিছু পড়ল না।

৩

ভোরবেলা উঠে খবর নিয়ে জানলুম, আমাদের টাঙ্গাইল যাওয়ার স্টিমার-স্টেশন পোড়াবাড়ি ছাড়িয়ে এসেছি এবং সিরাজগঞ্জের দিকে চলেছি। আমাদের এ স্টিমার ফুলছড়ি ঘাটের আগে কোথাও ভিড়বে না, কারণ তার পূর্বের কোনও জায়গার মাল এতে নেই এবং এটা প্যাসেঞ্জার স্টিমার নয়। বেলা এগারোটায় সিরাজগঞ্জ ছাড়ালুম। শহর থেকে অনেক দূরে এক চরের নীচে স্টেশনের ফ্ল্যাট; চরের উপর কয়েকখানা মালগাড়ি রেল-স্টিমারের সংগমস্থল ঘোষণা করছে। বিকাল তিনটের পর স্টিমার জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে একটু থামল, কোনও মাল দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে নয়, বোধহয় নিজেকে রিপোর্ট করতে।

স্টিমারে একলা চলেছি; এ পর্যন্ত স্টিমারের বা দুই ফ্ল্যাটের বাবুদের কেউ আলাপ-পরিচয় করতে আসেননি। কিন্তু একটু পরেই জানলুম তাঁদের মধ্যে গুণী লোকের

অভাব নেই। সন্ধ্যার একটু আগে অনন্তের হাত দিয়ে আমাকে একটুকরো কাগজ পাঠিয়ে একটি ভদ্রলোক একটু সরে দাঁড়ালেন। কাগজখানি দেখলুম একটি বিজ্ঞাপন, লাল কালিতে ইংরেজি হরফে ছাপা। 'Very nice! Very nice!! Horbolla Sound'— 'অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!! হরবোলার বোল'। এবং তারপর বিড়াল, মুরগি, দাঁড়কাক, দুই বিড়ালের ঝগড়া, শেয়াল-কুকুরের কলহ প্রভৃতি দ্বাদশ দফার উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'that's all'— 'এই শেষ'। নীচে নাম 'হেমেন্দ্রমোহন রায়, Sounder— শব্দোৎপাদক'। গ্রাম ও পোস্ট আপিস বিঝারি, জেলা ফরিদপুর।

এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে পরিচয় দিলুম। গোলগাল কালো চেহারা, মুখে পাকা-কাঁচা দাড়িগোঁফের খোঁচা, মাথায় একটি নাতিকৃশ টিকি, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। স্টিমারের ডাইনে যে ফ্ল্যাটখানি বাঁধা আছে তার কেরানি; ছাব্বিশ বছর স্টিমার-কোম্পানির কাজ করছেন। ঠিক হল আগামীকাল সকালে, খ্রিস্টমাসের দিনে, হরবোলার বৈঠক বসবে।

রাত দুটোয় ফুলছড়ি ঘাটে স্টিমার পৌঁছল এবং মালপত্র নামিয়ে উঠিয়ে ছাড়ল ভোর-রাত সাড়ে চারটেয়। লাগবার ডাকাডাকি ও ছাড়বার হাঁকাহাঁকিতে আমারও ঘুম ভেঙেছিল।

বৃহস্পতিবার সমস্ত দিন এসেছি শীতের যমুনার পরিচিত রূপ দেখতে দেখতে। ভাঙন-ধরা উঁচু পাড়, কলাগাছ আমগাছে ঘেরা খোড়ো চালের বসতি; সাদা বালুর নিচু চর রৌদ্রে ঝিক ঝিক করছে; সাদা পাল তুলে, ক্বচিৎ রঙিন পালের, নৌকা চলেছে; মাঝে মাঝে জেলে-ডিঙি। গোয়ালন্দের দিকে ছোট বড় স্টিমার যাচ্ছে, স-ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটহীন। ব্রহ্মপুত্রের এ অংশকে আমাদের দেশে বলে যমুনা। একসময় এখান দিয়ে যমুনা নামে ছোট এক নদী ছিল, ব্রহ্মপুত্র চলত ভিন্ন ধারায় ময়মনসিংহ শহরের নীচ দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালে কি-এক নৈসর্গিক বিপ্লবে ব্রহ্মপুত্রের মূলধারা নিজের পথ ছেড়ে এই যমুনার খাদ দিয়ে বহতা হল। ব্রহ্মপুত্রের পুরনো খাদ আজ হীনস্রোত। লাঙলবন্দের অষ্টমীস্নান তার পূর্ব-গৌরবের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

৪

আজ সকাল ন'টায় সেকেন্ড ক্লাস কেবিনের পিছনে হাওয়া থেকে একটু আড়ালের জায়গায় হরবোলার মজলিস বসল। স্টিমারের বাবু ও খালাসিদের অনেকে এবং ডেকযাত্রীদের প্রায় সকলেই উপস্থিত হল। কেবল এলেন না হেমেন্দ্রবাবুর সহকর্মী তাঁর ফ্ল্যাটের বাবুরা কেউ। ঈর্ষা এমনি জিনিস! গায়ের র‍্যাপারে মাথা-মুখ ঢেকে দু'-একটা বাদে বিজ্ঞাপনের লিস্ট-মাফিক সব ডাক হেমেন্দ্রবাবু আমাদের শোনালেন। প্রতি ডাকের প্রস্তাবনা করলেন ইংরেজি শব্দে বা ছোট ইংরেজি বাক্যে এবং কেন জানি না, তার ব্যাখ্যা দিলেন হিন্দিতে, যদিও তার শ্রোতাদের সকলেই ছিল বাঙালি। বোধহয় হেমেন্দ্রবাবু দূরদর্শী লোক, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রভাষায় এখন থেকেই নিজেকে অভ্যস্ত করছেন। মজলিস ভাঙলে তাঁকে

কেবিনে ডেকে এনে কিছু দক্ষিণা দিলুম; বললেন, টাকার জন্য কিছু নয়, শুনিয়েই তাঁর আনন্দ। একেবারে খাঁটি গুণীর কথা। বাড়ির পরিচয় নিয়ে জানলুম, তাঁরা পাঁচ ভাই, চারজন নানা জায়গায় চাকরি করেন, একজন বাড়িতে থাকেন। চারটি মেয়ে, দুটি ছেলে। বড় ছেলেটির বয়স চোদ্দো, ইস্কুলে পড়ে। একটি মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি। বাপ অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, কীসব মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বললেন, সবই অদৃষ্ট। আমার কলকাতার ঠিকানাটা নিলেন। জানালেন, যদি কলকাতায় যান (তাঁর এক ভাই সেখানে চাকরি করে) তবে আমার বাড়ির ছেলেমেয়েদের একবার হরবোলার বোল শুনিয়ে আসবেন। বোধহয় সন্দেহ হয়েছে, আমি হরবোলার ডাকের তেমন রসজ্ঞ শ্রোতা নই।

ফুলছড়ি ঘাটের পর থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত আমাদের স্টিমার প্রতি স্টেশনে থেমে থেমে যাবে। কারণ, এই জায়গাটা চলাচলের রাজ্যে নন-রেগুলেটেড প্রভিন্স। কোনও রেল নেই এবং স্টিমার-সার্ভিস যা আছে তা আমাদের সময়কার 'সবুজপত্রে'র চেয়েও তারিখের শাসন কম মানে। অসম-সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিসের অনিয়মগামী স্টিমারগুলিই (যা স্টিমার-কোম্পানির টাইম-টেবলের ভাষায় 'are not run to a timing'— কোনও নির্দিষ্ট সময় মাফিক চলে না) এখানকার দূর-গমনের একমাত্র বাহন। সেইজন্য এ স্টিমারগুলি উজান-ভাটিতে এ জায়গাটায় প্রতি স্টেশনে প্রায় থামে, মালও নেয়, লোকও নেয়। এবং কাপড়ের গাঁট, কেরোসিন তেলের টিন, রঙের ড্রাম, হালকা জাপানি মালের কাঠের বাক্স (দেখলুম একটা প্রকাণ্ড বাক্স একজন মুটেই স্টিমার থেকে নামাচ্ছে), লোহার শিক, তার, কড়াই, গ্যালভানাইজড্ বালতি প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণ ব্রহ্মপুত্রের দুই কূলে ছড়িয়ে চলে।

বেলা একটায় চিলমারি এলুম। চিলমারির কাঁসা-পিতলের বাসন, বিশেষ এখানকার অতি সুডৌল গাড়ু, একসময় বিখ্যাত ছিল। এখন কিছু নেই। চিলমারির বন্দরে এখন যে কারবার চলে সে শুধু পাট ও অন্য কৃষিবস্তু চালান দেবার। দেশ হয়তো industrialized হচ্ছে, কিন্তু বাংলার গ্রামগুলিকে আমরা খুব দ্রুতগতিতে বিশুদ্ধ Agriculturize করছি। সঙ্গে যে দুই ফ্ল্যাট এসেছিল তার একখানিকে এখানে রেখে যাওয়া হল; ওতে পাট বোঝাই হয়ে চালান যাবে। চিলমারি থেকে গারো পাহাড়ের সার আকাশের সীমান্তে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে।

চিলমারি থেকে অল্প দূরে ব্রহ্মপুত্রের অন্য পারে রৌমারি স্টেশন। সেখানে পৌঁছতে হল ফ্ল্যাটখানি খুলে রেখে দুই চরের মাঝ দিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ধারায় অনেক দূর উজিয়ে গিয়ে। এখানে-ওখানে তার মধ্যে বহু নিচু কাঁচি চর। নদীর কালো জল ও চরের শুভ্র বালু পাশাপাশি অপরাহ্নের রৌদ্রে অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করেছে। একটু দূরে একটা চর প্রায় ঢেকে চখাচখির ঝাঁক বসেছে। তাদের ধূসর চঞ্চল পাখায় চরটি যেন কাঁপছে, মনে হয় পদ্মের পাতায় ঢাকা পদ্মবন। একদিকের উঁচু কায়েম চরে একটা তাঁবু পড়েছে, অনেক লোক আনাগোনা করছে; নীচে একখানা বড় নৌকা বাঁধা। হাকিমের সফর না জমিদারবাবুর শিকার ঠিক বোঝা গেল না।

রাত প্রায় এগারোটায় স্টিমার যাত্রাপুর পৌঁছল। যাত্রাপুর রংপুর জেলায় এবং বাংলাদেশের শেষ স্টিমার-স্টেশন। এরপর থেকে অসমের গোয়ালপাড়া জেলার এলাকা।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৬
রবিবার

শনিবার ভোর সাতটায় ধুবড়ি আসা গেল। ধুবড়ি গোয়ালপাড়া জেলার হেড কোয়ার্টার্স এবং স্টিমার-লাইনের একটা অংশের হেড-আপিস। নদীর ধারে ধারে ছোটখাটো সুন্দর শহরটি। বছর-কয়েক পূর্বে এক মোকদ্দমায় ধুবড়ি এসে অনেকদিন ছিলুম, বোধহয় মনে আছে। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের উপরে যে রাস্তা দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াতে যেতুম সে রাস্তার ধারে ফরেস্ট-আপিসের দোতলা টিনের বাংলো, এস ডি ও-র (যিনি এখানকার combined hand— একাধারে ম্যাজিস্ট্রেট, সাবজজ, রেভিনিউ অফিসার) বাংলো, নদীর খাড়া পাড়ের উপর তিন দিক জলে ঘেরা, বেশ কবিত্বপূর্ণ কিন্তু একটু আশঙ্কাজনক অবস্থিতির উকিল-লাইব্রেরি, ধুবড়ি ছাড়ার পথে স্টিমার থেকে সব দেখতে দেখতে গেলুম। ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের লাগাও নদীর ধারেব যে বাংলোটিতে ছিলুম সেটি কিন্তু চোখে পড়ল না।

ধুবড়িতে স্টিমার প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড়াল। স্টিমার থেকে লোকজন নেমে গেল বাজার করতে। আমার বাটলার একটা বড় কাতলা মাছ কিনে নিয়ে এল। অতি সুস্বাদু টাটকা মাছ। ধুবড়ি থেকে আমাদের স্টিমার চলল ফ্ল্যাট-বিনির্মুক্ত হয়ে। বাকি ফ্ল্যাটখানি হেমেন্দ্রবাবুকে নিয়ে এখানেই রয়ে গেল এবং সম্ভব দু'-একদিন থাকবে। আশা করি ধুবড়ি শহরে গুণজ্ঞ লোকের অভাব নেই।

ধুবড়ি ছাড়ার পর থেকেই নদীর দুই ধারে পাহাড়ের সার দেখতে দেখতে এসেছি। ব্রহ্মপুত্রের মতো প্রকাণ্ড নদীর মাঝ থেকে দুই তীরে এমন পাহাড়ের দৃশ্য পৃথিবীতে নাকি খুব কম দেখা যায়। গাছে-গুল্মে ঢাকা কৃষ্ণাভ সবুজ সব পাহাড়। নন-কো-অপারেশনের সময় মহাত্মা যখন অসমে এসেছিলেন তখন এক অভিনন্দনের উত্তরে অসমবাসীদের বলেছিলেন, 'Your bewitchingly beautiful country'— জাদুকরী সৌন্দর্যের দেশ তোমাদের। ব্রহ্মপুত্র ও তার দুই কূলে নীল পাহাড়ের এই সার দেখলে এ বর্ণনার যাথার্থ্য বোঝা যায়।

বিকাল তিনটেয় স্টিমার বিলাসীপাড়া এল। শীতের ব্রহ্মপুত্র নিস্তরঙ্গ, মনে হয় যেন স্থির। কেবল পূর্ব-বাংলার ধানখেতের দিকে দ্রুতধাবমান কচুরিপানার ছোট বড় ঝাড় তার অন্তরের গতিবেগ জানান দিচ্ছে। এই জলের উপর রৌদ্রের খেলা ও স্টিমারের সামনের ডেকের ছাদে তার আলোছায়ার কাঁপন-লীলা সারা দুপুর দেখতে দেখতে এসেছি। বিলাসীপাড়ার স্টেশন-ফ্ল্যাটের ঠিক পিছনেই এক সার পাহাড় এবং বিলাসীপাড়ার পর অনেক পাহাড় নদীর বেশ কাছাকাছি। একটা তিন-চূড়াওয়ালা পাহাড়ের দিকে আমাদের স্টিমার এগিয়ে চলেছে। নদীর জলে তার অকম্পিত ছায়া বহুক্ষণ ধরে দেখছি, যেন কোনও মন্দিরের ছায়া।

স্টিমারের পিছনে সূর্যাস্ত হল। পশ্চিম-আকাশের সোনার রং নদীর এদিকের জল রাঙিয়ে রাখল অনেকক্ষণ।

রাত আটটায় স্টিমার গোয়ালপাড়া পৌঁছল।

২

আজ রবিবার সকাল থেকেই আকাশে মেঘ, নদীর উপর কুয়াশা এবং প্রচণ্ড শীত। সমস্ত দিন সূর্যের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কেবল দুপুরবেলার কাছাকাছি দু'-চার মিনিটের জন্য এক ঝলক রোদ, আর বিকালে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম-আকাশের কালো মেঘে গলানো সোনার একটা চওড়া রেখা।

নদী ও তার পাড়ের দৃশ্যও বদলে গেছে। পাহাড় বড় চোখে পড়ছে না। নদীতে নৌকা বিরল এবং দক্ষিণের যে উঁচু পাড়ের কাছ ঘেঁষে প্রায় সারাদিন স্টিমার চলেছে তাতে লোকালয় খুব কম। কেমন একরকম শুকনো চেহারার লম্বা ঘাস সে পাড়ের উপর। আকাশের ধূসর মেঘে ঢেউশূন্য ঘোলাটে নদী। মনটা দমে গেল। সারা দুপুর একটামাত্র জানলা খোলা রেখে কেবিনে শুয়ে শুয়ে জে বি প্রিস্টলির একটা উপন্যাস পড়ছি। ইয়র্কশায়ারের নিম্ন-মধ্যশ্রেণির তরুণ-তরুণীর লন্ডনে প্রণয়লীলার কাহিনিতে ব্রহ্মপুত্রের উপর কেমন মন বসছে না।

বিকাল চারটেয় পলাশবাড়ি স্টেশন এল। পাড়ে অনেকগুলি বড় নৌকা বাঁধা। ঘাটের উপর কমলালেবু, ডিম ও পায়রা বিক্রি হচ্ছে। পলাশবাড়ি থেকে আবার উত্তরদিকে পাহাড়ের সার দেখা দিল এবং ঘণ্টাখানেক পর পলাশবাড়ি ছাড়লে এক পশলা অল্প বৃষ্টি হয়ে ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চাঁদের দেখা পাওয়া গেল। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। পাতলা মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোতে তীরের পাহাড় ও নদীতে তার ছায়া কেমন একটু অবাস্তব মনে হচ্ছে।

সাড়ে ছ'টার মধ্যে স্টিমার পাণ্ডুঘাট এসে পৌঁছেছে। শিলংযাত্রীদের পারাপারের স্টিমার অনেক আলো জ্বালিয়ে ঘাটে লেগে আছে। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল, এখনও পাণ্ডুঘাটেই আছি। সামনে গৌহাটি শহরের আলো দেখা যাচ্ছে।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৬
সোমবার

কাল সমস্ত রাত স্টিমার পাণ্ডুঘাটেই নোঙর করেছিল। আজ ভোর ছ'টায় সেখান থেকে রওনা হল। স্টিমার ছাড়ার শব্দ পেয়ে ওভারকোট চাপিয়ে সামনের ডেকে এলুম। গৌহাটি ও শিলং যাত্রাপথের অল্পবিস্তর পরিচিত পাহাড় নদীর দু'ধারে; তাদের মাথায় মাথায় কালচে সাদা মেঘের মতো কুয়াশা জমে আছে। স্টিমার উমানন্দভৈরবের কাছ দিয়ে গেল। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে গ্রানাইট পাথরে ধার-বাঁধানো উঁচু ভিতের উপর বড় বড় গাছের ঘন বন, তার মধ্য দিয়ে ভৈরবের মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। গৌহাটি শহরের তখনও ঘুম ভাঙেনি, নদীর ধারের রাস্তায় লোক-চলাচল নেই। শহরের একদিকটার প্রায় সমস্ত দৈর্ঘ্য উজিয়ে গৌহাটির বাজার-ঘাটে স্টিমার লাগল। বেলা তখন সাতটা।

গৌহাটি শহর কামরূপ জেলার সদর; অসমীয়াদের রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রচেষ্টার কেন্দ্র। কিন্তু প্রদেশের রাজধানী শিলংয়ের শৈলচূড়ায়, যা না উত্তর-অসমের অসমীয়াদের, না দক্ষিণ-অসমের বাঙালিদের জায়গা। সেই পাহাড়ের চূড়ায় বসে বোধহয় রাজপুরুষেরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উত্তর-দক্ষিণ দেখছেন, অসমীয়া ও বাঙালি কেউ কারও চেয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে।

প্রাচীন পুথিপত্রে ও শিলালেখ-তাম্রশাসনে গৌহাটির নাম দেখা যায় গুবাকহট্ট, বোধহয় গোরুর হাট নয়, সুপারির হাট। মেধাতিথির মনুভাষ্যে দেখেছি, দেশের একটা নির্দিষ্ট ভূভাগকে বলত হট্ট। বোধহয় ওটা ছিল 'ইকনমিক ইউনিট'-এর নাম, যে ভূখণ্ডের লোকেরা বড় বড় বেচাকেনা একজায়গায় করত এবং সম্ভব হাটবাজারের হাট কথাটা সেখান থেকেই এসেছে। যা হোক, শব্দের প্রত্নতত্ত্বে আর দরকার নেই। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। স্টিমার *থেকে মাল নামছে বিস্তর। ডাকহাঁকে জানছি গৌহাটি ও শিলং দু' জায়গার মাল নামছে, আর তাদের তফাত করে রাখা হচ্ছে। ক্রমে বাজারঘাটে ধোপাদের কাপড় কাচা শুরু হল। একটা ছোট ফ্ল্যাটের সামনে বসে একটি খালাসি খুব মনোযোগ দিয়ে একটা নীল কোর্তায় সাবান ঘষছে। রাস্তা দিয়ে দু'খানা মোটরগাড়ি চলে গেল।* আজ পাঁচদিনের পর মোটরগাড়ি দেখে মনটা একটু খুশি হয়ে উঠল। নাগরিক জীবনের অভ্যাসের এমনি ফল!

২

গৌহাটি থেকে রওনা হতে বেলা বাজল এগারোটা। বেলা দুটোরও পর পর্যন্ত ডাইনে পাহাড়ের সার চলছে নদীর প্রায় পাড় ঘেঁষে। নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়; হঠাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা পাহাড়ের খানিকটা অনাবৃত কালো পাথরে মোড়া, প্রকাণ্ড ঐরাবতের পাশের মতো। এক সার পাহাড়ের পিছনে আর-এক সার তারপর আবার এক সার, দূরে দূরে আরও সব সারের মাথা দেখা যাচ্ছে, অতি পাতলা নীল ওড়নার মতো ফিকে নীল কুয়াশায় ঢাকা। এক জায়গায় একটা পাহাড় তার সঙ্গীদের ছেড়ে আড়াআড়ি সোজা চলে এসেছে জলের মধ্যে. নদীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করতে। উলটোদিকের পাড় একটা চরের জিহ্বা অনেকদূর নদীর মধ্যে এগিয়ে দিয়েছে। এ জায়গাটা স্টিমার পার হল অতি ধীরে ও সাবধানে। পাশ দিয়ে যাবার সময় নদীর এই দুঃসাহসী প্রণয়ীর রূপটি দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে মোড়া পা, তার উপর পালিশ-কালো পাথরের চওড়া বুক খাড়া উঠে গেছে, রুদ্ধদুয়ার মন্দিরের কপাটের মতো।

বাঁদিকের পাহাড় সব দূরে দূরে। তৃণলেশহীন উঁচু চর চলেছে মাইলের পর মাইল—ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গলাঞ্ছনা পাশে আঁকা। অনুজ্জ্বল রৌদ্রে মনে হচ্ছে যেন চুনারি পাথরে তৈরি। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে রোদকে ঢাকতে পারেনি, শুধু নিষ্প্রভ করেছে।

ডানদিকের পাহাড়ের প্রাচীরটা যখন একটু একঘেয়ে বোধ হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পাহাড় গেল দূরে সরে। পূর্ব-বাংলার শীতের নদীর পরিচিত রূপটি ফুটে উঠল। এখানে ওখানে

ছড়ানো চরের শুভ্র বালু কেটে কালো নীল জলের ধারা, দিকচক্রবালে গাছের ঘন সবুজ রেখা।

বেলা পড়ে আসছে; কেবিনের সামনে বেতের কুর্সিতে রোদে বসে আছি। সম্মুখে একটা গোল চর, চারদিকে নীল পাহাড়; যারা ছিল নদীর পাশে, বাঁক ঘুরে মনে হচ্ছে তারা যেন নদীর মাঝ থেকে উঠেছে। একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে— রুপালি জরির পাড়-দেওয়া নীলাম্বরীর আঁচল; মাঝখানে একটা চোখ-ঝলসানো গোল ফুটো দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে; নদীতে রঙের স্রোত। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন টার্নারের একখানা ছবি।

একটা চরের ওপারে নদীর মধ্যে সূর্য অস্ত গেল; আগুনের প্রকাণ্ড গ্লোব। ঘড়িতে পাঁচটা ছ' মিনিট। অনেকটা পুবে চলে এসেছি। শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের সময় ঘড়িতে ছিল পাঁচটা পনেরো মিনিট। তবে আমার এ হাতঘড়িকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তি করা চলে না। ওর তিনদিনের গতিবিধির ফল অনেক সময় চমকপ্রদ।

স্তব্ধ ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর সন্ধ্যা নেমে এল। পুবে প্রতিপদের সোনালি চাঁদ, পশ্চিম-আকাশে বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে।

'ইন্দ্র' ফ্ল্যাট, তেজপুব
২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৬
মঙ্গলবার

ভোরে কেবিন ছেড়ে বাইরে এসেই দেখি, বাঁয়ে তেজপুর শহর দেখা যাচ্ছে। স্টিমার ঘাটে লাগতে দেরি হল না। মালপত্র গুছিয়ে স্টিমারের লোকদের বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে এখানকার স্টিমার-স্টেশনের ওয়েটিং ফ্ল্যাট 'ইন্দ্র'তে এসে ওঠা গেল। ফ্ল্যাটের এক কেবিন দখল নিয়ে নীচে নেমে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের চর ভেঙে উপরে উঠে গেলুম শহরে। পোস্ট আপিস থেকে তোমাদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে একটা ঝরঝরে রকম ফোর্ড ট্যাক্সিতে সমস্ত শহর ঘুরে বেড়ালাম। ট্যাক্সিওয়ালার বাড়ি সিলেট, ছেলেবেলা থেকে এখানেই আছে। কিন্তু তেজপুর শহরের উপর তার অসীম অবজ্ঞা; বললে এটা শহর না শহরের আকার! সিলেট শহরে ট্যাক্সি চলে ষাটখানা, এখানে পাঁচখানা চলা কঠিন।

ইন্দ্র ফ্ল্যাটে নাওয়া-খাওয়া সেরে, সামনের ডেকে একটা আরাম-কেদারায় রৌদ্রে পা ছড়িয়ে প্রিস্টলির সেই উপন্যাসটা পড়ছি, আর ব্রহ্মপুত্রের স্রোত ও নদীর পাড়ে টিলার উপর টিনের বাংলোগুলি চেয়ে দেখছি।

তেজপুর শহরের গল্প মুখেই শুনো।

জমির মালিক

চাষি ও চাষের জমি নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমান আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে মন্টেগু চেমস্ফোর্ড রিফর্মে, অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে। গত এক নম্বর মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই বেশ বোঝা গেল, মর্লি-মিন্টো নামাঙ্কিত যে শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষে চলছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরা তার বদল ঘটাবেন। ফলে কোনও কোনও বিষয়ে আইন করার সামান্য কিছু ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসবে। কিন্তু এই সামান্য উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপে আইনসভাগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়বে একটু অসামান্য রকমে। এবং অনুপাতে তার চেয়েও অনেক বেশি বাড়ানো হবে ভোটদাতাদের সংখ্যা, যাদের ভোট কুড়িয়ে শাসনপরিষদে আসন পাওয়া যাবে। এদেশের বেশির ভাগ লোক চাষি। যে গুণে ভোটের অধিকার আসবে তাতে ভোটদাতাদের তালিকায় চাষির সংখ্যা হবে বেশ মোটা রকমের। তারা যদি দল বাঁধতে পারে তবে তাদের ভোট উপেক্ষা করা বেশির ভাগ সভ্যপদপ্রার্থীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। দেশময় সাড়া পড়ে গেল। বিশেষ করে বাংলাদেশের কথাই বলছি। জমিদারেরা বহু সভা করে প্রমাণ করলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সওয়াশো বছরের পুরাতন স্বীকৃতিতে তাঁরা যে শুধু চাষের জমির মালিক তা নন, তাঁরাই হচ্ছেন চাষিদের স্বভাবসংগত নেতা, natural leaders of the people। কারণ, ও-কথাটা আইনে না হোক তখনকার দলিল-দস্তাবেজে কোনও কোনও ইংরেজ রাজপুরুষ ব্যবহার করেছিলেন। জমিদারের স্বার্থ ও চাষির স্বার্থ এক; অর্থাৎ জমিদারের স্বার্থই চাষির স্বার্থ, চাষির হিতই জমিদারের হিত। যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। চাষিদের প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধি হবে তারা যদি ভোট দিয়ে জমিদারদের বেশি সংখ্যায় আইনসভায় পাঠায়। ঘরভেদী দুষ্ট লোকের কথায় চাষিরা যেন কান না দেয়। দুষ্ট লোকের অভাব ছিল না। দেশময় রায়তদের সভায় তারা প্রমাণ করতে লাগল যে, বাংলার চাষির যত দুঃখ তার মূলে বাংলার জমিদার। জমির সঙ্গে এরা কোনও সম্পর্ক রাখে না, সম্পর্ক শুধু জমির খাজনার সঙ্গে, অথচ এরাই জমির মালিক। সেই মালিকত্বের জোরে রায়তের খাজনা এরা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে, জমি যেন ইন্ডিয়া রবার। রায়ত ইচ্ছামতো তার জমি বিক্রি করতে পারে না, জমিদারকে দিতে হবে উঁচু নজর; নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে নিতে পারবে না, ঝড়ে-পড়া গাছও নিতে পারবে না; কারণ তারও মালিক জমিদার। নিজের জমিতে রায়ত ইচ্ছামতো পাকাবাড়ি করতে পারবে না, পুকুর কাটতে পারবে না, এ রকম আইনি অত্যাচার তো আছেই; তার উপর বে-আইনি অত্যাচারের শেষ নেই— জমিদারবাবুদের ও তাদের আমলাবাবুদের। এ সব বন্ধ করো। জমির খাজনার উচিত হার ঠিক করে খাজনা চিরকালের জন্য বেঁধে দাও, তার যেন আর বৃদ্ধি না হয়। জমিদারদের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। রায়তের খাজনারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। জমির মালিকি স্বত্ব দেওয়া হোক

রায়তকে, যাতে সে যদৃচ্ছা জমির ভোগ-ব্যবহার দান-বিক্রি করতে পারে। জমিদার থাকবে শুধু নির্দিষ্ট খাজনার মালিক, অর্থাৎ খাজনা আদায় করে রাজস্ব দেবার তহশীলদারির মুনাফার মালিক। তার অতিরিক্ত তাদের আর কিছু প্রাপ্য নয়। চাষের জমি তার সে-জমি যে চাষ করে শস্য ফলায়। "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্"। বনের পশু বাণ দিয়ে যে মারে সে পশু তার, শস্যের খেত শস্যের জন্য যে তৈরি করে সে-খেতের জমিও তার। এইসব পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলার চাষিকে যদি চাষের জমির মালিক করা যায়, আর তার খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তবে তার কোনও দুঃখই থাকবে না। তার গোয়ালভরা গোরু আর গোলাভরা ধানে সোনার বাংলা প্রকৃতই সোনার বাংলা হয়ে উঠবে। এর উপায় হচ্ছে যে-সব রায়ত-হিতৈষীরা সভা করে রায়তদের তাদের হিত বোঝাচ্ছেন ভোট দিয়ে বেশি সংখ্যায় তাদের আইনসভায় পাঠানো। যাতে রায়তদের সুবিধামতো আইন পরিবর্তন তারা ঘটাতে পারে। যাঁদের আইনসভার সভ্য হবার, বা আত্মীয়বন্ধুদের সেখানে পাঠাবার কোনও অভিপ্রায় ছিল না, তাঁদেরও অনেকে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই ভরসায় যে, রায়তেরা দল বাঁধলে নতুন আইনসভায় আইন মারফত রায়তের কিছু উপকার হতে পারে। আর, বাংলার রায়তের উপকার গোটা বাংলাদেশের উপকার। এই সাময়িক আন্দোলন বাংলা ভাষায় একটি স্থায়ী সাহিত্যিক ছাপ রেখে গেছে— শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' ও রবীন্দ্রনাথের লেখা তার ভূমিকা। এ আন্দোলন যে বাঙালির মনের অন্তস্তলে নাড়া দিয়েছিল এ তারই প্রমাণ।

মহাত্মার নন-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৯ সালের আইনে প্রতিষ্ঠিত আইনসভাগুলির সঙ্গে অসহযোগ উপলক্ষ করে। সুতরাং, কংগ্রেস প্রারম্ভে এ সভাগুলি বর্জন করল। তার ফলে অন্তত বাংলাদেশে যে স্বাদগন্ধহীন আইনসভার সৃষ্টি হল ভালমন্দ কোনও কাজ তার সাধ্য ও বুদ্ধির অতীত। চাষি ও চাষের জমি নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা সে সভায় উঠল না। এবং, অসহযোগ আন্দোলনের বিজ্ঞাপিত ফল— ছ'মাসে স্বরাজ— যখন হাতে হাতে ফলল না, যেমন প্রায় আন্দোলনের-ই ফলে না, তখন দেশব্যাপী দেখা দিল নিরাশা ও অবসাদের ভাব। তার প্রতিক্রিয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্যদল গড়ে তুললেন; তার মূল কর্মপদ্ধতি হল ১৯১৯ সালের আইনের আইনসভাগুলিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দখল করে তাদের অচল করা, অর্থাৎ ওই আইনের শাসনপ্রথাকে ব্যর্থ করা। অসহযোগ বাইরে থেকে ভিতরে নেওয়া, বর্জনের নীতিকে বিনাশের রীতিতে রূপান্তরিত করা। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কংগ্রেসে দু-দল দেখা দিল। প্র-গতি ও অ-গতি, প্রো-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জার, দলের অনেক ঝগড়াঝাঁটি ও গালমন্দের পর কংগ্রেসের অনুমতি পেয়ে পরবর্তী নির্বাচনে স্বরাজ্যদল আইনসভাগুলিতে ঢুকলেন, বাংলাদেশে মোটের উপর মোটা সংখ্যায়। প্রথমে কিছুকাল গেল ও সভাকে অচল করার চেষ্টায়। কতক সাফল্য ও মোটের উপর অসফলতার মধ্য দিয়ে শেষটা স্বরাজ্যদল হল আইনপরিষদে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধ দলের প্রধান দল— যে পরিণতি পূর্ব থেকে অনুমান করা কঠিন ছিল না। এমনধারা অবস্থায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর, বাংলা পরিষদে বাংলার প্রজা ও জমিদার অর্থাৎ চাষি ও খাজনাগ্রাহীদের স্বত্বাস্বত্বের ১৮৮৫

সালের মূল আইনের কতকগুলি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ১৯২৮ সালে স্বরাজ্যদলের সহযোগিতা ও সহায়তায় এক আইন পাশ হল। নূতন আইনে চাষের জমির গাছে চাষি সম্পূর্ণ স্বত্ব পেল; সে জমির গাছ সে ইচ্ছামতো কেটে নিতে কি ঝড়ে বা অন্য রকমে পড়ে গেলে আত্মসাৎ করতে পারবে— জমিদারকে নজর না দিয়ে। চাষের জমিতে সে পাকা বাড়ি করতে পারবে নিজের ও পরিবারের লোকদের বসবাসের জন্য। পুকুর কাটতে পারবে নিজেদের পানীয় জলের জন্য। ইতিপূর্বে আইন ছিল চাষের বিঘ্ন ঘটালে চাষি প্রয়োজনমতো জমির গাছ কাটতে পারবে কিন্তু সে গাছ নিজে নিতে পারবে না, সে গাছ নেবে জমির জমিদার। পূর্বের আইনে চাষের জমিতে চাষি বাসের জন্য বাড়ি তৈরি করতে পারত, কিন্তু সে বাড়ি হওয়া চাই চাষির প্রয়োজনের উপযোগী, এবং সম্পূর্ণ পাকা বাড়ি চাষির প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সে আইনে চাষের জমিতে চাষি পুকুর কাটতে পারত চাষের কাজে প্রয়োজন হলে এবং চাষে নিযুক্ত মানুষ ও পশুর প্রয়োজনে, নিজের ও পরিবারের লোকদের পান-স্নানের প্রয়োজনে নয়। কেউ যদি মনে করেন যে, চাষিকে যদৃচ্ছা গাছ কাটতে দিলে জঙ্গল লোপাট হওয়ার ফলে চাষের অবনতি ঘটে, কি ক্রমাগত পুকুর কাটার ফলে চাষের জমির লাঘব হয়, এবং সাধ্যের অতিরিক্ত খরচে বাড়ি করে চাষি ঋণগ্রস্ত হতে পারে— এসব অমঙ্গল থেকে দেশ ও চাষিকে রক্ষা করাই ছিল ও-রকম আইনের উদ্দেশ্য, তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন। দেশের হিত কি চাষির অনিষ্টের সঙ্গে ও-সব বিধিনিষেধের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ, জমিদারকে নজরের টাকা গুণে দিতে পারলেই ও-সব কোনও কাজেই চাষির আর বাধা থাকত না। এ সকল বিধিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল বিশুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের উপর; ওগুলি laws of pure reason। জমিদার জমির মালিক। মালিকি স্বত্বের অর্থই হচ্ছে বস্তুকে যতরকমে সম্ভব ব্যবহার ও তা থেকে যত কিছু লাভের অধিকার। এ অধিকারের যতটুকু মালিক অন্যকে দেবে কেবল ততটুকু মাত্র তার অধিকার হবে, বাকি অধিকার মালিকের থেকে যাবে। জমিদার তার মালিকি স্বত্বের জমি চাষিকে দিয়েছে চাষের জন্য, খাজনার বিনিময়ে। সুতরাং চাষের জন্য যে ব্যবহার প্রয়োজন এবং চাষ করে যা লাভ সম্ভব, তাতেই মাত্র চাষির অধিকার। এর বেশি অধিকার কি লাভ যদি সে চায়— যেমন গাছ কেটে নেবার, কি পাকা বাড়ি করবার, কি ইচ্ছামতো পুকুর কাটবার, তবে সে অধিকার জমির মালিকের কাছ থেকে খাজনার অতিরিক্ত আরও দাম দিয়ে কিনে নিতে হবে। এই দামের ভদ্রতা-সংগত নাম নজর বা সেলামি। ন্যায়ের নির্ভুল যুক্তি, এতে দেশের হিতাহিতের কোনও প্রশ্ন নেই। ১৯২৮ সালের নূতন আইনে জমিদারের খাজনা বাড়াবার ক্ষমতার কোনও লাঘব হল না, পূর্বের ক্ষমতাই বহাল থাকল। আন্দোলনটা খুব বেশি হয়েছিল চাষের জমি চাষির ইচ্ছামতো দান-বিক্রির দাবি নিয়ে। সুতরাং নূতন আইনে চাষিকে সে ক্ষমতা দেওয়া হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হল যে, সে-জন্য জমিদারকে জমির দামের শতকরা কুড়ি টাকা নজর দিতে হবে। পূর্বের আমলে যখন জমিদারের বিনা সম্মতিতে জমি বিক্রি করলে জমিদারের ইচ্ছা হলে ক্রেতাকে প্রজা স্বীকার না করে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন তখনও শতকরা নিরানব্বইটি জায়গায় মোটের উপর ওই পরিমাণ নজর নিয়েই জমিদার ক্রেতাকে প্রজা স্বীকার করে নিতেন, যদি না কোনও কারণে জমিদার কি

আমলাবাবুদের ক্রেতাকে কিঞ্চিৎ 'শিক্ষা' দেবার মতলব থাকত। কারণ, জমিদার জমি চায় না, চায় টাকা— আর চাষি চায় জমি। কিন্তু তখন এ টাকাটা আদায় হত কিছু দেরিতে, অল্পবিস্তর দর-কষাকষির পর। নূতন আইনে এই নজরের টাকা হাতে হাতে আদায়ে গভর্নমেন্ট হলেন জমিদারের তহশীলদার। নজরের টাকা রেজেস্ট্রি আপিসে জমা না দিলে বিক্রির দলিল রেজেস্ট্রি হবে না, এবং বিনা রেজেস্ট্রিতে বিক্রি অসিদ্ধ। টাকাটা জমিদারের কাছে পৌঁছে দেবার ভার গভর্নমেন্ট নিজে নিলেন, অবশ্য চাষির কাছ থেকে খরচাটা নিয়ে। মোটের উপর নূতন আইনে জমিদারের আর্থিক ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হল। কিন্তু তবুও এটা তার মালিকি স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ, খেয়ালমাফিক ক্রেতাকে বহাল কি উচ্ছেদের অধিকারের সংকোচ। এর ক্ষতিপূরণ দরকার। সুতরাং বিধান হল জমিদার ইচ্ছা করলে নজরের টাকাটা না নিয়ে ক্রেতাকে জমির দাম ও তার উপর শতকরা দশ টাকা বেশি দিয়ে আদালতযোগে জমি খাস করে নিতে পারবেন। অর্থাৎ, কিছু টাকা খরচের বদলে প্রয়োজনমতো ক্রেতাকে 'শিক্ষা' দেবার পূর্ব ক্ষমতা জমিদারের বহাল থাকল, এবং অবস্থাবিশেষে খাস করার ভয় দেখিয়ে, মোচড় দিয়ে কিছু বেশি নজর আদায়ের পথটাও খোলা রইল। কারণ, পূর্বেই বলেছি, জমির প্রয়োজন জমিদারের কিছুমাত্র নেই, প্রয়োজন টাকার; আর চাষি জমি বেচে কিনে লাভ করতে চায় না, তার নিতান্ত প্রয়োজন জমির। ইংরেজি প্রবচনের কথায়, বাংলার চাষি চেয়েছিল রুটি, পেল পাথরের ঢেলা।

মহাত্মার প্রথম অসহযোগ-আন্দোলনে বাংলার চাষি, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসকে মনে করেছিল নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব অবস্থার সুযোগে বাংলার কংগ্রেসের নেতারা বাংলার রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোনও চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের চিন্তা তাঁদের বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিল। বাংলার চাষির অনায়াসলভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। ১৯২৮ সালের আইন-সংশোধন ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হল বাংলার আইনসভার কংগ্রেসী সভ্যদের কাছে চাষির স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়। এই প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় স্বরাজ্যদলের এক বৈঠকে একজন বিখ্যাত নেতা বলেছিলেন যে, গাছ কেটে নেবার যে টানা স্বত্ব চাষিকে দেওয়া হল it will strike their imagination, অর্থাৎ তাতেই বাংলার চাষিরা বাংলার কংগ্রেসের চাষি-হিতৈষণার মুগ্ধ থাকবে। বাংলার চাষি চাষা বটে, কিন্তু অতটা বোকা নয়। এর পর বাঙালি চাষির আনুগত্য বাংলার কংগ্রেস আর ফিরে পায়নি। কিন্তু জমিদারের স্বার্থরক্ষার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হল। ১৯২৮ সালের বিধান বেশিদিন টিকে থাকল না। অর্থাৎ বাংলার কংগ্রেসের পিঁয়াজ ও পয়জার দু-ই হল।

বিলাতের পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রণয়ন ও পাশ করলেন। এই আইনের কম্যুনাল প্রতিনিধি ও কম্যুনাল নির্বাচনের ব্যবস্থায় বাংলার আইনপরিষদে মুসলমান সভ্যেরা হলেন সবচেয়ে দলে ভারী। আর, এ সভ্যদের বেশির ভাগ নির্বাচিত হলেন মুসলমান চাষির ভোটের জোরে। সুতরাং, এবারকার আইনসভায় চাষির দাবি অগ্রাহ্য

করে চলা আর সম্ভব হল না। ১৯৩৮ সালে ১৮৮৫ সালের টেনেন্সি আইন আবার সংশোধন হল। ১৯২৮ সালের আইনে চাষিরা গাছ কেটে নেবার, জমিতে ইচ্ছামতো পুকুর কাটবার ও পাকা বাড়ি তোলার যে সব স্বত্ব পেয়েছিল তা বহাল রইল। কিন্তু এবারের আইনে জমি বেচা-কেনার অধিকার হল নির্বাধ ও নিরুপদ্রব; ১৯২৮ সালের আইনে দেওয়া জমিদারের নজর পাওয়ার স্বত্ব ও ক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেবার স্বত্ব দু-ই বাতিল হল। জমিদার যেমন তার জমিদারি বিক্রি করতে পারে, গভর্নমেন্টের কোনও দাবিদাওয়ার ভয় না রেখে, চাষিও তার জমি বিক্রির স্বত্ব পেল জমিদারের কোনও দাবি মেটাবার দায়ে না থেকে। চাষের জমির খাজনা বাড়াবার পূর্বের বিধি আইনের পৃষ্ঠায় বহাল থাকল বটে, কিন্তু বিধান হল ১৯৩৭ সাল থেকে দশ বছরের জন্য ও-সব বিধির প্রয়োগ বন্ধ থাকবে, অর্থাৎ ওই সময়ের মধ্যে জমির খাজনা আর বাড়ানো চলবে না। এই সাময়িক বাধা যে জমিদারের খাজনা বাড়াবার স্বত্বের লোপ বা বিশেষ সংকোচের সূচনা, তাতে কারও সন্দেহ নেই। এবং এই লোপ বা সংকোচের আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওই দশ বছরের মেয়াদ যে মাঝে মাঝে আইন করে বাড়ানো হবে, তাও নিঃসন্দেহ।

১৮৮৫ সালের টেনেন্সি আইন পাশের প্রাককালে কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

টেনেন্সি বিল্ নামে আইন হচ্ছে তৈয়ার করা,
গয়া গঙ্গা গদাধর ভূস্বামী প্রজারা।

অর্থাৎ, ও আইনে চাষের জমিতে জমিদারদের মালিকি স্বত্বের গয়াশ্রাদ্ধ হয়ে গেল। সে আইনে তেমন কিছুই হয়নি, মাসিক শ্রাদ্ধও নয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের আইনে গয়াশ্রাদ্ধ হয়ে জমিদারের মালিকি স্বত্বের প্রেতাত্মা দূর না হোক, সে স্বত্বের যে সপিণ্ডীকরণ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুকে ইচ্ছামতো অগুন্তি রকমে ব্যবহারে লাগাবার অধিকার যদি হয় মালিকি স্বত্ব তবে বাংলাদেশের চাষের জমিতে মালিকি স্বত্ব মোটামুটি এসেছে চাষির হাতে, নির্দিষ্ট খাজনা পাবার অধিকার ছাড়া আর বেশি কিছু অধিকার জমিদারের অবশিষ্ট নেই। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের সমসাময়িক রায়ত-আন্দোলনে চাষিদের পক্ষে যে সব দাবি উপস্থিত করা হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে তার প্রায় সমস্তই পূরণ হয়েছে। কিন্তু বাংলার চাষির গোয়াল যদি গোরুতে ভরতি হয়ে থাকে, আর তার গোলা যদি ধানে বোঝাই হয়ে গিয়ে থাকে— তার একমাত্র কারণ, সে গোয়াল ও গোলা নিতান্তই ছোট; পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। চাষের জমির মালিকি স্বত্ব পেয়ে বাংলার চাষির আর্থিক দুর্দশা কিছুই ঘোচেনি। সোনার বাংলা কবিতা ও গানের 'সোনার বাংলা' রয়ে গেছে।

২

আকাঙ্ক্ষার পূরণে আশাভঙ্গের এই রহস্যের মূল খুঁজলেই চাষের জমির স্বত্ব নিয়ে চাষি ও জমিদারের ঝগড়ার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে; এবং বোঝা যাবে, এই বিবাদের মীমাংসায়, সে মীমাংসা সম্পূর্ণ চাষির অনুকূলে হলেও, কেন চাষির ও দেশের বেশি কিছু উপকার সম্ভব নয়। চাষের জমির মালিকি স্বত্বের ভাগ-বাটোয়ারার যে-সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলি অতীত কালের বাতিল প্রশ্ন। যথাকালে তার সদুত্তরের ফল কি হত সে ঐতিহাসিক আলোচনা আজ নিষ্ফল। চাষের জমি নিয়ে বর্তমানের প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন। প্রাচীন প্রশ্নের মীমাংসা তার কোনও উত্তর নয়।

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের আরম্ভ, বাংলাদেশে যখন ইংরেজের শাসন ও আইন কায়েম হচ্ছে, সে হল ইংল্যান্ডে ধনতান্ত্রিক যুগপরিবর্তনের কাল। পূর্বকালের ধনতন্ত্র আবর্তিত হত জমির উৎপন্ন ফসলকে কেন্দ্র করে। এই ফসলের যত বড় অংশের উপর যার যতখানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকত্ব সে ছিল তত বড় ধনী। সুতরাং, প্রাচীন ঐতিহাসিক কারণে যে অভিজাত সম্প্রদায় ছিল জমির মালিক, সেই সম্প্রদায় ছিল দেশের ধনী সম্প্রদায়। এবং এই সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধিই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য, কারণ তারাই ছিল রাষ্ট্রের কর্ণধার। দেশে যে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হত তা হত শিল্পীর নিজের বাড়িতে, শিষ্যসাকরেদদের সহায়তায়। আর, তার ক্রয়-বিক্রয় সচরাচর আবদ্ধ থাকত আশপাশের ছোট গণ্ডির মধ্যে। যে-সব বিশেষ শিল্পদ্রব্য তৈরি হত অল্প জায়গায়, কিন্তু যার চাহিদা থাকত দেশময় বা দেশের বাইরেও, ব্যবসায়ী মহাজনেরা শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি তা সংগ্রহ করে সে চাহিদা মেটাত, এবং সে-ব্যবসায়ের মুনাফায় তারাই ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের পর দেশের ধনী লোক। এই সময় ইংল্যান্ডের করিতকর্মা লোক আবিষ্কার করল যে, শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ না করে যদি অনেক শিল্পীকে এক জায়গায় এনে তাদের মজুরি দিয়ে জিনিস তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়, তবে অল্প খরচে ও অল্প সময়ে জিনিস তৈয়ারি হয় অনেক বেশি, এবং তা বেচে লাভ হয় আরও বেশি। ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় ওয়ার্কশপ গড়ে উঠল, সেখানে পূর্বের দেশময়-ছড়ানো স্বাধীন শিল্পীরা এক জায়গায় জমায়েত হয়ে অন্যের কাছ থেকে মজুরি নিয়ে ফরমায়েশমতো জিনিস তৈরি করে দিতে লাগল। যারা ছিল শিল্পী, craftsman, তারা হল মজুরির চাকর, workman; যারা ছিল দ্রব্যসংগ্রহ ও কেনাবেচার মহাজন, merchant, তারা হল শিল্পীর শ্রমের মজুরিদাতা মালিক, industrialist। এর নাম industrial revolution। হাতের কাজ কলে করা, কল চালাতে স্টিম ইঞ্জিন লাগানো, এগুলি industrial revolution-এর গোড়ার কথা নয়। ওগুলি নূতন শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থাকে সহস্রগুণ ফলপ্রসূ করেছে, এবং সে ব্যবস্থায় মালিকদের মুনাফা বাড়িয়েছে তার চেয়ে বেশিগুণ; এবং এই নূতন শিল্পব্যবস্থার ফলেই কল ও ইঞ্জিন কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু industrial revolution-এর গোড়ার কথা হচ্ছে, শিল্পীদের মজুর করে একসঙ্গে খাটিয়ে তাদের কাজের নিট লাভ অল্প লোকে বেঁটে নেওয়া। কল ও ইঞ্জিন কাজে লাগানোর পূর্বেই industrial revolution আরম্ভ হয়েছিল। কল ও ইঞ্জিনের

আবিষ্কার অনেকটাই ওই revolution-এর ফল, তার কারণ নয়।

এই নূতন শিল্পব্যবস্থায় ইংল্যান্ডের শিল্পনেতাদের হাতে যে অর্থ জমা হতে লাগল তাতে তারাই হয়ে উঠল সে দেশের প্রধান ধনী সম্প্রদায়। তাদের ধনের পরিমাণ জমিসর্বস্ব প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের ধনকে ছাড়িয়ে যেতে লাগল। তার ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাকে ছাড়িয়ে না গেলেও, ইংল্যান্ডে আজও তা যায়নি, তাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন রাষ্ট্রের একটা প্রধান কাজ হল এবং তার অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি ও প্রচার ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা উৎসাহের সঙ্গে করতে লাগলেন। কার্ল মার্কসের কথায়, সমাজের তৎকালীন এই সবচেয়ে প্রগতিশীল ধনোৎপাদক বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রয়োজনকে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির চিরন্তন মূলসূত্র বলে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করাতে ও বিশ্বাস করতে লাগলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল নূতন প্রথায় শিল্পসৃষ্টির জন্য যা কিছু উপকরণ তার উপর শিল্পনেতাদের অবাধ অধিকার। এ উপকরণ দু-রকমের; মানুষের শ্রম ও সে-শ্রম প্রয়োগের জন্য জমি ও জিনিস। মানুষের শ্রমকে ইচ্ছামতো আয়ত্তে আনার যে-কৌশল আবিষ্কার হল তার নাম freedom of contract, চুক্তিতে আবদ্ধ হবার অবাধ স্বাধীনতা। এবং, সে স্বাধীনতার প্রয়োগে একবার চুক্তিতে বদ্ধ হলে সে চুক্তি যাতে ভঙ্গ না হয় সে জন্য রাষ্ট্রীয় শাসন। এর নাম sanctity of contract, চুক্তির পবিত্রতা, অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গ পাপের আইনের দণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত। শিল্পনেতারা সংখ্যায় অল্প এবং পকেট ভরতি থাকায় পেটে ক্ষুধার জ্বালা নেই। তাদের পক্ষে দল বেঁধে শ্রমিকদের দাবি পেটভাতার সীমানায় ঠেকিয়ে রাখা খুব কঠিন নয়। শ্রমিকেরা সংখ্যায় বহু, এবং পূর্ব আমলের কুটিরশিল্প নূতন আমলের ফ্যাক্টরিশিল্পে ধ্বংস হওয়ায় বেকার, পেটে ক্ষুধার জ্বালা। সুতরাং, স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগে শিল্পনেতাদের শর্তেই রাজি হওয়া ছাড়া তাদের অন্য গতি ছিল না। গত শতাব্দীর শেষ দিকে যখন শ্রমিকেরা দল বাঁধতে শিখে নিজেদের শ্রম বিক্রির শর্তের দাবি উপস্থিত করতে আরম্ভ করল তখন সে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগকে দলবদ্ধ গুন্ডামি নাম দিয়ে ইংল্যান্ডের আইন-আদালত ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। দলবদ্ধ শ্রমিকদের চাপে এ স্বাধীনতাকে অনেকটা স্বীকার করতে হয়েছে। এবং চুক্তির স্বাধীনতা ও পবিত্রতা, freedom ও sanctity, বহু রকমে খর্ব করে অনেক আইন-কানুন গড়তে হয়েছে যার সবটাই শ্রমিকদের হিতে নয়। দু'পক্ষের স্বাধীন চুক্তির লড়াই এখন চলছে। যে পক্ষই জয়ী হোক চুক্তির স্বাধীনতার জয় হবে না। কিন্তু এ অনেক পরের কথা। আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের আরম্ভে ইংল্যান্ডে অবাধ চুক্তিবাদের ছিল জয়জয়কার, কারণ তার সুফলভাগী ছিল নূতন ধনস্রষ্টা সম্প্রদায়, এবং সে ধনের পরিমাণ পূর্ব পূর্ব কালের তুলনায় এত বেশি যে, তার চমক কাটিয়ে তার সৃষ্টিকৌশলের গলদের দিকে দৃষ্টি পড়ার তখনও সময় নয়।

শিল্পসৃষ্টির অন্য উপকরণ, জমি ও জিনিসে অবাধ অধিকারের যে-তত্ত্ব আবিষ্কার হল তার মূলকথা হচ্ছে কোনও বস্তু থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ আদায়ের উপায়— কোনও লোককে সে-বস্তু যদৃচ্ছা ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া। এই ক্ষমতা পেলেই সে লোক ওই বস্তু থেকে যাতে সবচেয়ে লাভ হয় সে-চেষ্টায় প্রাণপাত করবে, না পেলে করবে না। এ-তত্ত্বের নাম

magic of property, মালিকত্বের মহামায়া— যার প্রভাবে মালিক পাথরে ফুল ফোটায়, মরুভূমিতে ফসল ফলায়। সুতরাং দেশের জমি ও জিনিস দেশের সবচেয়ে বেশি হিতে লাগাতে হলে তার কৌশল হচ্ছে ওদের মালিকি স্বত্ব দেশের কতক লোকের মধ্যে বেঁটে দেওয়া, এবং মালিকদের ইচ্ছামতো ব্যবহারের পথে যথাসম্ভব কম বাধা দেওয়া। তা হলেই প্রতি মালিক তার মালিকি স্বত্বের জমি ও জিনিসকে নিজের সবচেয়ে হিতকর কাজে লাগাতে চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি করবে না। এবং তাদের হিতের যোগফল সমাজের হিত, কারণ সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টি।

কি অবাধ চুক্তিবাদ, কি মালিকত্বের মায়াবাদ কোনওটির প্রয়োগই কেবল শিল্পনেতাদের প্রয়োজনে বদ্ধ থাকল না। ওদের মেনে নেওয়া হয়েছিল উন্নতিশীল সমাজের আর্থিক ঊর্ধ্বগতির দুটি অপরিহার্য মূলসূত্র বলে। সুতরাং যেখানেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানেই ওদের প্রয়োগ হতে লাগল। অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন দেশের জমির মালিক। তাদের অধীনে চাষিরা চাষ করত, অপর লোক অন্য রকমে জমিকে কাজে লাগাত। এই চাষিদের ও অন্য লোকদের জমিতে অনেক রকম স্বত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছিল যাদের উৎপত্তি মালিকের সঙ্গে চুক্তিতে নয়, পূর্ব প্রচলিত প্রথায়। মালিক ইচ্ছা করলেই সে সব স্বত্ব রদ কি বদল করতে পারতেন না। জমির মালিকের জমিকে যদৃচ্ছা ব্যবহারের ক্ষমতার মধ্যে এ সব স্বত্ব খাপ খায় না। এবং চুক্তিবাদের মূলতত্ত্বের সঙ্গেও এদের বিরোধ; সে-তত্ত্ব হচ্ছে উন্নতিশীল সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্বন্ধের বুনিয়াদ হয় চুক্তি, আর স্থিতিশীল সমাজেই তা হয় চুক্তিনিরপেক্ষ প্রথা। সুতরাং অন্য সব লোকের স্বত্বের খাতিরে জমির ব্যবহারে মালিকের যে-সব বাধা ছিল ঊর্ধ্বগতি সমাজের অনুপযোগী প্রাচীন ফিউডাল ব্যবস্থা বলে তাদের দূর করা হল। নিজের যাতে সবচেয়ে লাভ হয় জমিকে তেমন ব্যবহারে লাগাতে মালিকের কোনও বাধা থাকল না। ইংল্যান্ডে চাষের জমির মালিক অনেকে দেখলেন যে, জমি থেকে চাষিদের বিদায় করে যদি সেখানে ভেড়া পোষা যায় তবে পশম বেচে লাভ হয় অনেক বেশি। সুতরাং চাষের খেত ভেড়া চরানোর মাঠ হল। উৎখাত চাষিরা পেটের দায়ে শিল্পনেতাদের দরজায় ভিড় করে জমা হতে লাগল মজুরি বেচার জন্য। এবং, শ্রমিকের সংখ্যাবাহুল্যে শিল্পনেতারা খুব কম দামেই শ্রম কিনতে লাগলেন। এই স্বল্প মূল্যের শ্রমে তৈরি শিল্পদ্রব্য, মায় পশমের কাপড়, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পৃথিবীর বাজারে বিক্রি হয়ে মুনাফা আসতে লাগল বেশ মোটা রকম। ওই মুনাফার এক অংশের বদলে বিদেশ থেকে ইংল্যান্ডে শস্য আমদানি হতে লাগল, তার পরিমাণ ভেড়া-চরানো চাষের খেতের শস্যের চেয়ে অনেক বেশি, তা দামেও দেশে-উৎপন্ন শস্যের চেয়ে অনেক সস্তা। উন্নতির চাকা যে জোরে ঘুরছে, তাতে কারও সন্দেহ থাকল না। আজ যখন ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যকে পৃথিবীর বাজারে নানা দেশের শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে হয়, যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ দেশে খাদ্য আমদানির পথে মারাত্মক বাধা জন্মায়, তখন বাধ্য হয়ে চাষি-বনাম-ভেড়া নীতির অনেক পরিবর্তন করতে হচ্ছে। দেশের চাষকে সুবিধা ও উৎসাহ দেবার জন্য চাষের জমিতে চাষির এমন অনেক স্বত্ব স্বীকার করতে হচ্ছে যা মালিকের স্বাধীন ইচ্ছা-পরিচালনার বাধা। কিন্তু এ সব আজকের দিনের কথা। শিল্পবিপ্লবের আদিকালে ও-নীতির বিরুদ্ধে যারা

কিছু কথা বলেছিল তারা ধনবিজ্ঞানী পণ্ডিত নয়, কবি কি ভাবুক গোছের মানুষ, অর্থাৎ "হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস"। স্বভাবতই তাদের কথায় কেউ কান দেয়নি।

৩

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নবলব্ধ বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের সুরাহার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে সব কর্মচারী চাষের জমির বিলি-বন্দোবস্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, স্বদেশীয় মালিকি স্বত্বের এই অবাধ পরিচালনার আদর্শে এবং তার অবশ্যম্ভাবী সুফল সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাসে তাঁদের মন ও বুদ্ধি ছিল ভরপুর। সুতরাং এদেশের চাষের জমিতে নানা লোকের নানা রকম স্বত্বের দাবিতে, এবং তার মধ্যে জমির মালিকের নিঃসন্দেহ সন্ধান না পাওয়াতে, তাঁরা একটু দিশাহারা হলেন। এমন কাকেও দেখা গেল না যে, জমির যথেচ্ছ ব্যবহারে তার-অধিকার আছে এবং অন্য লোকের জমিতে যা কিছু স্বত্ব তা তার সঙ্গেই চুক্তির ফল। এ ব্যাপার তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কার তর্ক বিতর্কের একজন প্রধান নায়ক সার জন শোর লিখলেন—

> The most cursory observation shows the situation of things in this country to be singularly confused. The relation of a zamindar to government, and of a ryot to a zamindar, is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary— the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zamindar to government, and of a ryot to a zamindar to the simple principles of land-lord and tenant.

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথায়, "শোর সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন।" অর্থাৎ মালিক যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন গোলমাল দূর করার একমাত্র উপায় মালিক সৃষ্টি করা। তবেই যা এলোমেলো তা হবে সুসংগত, যা জটিল তা হবে সরল। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদারদের বাংলার চাষের জমির মালিক করা হল। জমিদারেরা যখন হলেন চাষের জমির মালিক তখন তাঁরা যে সে-জমি থেকে যত বেশি সম্ভব লাভের চেষ্টায় মনোযোগী হবেন, অর্থাৎ জমিতে যত বেশি ফসল ফলে সেই কাজে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করবেন, তাতে আর সন্দেহ থাকল না। কারণ মালিকি স্বত্বের ভেলকি যাবে কোথায়। Magic of property-তে এই আস্থাই লাট কর্নওয়ালিস প্রকাশ করেছেন চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের সনন্দ ১৭৯৩ সালের ১ নং কানুনে—

The Governor-General in Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred upon them by the public assessment being fixed for ever, will exert themselves in the cultivation of their lands, upon the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry.

যে জমিদারদের জমির মালিক করা হল তাদের কর্মে উৎসাহ ও শক্তি কতটা, লাটসাহেবের তা অজানা ছিল না। যে সার জন শোর তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওকালতি করেছিলেন ১৭৮৯ সালে তিনি লিখেছিলেন—

It is allowed that the zamindars are, generally speaking, grossly ignorant of their true interests, and of all that relates to their estates.

পুনশ্চ—

If a review of the zamindars of Bengal were made, it would be found that very few are duly qualified for the management of their hereditary lands, and that in general they are ill-educated for this task, ignorant of the common forms of business, and of the modes of transacting it; inattentive of the conduct of it, even when their own interests are immediately at stake, and indisposed to undertake it.

জমিদারদের এ বর্ণনায় যদি কেউ বিস্ময় ও সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের লক্ষ্য করে শোর সাহেব লিখলেন—

They are the result of my own experience, combined with that of others; and I fear no refutation of them, where they are examined with candour, and can be ascertained by local reference and information.

এই প্রকৃতির লোক জমির মালিকি স্বত্ব পেয়েই জড়তা ত্যাগ করে, অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধি কাটিয়ে চাষের উন্নতিতে উৎসাহের সঙ্গে লেগে যাবে, এ বিশ্বাস ম্যাজিকে বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। ১৭৯৩ সালের পর দেড়শো বছর কেটেছে। এর মধ্যে জমিদারি হাতবদল হয়েছে অনেক। কিন্তু লক্ষ বিঘা জমির জমিদার থেকে একশো বিঘা জমির জমিদার পর্যন্ত কেউই চাষের কাজে নজর দিয়ে চাষা হবার মতো ছোটলোকী বুদ্ধির কখনও পরিচয় দেননি। পেটের দায়ে ও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় চাষি যে-ফসল ফলিয়েছে তার যতটা সম্ভব বড় অংশ খাজনায় ও খরচা-মাথট-ভিক্ষা ইত্যাদি ফিকিরে আদায় করতে পারে এমন নায়েব-গোমস্তা বহালে তাঁরা তৎপরতা মন্দ দেখাননি; কিন্তু এ ফসল যাতে বাড়ে সে-চেষ্টায় কখনও অর্থ কি সামর্থ্য খরচ করেননি। ইংল্যান্ডের কর্মক্ষম ও উৎসাহী শিল্পনেতারা লাভের লোভে ধনসৃষ্টির

কাজে অনেক জিনিসে অবাধ মালিকি স্বত্ব দাবি করেছিল, এবং তা পেয়ে ধনের পরিমাণ ও লাভের পরিমাণ অনেক বাড়িয়েছিল। সুতরাং যে-কিছুতে যে-কোনওজনকে মালিকি স্বত্ব দিলে ধনসৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাবে, এটা ন্যায়ের এমন সাধারণ ফাঁকি যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ যার পড়া আছে সেই বুঝতে পারে। কিন্তু, ওই ফাঁকিকেই যুক্তি মনে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক কাজ চলছে। সে যাই হোক, পশ্চিমের ম্যাজিক পূর্বদেশে কেরামতি দেখাতে পারলে না। মাটির দোষ।

৪

ইংরেজ-শাসনের আরম্ভে চাষের জমির মালিকি স্বত্ব জমিদারদের না দিয়ে চাষিদের দিলে (তার পূর্বে চাষিরাই জমির মালিক ছিল কি না সে-তর্ক ছেড়ে দিচ্ছি) চাষিরা যে পরবর্তী কালের অনেক অন্যায় ও জুলুম থেকে রক্ষা পেত তাতে সন্দেহ নেই। ফলে, চাষির আত্মসম্মান অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকত, এবং সম্ভব, বাংলার চাষি-সম্প্রদায় এখনকার চেয়ে স্বাধীন ও দৃঢ়চিত্ত হত। কিন্তু আজ তারা যে ফসল ফলাচ্ছে মালিকি স্বত্বের জাদুতে তার চেয়ে প্রকারে ও পরিমাণে ভাল ও বেশি ফসল ফলাত কিনা তাতে সন্দেহ আছে। প্রাণের তাগিদে চাষি নালায়েক জমিতে চাষ বিস্তৃত করেছে জমিদারকে নজর ও খাজনা দিয়ে। লাভের আশায় নূতন ফসল চাষ করেছে, কি অল্প জমিতে যে-ফসলের চাষ হত তার আবাদ অনেকগুণ বাড়িয়েছে— যেমন পাট ও গোল-আলু। এতে জমিদারের কোনও সাহায্য পায়নি, যদি সরকারের সাহায্য পেয়ে থাকে তা নগণ্য। চাষির অতি সামান্য যা উদ্বৃত্ত, এ দেশের কৃষিব তাই মূলধন। পুরুষপরম্পরাগত বহু প্রাচীন যে জ্ঞান ও কৌশল চাষি বাপপিতামহের কাছে শেখে এ দেশে তাই কৃষিবিদ্যা। চাষের যে যন্ত্রপাতি বাংলাব চাষি আজ ব্যবহার করে বহু শতাব্দী ধরে তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। দেড়শো বছর পূর্বে বাংলাদেশের চাষে যে মূলধন, বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ হত দেড়শো বছর পরেও তাই হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কোনও বদল হয়নি। জমিদারেরা চাষের জমির মালিকি স্বত্ব পেয়ে এর কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র উন্নতির চেষ্টা করেননি। তাঁদের সামাজিক পদমর্যাদা যাই হোক, দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোটা মুনাফায় রাজস্বের ইজারাদার ছাডা তাঁরা আর কিছু নন। এবং এক প্রাচীন দলিল ছাড়া তাঁদের টিকিয়ে রাখার অন্য কোনও কৈফিয়তও নেই। কিন্তু মালিকি স্বত্ব জমিদারের হাত থেকে চাষির হাতে তুলে দিলেই চাষের উন্নতি হয়ে দেশ কৃষিসম্পদে ভরে যাবে, এমন বিশ্বাস কর্নওয়ালিসি ম্যাজিক-বিশ্বাসেরই চাষি-সংস্করণ। মালিকি জাদু জমিদারের কাছে ফলেনি ইচ্ছার অভাবে, চাষির কাছে ফলবে না ক্ষমতার অভাবে।

বাংলায় ও ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের আমলেই অন্য অনেক সভ্যদেশে কৃষির জন্মান্তর ঘটেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও সমাধান পশ্চিম ইউরোপের মনে ও জীবনে যুগান্তর এনেছে মানুষের জীবনযাত্রায় তার ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই। কৃষিকার্যে তার প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে তারও অনেক পরে, মোটামুটি গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে বিদ্যায় ও কৌশলে এদেশের চাষের জমি চাষ হত, অন্য সভ্যদেশের কৃষিবিদ্যা ও কৌশল তা থেকে বেশি তফাত ছিল না। আজ আমরা বক্তৃতায় প্রবন্ধে প্রদর্শনীতে ছক কেটে তুলনায় দেখাই, নানা দেশের বিঘা প্রতি ফসল কত বেশি, আমাদের দেশে কত কম। সকলেই জানি, তার কারণ সে-সব দেশে কৃষির সহায় নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশল, আর সে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োগ আমাদের দেশের কৃষিতে নেই। বাংলার ও ভারতবর্ষের চাষের জমির আজ প্রথম প্রয়োজন ও প্রধান সমস্যা— এই নূতন জ্ঞান ও কৌশল কৃষির কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা। দেশে খাদ্যশস্যের যে-ফলন হয় গুণে ও পরিমাণে দেশের সমস্ত লোককে সুস্থ ও কর্মঠ শরীরে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়; লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে এই অপ্রাচুর্যের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এই লোকের অধিকাংশ হচ্ছে চাষি ও তাদের পরিবার। অন্য কৃষিপণ্য যা উৎপন্ন হয় চাষির ও দেশের দারিদ্র্য তাতে ঘোচে না। এ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার চাষের কাজে নূতন জ্ঞানবিজ্ঞান-কৌশলের প্রয়োগ, নানা সভ্যদেশ আজ যা করছে। জমির মালিক জমিদারেরা এ-কাজে কোনও সাহায্য করবেন, এমন কল্পনা কেউ করে না। চাষিরা নিজে থেকে এতে উদ্যোগী হবে, সে ভরসাও কারও নেই— জমির ভোগদখলে যত সুবিধাই তাদের হোক আর জমির খাজনার হার যত কমানোই হোক। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনে কি কি প্রয়োজন তার তালিকা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করে থাকেন। জমিতে জৈব ও রাসায়নিক সার দেওয়া, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, ভূমি-উদ্ভিদ-আবহ-বিদ্যার নানা তথ্যের ব্যাবহারিক প্রয়োগ। সংবাদপত্র থেকে চোখ তুলে যখন তাকাই দেশের চাষির দিকে— তার দাবিদ্র্য, তার অস্বাস্থ্য, তার অশিক্ষা, এবং ফলে তার মনের নিদারুণ দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা দেখে তখন ওইসব ফর্দ ও ফিরিস্তি নির্মম পরিহাস বলে মনে হয়। এ চেষ্টা সার্থক হতে পারে যদি সমস্ত দেশের শুভবুদ্ধি ও কর্মের উৎসাহ উদ্বুদ্ধ হয়, এবং দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্য দিয়ে সে-বুদ্ধি ও উৎসাহ যদি আত্মপ্রকাশের পথ পায়। চাষের জমিতে মালিকি স্বত্বের লোভ দেখিয়ে এ ভার শ্রেণি-বিশেষকে দেওয়া চলে না, দিয়ে ফললাভের আশা করাও চরম মূঢ়তা।

আমাদের দেশে যে সরকারি কৃষিশালা কি পরীক্ষাগার নেই, তা নয়; দু'-চারটে আছে। এ দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনে চাষিকে সাহায্য করা তাদের কাজ নয়। নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে ও অথবা তা কাজে লাগাবার উপায়-উদ্ভাবনেও এদের সার্থকতা নয়। এদেশে ইংরেজ-শাসন যে পূর্বকালের রাজশাসনের মতো শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্য ও পুলিশ-শাসন মাত্র নয়, একালের আদর্শ অনুযায়ী দেশবাসীর সর্ব-হিতে-রত মঙ্গলময় ব্যবস্থা— তারই চিহ্নস্বরূপ এদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এগুলি প্রতীকমাত্র, বস্তু নয়। ছোট-বড় লাটের বক্তৃতার এরা উপাদান জোগায়। এবং প্রসঙ্গত, গুটিকয়েক ইংরেজের বড় মাহিয়ানায়, ও কয়েকজন ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ভারতবাসীর ছোট মাহিয়ানায় চাকুরি সৃষ্টি করে। অথচ, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োগে ফসলের প্রকার ও পরিমাণ

বহুগুণে বাড়ানো খুব বেশিদিনের কাজ নয়। চোখের সামনে সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাক-সোভিয়েট রুশিয়ায় কৃষির অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের মতোই ছিল। মাত্র পঁচিশ বছরের চেষ্টার ফল আজ সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ সভ্যতার বহিরঙ্গ। তার প্রসার মানুষের বুদ্ধির স্তরে। সে-স্তর ছাড়িয়ে অন্তর্মুখীন হওয়ার তার প্রয়োজন নেই। সেইজন্য তাকে আয়ত্ত করতেও জাতির সময় লাগে না।

কিন্তু চাষের জমিতে এই বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন দেশের সমগ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্রভাবে ঘটানো সম্ভব নয়। এই আংশিক পরিবর্তন নির্ভর করে সমগ্রের গতি ও পরিণতির উপর। যেদিন আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক জীবনকে নতুন পৃথিবীর উপযোগী করে ভেঙে গড়ার কাজ আরম্ভ হবে, কৃষির উন্নতির প্রকৃত চেষ্টাও সেই দিন আরম্ভ হবে, তার পূর্বে নয়। সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্তই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই ভাঙা-গড়ার মধ্যে চাষের জমির দখল-ভোগের ব্যবস্থা কেমন রূপ নেবে বা নেওয়া উচিত হবে, তার আগাম নকশা বা blue print তৈরি করতে বসা আজ পণ্ডশ্রম। যতদিন আমাদের দেশের হিতচিন্তার গুরুভার বিদেশিকেই কষ্ট করে বহন করতে হবে, ততদিন কমিশন বসবে, সমুদ্রপার থেকে মোটা ভাতায় অজ্ঞাতনামা বিশেষজ্ঞেরা আসবেন, রিপোর্ট তৈরি হবে, চাকুরির সৃষ্টি হবে, আর দেশের অবস্থা ও দুরবস্থা যেমন আছে তেমনি থাকবে। তাই স্বাভাবিক। বিদেশির শ্রম লাঘব করে দেশেব ধনসৃষ্টি ও বণ্টনের ভার যেদিন দেশের লোককেই নিতে হবে তখন শুভবুদ্ধির যদি নিতান্ত অভাব না হয়, তবে চাষের জমির মালিকি স্বত্ব— ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার— কেউ পাবে না। সে নূতন ব্যবস্থার প্রধান প্রতিবন্ধক হবে বর্তমান চাষি সম্প্রদায়; কারণ, চাষের জমির মালিকি স্বত্বের বড় অংশ তারা পেয়েছে, তার চেয়ে বড় আর কিছু তারা পায়নি এবং কল্পনা করতেও শেখেনি। সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাস তারও দৃষ্টান্ত।

চৈত্র ১৩৫০

সমাজ ও বিবাহ

সমাজ ও বিবাহ

হিন্দুর প্রচলিত বিবাহ-রীতির আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্তিত রীতিকে বিধিবদ্ধ করার জন্য আইনের এক খসড়া তৈরি হয়ে জনসাধারণের অবগতি ও বিচারের জন্য প্রচার হয়েছে। ইংরেজি ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যে 'হিন্দু-আইন কমিটি' নিয়োগ করেন এ খসড়া সেই কমিটি প্রস্তুত করেছেন। এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত বেনেগল নরসিংহ রাও, এবং সভ্য আছেন ওই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, বোম্বাই-এর শ্রীযুক্ত ঘরপুরী ও শ্রীযুক্ত যোশী।

এই খসড়া অনুসারে আইন পাশ হলে তা কার্যকরী হবে ইংরেজি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে, অর্থাৎ এখন থেকে তিন বছর পরে।* আগামী তিন বছরে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা—তার শাসনযন্ত্র ও আইন-প্রণয়নের বিধি ব্যবস্থা কেমন দাঁড়াবে তা অনিশ্চিত। কারণ তা প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করবে বর্তমান যুদ্ধের গতি ও পরিণতির উপর। কিন্তু এই অনিশ্চয়ের মধ্যেই এই প্রস্তাবিত আইনের আলোচনা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ভাবী রাষ্ট্রচেহারা যা-ই হোক এ মহাদেশের হিন্দু জনসাধারণকে তাদের বিবাহ-বিধির নানা পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতেই হবে। চলতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদল ঘটলে সে প্রয়োজন কমবে না, বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বছর তিনেক পূর্বে 'অলকা' পত্রিকায় 'বাঙ্গালী হিন্দু' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সে লেখা অনেক লোকে পড়েছেন এমন দুরাশা ও অহংকার মনে রাখি না। সুতরাং সংক্ষেপে বলছি, সে প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বর্তমান হিন্দু-সমাজে ঐক্যের, ও একতায় যে বল আনে সে বলাধানের প্রধান অন্তরায় জাতিভেদের গণ্ডিতে আমাদের শতধা বিভক্ত সমাজ। হিন্দুশাস্ত্র-বর্ণিত বর্ণভেদের সঙ্গে আধুনিক জাতিভেদের জটিলতা ও অন্ধ কঠোরতার মিল খুব কম, এবং এ জাতিভেদ মরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি ছাড়া বর্তমান পৃথিবীতে আর কারও কাম্য হতে পারে না। সে প্রবন্ধে আরও বলেছিলাম যে, এ জাতিভেদের ভিত্তি জাতির গণ্ডির বাইরে বিবাহের নিষিদ্ধতায়। এ নিষেধবিধিকে দূর না করলে হিন্দু-সমাজ কোনও দিনই দৃঢ়বদ্ধ এক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে না। এবং দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, এই নিষেধের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক যুক্তি নাম দিয়ে যা সব বলা হয় সেগুলি যা আছে—তার সমর্থনে মনগড়া কল্পনামাত্র, সত্যে তাদের কোনও ভিত্তি নেই। এই নিষেধকে বহাল রেখেও আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে এড়িয়ে হিন্দু-সমাজে সংহতি আনার আর যে-সব চেষ্টা—যেমন অ-জলচল জাতির হাতে মাঝে মাঝে সভা করে জল খেয়ে তাদের

* এই রচনাটি সন ১৩৪৯ সালের কার্তিক মাসে লিখিত।

কৃতার্থ করা, বছরে একবার তাদের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন—সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম, নিজের মন ও পরের মনকে ফাঁকি দেওয়া। শুয়ে শুয়ে হাত পা ছুড়ে খুব এগিয়ে যাচ্ছি কল্পনা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

প্রস্তাবিত আইনে জাতিভেদের এই নিষিদ্ধ গণ্ডি কতটা দূর হয়েছে এ প্রবন্ধের তাই প্রধান আলোচ্য। প্রসঙ্গত এ খসড়ার অন্য মূল বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। আইন করে জাতিভেদ দূর করা যাবে না জানা কথা। কিন্তু হিন্দু-সমাজের ভিতরে যদি এ গণ্ডিকে লঙ্ঘনের বেগ সঞ্চিত হয়ে থাকে তবে আইন নানা বাধা দূর করে তার গতির পথে সহায় হতে পারে।

২

এই খসড়ায় দুই রকমের বৈধ হিন্দু-বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে —শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহ। শাস্ত্রীয় বিবাহে অসবর্ণ, সপিণ্ড, একগোত্র ও সমান প্রবর বরকন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। হোমাগ্নি-সাক্ষাতে মন্ত্রোচ্চারণ ও সপ্তপদীগমন এ বিবাহ-সিদ্ধির প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। তবে কোনও দেশাচার বা জাতি ও উপজাতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ও আচার অনুযায়ী বিবাহও বৈধ শাস্ত্রীয় বিবাহ বলে গণ্য হবে। লৌকিক বিবাহে বর্ণ-পিণ্ড-গোত্র-প্রবরের বাধা নেই। বরবধূ এই আইনের নির্দিষ্ট কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেই তাদের মধ্যে বৈধ বিবাহ সিদ্ধ হতে পারবে। এই আইন-নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলি হচ্ছে একের সঙ্গে অন্যের সন্তান সম্পর্ক, ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক, পিতৃব্য-ভ্রাতৃকন্যা কি মাতুল-ভগিনীকন্যা সম্পর্ক ও পিতৃষ্বসা-ভ্রাতুষ্পুত্র কি মাতৃষ্বসা-ভগিনীপুত্র সম্পর্ক। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের নিযুক্ত জনৈক কর্মচারী ও তিনজন সাক্ষীর সমক্ষে বরবধূর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণের অঙ্গীকার এ বিবাহের প্রযোজনীয় অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক এ দু'রকম বিবাহেরই ব্যাবহারিক ফল সমান। উভয় প্রকারে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা এক হিন্দু-দায়াধিকার আইনে শাসিত হবে। লৌকিক বিবাহের ফলে কেউ তার পরিবার থেকে বিচ্যুত হবে না বা দেবোত্তর প্রভৃতির সেবায়েতি বা অধ্যক্ষতা থেকে বঞ্চিত হবে না। দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা লোপ হবে না, এবং লৌকিক বিবাহকারী পুত্রকে মৃত গণ্যে তার পিতার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা হবে না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন যে, এই নতুন আইনের হিন্দু-বিবাহবিধি বর্তমান কালে হিন্দুর বৈধ বিবাহের, অর্থাৎ হিন্দুর যে বিবাহ ইংরেজের আদালতে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়, তারই ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ। শাস্ত্রীয় বিবাহে প্রচলিত হিন্দু-বিবাহের সমস্ত বিধিনিষেধ বহাল আছে। কেবল বরকন্যার সপিণ্ডত্ব নির্ণয়ে পিতৃপক্ষে সাত ও মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষ গণনার একটা নিয়ম বেঁধে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রচলিত গণনারীতির একটা সমন্বয় করা হয়েছে। এবং অসবর্ণ-বিবাহের নিষেধে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, —এই চার মূল বর্ণের গণ্ডি ভেঙে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রতি বর্ণের মধ্যে যে সব জাতি ও উপজাতি

আছে তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এ রকম বিবাহের বৈধত্ব ইংরেজের আদালতে অনেক দিন থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। যদিও সকল স্থানে এ নিয়মের প্রয়োগ সহজ নয়, এবং অনেক স্থানে সন্দেহহীন প্রয়োগ অসম্ভব। কারণ বর্তমান হিন্দু-সমাজ বহু বিচিত্র জাতিতে বিভক্ত, তার অনেক জাতি কোন মূল বর্ণের অন্তর্গত তার নির্ণয় দুরূহ। এ সব জাতির উৎপত্তির শাস্ত্রীয় ইতিহাস হচ্ছে যে, এরা চারবর্ণের মিশ্র-বিবাহের ফলে উৎপন্ন সংকর জাতি, বা ওই সংকরজাতিগুলির মধ্যে মিশ্র-বিবাহের ফলে উৎপন্ন অতিসংকর বা প্রকীর্ণসংকর জাতি বা ওই প্রকীর্ণজাতিগুলির মধ্যে মিশ্র বিবাহের ফলে উৎপন্ন প্রকীর্ণসংকরজাতি। শাস্ত্রে সংকর ও প্রকীর্ণসংকরজাতির অনেকগুলির নাম আছে, কিন্তু যেমন মিতাক্ষরাকার বলেছেন সেগুলি দৃষ্টান্তমাত্র—'প্রদর্শনার্থমুক্তং', কারণ 'সংকীর্ণ সংকরজাতানামানন্ত্যাদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ'—সংকীর্ণসংকরজাতিগুলির সংখ্যা অনন্ত জন্য নিঃশেষে তাদের নাম বলা যায় না। এই সংকর ও সংকীর্ণসংকরজাতিগুলি কোনটি কোন বর্ণের অন্তর্গত তার নির্ণয়ের নিয়ম কি? যে জাতিগুলি অনুলোম, অর্থাৎ উচ্চ বর্ণ-জাতি পুরুষের সঙ্গে নিম্ন বর্ণ-জাতি স্ত্রীর বিবাহের ফল —তাদের সম্বন্ধে একটা নিয়ম পাওয়া যায় যে, সন্তানের বর্ণ হবে মাতার বর্ণ। যেমন শঙ্খ বলেছেন, 'ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্য এব ভবতি' ইত্যাদি, যদিও শঙ্খবচনের যথার্থ অর্থ অর্থাৎ বিবক্ষা নিয়ে বিবাদ আছে। কিন্তু প্রতিলোম অর্থাৎ নিম্ন বর্ণ-জাতি পুরুষের সঙ্গে উচ্চ বর্ণ-জাতি স্ত্রীর বিবাহের ফলে যে সব সংকর জাতির উৎপত্তি তারা কোন বর্ণের অন্তর্গত? অর্বাচীন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি যা এখন প্রচলিত, তাতে প্রতিলোম বিবাহ অতি নিন্দিত। শাস্ত্রমতে সূত-বৈদেহিক-চাণ্ডাল-মাগধ প্রভৃতি জাতি প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন। শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও মোটের উপর বলা যায় যে, এরা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। কিন্তু সংকর জাতির বর্ণনির্ণয়ের জটিলতার এখানেই শেষ নয়। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বর্তমানে কোনও জাতির নাম যদি শাস্ত্রবর্ণিত কোনও সংকর জাতির নাম হয় তবে নামসাদৃশ্যে সে জাতিকে শাস্ত্রোক্ত সংকরজাতি বলে গণ্য করতে হবে, তা হলেও অনেক জাতি এখন রয়েছে যাদের নাম কোনও প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। এ সব জাতির বর্ণ নির্ণয় করতে হলে জানতে হবে তাদের উৎপত্তির ইতিহাস। বহুস্থলেই এ ইতিহাসের কোনও মালমশলা নেই। এ রকম জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নামে যা চলে তার লক্ষ্য সত্য-নির্ণয় নয়, তার উদ্দেশ্য জাতির সিঁড়িতে নিজের জাতিকে দু'-এক ধাপ টেনে তোলা, বা পাশের জাতিকে দু'-এক ধাপ নীচে ঠেলা। বাংলাদেশ থেকে পরিচিত দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। বাংলার বৈদ্যরা অনেক দিন থেকে দাবি করে আসছিলেন যে তাঁরা শাস্ত্রোক্ত 'অম্বষ্ঠ' জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীর সন্তানেরা তাঁদের আদি পুরুষ। 'বিপ্রান্মূর্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ অম্বষ্ঠঃ' (যাজ্ঞবল্ক্য)। সুতরাং শঙ্খস্মৃতির বচন অনুসারে তাঁরা বর্ণে বৈশ্য ও দ্বিজ। বাংলার হিন্দু-সমাজে এ দাবি মোটের উপর গ্রাহ্য হয়েছিল। সম্প্রতি অনেক বাঙালি বৈদ্য বলছেন যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বর্ণে ব্রাহ্মণ। বৈদ্যরা যে 'অম্বষ্ঠ' সুতরাং বর্ণে বৈশ্য, তার প্রধান প্রমাণ ছিল যে, অম্বষ্ঠের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি হচ্ছে চিকিৎসা—'সূতানামশ্ব-সারথ্যমম্বষ্ঠানাং-চিকিৎসনম্' (মনু); এবং ইংরেজের আগমনে বৃত্তিতন্ত্র ভঙ্গের

কৃতার্থ করা, বছরে একবার তাদের সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন—সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম, নিজের মন ও পরের মনকে ফাঁকি দেওয়া। শুয়ে শুয়ে হাত পা ছুড়ে খুব এগিয়ে যাচ্ছি কল্পনা আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

প্রস্তাবিত আইনে জাতিভেদের এই নিষিদ্ধ গণ্ডি কতটা দূর হয়েছে এ প্রবন্ধের তাই প্রধান আলোচ্য। প্রসঙ্গত এ খসড়ার অন্য মূল বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। আইন করে জাতিভেদ দূর করা যাবে না জানা কথা। কিন্তু হিন্দু-সমাজের ভিতরে যদি এ গণ্ডিকে লঙ্ঘনের বেগ সঞ্চিত হয়ে থাকে তবে আইন নানা বাধা দূর করে তার গতির পথে সহায় হতে পারে।

২

এই খসড়ায় দুই রকমের বৈধ হিন্দু-বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে —শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহ। শাস্ত্রীয় বিবাহে অসবর্ণ, সপিণ্ড, একগোত্র ও সমান প্রবর বরকন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। হোমাগ্নি-সাক্ষাতে মন্ত্রোচ্চারণ ও সপ্তপদীগমন এ বিবাহ-বিধির প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। তবে কোনও দেশাচার বা জাতি ও উপজাতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচলিত রীতি ও আচার অনুযায়ী বিবাহও বৈধ শাস্ত্রীয় বিবাহ বলে গণ্য হবে। লৌকিক বিবাহে বর্ণ-পিণ্ড-গোত্র-প্রবরের বাধা নেই। বরবধূ এই আইনেব নির্দিষ্ট কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেই তাদের মধ্যে বৈধ বিবাহ সিদ্ধ হতে পারবে। এই আইন-নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলি হচ্ছে একের সঙ্গে অন্যের সন্তান সম্পর্ক, ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক, পিতৃব্য-ভ্রাতৃকন্যা কি মাতুল-ভগিনীকন্যা সম্পর্ক ও পিতৃষ্বসা-ভ্রাতুষ্পুত্র কি মাতৃষ্বসা-ভগিনীপুত্র সম্পর্ক। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের নিযুক্ত জনৈক কর্মচারী ও তিনজন সাক্ষীর সমক্ষে বরবধূর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণের অঙ্গীকার এ বিবাহের প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক এ *দু'রকম বিবাহেরই ব্যাবহারিক ফল সমান।* উভয় প্রকারে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা এক হিন্দু-দায়াধিকাব আইনে শাসিত হবে। লৌকিক বিবাহের ফলে কেউ তার পরিবার থেকে বিচ্যুত হবে না বা দেবোত্তর প্রভৃতির সেবায়েতি বা [illegible]ক্ষতা থেকে বঞ্চিত হবে না। দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা লোপ হবে না, এবং লৌকিক বিবাহকারী পুত্রকে মৃত গণ্যে তার পিতার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা হবে না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন যে, এই নতুন আইনের হিন্দু-বিবাহবিধি বর্তমান কালে হিন্দুব বৈধ বিবাহের, অর্থাৎ হিন্দুর যে বিবাহ ইংরেজের আদালতে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়, তারই ঈষৎ পরিবর্তিত সংস্করণ। শাস্ত্রীয় বিবাহে প্রচলিত হিন্দু-বিবাহের সমস্ত বিধিনিষেধ বহাল আছে। কেবল ববকন্যাব সপিণ্ডত্ব নির্ণয়ে পিতৃপক্ষে সাত ও মাতৃপক্ষে পাঁচ পুরুষ গণনার একটা নিয়ম [illegible] দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম প্রচলিত গণনারীতির একটা সমন্বয় করা হয়েছে। এবং অসবর্ণ-বিবাহে[illegible] নিষেধে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষ[illegible]—এই চার মূল বর্ণের গণ্ডি ভেঙে [illegible] নিষিদ্ধ. কিন্তু প্রতি বর্ণের মধ্যে

আছে তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। এ রকম বিবাহের বৈধত্ব ইংরেজের আদালতে অনেক দিন থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। যদিও সকল স্থানে এ নিয়মের প্রয়োগ সহজ নয়, এবং অনেক স্থানে সন্দেহহীন প্রয়োগ অসম্ভব। কারণ বর্তমান হিন্দু-সমাজ বহু বিচিত্র জাতিতে বিভক্ত, তার অনেক জাতি কোন মূল বর্ণের অন্তর্গত তার নির্ণয় দুরূহ। এ সব জাতির উৎপত্তির শাস্ত্রীয় ইতিহাস হচ্ছে যে, এরা চারবর্ণের মিশ্র-বিবাহের ফলে উৎপন্ন সংকর জাতি, বা ওই সংকরজাতিগুলির মধ্যে মিশ্র-বিবাহের ফলে উৎপন্ন অতিসংকর বা প্রকীর্ণসংকর জাতি বা ওই প্রকীর্ণজাতিগুলির মধ্যে মিশ্র বিবাহের ফলে উৎপন্ন প্রকীর্ণসংকরজাতি। শাস্ত্রে সংকর ও প্রকীর্ণসংকরজাতির অনেকগুলির নাম আছে, কিন্তু যেমন মিতাক্ষরাকার বলেছেন সেগুলি দৃষ্টান্তমাত্র—'প্রদর্শনার্থমুক্তং', কারণ 'সংকীর্ণ সংকরজাতানামানন্ত্যাদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ'—সংকীর্ণসংকরজাতিগুলির সংখ্যা অনন্ত জন্য নিঃশেষে তাদের নাম বলা যায় না। এই সংকর ও সংকীর্ণসংকরজাতিগুলি কোনটি কোন বর্ণের অন্তর্গত তার নির্ণয়ের নিয়ম কি? যে জাতিগুলি অনুলোম, অর্থাৎ উচ্চ বর্ণ-জাতি পুরুষের সঙ্গে নিম্ন বর্ণ-জাতি স্ত্রীর বিবাহের ফল—তাদের সম্বন্ধে একটা নিয়ম পাওয়া যায় যে, সন্তানের বর্ণ হবে মাতার বর্ণ। যেমন শঙ্খ বলেছেন, 'ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্য এব ভবতি' ইত্যাদি, যদিও শঙ্খবচনের যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে [illegible] কিন্তু প্রতিলোম, অর্থাৎ নিম্ন বর্ণ-জাতি পুরুষের সঙ্গে উচ্চ বর্ণ-জাতি স্ত্রীর বিবাহের ফলে যে সব সংকর জাতির উৎপত্তি তারা কোন বর্ণের অন্তর্গত? অর্বাচীন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি যা এখন প্রচলিত, তাতে প্রতিলোম বিবাহ অতি নিন্দিত। শাস্ত্রমতে সূত-বৈদেহিক-চাণ্ডাল-মাগধ প্রভৃতি জাতি প্রতিলোম বিবাহে উৎপন্ন। শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও মোটের উপর বলা যায় যে, এরা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। কিন্তু সংকর জাতির বর্ণনির্ণয়ের জটিলতার এখানেই শেষ নয়। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বর্তমানে কোনও জাতির নাম যদি শাস্ত্রবর্ণিত কোনও সংকর জাতির নাম হয় তবে নামসাদৃশ্যে সে জাতিকে শাস্ত্রোক্ত সংকরজাতি বলে গণ্য করতে হবে, তা হলেও অনেক জাতি এখন রয়েছে যাদের নাম কোনও প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। এ সব জাতির বর্ণ নির্ণয় করতে হলে জানতে হবে তাদের উৎপত্তির ইতিহাস। বহুস্থলেই এ ইতিহাসের কোনও মালমশলা নেই। এ রকম জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নামে যা চলে তার লক্ষ্য সত্য-নির্ণয় নয়, তার উদ্দেশ্য জাতের সিঁড়িতে নিজের জাতিকে দু'-এক ধাপ টেনে তোলা, বা পাশের জাতিকে দু'-এক ধাপ নীচে ঠেলা। বাংলাদেশ থেকে পরিচিত দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। বাংলার বৈদ্যরা অনেক দিন থেকে দাবি করে আসছিলেন যে তাঁরা শাস্ত্রোক্ত 'অম্বষ্ঠ' জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীর সন্তানেরা তাঁদের আদি পুরুষ। 'বিপ্রান্মূর্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ অম্বষ্ঠঃ' (যাজ্ঞবল্ক্য)। সুতরাং শঙ্খস্মৃতির বচন অনুসারে তাঁরা বর্ণে বৈশ্য ও দ্বিজ। বাংলার হিন্দু-সমাজে এ দাবি মোটের উপর গ্রাহ্য হয়েছিল। সম্প্রতি অনেক বাঙালি বৈদ্য বলছেন যে প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বর্ণে ব্রাহ্মণ। বৈদ্যরা যে 'অম্বষ্ঠ' সুতরাং বর্ণে বৈশ্য, তার প্রধান প্রমাণ ছিল যে, অম্বষ্ঠের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি হচ্ছে চিকিৎসা 'সূতানামশ্ব-সারথ্যমম্বষ্ঠানাং-চিকিৎসনম্'

পূর্বে বৈদ্যদের জাতিগত বৃত্তি ছিল চিকিৎসা ও মোটের উপর তাঁরা দ্বিজের আচার পালন করতেন। বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ, এর সমর্থনে এ রকম প্রমাণের অভাব হওয়ার কথা নয়। সত্য যেখানে অজ্ঞাত, কল্পনা সেখানে অবারিত। বাংলার কায়স্থেরা নিজেদের শূদ্র বলেই স্বীকার করে আসছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের এক নজির আছে যে কায়স্থের ছেলের সঙ্গে তাঁতির মেয়ের বিবাহ সিদ্ধ, কারণ দুজনেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। সকলেই জানেন অনেক বাঙালি কায়স্থ দাবি করছেন যে প্রকৃতপক্ষে কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়বর্ণ, এবং তাঁরা দ্বিজোচিত আচারও পালন করছেন। যে প্রমাণে বাংলার বৈদ্যরা নিজেদের বৈশ্য কি ব্রাহ্মণ বলেন বাঙালি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের পোষকে সে রকম প্রমাণ উপস্থিত করা কিছু কঠিন নয়। আদালতে এ রকম সব দাবি উপস্থিত হলে কোন প্রমাণে তার বিচার হবে? কোন শাস্ত্র, ইতিহাস কি প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে? অথবা অনতিকাল পূর্বের দেশাচারই হবে সবচেয়ে গ্রাহ্য প্রমাণ? সুতরাং প্রস্তাবিত আইনের অসবর্ণ-বিবাহের বিধি-নিষেধ শুনতে যত সরল, তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ তত সহজ নয়। অধিকন্তু এর মূলেই আছে বড় গলদ। সংকর জাতিগুলির উৎপত্তির যে শাস্ত্রেতিহাস, হিন্দুর অনেক জাতিকে তার কাঠামে কিছুতেই ফেলা যায় না। কারণ স্বীকার না করে উপায় নেই যে অনেক জনসমষ্টি চারবর্ণের বাইরে থেকে এসে একটা জাতির নাম নিয়ে হিন্দুসমাজে মিশে গেছে। সে সব জাতির বর্ণনির্ণয়ে তাদের উৎপত্তির সত্য ইতিহাস অবান্তর। কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি করলেই তবে তাদের বর্ণ-নিরূপণ সম্ভব হয়।

৩

প্রস্তাবিত আইনের 'লৌকিক বিবাহ' ১৮৭২ সালের প্রসিদ্ধ তিন আইনের ১৯২৩ সালে যে সংস্কার হয়েছে তারই কিছু পরিবর্তিত রূপ। মূল তিন আইন অনুসারে যদি কোনও হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ করত তবে তাকে স্বীকারোক্তি করতে হত যে ধর্মে সে হিন্দু নয়। কারণ ওই আইন অনুসারে বিবাহ কেবল তাদের মধ্যেই হতে পারত যারা খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, পারসি, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন কোনও ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে স্বীকার করে না। কিন্তু ইংরেজের আদালতে বিচার হল যে এ অস্বীকার কেবল বিবাহার্থ। সুতরাং তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহকারী হিন্দু ও তাদের সন্তানদের দায়াধিকারের আইন হিন্দু-আইন। ১৯২৩ সালের সংস্কারে ব্যবস্থা হল যে যাঁরা নিজেদের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈনধর্মাবলম্বী বলবেন তাঁরাও তিন আইন অনুসারে বিবাহ করতে পারবেন। সুতরাং ওই আইন অনুসারে অসবর্ণ বিবাহেচ্ছুক হিন্দু ধর্মে হিন্দু পরিচয়েই সে বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হল যে এ রকমে বিবাহিত হিন্দুর দায়াধিকার আইন হিন্দু-আইন থাকবে না, হবে 'ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকার' আইনের দায়ভাগবিধি, অর্থাৎ খ্রিস্টানদের দায়াধিকার আইন। এ বিবাহের ফলে হিন্দু তার পরিবার থেকে বিচ্যুত হবে, দেবোত্তরে কোনও স্বত্ব থাকবে না, দত্তকগ্রহণ নিষিদ্ধ হবে, তাকে মৃতগণ্যে তার পিতা দত্তকগ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ হিন্দু স্বীকারে যখন

এ রকম বিবাহ করেছ তখন হিন্দু-আইন আর তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়! হিন্দু-আইন বহাল রাখতে হলে বিবাহের সময় বলতে হবে যে তুমি হিন্দু নও! পূর্বেই বলেছি যে প্রস্তাবিত আইন ১৯২৩ সালের সংস্কারের এই আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত ব্যবস্থাগুলিকে রদ করেছে।

৪

তিন আইনের ১৯২৩ সালের এই অদ্ভুত সংস্কারগুলি অকারণ নয়। ওদের উদ্দেশ্য ছিল অসবর্ণ বিবাহের নামে 'হিন্দুধর্ম গেল' বলে যাঁরা সরব হন তাঁদের আশ্বস্ত করা। করুক না লোকে হিন্দু নাম নিয়েই এ রকম বিবাহ। বিবাহের পর তারা তো আর কোনও অর্থেই হিন্দু থাকছে না। বরং ইংরেজ আদালতের বিচার উলটে বলা যায় যে, এদের হিন্দুত্ব স্বীকার কেবল বিবাহার্থ। আর বর্জন করে আত্মরক্ষার রীতিতে হিন্দু-সমাজ বহুদিন যে মরণান্ত বীর্য দেখিয়ে আসছে এ বিবাহ স্বীকার হবে তার-ই একটা প্রকাশ। প্রস্তাবিত আইনে যে দু'রকম হিন্দুবিবাহের ব্যবস্থা হয়েছে তারও উদ্দেশ্য এই সনাতনীদের আশ্বস্ত করা। 'শাস্ত্রীয় বিবাহে' যখন চলতি নিষেধ সব বহাল থাকল তখন একটা অশাস্ত্রীয় 'লৌকিক বিবাহ' স্বীকারে ক্ষতি কী! কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। যদি সনাতনীদের তুষ্ট করে এ আইন পাশ করাতে হয় তবে এ আইন পাশ হবে না। কারণ দু'রকম বিবাহের ব্যাবহারিক ফল যেখানে এক, অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহের পতি-পত্নীর হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে সকল দাবি যখন সম্পূর্ণ বহাল থাকবে তখন সনাতনপন্থী তুষ্ট বা আশ্বস্ত হবে কীসে? এ দ্বৈত যে মায়ামাত্র তা বুঝতে বেশি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দরকার হয় না। আর যদি সনাতনীদের বিরোধ সত্ত্বেও এ আইন পাশ হয় তা হবে তাদের মতের জোরে যারা সমগ্র হিন্দু-সমাজের যুগ-উপযোগী পরিবর্তন চায়, সে সমাজের বিধি-বন্ধন থেকে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তিমাত্র চায় না। এ রকম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু সমস্ত সমাজের উপর তার ফল গৌণ ফল। হিন্দুর বর্তমান সমাজ এই গৌণ উপায়ে পরিবর্তনের চেষ্টায় যুগ ছাড়িয়ে এসেছে। এখন প্রয়োজন সমস্ত সমাজের হিতে হিন্দুর সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন, যার ফলে হিন্দু-সমাজ পাবে নূতন দৃঢ় গড়ন ও সে সমাজে আসবে নূতন প্রাণ ও নূতন বল।

প্রস্তাবিত আইনে অপরিবর্তিত 'শাস্ত্রীয় বিবাহ' বিধির পাশে পরিবর্তিত এক 'লৌকিক বিবাহ'-রীতি দাঁড় করানোর ব্যবস্থা এই কাম্য পরিবর্তনের অনুকূল নয়। এ ব্যবস্থার বাহ্য আকার হচ্ছে সেই সব পূর্ব চেষ্টার অনুরূপ যা হিন্দু-সমাজের চলতি বিধিকে বহাল রেখে তার বন্ধন থেকে মুক্তিকামী লোকদের ছাড়পত্র দিতে চেয়েছে, যদিও এর আন্তরিক উদ্দেশ্য গৌণভাবে সে বিধির বদল ঘটানো। কিন্তু এ আইন পাশ হলেও এই বাহ্যিক আকারেরই জয় হবে, এর আন্তরিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এর ফলে হিন্দু-সমাজের বিবাহ-রীতির কোনও বড় পরিবর্তন ঘটবে না, যেমন ঘটেনি মূল তিন আইনে বা তার পরিবর্তিত রূপে। তার কারণ কিছু নিগূঢ় নয়। যে হিন্দু তার বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় এ পরিবর্তন আসবে যতটা সম্ভব হিন্দুর আচার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে। পরিবর্তনের ফল হবে পরিবর্তিত

হিন্দু-সমাজ, পূর্বের সঙ্গে যোগসূত্রহীন সম্পূর্ণ নূতন বস্তু নয়। এই মনোভাবের কাছে পাণিগ্রহণ-মন্ত্র-উচ্চারণে বিবাহ আর রাজকর্মচারীর কাছে রেজিস্ট্রি করে বিবাহ এক জিনিস নয়। হিন্দু-সমাজ থেকে অসবর্ণ বিবাহের বাধা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায় নয় ও বিবাহকে ধর্মানুষ্ঠানে অপাঙ্‌ক্তেয় করা, যাতে প্রচলিত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানেও বিবাহ সিদ্ধ হবে না, ওর সিদ্ধির জন্য দরকার হবে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর ও রেজিস্ট্রি।

এ আইনের দু'রকম বিবাহ-বিধির প্রস্তাব আরও নিরর্থক, কারণ কি শাস্ত্রীয় কি লৌকিক উভয় বিবাহই করা হয়েছে একপত্নীক; এক স্ত্রী বর্তমানে স্বামীর পুনর্বিবাহ অসিদ্ধ হবে। আশা করা যায় এ প্রস্তাবে সনাতনীদেরও খুব বেশি আপত্তি হবে না। আইনে যা-ই হোক, সমাজে আধুনিক হিন্দুর বিবাহ মোটের উপর একপত্নীক। অর্থাৎ আমাদের মনের সম্মতি একপত্নীক বিবাহের আদর্শের দিকেই। বহু-বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ করলে অন্য দেশে ও সমাজে মাঝে মাঝে যে সব অসুবিধা ঘটে তা আমাদের মধ্যেও ঘটবে। কিন্তু তার কুফলের পরিমাণ বহু-বিবাহের কুফলের তুলনায় অনেক কম। মানুষের কোনও নিয়ম সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করা যায় না। যেটা মোটের উপর ভাল তাকেই বেছে নিতে হয়।

৫

শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রভেদ যদি আইনে রাখতেও হয়, এবং শাস্ত্রীয় বিবাহে যদি অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধই থাকে তবুও সে বিবাহে গোত্র-প্রবরের বাধা দূর করে বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রের আরও প্রসার করা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতামাতা মাত্রই জানেন হিন্দু-সমাজের সংকীর্ণ বিবাহক্ষেত্র কত বড় বিপত্তি। অথচ সগোত্র সমানপ্রবরের বাধা আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন। থিয়োরি হচ্ছে যে, জমদগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই কয়জনের নামই গোত্রনাম। সুতরাং যে ব্রাহ্মণের বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রসিদ্ধ ধরতে হবে তিনি সেই নামের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর। 'প্রবরে'র ব্যাপার আরও একটু ঘোরালো। প্রতি গোত্রে অনেকগুলি করে প্রবর আছে। সেগুলিও ব্যক্তিবিশেষের নাম। একটা প্রসিদ্ধি এই যে, 'প্রবর' প্রবর্তক ঋষিরা 'গোত্র' প্রবর্তক ঋষিদের পুত্রপৌত্র। সুতরাং সগোত্র ও সমান প্রবর লোকেরা যত দূরের সম্পর্কই হোক এক বংশের লোক। এবং যাদের প্রবর এক তাদের সম্পর্কটা ওরই মধ্যে একটু নিকট। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবরের নাম আছে। যেমন উপমন্যু গোত্রের এক প্রবর বশিষ্ট, আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর বশিষ্ট। অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হতে পারে। আমরা সবাই জানি সেই জন্যই সমানপ্রবরের বাধা বিবাহে সগোত্রের অতিরিক্ত আর এক বাধা। সুতরাং মেধাতিথি মনুভাষ্যে প্রশ্ন তুলেছেন যে, প্রস্তাবিত বরকন্যা যদি ভিন্নগোত্রের হয় তবে কি করে তারা এক ঋষির সন্তান গণ্যে সমানপ্রবর হতে পারে। এবং মীমাংসা করেছেন যে, স্মৃতি যখন বলছেন হতে পারে তখন তাই স্বীকার করতে হবে। কারণ গোত্রপ্রবর জিনিসটি সম্পূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতির এলাকার অর্থাৎ অলৌকিক বস্তু। লৌকিক যুক্তিতে ওর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার ও নিবন্ধকারদের সময়ে প্রবরের যথার্থ অর্থের স্মৃতিও লোপ হয়েছিল। এবং নানা পরস্পরবিরোধী কল্পনা তার স্থান পূরণ করছিল। পাঠক যদি রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত মাধবাচার্যের প্রবরের ব্যাখ্যার সঙ্গে, 'অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চা পিতুঃ'—এই মনু বচনের মেধাতিথির ভাষ্য মিলিয়ে দেখেন তবেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে।

গোত্র-প্রবরের যথার্থ ব্যাখ্যা যাই হোক সকলেই একমত যে, এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের বংশগত গোত্র-প্রবর সম্ভব নয়, কারণ গোত্র-প্রবর প্রবর্তক ঋষিরা ছিলেন সবাই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যে গোত্র-প্রবর সে হচ্ছে তাদের পুরোহিতদের গোত্র-প্রবর তাদের আরোপ করে। 'যদ্যপি রাজন্য বিশাং প্রতিস্বিক গোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাবঃ তথাঽপি পুরোহিতগোর্ত্রপ্রবরৌ বেদিব্যৌ' (মিতাক্ষরা)। কিন্তু এই আরোপিত গোত্র-প্রবরই আবার বিবাহে বাধা! শূদ্রের বিবাহার্থ কোনও গোত্র-প্রবর নেই। 'প্রাগুরু মনুশাতাতপবচনে দ্বিজাতিগ্রহণং সগোত্রবর্জনে শূদ্রব্যাবৃর্ত্যর্থম' (উদ্বাহতত্ত্ব)। কিন্তু মজা এই যে, যাঁদের পূর্বপুরুষেরা নিজেদের শূদ্র বলতেন এবং যাঁরা এখন নিজেদের দ্বিজ বলে তাঁরা কল্পিত গোত্র-প্রবরের বাস্তব বন্ধনে নিজেদের বাঁধতে বাধ্য হচ্ছেন!

কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষেও এই গোত্র-প্রবরের বাধার স্বরূপ কি? রক্তসম্বন্ধজন্য বিবাহ নিষেধের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ সপিণ্ড-সম্বন্ধ সীমার বাইরে হলেই তার সঙ্গে বিবাহ চলে এবং বাংলাদেশে সে সীমার মধ্যেও কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা হলে তাকে বিবাহ করা যায়, কিন্তু যেখানে রক্তসম্বন্ধের কোনও ইতিহাস নেই, কেবলমাত্র বংশ-পরম্পরাগত দুইটি নামসাম্য বিবাহের অলঙ্ঘনীয় বাধা! যদি স্বীকার করা যায় যে একশো পুরুষ পূর্বে সগোত্র স্ত্রীপুরুষের পূর্বপুরুষ এক ছিল, কোন যুক্তিতে সেটা বিবাহে বাধা হতে পারে? সপিণ্ডের সঙ্গে বিবাহ নিষেধ। সপিণ্ড শব্দের অর্থ যাদের পিণ্ড বা দেহ এক, একদেহ থেকে যারা উদ্ভূত। 'সপিণ্ডতা তু এক শরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি' (মিতাক্ষরা)। কিন্তু এই অনাদি সংসারে সকলের মধ্যেই সকলের এ রকম সপিণ্ডতা সম্ভব, কিন্তু সেটা অতিপ্রসঙ্গ, কারণ তা হলে কোনও বিবাহই সম্ভব হয় না। "তচ্চ সর্বত্র সর্বস্য যথাকথং চিদমাদৌ সংসারে ভবতীত্যতিপ্রসংগঃ" (মিতাক্ষরা)। সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থকে নিতে হবে কাট-ছাট করে একটা নিয়মিত কার্যকরী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে, পঙ্কজ শব্দের অর্থে যেমন করা হয়। অতশ্চায়ং সপিণ্ডশব্দোঽবয়শক্ত্যা সর্বত্র প্রবর্ত্তমানেঽপি নির্মন্থা পঙ্কজাদি শব্দ বন্নিয়ত বিষয় এব" (মিতাক্ষরা)। সেই জন্যই বিবাহের সপিণ্ডতা মাতার বংশে পাঁচ পুরুষ ও পিতার বংশে সাত পুরুষেই শেষ হয়। "পঞ্চমাৎ সপ্তমাৎ ঊর্ধ্বৎ মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা" (যাজ্ঞবল্ক্য)। হিন্দু-বিবাহে সগোত্রপ্রবরের নিষেধ বর্জনের চেয়ে হিন্দু-শাস্ত্রকারদের এ যুক্তির সুষ্ঠুতর প্রয়োগের ক্ষেত্র আর নেই।

হিন্দু-বিবাহে সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহ নিষেধের বিধি নিকট সম্পর্কিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ নিবারণের নিয়ম। এ নিষেধ সকল সমাজের বিবাহরীতিতেই কোনও-না-কোনও রকম আছে। হিন্দু-সমাজের প্রচলিত নিয়মে পিতার বংশে সাত ও মাতার বংশে পাঁচ সিঁড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ডি। অনেকে সম্ভব জানেন যে, এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রকার একমত ছিলেন না। কোনও কোনও শাস্ত্রকার ওই গণ্ডিকে সংক্ষেপ করে পিতৃপক্ষে পাঁচ ও মাতৃপক্ষে তিন পর্যন্ত মাত্র গণনার বিধি দিতেন। "ত্রীনতীত্য মাতৃতঃ পঞ্চাতীত্য চ পিতৃতঃ" (পৈঠীনসি)। পরবর্তী কালের ভাষ্য ও নিবন্ধকারেরা পৈঠীনসি-প্রমুখদের মতো এই বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ও দুই সংখ্যার উল্লেখ তার চেয়ে কম সংখ্যার নিষেধের জন্য, সংখ্যা দুটিকে স্থাপনের জন্য নয়, কারণ তা না হলে স্মৃতিবাক্যের পরস্পর বিরোধ হয়। "তদপ্যর্বাঙ্ নিষেধার্থং ন পুনস্তৎপ্রাপ্তুর্থমিতি সর্বস্মৃতী নামবিরোধঃ" (মিতাক্ষরা)। সকল স্মৃতিকার যে সমস্ত বিষয়ে একবিধি দিয়েছেন এটা স্পষ্টতই সত্য নয়, ভাষ্যকারদের 'ওয়ার্কিং হাইপথেসিস' মাত্র— যার উপর নির্ভর করে নিজের মতের বিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্যকে যা কিছু একটা দুর্ব্যাখ্যা দিয়ে সরিয়ে রাখা যায়। সাত আর পাঁচ এই সহজ কথা বলা যার অভিপ্রায় সে কখনও ব্যাখ্যাকারদের উপর ভরসা রেখে বলতে যায় না পাঁচ আর তিন। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর 'হিন্দু আইন' পুস্তকে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৈঠীনসির পাঁচ আর তিন মতবাদই কার্যত চলে। যদিও বাঙালি স্মার্ত রঘুনন্দন সাত আর পাঁচ গণনার জোর পক্ষপাতী। আমার মতে প্রস্তাবিত আইনে সপিণ্ডত্বের সীমা পাঁচ আর তিন নির্দেশ করা উচিত। এ নিয়মের পক্ষে শাস্ত্রও আছে, এবং বর্তমান হিন্দু-সামাজিক বোধ ও রুচিরও তা বিরুদ্ধ নয়। এ নিয়মে বিবাহ্য বর ও বিবাহ্য কন্যার ক্ষেত্র বড় হবে, যার সামাজিক প্রয়োজন আছে।

এ আইনে শাস্ত্রীয় বিবাহের নিষিদ্ধ সম্বন্ধের গণ্ডি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খুব বড়, কিন্তু লৌকিক বিবাহের ওই গণ্ডি তিন আইনের নিষিদ্ধ গণ্ডির চেয়েও ছোট। প্রস্তাবিত আইনের এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের বিবরণ পূর্বেই দিয়েছি। এ নিয়মে খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কমিটি তাঁদের টীকায় বলেছেন যে, এ রকম বিবাহের বৈদিক প্রমাণ আছে, এবং এর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সত্য কথা। কিন্তু প্রাচীন প্রথার নজির তখনই কার্যকরী হয় যখন সে প্রথাকে পুনরায় চল করার সামাজিক প্রয়োজন আছে, এবং সামাজিক মন ও রুচি তার প্রতি একান্ত বিমুখ নয়। এ আইনের লৌকিক বিবাহের নিষিদ্ধ সম্পর্কের সীমা এত অপ্রসর যে এমন অনেক বর-কন্যার বিবাহ সম্ভব যে-বিবাহ আধুনিক হিন্দুর সামাজিক বোধ ও রুচিতে প্রকাণ্ড ঘা দেয়। কমিটি বলেছেন যে তাঁদের প্রস্তাবিত এই নিষিদ্ধ সম্পর্কের তালিকা পৃথিবীর প্রায় অন্য সব দেশের নিষেধের তালিকার সঙ্গে এক। কথাটা সর্বাংশে সত্য বলে মনে হয় না। বহু সভ্যদেশের নিষিদ্ধ সম্বন্ধের সীমা এর চেয়ে বড়। নিকট সম্পর্কিতের মধ্যে বিবাহ নিষেধের জীব-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আধুনিক বিজ্ঞানের মতে খুব দৃঢ় নয়। ওর যথার্থ ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক পরিবেশের ফলে সামাজিক রুচির বিরুদ্ধতা। সুতরাং কোনও বিশেষ সমাজের বিমুখ রুচিকে অন্য সমাজের দৃষ্টান্তে এখানে অগ্রাহ্য করা চলে না।

আমার মতে শাস্ত্রীয় বিবাহের গণ্ডি কিছু খাটো করে, এবং লৌকিক বিবাহের গণ্ডি অনেকটা বাড়িয়ে বিবাহ-নিষেধের সম্বন্ধ-গণ্ডিকে এক করা উচিত। পৈঠীনসির বিধি স্বীকার করলে আপাতত কাজ চলতে পারে। এবং তাতে দু' রকম বিবাহ-বিধি রাখার একটা কারণ লোপ হয়।

এ পর্যন্ত হিন্দু-বিবাহ আইনের খসড়ার যে আলোচনা করেছি তাতে আমার মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায়।

১। 'শাস্ত্রীয়' ও 'লৌকিক' দু' রকম পৃথক বিবাহবিধি থাকবে না। হিন্দু বিবাহবিধি হবে এক রকম।

২। সে বিধিতে বর-কন্যার অসবর্ণত্ব বৈধ বিবাহের বাধা হবে না।

৩। সগোত্র বা সমানপ্রবর বর-কন্যার বিবাহ হতে পারবে।

৪। বিবাহের সপিণ্ডত্ব পৈঠীনসির মতানুযায়ী হবে পিতৃপক্ষে পাঁচ ও মাতৃপক্ষে তিন।

৫। বিবাহ হবে একপত্নীক।

কমিটি যেমন প্রস্তাব করেছেন তিন আইন অনুসারে কোনও হিন্দু, যিনি নিজেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করেন, তার বিবাহ হবে না। ওই আইন বা অনুরূপ আইন থাকবে তাঁদেব জন্য যাঁরা 'ব্রাত্য'— যারা সংস্কাররহিত; যাঁরা কোনও ধর্মমতকে সামাজিক বিধির নিয়ামক স্বীকার করেন না। ভবিষ্যৎ কালের এক অখণ্ডজাতি ভারতবর্ষের তাঁরা সম্ভব পথপ্রদর্শক অগ্রদল। তাঁদের নমস্কার কবি। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজ নূতন কলেবর নিয়ে শক্তিমান হয়ে গড়ে উঠুক।

রাও বিল

রাও কমিটির প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বা সংহিতার প্রধান লক্ষ্য দুইটি— (১) ব্রিটিশ ভারতের হিন্দুরা এখনও যেসব বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু আইন দ্বাবা শাসিত সেসব বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইনের প্রবর্তন; (২) প্রাচীন হিন্দু আইনের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী যে সকল সংস্কার বা পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই সকল সংস্কার ও পরিবর্তনেব ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্য দুইটির প্রথমটি ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত হিন্দুকে এক অখণ্ড হিন্দুজাতিরূপে পরিণত করার একটি বড় উপায়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দুর মধ্যে বর্তমান অবস্থায় ধর্ম ছাড়াও অন্য যোগসূত্র নিতান্ত প্রয়োজন। দেশের মধ্যে হিন্দু সংগঠনের যে কথা শোনা যায়, সেই সংগঠনের এ একটি প্রধান উপায়। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইন প্রবর্তনের উপায়— বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে এক আইনের রূপ দেওয়া।

রাও কমিটির প্রস্তাবিত সংহিতার দ্বিতীয় লক্ষ্যটি এইজন্য প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ

রাজ্যশাসনের প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে উপায়ে হিন্দু আইনের সংস্কার হত সে সব উপায় এখন অসম্ভব হওয়ায় হিন্দু আইনের স্বাভাবিক পরিণতি ও সংস্কারের ধারা বন্ধ হয়েছে। আইনসভায় হিন্দু আইনের সংস্কার না করলে বর্তমান কালোপযোগী তার সংস্কার আর সম্ভব নয়।

রাও কমিটির প্রস্তাবিত সংহিতা সম্বন্ধে যে সব আন্দোলন ও আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে দুইটি বিষয় নিয়েই সচরাচর আলোচনা দেখা যায়— (১) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন; (২) হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে রাও কমিটির প্রস্তাবের মর্ম এই রকম : নিকট সম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি দায়ভাগের অনুসরণ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি মিতাক্ষরার অনুসরণ। কারণ, নিকট সম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে দায়ভাগের বিধান মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অধিকতর অনুরূপ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মানুষের বিশেষ কোনও স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে না। সেখানে একটি ন্যায়সম্মত সরল বিধিরই বিশেষ প্রয়োজন এবং মিতাক্ষরার বিধি এইরূপ ন্যায়বিধি ও দায়ভাগের বিধির চেয়ে অনেক সরল।

দ্বিতীয়ত, রাও কমিটির প্রস্তাবে স্ত্রীসম্পর্কীয়দের উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রচলিত আইনের তুলনায় বেশি স্বীকার করা হয়েছে। এই স্বীকারের বিরুদ্ধেই বিরুদ্ধমত সবচেয়ে প্রবল। বিশেষত, বাপের সম্পত্তিতে মেয়েকে ছেলের অর্ধেক অংশ দিবার যে প্রস্তাব তার বিরুদ্ধেই বিশেষ আপত্তি। আপত্তিকারীগণ বলেন যে, এতে হিন্দুর সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে হিন্দুর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটবে। এই আপত্তি ও আশঙ্কা ভিত্তিহীন। আপত্তিকারীগণ ভুলে যান যে, সম্পত্তির যাতে ভাগ বেশি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য করেই হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত হয়নি। তা হলে পিতার এক পুত্র অথবা দুই পুত্র মাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তি পাবে, এইরূপ বিধান হত। সেইরূপ বিধানের অনুবর্তন প্রয়োজন, একথা কোনও আপত্তিকারী এ পর্যন্ত বলেননি। উত্তরাধিকার আইনের একটি প্রধান লক্ষ্য— যাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়, তাদের উত্তরাধিকারী করা। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই উত্তরাধিকারের একমাত্র, এমনকী প্রধান উদ্দেশ্য নয়। বাপের বিষয়ে মেয়ের অংশ ও সে অংশ ছেলের অর্ধেক নির্ধারণ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। যাঁরা এই ব্যবস্থায় হিন্দুর আর্থিক অবনতির আশঙ্কা করেন, তাঁরা সম্ভব ভেবে দেখেননি যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যে এবং বহু দেশে ছেলে ও মেয়ের একসঙ্গে উত্তরাধিকার প্রচলিত আছে এবং তাতে তাদের আর্থিক অবস্থা হীন হয়েছে, এর কিছুমাত্র প্রমাণ নেই। কেহ কেহ আপত্তি তুলেছেন, মেয়েরা যখন স্বামীর উত্তরাধিকারিণী তখন তাদের পিতার উত্তরাধিকারিণী করা উচিত নয়। একজনের উত্তরাধিকারিত্ব অপর জনের উত্তরাধিকারিত্বে বাধা হওয়া কোনও ন্যায়ই সমর্থন করে না—যেমন একথা কেহ বলে না যে, ছেলে যখন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী— তখন তাকে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে রাও কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাদের নির্ব্যূঢ়স্বত্ব স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃত কথা, এক দায়ভাগশাসিত বাংলাদেশ ছাড়া মিতাক্ষরাশাসিত সমস্ত ভারতবর্ষেই এইরূপ নির্ব্যূঢ়-স্বত্বই স্বীকৃত। মিতাক্ষরাকার সুস্পষ্টভাবে সেই ব্যবস্থা

দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র প্রিভি কাউন্সিলের নজির সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রী-উত্তরাধিকারীগণের সেই স্বত্ব লোপ হয়েছে। দায়ভাগ প্রচারিত স্ত্রী-উত্তরাধিকারীগণের জীবন-স্বত্বের বিধি— যা শাস্ত্রবলে নয়, প্রিভি কাউন্সিলের নজিরবলে এখন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত আইন, তার ফল যে কিছুমাত্র মঙ্গলকর নয়— তা প্রত্যেক আইন-ব্যবসায়ী অবগত আছেন। এ নিয়ে যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তা স্ত্রী-উত্তরাধিকারীগণের নিরর্থক ক্লেশকর। সম্পত্তির শেষপুরুষ— অধিকারীর যে পুরুষ ওয়ারিশগণের হিতার্থে এই জীবনস্বত্ব কল্পিত, তারা প্রায়শই দূর সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাদের অনুকূলে নিজের অত্যন্ত নিকট স্ত্রী-ওয়ারিশগণের সম্পত্তিভোগে বাধা জন্মানোর কিছুমাত্র অর্থ নেই। কয়েক বছর হল এক প্রস্তাবিত আইনে মা ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। মা যেখানে নিজের জীবনান্ত এই উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তি ছেলের জন্য না রেখে বিক্রি করবেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে শতকরা নব্বইটি জায়গায় উপযুক্ত কারণ আছে।

২

এই উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে অনেক হিন্দুর মনে একটা ভুল বিশ্বাস আছে। তাঁরা মনে করেন যে, হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইনের পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্মে আঘাত লাগবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-প্রসূত! দায়বিভাগ বিধি ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তর্বর্তী। ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহাব অধ্যায় যাকে ইংরেজিতে রিলিজিয়ন বলে, তার অন্তর্গত নয়। কারণ, ধর্মশাস্ত্র-বেত্তাগণ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্যবহারবিধি ও উত্তরাধিকার বৈদিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ওদের ভিত্তি অর্থশাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধি। সুতরাং উত্তরাধিকার বিধির পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নে কোনও আঘাত লাগে না। লোক ব্যবহারের উপর যার প্রতিষ্ঠা, লৌকিক অবস্থার পরিবর্তনে তার পরিবর্তন না ঘটলে লোকযাত্রা ও সমাজযাত্রা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় না। সেই জন্য দায়ভাগকার জীমূতবাহন বাংলাদেশে অন্যত্র প্রচলিত উত্তরাধিকারবিধির পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন।

কথাটার একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

৩

হিন্দু দায়াধিকার বিধি হিন্দুধর্মের অঙ্গ; সুতরাং তার পরিবর্তনে ধর্মে আঘাত লাগে এই বিশ্বাসের মূলে আছে একটা ভুল ধারণা। সে ধারণা হচ্ছে— হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম কথাটা ইংরেজি রিলিজিয়ন শব্দের সমার্থবাচক। এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ধর্মশাস্ত্র কি তার টীকাকারদের মত থেকে নয়, কয়েকজন ইউরোপীয় লেখকের গ্রন্থ থেকে। এই সব লেখক হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে অপ্রমাণের জন্য একটি মত খাড়া করেছিলেন। হিন্দুর আইন তার ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ন থেকে পৃথক হয়ে পরিণতি লাভ করেনি। সকল সমাজেই আদিতে ধর্ম ও আইন অবিশ্লেষিত অবস্থায় থাকে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ন থেকে আইন স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এইসব ইউরোপীয় লেখকেরা প্রচার করেছিলেন যে, হিন্দু সভ্যতা এই শেষ স্তরে পৌঁছতে পারেনি। হিন্দুর রিলিজিয়ন ও আইন চিরদিন অবিশ্লেষিত অবস্থায় থেকে গেছে। ইংরেজ লেখক হেনরি মেইন এই মতের একজন প্রধান প্রচারক। তাঁর প্রাচীন আইন বা 'এনসেন্ট ল' নামক পুথি আমাদের দেশের আইন পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পড়তে হয়। এই পুথিতে মেইন তাঁর মত প্রচার করেছেন। হিন্দু সভ্যতার কুৎসাকারীদের এই মতকে সাহেবের লেখা বলে কোনও অনুসন্ধান না করেই আমরা মাথা পেতে নিয়েছি এবং গর্বের সঙ্গে প্রচার করছি যে, আমরা হিন্দুরা ধমপ্রাণ জাতি, আমাদের যা কিছু সবই ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকারগণ ও ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা নিবন্ধকারগণ রিলিজিয়ন ও আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা নির্দেশ করেছেন। ওর প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক, দ্বিতীয়টি লৌকিক। একই ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থে এই উভয়বিধ জিনিসের আলোচনা আছে, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা আছে। ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম কথাটির অর্থ 'কর্তব্য'। কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিধি ও নিষেধ ধর্ম শব্দের অর্থ।

মনুসংহিতার আরম্ভে আছে, ঋষিগণ ভগবান মনুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে সমস্ত ধর্ম আনুপূর্বিক জানতে চেয়েছিলেন। সেই ধর্ম শব্দের ব্যাখ্যায় মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখেছেন: "ধর্ম শব্দঃ কর্তব্যতাবচনঃ। ধর্ম শব্দঃ কর্তব্যাকর্তব্যয়োবিধি প্রতিষেধয়ো দৃষ্ট প্রয়োগঃ।" এর অর্থ পূর্বেই বলেছি। এই যে কর্তব্য ও অকর্তব্য এটা হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত রকম কর্তব্য ও অকর্তব্যকে সূচিত করে। যে সকল করণীয় ও অকরণীয় ঐহিক নয় পারত্রিক, সেগুলি রিলিজিয়ন অর্থে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। আর যে কর্তব্য ও অকর্তব্য ঐহিক তারা ধর্ম; কিন্তু নন-রিলিজিয়স। রিলিজিয়ন অর্থে যে ধর্ম তার মূল হচ্ছে বেদ। আর যে ধর্ম নন-রিলিজিয়স তার মূল বেদ নয়, তার মূল লোকাচার ও লোকপ্রসিদ্ধি। বেদ হচ্ছে সেই ধর্মের প্রমাণ যা অন্য কোনও প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না। বেদ শব্দের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেন— "বিদন্তি অনন্য প্রমাণ বেদ্যং ধর্মলক্ষণমর্থমস্মাদিতি বেদঃ" অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয় অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় অন্য কোনও প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না তাই জানিয়ে দেয় বলেই বেদের নাম বেদ— যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হয় অন্য কোনও প্রমাণেই তা জানা যায় না, সুতরাং এখানে বেদই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গলের যে সকল উপায় লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় সেটা বেদের বিষয় নয়,

লৌকিক জ্ঞানের বিষয়। কারণ সেখানে বেদের কোনও প্রয়োজন নেই। মেধাতিথি লিখেছেন— "শ্রেয়ঃ সাধনং কৃষি সেবাদি ভবতি। পুরুষস্য কর্তব্য ত্বস্য চ তৎসাধনস্বভাবঅন্বয় ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে। যাদৃশেন ব্যাপারেন কৃষ্যাদেঃ বৃহ্যাদিসিদ্ধিঃ সাপি প্রত্যক্ষাদবগম্য এব। যাগাদেস্তু সাধনত্বং যেন চ রূপেন অপূর্বোৎপত্তি ব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদি অবগম্যম্" অর্থাৎ "কৃষি ও চাকুরি করে" মানুষের শ্রেয় সাধন হয় এ জ্ঞান লৌকিক, অন্বয়-ব্যতিরেকে প্রমাণ দ্বারাই লোকে জানতে পারে। কি উপায়ে কৃষিকার্যের ফলে ধান প্রভৃতি ফসল ফলান যায় তা প্রত্যক্ষ প্রমাণেই মানুষ জানতে পারে। কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদির ফলে যে এক অপূর্ব-ফলোৎপত্তি হয়ে পরকালে মানুষকে সুফল দেয় তা প্রত্যক্ষাদি কোনও লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না। সুতরাং এখানে বেদ প্রমাণ। কৃষি ও চাকুরিতে মানুষের ফললাভ, কি চাষের উপায়— এই জ্ঞানের প্রমাণ বেদ নয়। বেদে যদি এ সম্বন্ধে কোনও কথা থাকে তবে তা প্রসঙ্গত, মীমাংসকদের ভাষায়, অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত বেদ অর্থাৎ বিধিনিষেধের তা অঙ্গ নয়।

যে সকল ধর্মসংহিতা সম্পূর্ণাঙ্গ তাদের তিনটি ভাগ। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির তিন অধ্যায়— আচার অধ্যায়, ব্যবহার অধ্যায় ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়। মনুসংহিতায় এই তিন ভাগ আছে। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিব অধ্যায় ভাগ করে তাদের বিভাগ দেখানো হয় নাই। মনুসংহিতার শেষ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে। এই দুটি প্রধান সংহিতা বা ধর্মশাস্ত্রে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশমূলক অধ্যায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহার অধ্যায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

বেদ প্রমাণে ও অন্য লৌকিক প্রমাণে কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মেধাতিথি লিখেছেন যে, 'অন্যত্র যেমন ব্যবহার স্মৃতি প্রভৃতিতে জ্ঞান ন্যায়মূল, অর্থাৎ বেদমূল নয়, তা ক্রমে প্রদর্শিত হবে।' "অন্যত্রাপি ব্যবহারস্মৃত্যাদৌ যত্র ন্যায়মূলতা স্তত্র যথাবসরং দর্শয়িষ্যাম্।" এবং মনুর সপ্তম অধ্যায়ে, যেখানে রাজধর্মের বিবরণ আরম্ভ হয়েছে সেখানে মেধাতিথি লিখেছেন, "প্রমাণান্তরমূলোহি অত্র ধর্মা উচ্যন্তে। ন সর্বে বেদমূলাঃ।" অর্থাৎ, এখানে যে ধর্ম বলা হচ্ছে, তার মূল অন্য প্রমাণ, এই ধর্মের সমস্ত বেদমূল নয়।

শাস্ত্রকারেরা এবং নিবন্ধকারগণ কেন যে ব্যবহার স্মৃতিকে বেদমূল নয় বলেছেন এবং অন্য লৌকিক প্রমাণ সাপেক্ষ বলেছেন তার কারণ ব্যবহার স্মৃতি কোনও বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ— তার উপর একটু চোখ বুলালেই বুঝা যায়। ব্যবহার স্মৃতির বিষয় হচ্ছে আমরা এখন যাকে বলি মামলা মোকদ্দমা। মিতাক্ষরাকার লিখেছেন— "অন্য বিরোধেন স্বাত্ম- সম্বন্ধিতয়া কখনং ব্যবহারো, যথা কশ্চিদিদং ক্ষেত্রাদি মদীয়ং ইতি কথয়তি। অন্যেপিতদ্ বিরোধেন মদীয়ং ইতি" অর্থাৎ একই বস্তুতে দুই ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ স্বত্বের দাবির নাম ব্যবহার— যেমন যদি একজন লোক বলে এ শস্যক্ষেত্র আমার ও অন্য লোক বলে ওই শস্যক্ষেত্র তার, তা হলে তাকে বলে ব্যবহার।

ব্যবহার স্মৃতির কাজ সাংসারিক ভোগের বস্তুতে বিভিন্ন লোকের বিরোধী দাবির বিচারের উপায় নির্ণয় করা। সুতরাং ও স্মৃতিতে আছে, রাজার বিচারসভায় কারা সভ্য হবেন, কি প্রণালীতে তাঁরা বিচার করবেন, কোন প্রমাণ গ্রাহ্য, কোন প্রমাণ অগ্রাহ্য এবং যে

সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে লোকের বিরোধী দাবি হতে পারে, মোটামুটি তাকে ১৮ ভাগে ভাগ করে তার আইনের ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রে এর নাম "অষ্টাদশ বিবাদ পদানি।" এর মধ্যে আছে— ঋণ, তার সুদ ও তার পরিশোধের আইন, নানাবিধ চুক্তির আইন, ক্রয় বিক্রয়ের আইন, জমির সীমা নিয়ে বিবাদের আইন, নানারকম অপরাধের ফৌজদারি আইন ইত্যাদি। অর্থাৎ মোটামুটি প্রাচীন হিন্দু আইন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ আদালতে ইংরেজের প্রবর্তিত আইন দ্বার যেসব বিষয়ের বিচার হিন্দু, কি মুসলমান আজ মেনে নিচ্ছে। এতে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হয়েছে, অতি বড় সনাতনীও এমন কথা বলেন না।

এই সকল নিতান্ত লৌকিক বিষয়, যার ফলাফল ও মঙ্গলামঙ্গল হাতে হাতে পাওয়া যায় এবং মানুষের স্বাভাবিক লৌকিক জ্ঞানে যে বিধিব্যবস্থা করা যায়, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কি তাদের ভাষ্যকারেরা তা রিলিজিয়নের অঙ্গ সুতরাং অপরিবর্তনীয় একথা কখনও মনে করেননি। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের ভার তাঁদের উপর ছিল। সুতরাং কাণ্ডজ্ঞানহীন গোঁড়ামি করার অবসর তাঁদের ছিল না। তার উপর তাঁরা ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন, সাংসারিক জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান পণ্ডিত। সেইজন্য তাঁরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্যবহার স্মৃতি লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক ব্যবহারের উপর স্থাপিত।

হিন্দুর দায়বিভাগ এই ব্যবহার স্মৃতির অন্তর্গত। সুতরাং এর মূল বেদ নয় এবং রিলিজিয়ন অর্থে দায়ভাগ হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়। স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে একটা তর্ক প্রচলিত ছিল— বস্তুর উপর স্বামিত্ব, কি স্বত্ব, শাস্ত্র-প্রমাণের বিষয়, না লোক-প্রসিদ্ধির বিষয়। সকল স্মৃতিকার একবাক্যে বলেছেন যে, বস্তুর উপর স্বত্ব কি স্বামিত্ব শাস্ত্র-প্রমাণের বিষয় নয়, লৌকিক স্বীকৃতির বিষয়। মিতাক্ষরাকার বলেছেন যে, তা না হলে যে সকল অহিন্দু প্রত্যন্তবাসী শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রাহ্য করে না, তাদের মধ্যেও বস্তুর স্বামিত্ব স্বীকৃত হয় কি করে? যে সকল বিভিন্ন প্রকারে বস্তুতে লোকের স্বামিত্ব জন্মে, স্মৃতিশাস্ত্রে তার ফর্দ দেওয়া আছে। কিন্তু ভাষ্যকারেরা বলেছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রে ওই ফর্দ আছে বলেই ওকে শাস্ত্রের বিধি বলে মনে করতে হবে না। মিতাক্ষরাকার এর উদাহরণে যা বলেছেন, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তা সকল সংশয় নিরসন করে। তিনি বলেছেন, 'যদ্যপি পত্নী দুহিতরশ্চ ইত্যাদি স্মরণং তত্রাপি স্বামী সম্বন্ধিতয়া বহুর্ষু দায়বিভাগিতয়া প্রাপ্তেষু লোকপ্রসিদ্ধেপি স্বত্বে ব্যামোহ নিবৃত্যর্থং স্মরণমিতি সর্বমনবদ্যং' অর্থাৎ যেমন পুত্রহীন লোকের ধনের কারা অধিকারী হবে, সে সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য "পত্নী দুহিতরশ্চ" ইত্যাদি বচনে নির্দেশ দিয়েছেন, তবু এটা শাস্ত্রের বিধি নয়, কিন্তু ধন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কবশত বহু লোক তার সম্পত্তিতে অধিকার দাবি করতে পারে, এজন্য লোকের সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য এই বচন বলেছেন, যদিও এ দায়াধিকার বচনের উপর নয়— লোকপ্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করে, তেমনি সম্পত্তি অর্জনের নানারূপ উপায় আছে অন্য স্মতিশাস্ত্রে সে সব উপায় বলা হয়েছে, বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্যে নয়, লোক-প্রসিদ্ধ ব্যাপারের বর্ণনা হিসাবে।

এর পর যে দুটি বিখ্যাত শ্লোক যাজ্ঞবল্ক্য নির্দেশ করেছেন, কোন কোন স্বোপার্জিত সম্পত্তি উপার্জনকারী নিজে রাখতে পারবেন, পরিবারের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে না। তার টীকার এক জায়গায় মিতাক্ষরাকার লিখেছেন যে, এই প্রকরণের বচনগুলি

প্রায়ই যা লোক-প্রসিদ্ধ ব্যবহার তারই অনুবাদ মাত্র অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি নয়। "লোকপ্রসিদ্ধস্যৈবানুবাদকান্যেব প্রায়েনাস্মিন প্রকরণে বচনানি।" লক্ষ্য করার বিষয়, "অস্মিন প্রকরণে" 'এই প্রকরণে' যে প্রকরণের কথা মিতাক্ষরাকার বলেছেন, সে হচ্ছে— দায়বিভাগ প্রকরণ। সুতরাং মিতাক্ষরাকারের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহার অধ্যায়ের দায়ভাগ প্রকরণের বিধিগুলি বেদমূল নয়, অর্থাৎ হিন্দু রিলিজিয়নের অঙ্গ নয়, লোক-প্রসিদ্ধ ও লোক-ব্যবহার সে বিধির স্রষ্টা। মিতাক্ষরার অনেক পরবর্তী গ্রন্থ "বীর মিত্রোদয়" সোজাসুজি বলেছেন, "প্রায়েণ ব্যবহার-স্মৃতীনাং লোকসিদ্ধার্থানুবাদকত্বমিতি সকল নিবন্ধৃভিরভিধানাৎ", অর্থাৎ ব্যবহার স্মৃতির প্রায় বচনগুলি যা লোকসিদ্ধ তারই অনুবাদক— এই কথা সকল নিবন্ধকার বলেছেন।

যাঁরা আপত্তি তুলেছেন যে, হিন্দু দায়াধিকার বিধি পরিবর্তন করলে হিন্দুধর্মে আঘাত লাগবে, ধর্মশাস্ত্রকারগণ ধর্ম বলতে কি বুঝতেন, তার কোনও খবর তাঁরা রাখেন না। রাষ্ট্র বা সমাজে কোনও কিছু পরিচালনের দায়িত্ব আমাদের নেই বলে সব কিছুতেই ধর্ম গেল রব তোলা সম্ভব হয়েছে। সে দায়িত্ববোধ থাকলে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে দায়বিভাগের প্রচলিত বিধির পরিবর্তনে ধর্মহানির কথা কখনও উঠতে পারত না।

দায়ভাগ যে ধর্মের অঙ্গ— এই ভুল বিশ্বাস বাঙালির মনে হওয়ার একটা অতিরিক্ত কারণ আছে। বাঙালি হিন্দু জীমূতবাহনের দায়ভাগদ্বারা শাসিত। জীমূতবাহন অন্যত্র প্রচলিত দায়বিভাগক্রমকে পরিবর্তন করেছিলেন। সেই পরিবর্তনের জন্য তিনি একটা তর্ক আশ্রয় করেছিলেন। সে তর্ক হচ্ছে এই পার্বণ— শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে যে যত বেশি উপকার করে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে তার দাবি তত বেশি। পার্বণ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান হিন্দুর আচারধর্মের অন্তর্গত। সুতরাং মনে হতে পারে যে, দায়ভাগের দায়াধিকার বিধি হিন্দুধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দায়ভাগ গ্রন্থ যিনি পাঠ করেছেন, তিনিই জানেন যে, এই তর্কটা হিন্দুধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জীমূতবাহন আদৌ মনে করেননি। এই তর্কটা জীমূতবাহন নিয়েছিলেন উদ্যোত নামা একজন পূর্বাচার্যের কাছ থেকে। উদ্যোতের কোনও গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। দায়ভাগ থেকে যতদূর বোঝা যায়, কি উদ্যোত, কি জীমূতবাহন— দুজনেই এই তর্কটিকে ন্যায়ের যুক্তি বলেছেন, ধর্মের অনুশাসন বলেননি। জীমূতবাহন এই কথা বলে তাঁর বিচার শেষ করেছেন, "তদর্জিত ধনস্য চ তদুপকারতারতম্যেন তদর্থ্য সম্পাদনস্য ন্যায্যত্বাৎ উপকারকৃত্ত্বনৈব ধনসম্বন্ধো ন্যায়প্রাপ্তো মন্বাদীনামভিমতমিতি মন্যতে। অর্থাত্রাপরিতোষোবিদুষাং বাচনিক এবায়মর্থঃ।" অর্থাৎ যার ধন পিণ্ড দানের তারতম্যে তার উপকারের তারতম্য হয়। সুতরাং বেশি উপকারীর ধনের উত্তরাধিকার দাবি ন্যায্য ও ন্যায়প্রাপ্ত— যাজ্ঞবল্ক্য মনু প্রভৃতির এইরূপ অভিমত— ইহাই আমি মনে করি। এতেও অর্থাৎ এইরূপ তর্কেও যদি পণ্ডিতেরা তুষ্ট না হন, তা হলে বলি যে, মনু প্রভৃতির বচন থেকেও আমি যে উত্তরাধিকার ক্রম স্থাপন করেছি, তা পাওয়া যায়। এর টীকায় দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার বলেছেন, "যতো ন্যায়মূলত্বে বিদুষামসন্তোষঃ ততো বাচনিক এবার্থ ইতি" অর্থাৎ যদি ন্যায়মূলক এই তর্কে পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট না হন, তবু জীমূতবাহনের মত ঋষিদের বচন থেকেও পাওয়া যায়। এটা সুস্পষ্ট যে

জীমূতবাহন তাঁর দায়ক্রম বিধিকে বেদমূল বলেননি, বলেছেন ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ ন্যায়মূল। দায়ভাগের উত্তরাধিকারবিধি জীমূতবাহন হিন্দুধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নের উপর প্রতিষ্ঠা করেননি, করেছেন ন্যায়ের বা যুক্তির উপর।

অনেকে জানেন বাংলা ভিন্ন সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে মোটামুটি মিতাক্ষরা দ্বারা লোকে শাসিত, পার্বণশ্রাদ্ধে পিণ্ডের উপর দায়াধিকার নির্ভর করে না, নির্ভর করে রক্ত সম্পর্কের উপর। রক্ত সম্পর্কে যে যত নিকট মিতাক্ষরার মতে সে তত নিকট উত্তরাধিকারী। আশা করা যায়, রক্ত সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের বীজ কেহ খুঁজে বের করবেন না।

হিন্দুর দায়বিভাগ যে হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ, এটা হিন্দু সভ্যতাকে খাটো করার জন্য পশ্চিম দেশে কোনও কোনও লেখক প্রচার করেছিলেন। আমরা সেই প্রচারকে প্রশংসাবাক্য জ্ঞানে মাথায় করে নিয়েছি। হিন্দু শাস্ত্রকর্তাগণ প্রকৃত কি বলেছেন, তা জানবার জন্য আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। যে অনড় অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, যা তার অনুকূলে তাই হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি—তাতে অনেকেই সন্দেহ করে না। কারণ, অনেক মানুষই—যা বিশ্বাস করলে মন খুশি হয়, তাই বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক হতে পারে, তা তারা মনে করতে চায় না। কেউ প্রমাণ করে দেখালে তার উপর বিরক্ত হয় ও গালাগালি করে।

৪

রাও কমিটির প্রথম খসড়ায় বিবাহকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল—শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহ। প্রচলিত হিন্দু বিবাহে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, শাস্ত্রীয় বিবাহে সে সমস্তই বলবৎ রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবব বর-কন্যার মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরিবর্তন কেবলমাত্র এইটুকু ছিল যে, বিবাহ হবে একপত্নীক, অর্থাৎ এক পত্নী বর্তমানে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলবে না। প্রস্তাবিত লৌকিক বিবাহে অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার বিবাহ বৈধ বিবাহ করা হয়েছিল। কেবল কতকগুলি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত বর-কন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য এই বিবাহও ছিল একপত্নীক। এই দুই শ্রেণির বিবাহে ব্যাবহারিক ফল একরকম হবে—এই নির্ধারণ ছিল। অর্থাৎ উভয় প্রকার বিবাহিত স্বামী স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততিরা এক হিন্দু দায়াধিকার আইনে শাসিত হবে। লৌকিক বিবাহের ফলে কেহ তার পরিবার থেকে বিচ্যুত হবে না বা দেবোত্তর প্রভৃতির সেবাইতি থেকেও বঞ্চিত হবে না, দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা লোপ হবে না এবং লৌকিক বিবাহকারী পুত্রকে মৃতগণ্যে তার পিতার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা হবে না। হিন্দু বিবাহের এই দুই শ্রেণি ভাগের উদ্দেশ্য ছিল সনাতন-পন্থীদের আশ্বস্ত করা। শাস্ত্রীয় বিবাহে যখন চলতি সব নিষেধ বহাল থাকল তখন একটা অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহ স্বীকারে ক্ষতি কি? কিন্তু এইরকম শ্রেণি ভাগের বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি আছে, প্রথম—এই শ্রেণি ভাগের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। কারণ সনাতনীদের তুষ্ট করে যদি এ আইন পাশ করাতে হয়, তবে এ আইন পাশ হবে না। কারণ দুই রকম বিবাহের

ব্যাবহারিক ফল যেখানে এক, অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহে পতি-পত্নীর হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে সকল দাবি যখন সম্পূর্ণ বহাল থাকবে, তখন সনাতনপন্থী তুষ্ট বা আশ্বস্ত হবে কীসে? সনাতনপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইন যদি পাশ হয় তা হবে তাদের মতের জোরে যারা সমগ্র হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তন চায়, সমাজের বিধিবন্ধন থেকে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি মাত্র চায় না। এই শ্রেণি বিভাগের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এবং যা প্রধান আপত্তি তা হচ্ছে—এই শ্রেণি ভাগ হিন্দু বিবাহবিধির সংস্কার নয়, হিন্দুকে হিন্দু বিবাহবিধি অগ্রাহ্য করে বিবাহের স্বাধীনতা দেওয়া। এইরকম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু সমস্ত সমাজের উপর তার ফল গৌণ ফল। হিন্দুর বর্তমান সমাজ এই গৌণ উপায়ে পরিবর্তনের চেষ্টার যুগ ছেড়ে এসেছে। এখন প্রয়োজন, সমস্ত সমাজের হিতে হিন্দুর সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন, যার ফলে হিন্দু সমাজ দৃঢ় গড়ন ও নূতন বল পাবে।

এই সব আপত্তির ফলে রাও কমিটি বর্তমান যে খসড়া প্রকাশ করেছেন. তাতে শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহের শ্রেণিভেদটা বহাল থাকলেও তার মধ্যে ভেদরেখা অতি অস্পষ্ট। এই শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহবিধির এক পরিবর্তিত ব্যবস্থার প্রস্তাব হয়েছে। সে বিধিতে অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার বিবাহে বাধা নেই; বরকন্যা সপিণ্ড ও বিশিষ্ট নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেই হল। প্রথম খসড়ার একপত্নীক বিবাহের নিয়ম এতেও বহাল আছে। এই শাস্ত্রীয় বিবাহ ও প্রস্তাবিত লৌকিক বিবাহের মধ্যে প্রকৃত তফাত কিছুই নেই। সুতরাং এই লৌকিক বিবাহের প্রস্তাবটিকে প্রস্তাবিত হিন্দু বিবাহ আইন থেকে বর্জন করলে কিছুই ক্ষতি হয় না এবং তা করা উচিত। লৌকিক বিবাহ বা সিভিল ম্যারেজ ধর্মের গণ্ডির কোনও অর্থ নেই। সুতরাং সেই রকম বিবাহকে হিন্দু বিবাহের অর্থাৎ ধর্মের গণ্ডির মধ্যে বিবাহের একটা শ্রেণি গণ্য করার কোনও অর্থ হয় না।

হিন্দু বিবাহ হিন্দুর ধর্মাচারের অঙ্গ। সুতরাং বিবাহ-বিধির পরিবর্তন এই আচারের পরিবর্তন। কাজেই এ আপত্তি উঠা কিছুই বিচিত্র নয় যে, বিবাহ-বিধির এ রকম পরিবর্তন হিন্দু ধর্মকে আঘাত করে। এ রকম আপত্তির উত্তর—হিন্দুর আচার প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কারণ তা না হলে কোনও সমাজ বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। এই বিবাহ-বিধিতেই গৌতমস্মৃতির সময় বিভিন্ন বর্ণের বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময় বর্ণগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বরের সঙ্গে নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ বৈধ ছিল। সমাজ থেকে এই রকম অনুলোম বিবাহ খুব বেশি দিন লোপ হয়নি। ব্রাহ্মণের শূদ্রা পত্নী বিবাহ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য অবৈধ বলেননি; কিন্তু নিন্দা করেছেন। এই রকম বিবাহ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময়ের পরেও যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি : "কাদম্বরী"র গ্রন্থকার বাণভট্ট তাঁর "হর্ষচরিতে" লিখেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং পিতার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত তাঁর দুটি ভাই ছিল। অথচ বাণভট্ট গর্ব করে লিখেছেন যে, তাঁর বংশ এই রকম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ যে, তাঁদের বাড়ির শুক পাখিরাও শুনে শুনে বেদমন্ত্র গান করত। বাণভট্ট সত্য বা ত্রেতার লোক নন। মহারাজ

হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ, যেমন কালিকা পুরাণে কলিকালে কোন কোন আচার বর্জনীয়, তার ফর্দ আছে। এই ফর্দগুলিই প্রমাণ যে, হিন্দুর আচার যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি হয়তো ইচ্ছাকৃত আর কতক সময়ের ও অবস্থার চাপে। অবস্থার চাপে যে সামাজিক আচার পরিবর্তন করতে হয়, ব্রাহ্মণ নির্বিশেষে বর্তমান হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহের বয়স তার একটি প্রমাণ। অতিবড় সনাতনীও এখন কন্যার বিবাহের বয়সে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিনিষেধ মানতে পারেন না। সুতরাং হিন্দুর বিবাহ-বিধির সংস্কার বর্তমানে প্রয়োজন কি না, সেই কথাই বিবেচনার বিষয়; প্রাচীন আচার ও শাস্ত্রবিধি মাত্র তার নিয়ামক নয়।

প্রথম ধরা যাক, বর্তমান সমাজে অসবর্ণ বিবাহের নিষিদ্ধতা। প্রাচীন হিন্দু সমাজে যে বর্ণবিভাগ, তার সঙ্গে বর্তমান সমাজে বিবাহে জাতিভেদের গণ্ডি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ বোঝা যায়। এখন যে জাতিভেদ বিবাহে বাধা, তা এই চারি বর্ণের ভেদ নয়; বহু জাতি ও উপজাতির ভেদ। এই ভেদ হিন্দু সমাজকে বহু ভাগে বিভক্ত ও নিতান্ত দুর্বল করেছে এবং দিন দিন বেশি দুর্বল করছে। এই জাতিভেদে বিবাহের বাধা উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা যাকে বলে নিম্নশ্রেণির হিন্দু, সেই নিম্নশ্রেণির হিন্দুজাতির সংখ্যা লাঘব করে ক্রমশ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এ যাঁর চোখ আছে, তিনিই দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এই সকল বর্ণ ও জাতির মধ্যে বস্তুগত কোনও প্রভেদ খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। মনুর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। তিনি তখনই প্রশ্ন তুলেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রে যে ভেদ, এ কী রকম ভেদ? এ কি গো ও অশ্বের মতো ভেদ যে চোখে দেখলেই চেনা যায়, কোনটা গোরু আর কোনটা ঘোড়া? কিন্তু চোখে দেখে তো চেনা যায় না, কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র। সুতরাং তিনি মীমাংসা করেছেন—এ ভেদ কোনও বস্তুগত ভেদ নয়। প্রাচীনকাল থেকে আগত শাস্ত্রকৃত ভেদ মাত্র। আমাদের হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ভিত্তি জাতির গণ্ডির বাইরে বিবাহে নিষিদ্ধতায়। এই নিষেধকে দূর না করলে হিন্দু সমাজ কোনও দিনই দৃঢ়বদ্ধ এক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে না। এই নিষেধের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক যুক্তির নাম দিয়ে যা সব বলা হয়, সেগুলি যা আছে, তার সমর্থনে মনগড়া কল্পনা মাত্র; সত্যে তার কোনও ভিত্তি নেই। এই নিষেধকে বহাল রেখেও আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে এড়িয়ে হিন্দু সমাজে সংহতি আনার আর যে সব চেষ্টা—যেমন অ-জল-চল জাতির হাতে মাঝে মাঝে সভা করে, জল খেয়ে তাদের কৃতার্থ করা, বৎসরে একবার তাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করে তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন—সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম—নিজের মন ও পরের মনকে ফাঁকি দেওয়া। এই জন্য হিন্দু বিবাহ বিধির সংস্কারে প্রথম প্রয়োজন হিন্দু বিবাহে বরকন্যার অসবর্ণত্বের বাধা দূর করা। সুতরাং রাও কমিটির শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহে এই বাধা দূর করার যে প্রস্তাব হয়েছে, হিন্দু সমাজের মঙ্গলকামী সকল হিন্দুর তা সমর্থন করা উচিত।

প্রচলিত হিন্দু বিবাহে সগোত্র ও সমান প্রবরের বাধার মতো অর্থশূন্য বাধা আর কল্পনা করা যায় না। গোত্র কাকে বলে? থিয়োরি হচ্ছে, জমদগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই কয়েকজনের নামই গোত্র নাম। সুতরাং যে ব্রাহ্মণের

বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রসিদ্ধ, ধরতে হবে তিনি সেই নামের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর। যদি স্বীকার করা যায় এ থিয়োরি সত্য এবং বহু শত পুরুষ পূর্বে সগোত্র স্ত্রীপুরুষ ব্রাহ্মণের এক পূর্বপুরুষ ছিল, কোন যুক্তিতে সেটা বিবাহে বাধা হতে পারে? সপিণ্ড বরকন্যার বিবাহে নিষেধের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, তারাই সপিণ্ড—এক দেহ থেকে যারা উদ্ভূত—"সপিণ্ডতাতু এক শরীরাবয়বান্বয়েন ভবতি" (মিতাক্ষরা)। এই অনাদি সংসারে সকলের মধ্যেই এই রকম সপিণ্ডতা সম্ভব। কিন্তু সেটা অতি প্রসঙ্গ। কারণ তা হলে কোনও বিবাহই সম্ভব হয় না—"তচ্চ সর্বত্র সর্বস্য যথা কথঞ্চিদ নাদৌ সংসারে ভবতাতি প্রসঙ্গঃ" (মিতাক্ষরা)। সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থকে নিতে হবে কাটছাঁট করে একটা নিয়মিত কার্যকরী গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে। "পঙ্কজ" শব্দের অর্থ যেমন করা হয়—

"অতশ্চায়ম্ সপিণ্ড শব্দোহ বয়বশক্ত্যা সর্বত্র প্রবর্তমানেতি নির্মন্থা পঙ্কজাদি শব্দবন্নিয়ত বিষয় এব" (মিতাক্ষবা)। এজন্য বিবাহের সপিণ্ডতা মাতার বংশে পাঁচ পুরুষ ও পিতার বংশে সাত পুরুষেই শেষ হয়। হিন্দু বিবাহে সগোত্র নিষেধের বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারদের এই যুক্তির সুষ্ঠুতর প্রয়োগের ক্ষেত্র আর নেই। যেখানে রক্তের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত, সপিণ্ড সম্বন্ধে সীমার বাহিরে হলেও তার সঙ্গে বিবাহ চলে, আর সেই সীমার মধ্যেও কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা হলে তাকে বিবাহ করা যায়। কিন্তু যেখানে রক্ত সম্বন্ধের কোনও ইতিহাস নেই, কেবলমাত্র বংশপরম্পরাগত একটা নাম সাম্যই বিবাহের অলঙ্ঘনীয় বাধা, এই রকম নিয়ম, যারা কোনও কিছু বোঝাকেই ঘাড় ভেঙে গেলেও ঘাড় থেকে নামাতে ভরসা পায় না, তারা ছাড়া আর কেউ সমর্থন করবে না। তা ছাড়া কল্পিত পূর্বপুরুষ সম্বন্ধ কেবল তো আছে ব্রাহ্মণের। সুতরাং শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রকৃত কোনও গোত্র থাকতে পারে না। পুরোহিতের গোত্র থেকেই তাদের গোত্র কল্পনা করা হয় এবং শূদ্রের বিবাহে কল্পিত সগোত্রও কোনও বাধা নয় : "প্রাগুক্ত মনু শাতাতব বচনে দ্বিজাতি গ্রহণং সগোত্র বর্জনে শূদ্রাদ্যাবৃর্ত্যর্থম্" (উদ্বাহতত্ত্ব)।

প্রববের ব্যাপারটা আরও একটু ঘোরাল। কাকে প্রবব বলে, তার প্রকৃত অর্থ বহুদিন থেকেই হিন্দু সমাজে পণ্ডিতদেরও জানা নেই। প্রতি গোত্রে অনেকগুলি করে আছে। সেগুলিও ব্যক্তিবিশেষের নাম। একটা প্রসিদ্ধি এই যে, প্রবর প্রবর্তক ঋষিরা গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের পুত্র পৌত্র। সুতরাং সগোত্র ও সমান প্রবরের লোকেরা খুব দূর সম্পর্কের হলেও এক বংশের লোক এবং যাদের প্রবর এক তাদের সম্পর্কটা ওরই মধ্যে একটু নিকট। কিন্তু মুশকিল এই যে, ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবরের নাম আছে, যেমন উপমন্যু গোত্রে এক প্রবর। বশিষ্ঠ আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর। বশিষ্ঠ অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হতে পারে। আমরা সবাই জানি যে, সেজন্যই সমান প্রবরের বাধা বিবাহে সগোত্রের অতিরিক্ত আর এক বাধা। এ কি করে সম্ভব? সেইজন্য মেধাতিথি বলেছেন—স্মৃতি যখন বলেছে তখন তা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ ওটি অলৌকিক বস্তু, লৌকিক বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝা যাবে না। প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার ও নিবন্ধকারদের সময় প্রবরের যথার্থ অর্থের স্মৃতিও লোপ হয়েছিল এবং নানা পরস্পরবিরোধী কল্পনা তার স্থান পূরণ করেছিল। যদি পাঠক রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত মাধবাচার্যের প্রবরের ব্যাখ্যার সঙ্গে

"অসপিণ্ডাতু যা মাতুঃ সগোত্রাচ যা পিতুঃ" এই মনু বচনের মেধাতিথির ভাষ্য মিলিয়ে দেখেন তবে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে, কিন্তু এখনও আমরা এই বহুদিন মৃত প্রবরের বাসি মড়া ঘাড়ে করে কষ্ট পাচ্ছি এবং বিবাহের ক্ষেত্রকে অকারণে সংকীর্ণ করে সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনছি।

হিন্দু বিবাহে সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহ নিষেধের বিধি নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিবারণের নিয়ম। এই নিষেধ সকল সমাজের বিবাহ-বিধিতেই কোনও-না-কোনও রকমে আছে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়মে পিতার বংশে সাত ও মাতার বংশে পাঁচ সিঁড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ডি—"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্ধ্ব মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা" (যাজ্ঞবল্ক্য)। রাও কমিটির শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহে এই নিয়মই বহাল রাখা হয়েছে। অনেকে সম্ভব জানেন যে, এ-বিষয়ে সকল শাস্ত্রকার একমত ছিলেন না। কোনও কোনও শাস্ত্রকার এই গণ্ডিকে সংক্ষেপ করে পিতৃপক্ষ পাঁচ ও মাতৃপক্ষ তিন পর্যন্ত মাত্র গণনার বিধি দিতেন—"ত্রীনতীত্য মাতৃতঃ পঞ্চাতীত্য চ পিতৃতঃ" (পৈঠীনসি)। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর হিন্দু আইন পুস্তকে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৈঠীনসির পাঁচ আর তিন মতবাদই কার্যত চলে, যদিও বাঙালি স্মার্ত রঘুনন্দন সাত আর পাঁচ গণনার জোর পক্ষপাতী। শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্রের কথা হয়তো একটু অতিরঞ্জিত, কিন্তু বাংলাদেশের অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পৈঠীনসির মত কার্যত চলে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমার নিজের মতে এই প্রস্তাবিত আইনে সপিণ্ডত্বের সীমা পাঁচ আর তিন-এ নির্দেশ করা উচিত। এই নিয়মের পক্ষে শাস্ত্রও আছে এবং বর্তমান হিন্দুর সামাজিক বোধ ও রুচিরও তা বিরুদ্ধ নয়। এই নিয়মে বিবাহ্য বর ও বিবাহ্যা কন্যার ক্ষেত্র বড় হবে, যার সামাজিক প্রয়োজন আছে।

রাও বিলের প্রস্তাবিত একপত্নীক বিবাহের বিরুদ্ধ মত এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কারণ, আইনে যাই হোক, সমাজে আধুনিক হিন্দু বিবাহ মোটের উপর একপত্নীক অর্থাৎ আমাদের প্রায় সকলের মনের সম্মতি এক পত্নীকে বিবাহের আদর্শের দিকেই; বহু বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ করলে অন্য দেশে ও সমাজে মাঝে মাঝে যেসব অসুবিধা ঘটে তা আমাদের মধ্যেও ঘটবে। কিন্তু তার কুফলের পরিমাণ বহু বিবাহের কুফলের তুলনায় অনেক কম। মানুষের কোনও নিয়ম সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করা যায় না। যেটা মোটের উপর ভাল তাকেই বেছে নিতে হয়।

রাও বিলে বিবাহ ভঙ্গের যে সব বিধিনিষেধ আছে, তার একটা প্রধান প্রয়োজন হয়েছে এই একপত্নীক বিবাহের আইনত প্রবর্তনে! পরের প্রবন্ধে রাও বিলের প্রস্তাবিত বিবাহ ভঙ্গবিধির আলোচনা করা যাবে।

৫

হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানে বর বধূকে বলে "যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম"—আমার এই যে হৃদয় তা তোমার হোক, তোমার যে হৃদয় তা আমার হোক। অর্থাৎ বিবাহের ফলে বর বধূর হৃদয়ের যোগ হোক অতি নিবিড়। মন্ত্রের আর যে শক্তিই থাকুক, নরনারীর দুই হৃদয়কে এক করার ক্ষমতা নেই। ও মন্ত্রের উদ্দেশ্য নব বিবাহিত দম্পতির সামনে দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের একটি আদর্শ ধরা ও প্রার্থনা করা যে দম্পতির জীবনে এ আদর্শ সফল হোক। কিন্তু এ সফলতা কদাচিৎ ঘটে। বেশির ভাগ দম্পতির জীবনে নরনারী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট হয়। তারপর দৈনিক জীবনের সাহচর্যে, সন্তানের প্রতি স্নেহ, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত একসঙ্গে সহ্য করে মোটের উপর সুখে দুঃখে গার্হস্থ্য জীবন এক রকম কেটে যায়। স্বামী স্ত্রীর একাত্মতা দুর্লভ বলেই কাব্যে ও উপন্যাসে তার উজ্জ্বল চিত্রে মানুষ মুগ্ধ হয়; আর যদি বাস্তব জীবনে সে একাত্মতা ক্বচিৎ দেখা যায়, তবে মানুষ তাতে কাব্য পাঠের আনন্দ পায়। অর্থাৎ দুর্লভ বলে এই রকম একাত্মতাকে মানুষ অলৌকিক মনে করে। কিন্তু কখনও কখনও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর অভিশাপে, কি স্বামী বা স্ত্রীর কৃতকর্মের ফলে সাধারণ রাগ-বিরাগের ও সুখ-দুঃখের গার্হস্থ্য জীবনও স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই ভয়ংকব অবস্থা থেকে স্বামী ও স্ত্রীকে মুক্তি দেবার জন্যই প্রায় সভ্য-সমাজে বিবাহের বন্ধন ছেদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য, কি তা ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন, সমাজ ও আইনের এই রকম ব্যবস্থা নরনারীকে অনেক দুঃখ-কষ্ট অত্যাচার সহ্য করেও পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে। এই মনোভাবের অভাবে শিথিল বিবাহ-বন্ধন সভ্য-সমাজে বহু বন্ধনকেই শিথিল করে দেয়। সেই জন্য অনেক সভ্য-সমাজেই বিবাহের বন্ধন ছেদনকে যথাসম্ভব কষ্টসাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এরও একটি সীমা আছে। অবস্থা এমন হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন তাদের নিজেদের পক্ষেও শুধু মহাক্লেশকর নয়, সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। তেমন জায়গায় বিবাহকে ভঙ্গ হতে দেওয়াই ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রয়োজন। প্রাচীন হিন্দু আইনে এই কারণে অনেক স্থলে স্বামীর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার এবং স্ত্রীর স্বামীকে পরিত্যাগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কোন অবস্থায় বিবাহকে ভঙ্গ হতে দেওয়া হবে এবং কখন হবে না এই বিধিনিষেধ প্রণয়ন সব সময়েই কঠিন। কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজন এই দুই দিক বিবেচনা করে তবেই এর নিয়ম প্রণয়ন করা যায়। বিবাহবন্ধন যাতে স্বভাবতই অশিথিল থাকে, কিন্তু স্বামী কি স্ত্রীর জীবন একান্ত দুর্বহ না হয়—এই দুই দিকে সমান দৃষ্টি রাখলে তবেই বিবাহভঙ্গের বিধি গ্রহণযোগ্য হয়। রাও কমিটির প্রস্তাবগুলি এতে কতদূর সফল হয়েছে, সেটাই বিচার্য বিষয়।

অন্য নানা দেশের বিবাহভঙ্গের আইন অনুসরণ করে রাও কমিটি বিবাহভঙ্গের বিধিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক —কতকগুলি অবস্থায় স্বামী কিংবা স্ত্রীর আবেদনে আদালত প্রচার করতে পারবেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈধ ও আইনসঙ্গত কোনও বিবাহ আদৌ হয়

নাই। দুই—অন্য কতকগুলি অবস্থায় স্বামী কি স্ত্রীর আবেদনে আদালত বৈধ বিবাহকে আদেশের তারিখ থেকে ভঙ্গ হল বলে নির্ধারণ করতে পারবেন। আদৌ সিদ্ধ বিবাহ হয় নাই— এই প্রচারের মোটামুটি কারণগুলি এই — (১) যদি বিবাহের সময় ও আদালতে আবেদনের সময় স্বামী কি স্ত্রীর পুরুষত্ব কি স্ত্রীত্ব না থেকে থাকে; (২) যদি স্বামী-স্ত্রী এই রকম সম্পর্কিত হয় যাদের মধ্যে আইনত বিবাহ নিষিদ্ধ, (৩) যদি বিবাহের সময় স্বামী কি স্ত্রী উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি থাকে; (৪) যদি বিবাহের সময় স্বামী কি স্ত্রীর পূর্ব বিবাহের স্ত্রী কি স্বামী জীবিত থাকে এবং সেই পূর্ব বিবাহ বলবৎ থেকে থাকে; (৫) যদি স্বামী কি স্ত্রীর বিবাহে সম্মতি, অথবা যেখানে তাদের অভিভাবকদের সম্মতি বিবাহে প্রয়োজন, সেরূপ সম্মতি বলে কি ছলে বিবাহের অপর পক্ষ নিয়ে থাকে।

সিদ্ধ বিবাহ ভঙ্গের কারণগুলি মোটামুটি এই—(১) যদি স্বামী বা স্ত্রী বিকৃতমনা হয় বা চিকিৎসার অতীত এবং বিবাহভঙ্গের আবেদনের পূর্বে যদি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর এই রকম বিকৃতমনা থেকে থাকে; (২) যদি স্বামী কি স্ত্রী অচিকিৎস্য মহাকুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হয় যে ব্যাধি আবেদনকারী কি আবেদনকারিণীর ছোঁয়াচ থেকে উৎপন্ন হয়নি; (৩) যদি স্বামী কি স্ত্রী বিনা কারণে স্ত্রী কি স্বামীকে সাত বৎসর পর্যন্ত ত্যাগ করে থেকে থাকে; (৪) যদি স্বামী কি স্ত্রী অন্য ধর্মাবলম্বনের ফলে আর হিন্দু না থেকে থাকে; (৫) যদি স্বামী কি স্ত্রী সাত বৎসর পর্যন্ত সংক্রামক যৌনব্যাধিগ্রস্ত থেকে থাকে যে ব্যাধি আবেদনকারী কি আবেদনকারিণীর ছোঁয়াচ থেকে উৎপন্ন নয় এবং (৬) যদি অন্য কোনও স্ত্রীলোক স্বামীর রক্ষিতা হয়ে থাকে অথবা বারবনিতার জীবনযাপন করে।

বিবাহকে অসিদ্ধ প্রচারের বিধি ও সিদ্ধ বিবাহভঙ্গের বিধি—এ দুই-ই কেবল সেই সব বিবাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবে যেসব বিবাহ হবে এই হিন্দু কোড বা সংহিতা আইন হয়ে পাশ হবার পর। তার পূর্বেকার কোনও বিবাহে এসব বিধি প্রযুক্ত হবে না।

লক্ষ করার বিষয়, প্রস্তাবিত আইনে স্বামী ও স্ত্রীকে বিবাহের অসিদ্ধি প্রচার ও বিবাহ ভঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনে হিন্দু স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে ও দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে, তাতে কোনও কারণ দেখাবার প্রয়োজন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে স্বামীর স্ত্রী পরিত্যাগের যেসব কারণ বলা হয়েছিল, সেগুলি আইনের ব্যবস্থা নয়; নৈতিক উপদেশমাত্র—বর্তমান আইনের এই বিধান এবং পরাশর সংহিতায় যে সব কারণে স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করে অন্য স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া ছিল, তাও এখন আইনত বাতিল, এক বিধবার পুনর্বিবাহ ছাড়া যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আইন করে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদার দিক থেকে স্ত্রী-পুরুষের এই সাম্য অবশ্য গ্রহণীয় এবং সামাজিক দিক থেকে এতে অহিতের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নাই। রাও বিলে যে সকল কারণে বিবাহ অসিদ্ধ কি ভঙ্গ হতে পারে, সেগুলি এমন কারণ যা সত্ত্বেও স্বামী কি স্ত্রীকে অনিচ্ছায় দাম্পত্য-জীবনযাপন করতে বাধ্য করা কেবল মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়, সমাজের পক্ষেও অমঙ্গলকর। রাও বিলের বিধিনিষেধগুলি ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের হিত কোনওটাকে অগ্রাহ্য করে একদিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছে বলে মনে হয় না। পূর্বকালে হিন্দু সমাজে এমন দিন ছিল, যখন এর চেয়ে অনেক লঘু কারণে বিবাহ ভঙ্গের

বিধি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি—স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণতা বিবাহ ভঙ্গের একটা কারণ ছিল—"পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ" (কৌটিল্য)।

বিবাহকে অসিদ্ধ প্রচার করা কি বিবাহকে ভঙ্গ করা দুই-ই নির্ভর করে স্বামী কি স্ত্রীর আদালতে আবেদনের উপর। সে রকম আবেদন করা না-করা স্বামী কি স্ত্রীর ইচ্ছাধীন। খুব সম্ভব, বহুস্থলে বিবাহ ভঙ্গের কারণ উপস্থিত হলেও স্বামী বা স্ত্রী তার জন্য আবেদন করবে না। উন্মাদ স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে তার সেবায় স্বামী জীবন কাটিয়েছেন—এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই এবং উন্মাদ স্বামীমাত্রকেই তার স্ত্রী পরিত্যাগ করবে, এ রকম আশঙ্কাও অমূলক। তবে সব মানুষের—কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক—মন সমান নয়। সকলের কাছ থেকে অসাধারণ মহত্ত্ব কি প্রেম আশা করা যায় না এবং তার উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা চলে না। ভাবী স্বামী অতি অল্পজীবী হবেন জেনেও সাবিত্রী সত্যবানকে স্বামিত্বে বরণ করেছিলেন; কিন্তু সকল স্ত্রীর সাবিত্রী হওয়া সম্ভব নয়। এটা একটা আদর্শ। অল্প লোকেই সে আদর্শের নাগাল পাবে। সাধারণ মানুষের সাধারণ চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই সামাজিক বিধিনিষেধ গড়তে হয়। মহৎ জীবনের মহত্ত্বের পথও খোলা থাকবে, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পথও খোলা থাকবে। রাও কমিটির প্রস্তাবগুলি এর অন্যথাচরণ করেনি। এক জায়গায় রাও কমিটির বিধিব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে মনে হয়। রাও কমিটির প্রস্তাবিত কোনও কোনও কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করলে পরিত্যক্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—যেমন উন্মাদিনী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ যদি ভঙ্গ হয়। তার কারণ আমাদের সমাজে ও পৃথিবীর অনেক সভ্য-সমাজেই স্ত্রী ও পুরুষের ধনতান্ত্রিক বৈষম্য।

যাঁরা ভয় করেন যে, বিবাহ অসিদ্ধি ও বিবাহভঙ্গের এই সব বিধি-বিধান হিন্দুর বিবাহবন্ধন ও সমাজকে শিথিল করবে তাঁরা হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু নারীকে অন্যান্য সমাজের পুরুষ ও নারীর চেয়ে মনে মনে নিশ্চয়ই হেয় জ্ঞান করেন। বিবাহ ভঙ্গের বিধি থাকলেও স্বামী ও স্ত্রী সুযোগ পেলেই বিবাহ ভঙ্গের চেষ্টা করবে—এ রকম ব্যাপার অন্য সমাজে ঘটে না। হিন্দু সমাজে কেন ঘটবে, তার কারণ নেই। যাঁরা কারণ আছে মনে করেন, তাঁদের অবচেতন মনে সম্ভবত এই ধারণা আছে যে, হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের বিবাহের যে বন্ধন, তা কেবল টিকে আছে, আইনে সেই বিবাহ অন্তত স্ত্রীলোকের পক্ষে অচ্ছেদ্য বলে।

৬

প্রচলিত হিন্দু আইনের আংশিক পরিবর্তন ও আইনসভার মারফত হিন্দু কোড বা সংহিতা বিধিবদ্ধ করে সকল হিন্দুর জন্য এক আইন প্রবর্তন—এই চেষ্টার বিপক্ষে দুইটি সাধারণ আপত্তির আলোচনা এই শেষ প্রবন্ধে করব।

প্রথম রকমের আপত্তি হচ্ছে যে, চলতি হিন্দু আইনের কিছুমাত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ও আইন যা আছে, বেশ আছে। মুনি ঋষিরা আইন করে গেছেন। তাঁরা ছিলেন অভ্রান্ত

ত্রিকালজ্ঞ। তাঁদের ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথাই উঠতে পারে না। রাও বিলের প্রথম খসড়া যখন প্রকাশ হয়, তখন "মডার্ন রিভিউ" পত্রিকায় একজন আইনজীবী বাঙালি হিন্দু এই মত খুব জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন। এখনকার দিনে আইনসভা যে সব আইন করে তার প্রথমে প্রায়ই এই বাক্য থাকে : "যেহেতু অমুক বিষয়ে আইন প্রবর্তন বা আইনের সংশোধন প্রয়োজন, অতএব ইত্যাদি।" রাও বিলেও এই মামুলি কথা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে:—

"Whereas it is expedient to amend and codify certain branches of the Hindu Law as now in force" ইত্যাদি "যেহেতু প্রচলিত হিন্দু আইনের কতক অংশ সংশোধন ও সংহিতাকারে বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন, অতএব ইত্যাদি।" "মডার্ন রিভিউ" পত্রিকার লেখক বলেছিলেন যে, এখানে বিসমিল্লায় গলদ। চলতি হিন্দু আইনের কোনও অংশের কোনও রকম পরিবর্তনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সুতরাং রাও বিল আর অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এই মতবাদীদের সঙ্গে যুক্তি তর্ক খুব সম্ভব নিরর্থক। মুনি ঋষিদের নামযুক্ত ধর্মশাস্ত্রের যে গ্রন্থ আমরা পাচ্ছি, যেমন মনু কি যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ কি বৃহস্পতি, তাঁরা কোন কালের লোক ছিলেন এবং তাঁদের নাম সংযুক্ত ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ কতটুকু; সব ঋষিরাই যখন অভ্রান্ত ও ত্রিকালজ্ঞ, তখন এক ঋষির সঙ্গে অন্য ঋষির মতের অমিল কেন, যাতে সংস্কৃত ভাষায় প্রবাদ হয়েছে যে, তিনি ঋষিই নন, যাঁর একটা ভিন্ন মত নাই; ধর্ম-শাস্ত্রের যুগের পর নিবন্ধকারেরা শাস্ত্র বাক্যের ব্যাখ্যাকে উপায়স্বরূপ করে কী রকম যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে হিন্দু ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং এখনও ইংরেজের আদালতে বিচারকেরা যাঁদের অনেকে হিন্দু নন, কেমন করে হিন্দু আইনের অল্পাধিক পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন—এসব বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধ হয় পণ্ডশ্রম। কারণ এসব যে তারা জানেন না, তা মনে হয় না। এসব জেনে শুনেও তাঁরা চোখ মুঁদে ও কান বন্ধ করে অচলের যোগাসনে বসেছেন। তাঁদের অধৃষ্য মূর্তি দেখে সমাজের প্রয়োজন প্রভৃতি চপল ব্যাপারগুলি সভয়ে দূরে পলায়ন করবে। এই আপত্তির নাম দেওয়া যেতে পারে "কভি নেহি" আপত্তি। এই আপত্তি সম্বন্ধে বাক্যব্যয় বৃথা। এ আপত্তিকারীদের দূর থেকেই নমস্কার জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় রকমের আপত্তির সুর অতটা চড়াগ্রামে চড়ান নয়। সে আপত্তি হচ্ছে:

যদিও চলতি হিন্দু আইনের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন কিন্তু বর্তমান সময় তার অনুকূল নয় এবং বর্তমানের আইনসভাগুলি তার উপযুক্ত স্থান নয়। এ আপত্তিকে বলা যায় "আভি নেহি" আপত্তি। হিন্দু মহাসভার গত বিলাসপুর অধিবেশনে রাও বিল সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, সে প্রস্তাব এই আপত্তির একটা ভাল উদাহরণ। হিন্দু মহাসভা এ প্রস্তাবে বলেছেন যে, চলতি হিন্দু আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন নাই, একথা তাঁরা বলেন না। পরিবর্তনের প্রয়োজন তাঁরা স্বীকার করেন। তবে বর্তমান আইনসভাগুলি হিন্দু জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। যখন প্রকৃত ডেমোক্রেটিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে আইনসভাগুলি জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধি স্থানীয় হবে, তখন সে প্রতিনিধি সভা বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে হিন্দু আইনের পরিবর্তন সাধন করবেন। তার পূর্বে পরিবর্তন হতে দেওয়া উচিত নয়।

হিন্দু মহাসভা যখন বলেছেন তখন লোকে মেনে নিতে বাধ্য যে, এই প্রস্তাব হিন্দু মহাসভার সভ্যদের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করছে, ও প্রস্তাব অশুভস্য কালহরণের ফিকির নয়, অথবা স্বীকার কি অস্বীকার এ দু'য়ের দায় থেকে আপাতত মুক্তি পাওয়ার একটা উপায় মাত্র নয়। কিন্তু মনের এ সন্দেহ দূর করা কঠিন। কারণ বলছি : মহাসভার এই অধিবেশনেই হিন্দুস্থানের ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র কী রকম হওয়া উচিত তার এক খসড়ার অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণ হয়েছে। হিন্দু মহাসভা অবশ্য মনে করেন যে ওই খসড়া অনুসারে বিলাতের পার্লামেন্ট এখনই আইন পাশ করবেন অথবা ইংরেজের সম্মতি নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের লোকেরা ওই খসড়া অনুযায়ী এখনই হিন্দুস্থানে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্তিত করবে। এ সত্ত্বেও এ প্রস্তাব গ্রহণ করে হিন্দু মহাসভা তাঁর কর্তব্য কার্যই করেছেন। কারণ ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের আকার কি হবে সে সম্বন্ধে দেশবাসীর মনকে প্রস্তুত করা সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। প্রতিষ্ঠান তার নিজের কল্পনা দেশের লোকের সামনে উপস্থিত করবার অধিকারী যাতে সেই অনুসারে দেশের লোকের মত গঠিত হয়। চলতি হিন্দু আইনের যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে সে কী রকম পরিবর্তন সে সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার কর্তব্য ছিল দেশের লোককে উপদেশ করা এবং সেজন্য জনমত গঠন করা। হিন্দু মহাসভা বিলাসপুরের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতে এ কর্তব্য করা হয় নাই। ভারতবর্ষের হিন্দুর অধিকাংশ যদি প্রচলিত হিন্দু আইনের কোনও পরিবর্তন চায় তবে বর্তমান অবস্থাতেও সেই অনুসারে আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, হিন্দু মহাসভার খসড়া অনুসারে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতন্ত্র বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি।

হিন্দু মহাসভা যে বর্তমানের আইন সভাগুলিকে আন-ডিমোক্রেটিক ও নন-রিপ্রেজেন্টেটিভ বলেছেন সে কথা ঠিক। কিন্তু তার উপর একটু বেশি ঝোঁক দিয়েছেন। প্রথমত হিন্দু মহাসভা যাকে বলেছেন আইন সভাগুলির সম্পূর্ণ ডিমোক্রেটিক গঠন, তার অর্থ যাই হোক, সে রকম গঠন পেতে যে বহু সময় যাবে তাতে সন্দেহের অবসর নেই। দ্বিতীয়ত পরিবর্তিত হিন্দু আইন প্রণয়ন সোজাসুজি ডিমোক্রেসির কাজ নয়। কারণ জনসাধারণের তা সাধ্যাতীত। বিশেষ, ভারতবর্ষের হিন্দু জনসাধারণের এখনও শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর। এ হচ্ছে তাদের কাজ যারা বুদ্ধি ও বিদ্যায় অগ্রণী এবং সমাজতত্ত্বে যাদের দৃষ্টি আছে। এ রকম লোকই পরিবর্তিত হিন্দু আইন কী রকম হবে তার বিচার করে হিন্দু জনসাধারণের মতকে গড়ে তুলতে পারে। কেবলমাত্র ডিমোক্রেসির বিদ্যাবুদ্ধিতে যে হিন্দু সভার ভরসা নেই ওই প্রস্তাবেই তাঁরা তার প্রমাণ দিয়েছেন। তা নইলে সম্পূর্ণ ডিমোক্রেটিক আইন সভার সভ্যদেরও আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করতেন না। হিন্দু কোড এখন পাশ হোক কি অনেকদিন পরে পাশ হোক যাঁরা মনে করেন যে, প্রচলিত হিন্দু আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন তাঁদের এখন থেকেই কী রকম পরিবর্তন প্রয়োজন তার আলোচনা করে জনমতকে শিক্ষিত করা ও পরিবর্তনের প্রতি অনুকূল করা উচিত। নইলে এ সন্দেহ কিছুতেই মন থেকে দূর করা যায় না যে তাঁরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যে পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে একথা সাহস করে বলতে চান না, কী রকম পরিবর্তন প্রয়োজন সেকথা প্রকাশ করে তাঁরা যে প্রকৃতই পরিবর্তন চান তা বলারও তাঁদের সাহস

নেই। এতে হিন্দু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না।

রাও বিলের কতকগুলি প্রধান ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মত সংক্ষেপে বলেছি। যদি তাতে ও বিলের আলোচনার কোনও সাহায্য হয় তবে শ্রম সার্থক হবে। হিন্দু আইন সংস্কারের প্রস্তাবে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে যুক্তিতর্ক দিয়ে শুভবুদ্ধির বিচার। সভায় একত্র হয়ে না বা হ্যাঁ প্রস্তাব গ্রহণের মূল্য বেশি নয়। ও রকম প্রস্তাব খুব সম্ভব মনের তম বা রজের প্রকাশ মাত্র। সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম, যে সত্য মনকে আলো করে বস্তুর স্বরূপকে প্রকাশ করে।

পৌষ ১৩৫১

বাঙালি হিন্দু

বাঙালি হিন্দু সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত উপরের স্তর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ চাঞ্চল্যের কারণ বাইরের আঘাত, সুতরাং ও অংশের সজীবতার প্রমাণ।

ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন আমলে সে বিদেশি শাসন তার অধীন দেশের লোককে যতটা সুযোগ দিয়েছিল তার ষোলো আনা সুবিধা নিয়েছিল বাঙালি হিন্দু। রাজার দেশের ভাষা শিখে, এবং মোগল শাসন ও স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মিশিয়ে কর আদায় ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় যে প্রকাণ্ড ও জটিল শাসন যন্ত্র ইংরেজ এ-দেশে আমদানি করেছে তার মোটা কলকব্জাগুলো চালাবার বিদ্যা আয়ত্ত করে তার প্রতিষ্ঠা ও চলার কাজে সে কম সাহায্য করেনি। এই মিস্ত্রিগিরির মজুরি সে যা পেয়েছে তাই হচ্ছে উচ্চশ্রেণি বাঙালি হিন্দুর এ দেশে প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বের বাস্তব ভিত্তি। বাঙালি হিন্দু যে নতুন ভাষা ও বিদ্যায় সহজেই নিজেকে রপ্ত করে তুলেছিল তার এক কারণ তার মনে অতীত গৌরবের এমন কোনও স্মৃতি ছিল না যার অভিমান এর বাধা জন্মাতে পারে।

ব্রিটেনের রাজতক্ত দখল সে সানন্দেই বরণ করেছিল। যার ফলে পাটনা থেকে পেশোয়ার, কটক থেকে মধ্যভারত ইংরেজের বিজয় নিশানের পিছু পিছু সে ছুটেছিল হাতে কলম, বগলে ইংরেজি বিদ্যা শিখবার পুথি। বিজিত দেশে নব শাসন রীতি চলতি করতে, আর সে বিদ্যায় সে দেশের লোকের হাতে খড়ি দিতে। কেরানিগিরি গুরুগিরির এই একচেটে ব্যবসায় উত্তরা পথ জুড়ে বাঙালি হিন্দু বহুদিন কায়েম ছিল। আজও সেখানকার বড় বড় শহরে তার ধ্বংসাবশেষ আমাদের আপশোস ও আস্ফালনের খোরাক জোগাচ্ছে। স্বভাবতই এ 'মনপলি' ছিল সাময়িক; আর তা না হলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হতে হত। যে মাস্টার আশা করে ছেলেরা স্কুলের বিদ্যা শেষ করে নিজেরা কখনও মাস্টার হবে না, নিরাশ তাকে হতেই হয়।

কিন্তু এইটুকুই পুরো সত্য নয়। রাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে নব ইউরোপের যে সব ভাব ও বিদ্যা ইংরেজ এ-দেশে এনেছিল, সাংসারিক সুবিধার উপায় স্বরূপে ছাড়াও বাঙালি হিন্দুর তা মনে হয়েছিল পরম উপাদেয়। কারণ যাই হোক হিন্দু বাঙালির মনে এমন কিছু ছিল যা এদের অনুকূল।

সেই জন্য রামমোহন রায়ের মতো আশ্চর্য মানুষের বাংলায় আবির্ভাব হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মতো প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত এ নব বিদ্যা ও ভাব প্রচারের অগ্রণী হয়েছিলেন। এবং প্রথম প্লাবন কেটে গেলে দেখা গেল যে বাঙালির মন এ বন্যায় ডুবে মরেনি, উর্বর হয়েছে।

ফলে ইংরেজ যুগের বাংলা সাহিত্য যা আধুনিক ইউরোপের প্রধান সাহিত্যগুলির তুলনায় নানাদিকে ছোট, কিন্তু কেবল সেই তুলনাতেই ছোট। কারণ ভারতবর্ষ কি এশিয়ার আর কোথাও এর তুল্য মূল্য আধুনিক সাহিত্য আজ নেই। এ সাহিত্যের একটি প্রধান বাণী নব ইউরোপের মুক্তির-বাণী মনে, সমাজে, রাষ্ট্রে। বাংলায় এই মুক্তির বাণী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষের চিন্তা ও কর্মকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালি হিন্দু ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে বার্তা প্রচার করেছে, বৃহৎ রাষ্ট্রীয চেষ্টার দুরূহ পথে সাহস, নিষ্ঠা ও ত্যাগের যে আদর্শ দেখিয়েছে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মে তা ভারতবর্ষের নবজন্ম। ব্রিটিশ শাসনের কলের মজুরি কেমন করে করতে হয় বাঙালি হিন্দু অর্ধেক ভারতবর্ষকে তা শিখিয়ে ছিল, ভারতবাসীকে মানুষের মতো বাঁচতে ও মরতে হলে ও কলের যে বদল দরকার এ জ্ঞানও বাঙালি হিন্দু ভারতবর্ষকে দীক্ষা দিয়েছে। প্রথম গুরুগিরির পুরস্কার সে ইংরেজের হাতে পেয়েছে। দ্বিতীয় গুরুগিরির দণ্ড ও হাতে না পেলে প্রমাণ হত যে গুরুগিরি নিষ্ফল হয়েছে।

২

নিষ্ফল কিন্তু হয়নি। ভারতবাসীর বর্তমান রাষ্ট্রীয় চেতনা ভারতবর্ষে সর্বময়ত্বের অবসান সূচনা করেছে। ওর পরিপুষ্টিতে তার ধ্বংস। এ চৈতন্যের প্রধান উৎস যে বাঙালি হিন্দু তাতে অবাঙালি ভারতবাসীর মনে যে মোহই থাকুক ইংরেজের মনে কোনও সংশয় নেই। এই উৎসের মুখ বন্ধ করতে সাম্রাজ্যভোগী ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের যে চেষ্টা হবে তা স্বাভাবিক।

এ শতাব্দীর প্রথমে সে চেষ্টা হয়েছিল বাঙালির রাষ্ট্রীয় জীবনকে দু'ভাগ করে। ফল হল উলটো। রুদ্ধ স্রোত বাধাকে ঠেলে ফেলে ভারতবর্ষময় ছাড়িয়ে পড়ল যার গতিবেগে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও চেষ্টা আজকের খাদে প্রবাহিত হচ্ছে। এইবার চলেছে দ্বিতীয় চেষ্টা। পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীর অবস্থা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা আজ এমন হয়েছে যে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণের পূর্ব রীতির বদল হয়ে উঠেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজন। আশা আছে ওর ভিতরটা বহাল রেখে চেহারাটা বদলে দিলেই এখনকার মতো

কাজ চলবে। ব্রিটিশ শাসকেরা যখন এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবহার 'রিফর্মের কথা বলেন তখন সম্ভব তাঁদের মনে থাকে ধাত্বর্থ— ফর্ম' অর্থাৎ আকারের পরিবর্তন। আর যদি বাধ্য হয়ে বাইরের আকারের সঙ্গে ভিতরের উপাদানেরও রদ বদল করে ভারতবাসীর সঙ্গে রফাই করতে হয় তবে বাকি ভারতবর্ষের মন থেকে বাঙালি হিন্দুর রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব দূর হলে আপোষ নিষ্পত্তিতে বর্তমান সুবিধার অনেকটাই বজায় থাকবে বলে ইংরেজের বিশ্বাস। বাঙালি হিন্দুর 'একস্ট্রিমিজম্' বাদ দিলে বাকি ভারতবর্ষের সুইট ও 'রিজিনেবল' হবার আশা আছে। সেইজন্য রিফর্মের শেষ কিস্তিতে বাঙালি হিন্দুকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে বাঙালি মুসলমানের ভোটের চাপে। বাংলাদেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। তার ফলেই বাংলার রাষ্ট্র পরিষদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যায় আসবে বেশি, এবং তাতে বাঙালি হিন্দুর রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও অন্য প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হবে 'রিফর্ম কর্তারা' এই ভরসাতেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। বাঙালি হিন্দু যে ডেমোক্রেসির বচন আওড়ায় তার পাটিগণিতের মারে তাকে কাবু করে মজা দেখার লোভেও নয়। তাঁদের মনে এ আশঙ্কা ছিল যে প্রতিনিধি নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান মিশিয়ে দিলে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানির চেয়ে রাষ্ট্র ব্যাপারে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের কাছে বাংলাদেশ বড় হয়ে উঠতে পারে। আর 'ওয়াইলি' হিন্দুকে বিশ্বাস কী! সেই জন্য গড়তে হয়েছে ধর্ম সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মণ্ডলী। যাতে মুসলমান যে পরিষদে আসবে সে বুঝবে মুসলমান বলেই সে এসেছে। সে মুসলমানের প্রতিনিধি দেশের নয়। আর যারা তাকে পাঠাবে তারাও জানবে রাষ্ট্র ব্যাপারে তারা বাঙালি নয় তারা মুসলমান; প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে এক নয়, যদিও তাদের ভাষা এক এবং রক্তও এক আর দুঃখ সুখের ভোগও এক। এইখানেই শেষ নয়। নষ্টের গোড়া গোটা বাঙালি হিন্দু সমাজ নয়, উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু। সুতরাং প্রয়োজন হয়েছে উচ্চ হিন্দু ও অনুচ্চ হিন্দুর মধ্যে প্রাচীর তোলা যাতে উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু বাংলাদেশে এক ঘরে হয়। মহাত্মার উপবাস দৈব সুযোগ; ইংরেজের আর পাঁচটা সৌভাগ্যের মধ্যে একটা সৌভাগ্য।

৩

ব্রিটিশ যুগের প্রথম আমলে পশ্চিমের নূতন ভাব ও বিদ্যার দিকে বাঙালি হিন্দুর মতো বাঙালি মুসলমান ঝুঁকে পড়েনি। কতকটা রাজ্যাপহারী ইংরেজের উপর আক্রোশে, কতকটা সংস্কারান্ধ মৌলভি মৌলানার বিরোধিতায়। ফলে আধুনিকতার যে নদীতে বাঙালি হিন্দু স্নান করেছে, বাঙালি মুসলমান তখন তার জলে নামেনি। প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারকে বাঙালি হিন্দু যেমন যুক্তির বিচারে যাচাই করতে সাহস করেছে, বাঙালি মুসলমান তা পারেনি। মুসলমান রামমোহন কি মুসলমান বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে সম্ভব হয় নাই। এই আধুনিকতার বিরোধী, ইংরেজি শিক্ষা পরাঙ্মুখ সম্প্রদায়ে আর্থিক সুতরাং সামাজিক বিপ্লব ঘটল যখন ইংরেজের আপিস আদালতে ফারসির বদলে প্রচলন হল ইংরেজি ভাষার। মুনশি মৌলভির হাতের কাজ চলে গেল ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুর হাতে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত

একটা বড় মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠল যাদের যে শিক্ষা আনলো হাতে অর্থ, সেই শিক্ষায় করল মনকে সজীব। মুসলমান হয়ে পড়ল দরিদ্র এবং মনে অচল। আধুনিক কালে যখন বাঙালি মুসলমানের চেতনা হল, এবং নব শিক্ষায় তারা শিক্ষা পেতে লাগল তখন রাজ দরবার ও রাজ সরকারের দেশি লোকের জায়গায় হিন্দুর দখলে এবং ইংরেজি বিদ্যায় উপার্জনের আর যে সব পথ খুলেছে সেখানে হিন্দুর ঠাসাঠাসি ভিড়। নব ব্রতী মুসলমানের ওস্তাদ হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাথা গলান কঠিন।

বাঙালি মুসলমান সমাজের এই অবস্থায় রিফর্মের শেষ চালের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। নব শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা বাঙালি হিন্দুর তুলনায় এখনও অতি অল্প। যদি হিন্দুর সঙ্গে বিনা প্রতিযোগিতায় কেবল মুসলমানের খাতিরে, শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাতে নয় মুসলমান সমাজের নিরক্ষরত্বের পরিমাণে শিক্ষাসাপেক্ষ সরকারি চাকরি ও সরকার অনুগৃহীত অর্থাগমের অন্যান্য উপায় মুসলমানের হাতে আসে তবে এই অল্প সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের দারিদ্র্য কমে, শিক্ষিত মুসলমানের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনোপায়ের পথ হয়, দেশে বাঙালি মুসলমানের প্রতিপত্তি ও সম্মান বাড়ে। শুধু যোগ্যতার জোরে যে মুসলমান দোতলা উঠতে পারে না সাম্প্রদায়িক লিফটে সে অনায়াসে তেতলা উঠে যায়। এ লোভ কম লোভ নয়। সুতরাং বাংলার রাষ্ট্রসভায় যে ইংরেজরা রয়েছেন প্রাপ্যের বহু সংখ্যায় রিফর্মের 'পলিসি' ইমপ্লিমেন্ট করতে তাদের আওতায় মুসলমান সভ্যদের যেই কিঞ্চিৎ আধিপত্য হয়েছে অমনি চড়াসুর উঠেছে মুসলমানের বিশেষ স্বার্থের। স্থানে এবং অস্থানে মুসলমান ধর্মে ধার্মিকের সংখ্যার অনুপাতে ভাগ বাটোয়ারায় দাবি চলেছে, যা কখনও করুণ কখনও কমিক। এর যুক্তি এক সময় বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য যাকে অমুসলমানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলা অন্যায়, অন্য সময় বাঙালি মুসলমানের পৌরুষ যা রাজার জাতিতেই কেবল দেখা যায়। কখনও মুসলমানের ব্রিটিশ রাজভক্তির কাহিনি. কখনও আরবদের বিশ্বজয়ের ইতিহাস। কাজেই সাম্প্রদায়িক ভাগকে আঁকড়ে থাকতে হবে প্রাণপণে, এবং সবখানে চাই তার প্রসার— মন্ত্রীগিরি থেকে পেয়াদাগিরি পর্যন্ত। এবং এই ভাগাভাগির মূল মালিক ইংরেজকে রাখতে হবে হাতে, কখনও চোখ রাঙিয়ে কখনও চোখ নামিয়ে; এবং সবচেয়ে বড় কথা তার স্বার্থে ঘা না দিয়ে। তার খোদার মেহেরবানিতে এমন দিনও আসতে পারে. যখন বাংলাদেশের চাকরি-বাকরি মুসলমানের হবে একচেটে, যেমন এককালে বাঙালি হিন্দুর ছিল। মোট কথা বাঙালি মুসলমান চাকরি চাই— চাকরি আরও চাকরি।

উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দু যে ক্ষোভ ও আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠবে তাতে বিচিত্র কী! যে ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাঙালি হিন্দুর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক এই চাকরি তাদের প্রাণস্য প্রাণঃ। সরকারি চাকরি, আধা-সরকারি চাকরি, সরকারকে যারা চালায় এবং সরকার যাদের জন্য চলে, সেই ইংরেজ সওদাগরের চাকরি। এ শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে এই চাকরিতে. চাকরিতেই তা বেঁচে আছে, এই চাকরির লোপে তার বিলোপের ভয়। যার এ চাকরি যখন অন্ন তখন বাঙালি হিন্দুর মন ও আনন্দ যে আধুনিক 'কালচারে'র ফুল ফুটিয়েছে তার রসও আসছে সেখান থেকেই। সে 'কালচারে'র ভালমন্দ যাই থাকুক ভারতবর্ষে তা অদ্বিতীয়। এ সব চাকরির উদ্দেশ্য টাকা উপার্জন হলেও তার কতকগুলি বিদ্যা ও বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে সার্থক করায় সুযোগ, সুতরাং আত্মতৃপ্তির মূল, এবং সম্মান ও প্রতিপত্তির হেতু। এই চাকরির যা এখন বাঙালি হিন্দুর হাতে আছে তার অধিকাংশ অন্যের হাতে যাবার সম্ভাবনার উদ্বেগ ও আশঙ্কা স্বাভাবিক। এবং এমন লোকের হাতে যদি যায় তুলনায় যাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতা কম তাতে ক্ষোভের কারণও আছে যথেষ্ট।

সুতরাং এর প্রতিকারের ডাকে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু বাঙালির বড় রকম সাড়া পাওয়া যাবে। সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি বন্ধ করতে হবে। সব অনিষ্টের মূল কারণ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন তুলতে হবে। সেজন্য বাঙালি হিন্দুর একজোট হওয়া চাই। জাতীয় কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, 'হিন্দু মহাসভা'র নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। ভারতবর্ষের জন্য হিন্দুদের সঙ্গে মিলে সংঘ গড়তে হবে হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার জন্য। হিন্দুকে হিন্দু না রাখলে কে রাখবে? মোট কথা ভারতবর্ষ ও বাংলার মুসলমান যেমন হয়েছে কমুন্যাল হিন্দুস্থানের এবং বাঙালি হিন্দুকে হতে হবে তেমনি কমুন্যাল, কথায় না হোক মনে এবং কাজে। মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন যে দেশের হিতের জন্যই মোসলেম লিগের কর্তাদেরও সেই বুলি। বাঙালি হিন্দুর এই নব লব্ধ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি যে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্য এইসব বক্তৃতায় প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হয়, এবং বক্তার নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি ওঠে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর সব সময় উহ্য থেকে যায় বাংলাদেশে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সংখ্যায় বেশি। বাঙালি হিন্দু যদি বাঙালি মুসলমানের কমুন্যালিজমের আঘাতে ও অনুকরণে তাদের মতোই কমুন্যাল হয় তবে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি না কমে অবশ্য বেড়ে যাবে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ভয়ে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। ঘাত প্রতিঘাতে দু' পক্ষের সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি হবে। দলাদলি করে দলাদলি কমে না, বেড়েই যায়। এমন অবস্থায় যদি কমুন্যাল ইলেক্টোরেটের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ডেমোক্রেটিক নির্বাচক মণ্ডলীর ব্যবস্থা হয় তাতে কীসের ভরসা যে মুসলমান নির্বাচিত হবে এখনকার চেয়ে কম সংখ্যায়, বা যারা হবে তাদের কমুন্যাল মনোবৃত্তি হবে বর্তমানের চেয়ে কম। এবং তা না হলে সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি ও বিশেষ স্বার্থের দাবি কেন দূর হবে, আর হিন্দুর হিত বা দেশের হিত সিদ্ধ হবে কেমন করে! দেশের মন যদি থাকে কমুন্যাল পুরো ডেমোক্রেটিক নির্বাচনের ফলে ঘোর কমুন্যাল রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি কিছু অসম্ভব

নয়। যাঁরা আশা করেন মিশ্র নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় মুসলমানকে কুড়ুতে হবে হিন্দুর ভোট আর হিন্দুকে খুঁজতে হবে মুসলমানের ভোট, সুতরাং যারা ঘোর কমুন্যাল তারা বাদ পড়বে, যারা মধ্যপন্থী তারাই হবে নির্বাচিত তাদের নিরাশ হতে দেরি হবে না। রাগ দ্বেষ যখন প্রবল থাকে তখন ও রকম ভোট ভাগাভাগি বেশি হয় না। তখন হিন্দুয়ানির ডাকে হিন্দু দেবে হিন্দুকে ভোট, মোসলেমের ডাকে মুসলমান দেবে মুসলমানকে ভোট। যারা উৎকট মুসলমান ও উৎকট হিন্দু তারাই যেতে পারবে প্রতিনিধি হয়ে, আপোষপন্থী কাফের ও অনার্য হবে একঘরে। খাঁটি হিন্দু ও খাঁটি মুসলমানের এই মিশ্র নির্বাচনের এমন পরিণতি হতে পারে যে বাঙালি হিন্দুকে ছুটতে হবে ইংরেজের দরবারে ডেমোক্রেটিক কুত্তা বলিয়ে নেবার আর্জি পেশ করতে।

৫

বাঙালি হিন্দু মুসলমানের ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক দল গড়ার স্পষ্টার্থ দু' পক্ষের পাল্লা দিয়ে ইংরেজের আনুগত্য করা। আমরা হিন্দু কারও অহিত করতে চাই না, শুধু চাই নিজেদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে; আমরা মুসলমান কারও অনিষ্ট চিন্তা করি না, কেবল নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবির পূরণ চাই এ বুলিতে সত্য উলটে যায় না। সে সত্য হচ্ছে ধর্মমতের তফাত রাষ্ট্রীয় কাজে অবান্তর। যেখানে পরাধীন দেশে সেই ভেদকে করতে হয় স্বতন্ত্র অধিকারের ন্যায় অন্যায়ের বাটখারা সেখানে এই বিরুদ্ধ স্বার্থের 'ব্যালান্স' রক্ষার ভার যাবেই যাবে তৃতীয় পক্ষের হাতে। সে তৃতীয় পক্ষ নিরাসক্ত মধ্যস্থ নয়। নিজের দিকে পাল্লা ভারী করতে এমনকী মাপ সমান রাখতে তাকে খুশি করতে হবে। তার দাম আছে। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু যদি সে দাম দিতে রাজি থাকে চেষ্টা করে দেখতে পারে। সে দাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্তমান জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কথায় না হোক কাজে হতে হবে তার পরিপন্থী। এ দেশে ইংরেজের যে শক্তি ও সুবিধা আছে তাকে বহাল রাখতে, এবং বর্তমানে তার যেটুকু লাঘব হয়েছে তার পূরণে ইংরেজের পুরো সহায় হতে হবে।

বাঙালি হিন্দুর বুদ্ধির উপরে ইংবেজের কিঞ্চিৎ আস্থা আছে। দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ বিজয়ে তার এই সাহায্য ইংরেজ স্বীকার করলেও করতে পারে। এবং তার বিনিময়ে ছোট বড় চাকরি ও আনুষঙ্গিক প্রভাব প্রতিপত্তির আর্জি হয়তো মঞ্জুর হবে। বাঙালি হিন্দুর স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষায় হিন্দুর একজোট হওয়ার যে ডাক সে এই পথে চলার ডাক। কিছু কাজ আরম্ভ হলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রের স্বপ্ন বাঙালি হিন্দু দেখেছে ও ভারতবাসীদিগকে দেখিয়েছে। সে আদর্শের অনুকরণে মৃত্যুপণ তার নিকট অতীতের ইতিহাস। সে আদর্শ ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে খণ্ড খণ্ড স্বার্থের রক্ষায় বিদেশির চির প্রভুত্বই কি সে বরণ করবে? গোয়ালন্দেশ্বর পদ্মা কি হরিদ্বারের ঘাটে ফিরে যাবে, মহাতীর্থের পুণ্যলোভে? আমাদের যৌবনে স্বদেশীয় যুগে আমরা একটি গান গেয়েছি,

যার ভাবার্থ মার দিয়ে দেশকে ভুলাবে আমরা দেশের তেমন ছেলে নই। হাতের মারে আমরা দেশকে ভুলি নাই, ভাতের মারের ভয়ে ভুলি কিনা তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। বাঙালি হিন্দু পাশ না ফেল?

৬

তবে এ সাম্প্রদায়িক মহামারী থেকে দেশকে বাঁচাবার কি উপায় নেই? আছে না আছে স্থির করতে এ রোগের নিদান জানা চাই। রোগ জানলেই যে তার ঔষধ আছে এমন নয়, কিন্তু রোগ নির্ণয় না হলে চিকিৎসার চেষ্টাই চলে না হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া। বর্তমান সাম্প্রদায়িক রোগের ব্যাসিলাই উৎপত্তির প্রধান বীজাণুক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের চাকরির দ্বন্দ্ব, চাকরি এক প্রতিপত্তি, চাকরির ফলে প্রতিপত্তি, প্রতিপত্তির ফলে চাকরি দেশের অশিক্ষিত ও অচাকুরে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ, যাদের নামে এবং ভরসায় এই দ্বন্দ্ব চলে তারা করে এতে লাঠিয়ালি বিনা ভাতায় নিজের খেয়ে। এই লাঠালাঠিতে তাদের নিজের হিত কিছুমাত্র নেই, অহিত আছে ষোলো আনা, দেশের সকল উন্নতির পথ বন্ধ হয় বা বিপথে চলে। ধর্মের নামে অন্ধ উত্তেজনায় এই অজ্ঞানদের নিজের ভাল মন্দ বোধ লোপ হয়, আর সে উত্তেজনার সৃষ্টি করে শিক্ষিত মুসলমান ও শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের শ্রেণির সাংসারিক স্বার্থ ও সাংসারিক ক্ষমতা হাসিল করার অভিসন্ধিতে। কমুন্যাল রোগের এই নিদান। অন্য সব কারণ এই মূল থেকেই পুষ্টি পেয়ে রোগকে জটিল করে তোলে। সুতরাং এ রোগের চিকিৎসা দেশের জনসাধারণকে মুসলমান চাষি ও হিন্দু চাষিকে, মুসলমান কারিকর ও হিন্দু কারিকরকে, মুসলমান মজুর ও হিন্দু মজুরকে পলিটিকাল দল গড়তে শেখান পলিটিকাল আদর্শ ও উপায়ের ভিত্তিতে। কলমা পড়া ও গায়ত্রী জপার ভেদ ও সাম্য দলে টানার ফন্দি ও ফাঁকিতে তাদের সচেতন করা। দেশের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ যেদিন নিজের স্বার্থ মোটামুটিও বুঝবে, যেদিন পলিটিকসে দীন-এর তত্ত্ব ছেড়ে দুনিয়ার তথ্যে চোখ যাবে শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের চাকরি প্রতিপত্তির ঝগড়ার সেই দিন হবে সমাপ্তি। কারণ যে খুঁটির জোরে লড়াই সে আর খুঁটিগিরি করতে রাজি হবে না। কলমা গায়ত্রীর চাকরি ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব দেশ তখন বরদাস্ত করবে না। চাকরে হিন্দু মুসলমানের কমুন্যাল বিষ ছড়ান বন্ধ হবে না, যতদিন না অ-চাকরে জনসাধারণের নিজেদের পলিটিকস সে বিষের থলি উগরে ফেলে। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান অন্যান্যের যুদ্ধ সজ্জার ভয়ে বা যুদ্ধান্তে নিজেরাই চাকরি প্রতিপত্তির একটি রফা নিষ্পত্তি করে দেশের বড় কাজে হাত দেবে সে আশা দুরাশা। চাকরির কামনা চাকরিতে শান্ত হয় না; যত পাওয়া যায় লোভ ততই বাড়ে। 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে।' কমুন্যাল রোগের চিকিৎসা দেশের চাকরিপন্থীদের হাত থেকে দেশের পলিটিকসকে ছিনিয়ে নেওয়া।

এ কাজ কঠিন। এ পথ চড়াই উতরাই-এর বিষম পথ; যার মোড়ে মোড়ে বিপদ। এ পথে প্রকাশ্য ও গোপন মুসলমান ও হিন্দু শত্রুর অবধি থাকবে না স্বার্থনাশের যাদের আশঙ্কা। যাদের

মধ্যে কাজ এবং যাদের জন্য কাজ তারাই সন্দেহ করবে ও মারমুখ হবে। তাদের উত্তেজিত করার লোকের অভাব হবে না। কম্যুনিস্ট বলে পুলিশ লেলিয়ে দেবার কমুন্যালিস্ট জুটবে অনেক। এ কাজের উপায় মানুষের বুদ্ধিকে জাগান, অন্ধ সংস্কারকে উসকান নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ সে মানুষের দলের অধিকাংশ যখন নিরক্ষর অজ্ঞান। এ কাজের যারা কর্মী তাদের চেতন ও অবচেতন মনকে করতে হবে সকল রকম সাম্প্রদায়িক রাগ দ্বেষের কলুষমুক্ত। এবং আচার ব্যবহারে যারা ভিন্ন তাদের সঙ্গে শত্রুতায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে তীব্র মাদকতা তাতে মাতাল হওয়ার আনন্দ এতে নেই। বহু শ্রমে ফল ফলবে অল্প, বহু ডাকে সাড়া দেবে অল্প লোক। আশা ভঙ্গ হবে পদে পদে। তবু এই পথই পথ, আর সব অন্ধগলি।

এ পথেও সিদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তা নয়। জাতির এমন দুর্দিন আসে, যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র লোভ অন্ধ বিদ্বেষকে দূর করে তার শুভবুদ্ধি কিছুতেই জাগে না। ভারতবর্ষ ও বাংলার যদি এমন দুর্ভাগ্যই হয়, যদি জাতীয়তার কোনও মন্ত্রেই সাম্প্রদায়িক বিষ ধ্বংস না হয় তবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পালটায়, তার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হয়তো অনিবার্য হবে। কিন্তু তাতে উৎসাহের কিছু নেই; সে আমাদের পরাজয়। এমন প্রাণী আছে পারিপার্শ্বিক যখন তাদের স্বাভাবিক জীবনলীলার প্রতিকূল হয় উঁচুস্তরের প্রাণীর উপযোগী শরীরের যন্ত্রপাতি লোপ হয়ে তারা ধাপে ধাপে নেমে যায় আদিম ভ্রূণের পিণ্ডাকার অবস্থায় শুভ দিনের অপেক্ষায়। তবুও বেঁচে থাকে। সে বাঁচা জীবন্মৃত্যু, হিন্দু স্মৃতিকারেরা যাকে বলেছেন জীবন্ত শব। জীবিতা এব শবাস্তে তস্মাৎপারশবা স্মৃতাঃ। জাতির পারশবত্ব প্রাপ্তি জয়ধ্বনির কারণ নয়।

কমুন্যাল সমস্যা মীমাংসার অন্য উপায় যে কল্পনা করা যায় না তা নয়। ভারতবর্ষের বাইশ কোটি হিন্দু আট কোটি মুসলমানকে দমিয়ে ইংরেজকে তাড়ালে, অথবা আট কোটি মুসলমান বাইশ কোটি হিন্দুকে দাবিয়ে ইংরেজকে খেদালে এ সমস্যার অবশ্য মীমাংসা হয়। হিন্দু মহাসভার ভীষ্ম দ্রোণেরা ও মোসলেম লিগের সিংহ ব্যাঘ্ররা চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে যে শক্তিতে সম্ভব চাকরির ভাগাভাগির উৎসাহে তার সৃষ্টি হয় না। ভাতেব চুল্লির আগুনে ড্রেড নট চলে না।

৭

উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুর চাকরি ও প্রতিষ্ঠার উপর মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অভিযানের একটা সুফল ফলেছে। উচ্চ হিন্দু যে বাঙালি হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র অংশ সে চেতনার শুরু হয়েছে। ভাব ও চিন্তার প্রচার অল্প লোকে করা যায়, তার সৃষ্টি করে আরও অল্প লোক, চাকরি ও প্রতিপত্তি প্রার্থী লোক অনেক হলে বিপদ কিন্তু সংখ্যার চাপ যেখানে প্রয়োজন সেখানে দল বড় না হলে কাজ হয় না। বাঙালি হিন্দুর এই সংখ্যা আছে উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে নয়, নিচু জাতি হিন্দু পল্লির ভিতরে। সুতরাং উচ্চবর্ণের হিন্দু মুখে এনেছে যে উঁচু নিচু সব হিন্দু আমরা পরস্পরের ভাই। আমরা ভিন্ন নই, আমরা এক।

এই নিম্ন শ্রেণি হিন্দুর প্রাণশক্তি যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, অর্থহীন ও আত্মঘাতী আচারের নাগপাশে যে তাদের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম, জীবনকে পঙ্গু করে মৃত্যুকে ঘনিয়ে আনার যত রকম ফন্দি দিনের পর দিন যে তারা আবিষ্কার করে চলেছে সে দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। এরা যে কত দুর্বল, নিজের শক্তিতে কত আস্থাহীন, যেখানে এরা সংখ্যায় অল্প এবং যেখানে এরা সংখ্যায় বেশি প্রতিবেশী দুর্দান্ত মুসলমানের অত্যাচার যে এরা বিনা প্রতিকারে সহ্য করে, স্ত্রী কন্যার সম্মান রক্ষায় হাত তুলতে ভরসা করে না সে বার্তাও আমাদের বিচলিত করতে আরম্ভ করেছে। এ সব ব্যাপার নতুন নয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পর থেকে এদের আরম্ভ হয়নি। দু'-চারটি সন্ন্যাসী গোছের প্রতিষ্ঠান ছাড়া উচ্চ হিন্দুর ব্যাপক দৃষ্টি এতদিন এদিকে যায়নি। আজ যাচ্ছে নিষ্কাম প্রীতিতে নয়, নিজের গরজে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কোন আঘাতে চৈতন্য এল সেটা মুখ্য নয়, আশার কথা যে ঘুম ভাঙছে।

এর প্রতিকারের যে উপায় উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্যবস্থা করছে তার নাম 'হিন্দু-সংগঠন'।

হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর, উচ্চ শ্রেণির সঙ্গে নিম্ন শ্রেণির হিন্দুর নাড়ির যোগ এমন দৃঢ় করতে হবে যে এক অঙ্গের আঘাতে সমস্ত শরীর ব্যথা পাবে এবং প্রতিবিধানে তৎপর হবে।

অসহায় নিম্ন শ্রেণির হিন্দুকে ভরসা দিতে হবে, কথায় ও কাজে, যে তারা অসহায় নয়, উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত হিন্দু, যাদের অর্থ আছে, বুদ্ধি আছে, বল আছে, তারা তাদের ভাই, আপদ বিপদে সহায়, সুখ দুঃখের ভাগী। এবং আশা করা অন্যায় হবে না যে এতে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর আপদ বিপদ নিজেদের আপদ বিপদ মনে করবে, সব কাজে তাদের অনুবর্তী হবে, সংখ্যার প্রয়োজনে নিজেদের সংখ্যা দিয়ে বাঙালি হিন্দুর অখণ্ড সংখ্যা বাড়াতে দ্বিধা করবে না।

যে 'সংগঠন' বাঙালি হিন্দুকে বড় ছোট অভেদে এক গোষ্ঠী করে গড়তে চায় তার প্রেরণা যে অবস্থার ফেরেই এসে থাকুক না কেন জাতির পক্ষে তা পরম মঙ্গলের। কিন্তু প্রথম উৎসাহের উত্তেজনার ফেনা প্রশমন হলেই দেখা যাবে যে এ সংগঠনের যে সব পেটেন্ট মাল মশলার বিজ্ঞাপনে দেশের মনের দেয়াল ভর্তি, গড়নের কাজ তা দিয়ে বেশি দূর এগোয় না। কারণ তাতে আর যাই থাকুক চুন সুরকি নেই। ইট সাজান যায় কিন্তু তাদের জোড়া লাগান যায় না।

যে আশ্চর্য ভ্রাতৃত্বে ভাইয়ের স্পর্শ অশুচি, তার হাতের অন্ন অমেধ্য, তার সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ পাতিত্য আনে সেই আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব নিয়ে কোনও রকম ব্যাবহারিক একত্ব বন্ধন সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যতা বর্জন, মন্দিরের দ্বার মোচন, হাতের জল চল এ সব উপসর্গের চিকিৎসা, রোগকে বহাল রেখে। রোগ থাকতে উপসর্গ দমন করা যাবে কিনা সন্দেহ। আর যদি যায় তবে সে রোগ যে অন্য উপসর্গের আকারে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে তা নিঃসন্দেহ। হিন্দু সমাজের সেই মূল রোগ হচ্ছে জাতি ভেদের গণ্ডি। ওর অভেদ্য খোলার আবরণ সমস্ত সমাজে এক নাড়ির যোগ স্থাপন অসম্ভব করেছে। হিন্দু সংগঠন যদি প্রকৃতই সে কাজ করতে চায় তবে ওই গণ্ডি তুলতে হবে, ওই খোলা ভাঙতে হবে। জাতির খোপ খোপ যেমন আছে তেমনি থাকবে, শুধু ভাই বলে ডাক শুনে সমস্ত হিন্দুর হবে এক মন,

এক প্রাণ— এ আশা নিজেকে বঞ্চনা করা, পরকে ফাঁকি দেওয়া। সামাজিক অসম্বন্ধের গভীর পরিখার যে ভেদ সুস্পষ্ট নামের জোরে সে ভেদ অভেদ প্রমাণ হবে না, কলিতে নামের মাহাত্ম্য যতই প্রবল হোক। আর এ সব বর্জন মোচন আন্দোলনের মধ্যে যে মনুমেন্ট স্পর্শী দম্ভ রয়েছে কেবল শুনে শুনে গা সওয়া হয়েছে বলেই আমরা তাতে লজ্জা পাইনে। আমাদের স্পর্শ পেলে নিম্ন হিন্দু কৃতার্থ হবে এ রামচন্দ্রত্বের অভিনয় উচ্চবর্ণের হিন্দু করে কোন লজ্জায়! আমাদের দেব মন্দিরে ঢোকার অধিকারে চণ্ডাল হবে ধন্য দেবতার এ অপমান তারা করে কোন সাহসে যারা গর্ব করে বলে হিন্দুর 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

৮

এ প্রস্তাবে তর্ক উঠবে জানি ইতিহাস, বিজ্ঞান, শাস্ত্রের তর্ক। এমন কোনও প্রস্তাব আছে পণ্ডিত লোকে যাকে গ্রাহ্য অগ্রাহ্য দুই প্রমাণ করতে না পারে।

অতি বুদ্ধিমান লোক বলে হিন্দু সমাজে উঁচু জাত যে তার নিচু জাতের হাতে ভাত খায় না, তাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ যে নিষেধ, তার মধ্যে ঘৃণা অবজ্ঞার লেশ নেই। ওটা শুধু আচার, যেমন অনেক বিধবা মা ছেলের হাতের ছোঁয়া খান না। তফাত কেবল এই শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের মনোভাব ছেলের উপর মায়ের স্নেহ নয়, অন্তত শূদ্র তার কোনও প্রমাণ পায় না। অন্য সমস্ত গুণ দোষ নিরপেক্ষ কেবল জন্মের ফলে একদল লোকের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যদলের হীনত্ব জাতি ভেদের ভিত্তি। মনু বলেছেন বটে যে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোক্ত গুণ নেই সে হচ্ছে তেমনি ব্রাহ্মণ যেমন কাঠের হাতি ও হাতি। কিন্তু সেই পুতুল ব্রাহ্মণেরও শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করলে জাত যায়, সে শূদ্রের যতই ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকুক না কেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অন্যের হীনত্বের ধারণা এক বস্তুর দুই পিঠ। একটি ছেড়ে অন্যটি থাকে না।

জাত অল্প নিচু হলে তার উপর অবজ্ঞা, আর বেশি নিচু হলে তার উপর ঘৃণা এর অবশ্যম্ভাবী ফল। অবশ্য এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা যখন দু'পক্ষের একান্ত অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন যে ঘৃণা করে তার সে মনোভাবে কোনও তীক্ষ্ণতা থাকে না, যে ঘৃণা পায় তারও অপমানের বোধ থাকে না। ব্যাপারটা দু' পক্ষের রোদ বাতাসের মতো স্বাভাবিক মনে হয়। দাসত্বের ইতিহাসে বার বার তা প্রমাণ হয়েছে। এটা ঘৃণার অভাব নয়, ঘৃণার চরম ও ভয়ংকর পরিণতি। যাক এ মনস্তত্ত্বের তর্কে লাভ নেই। যাদের বাঁচিয়ে 'আচার' তারা একে অপমান বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা তাদের মধ্যে যত বাড়বে এ অপমানের বোধ তত বেশি হবে, এবং জাতের দেয়াল আঁকড়ে থাকলে উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হবে অনতিক্রমণীয়। এর লক্ষণ চার দিকে দেখা যাচ্ছে। 'হিন্দু সংগঠনে' যারা উদ্যোগী একে উপেক্ষা করার তাদের উপায় নেই।

ইতিহাসের তর্ক কম নয়। এ জাতিভেদ তো হিন্দু সমাজে হাজার হাজার বছর রয়েছে। আর হিন্দু সভ্যতা আজও টিকে আছে। কোথায় অন্য সব প্রাচীন সভ্যতা! হিন্দু সভ্যতা যে টিকে আছে, অর্থ তার যাই হোক, আর এককালে যে সে সভ্যতা গৌরবের ছিল সেটা

জাতিভেদের ফল নয়, জাতিভেদ সত্ত্বেও অন্য গুণে এবং পারিপার্শ্বিকের অনুকূলতায়। বাইরের আঘাত যেই প্রবল হয়েছে অমনি ওই দুর্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। শরীরে অনেক রোগের বীজ থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে থাকে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায়, শরীরের অন্য শক্তি যতদিন রোগের বীজ চেপে রাখতে পারে, এবং পারিপার্শ্বিক যতদিন বীজ থেকে রোগ প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি না করে। যখন যা ঘটে তখন জীবনযাত্রার প্রণালী বদলাতে হয়, রোগ প্রতিষেধের বিশেষ উপায় করতে হয়। সহজ কথা অবস্থা বদলেছে, বাঁচতে হলে ব্যবস্থা বদলাতে হবে। সেইজন্য হিন্দুর 'স্মৃতি' বার বার বদল হয়েছে, এক এক মুনির সঙ্গে অন্য মুনির মতের মিল নেই।

তর্কটা যখন পণ্ডিত লোকেই তোলে তখন দু'-একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অবান্তর নয়। হিন্দুর জাতিভেদের আজ যে চেহারা, ভাতের হাঁড়ির শুচিতা, ও বিবাহে পাথরের বেড়া, হিন্দু সভ্যতার গৌরবের দিনে তার এমন আকার ছিল না। আপস্তম্বের স্মৃতিতে দেখি পাকটা ছিল আর্যাশ্রিত শূদ্রের কাজ, কেবল নামটা দেওয়া হয়েছিল পাকযজ্ঞ। অনুলোম বিবাহ হিন্দু সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ পর্যন্ত চলতি ছিল; স্মৃতি গ্রন্থের পাতায় নয়, সামাজিক ব্যবহারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক; হিন্দু সভ্যতার গৌরবের শেষ যুগ, অনেকের মতে সবচেয়ে গৌরবের যুগ যখন সে সভ্যতা এশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বাণভট্টের বংশ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ। যার পরিচয়ে তিনি 'কাদম্বরী'র প্রস্তাবনা শ্লোকে বলেছেন যে, অনেক গুপ্ত রাজারা তাঁর পূর্ব-পুরুষের পাদপল্লব অর্চনা করেছেন। তাঁদের বাড়ির পোষা শুকপক্ষীও ক্রমাগত তান শুনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করত। সেই বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' বিনা দ্বিধায় লিখেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার ব্রাহ্মণী পত্নীর পুত্র, কিন্তু তাঁর আর দুটি ভাই আছে যারা তাঁর পিতার শূদ্রা স্ত্রীর সন্তান; তাদের নামও তিনি দিয়েছেন। সেদিনকার উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজে যদি এমন বিবাহে বিন্দুমাত্রও দোষ বর্ণনা থাকত, বাণভট্ট সে কাহিনি কখনই লিখতেন না।

কিন্তু 'বায়লজি' কি এ প্রস্তাবের বিরোধী নয়? হিন্দুসমাজে এই যে উচ্চ জাতি নিচু জাতির ভেদ একি কতকগুলি বিশেষ শ্রেষ্ঠ গুণকে রক্ত মিশ্রণে লোপের আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে চিরকালের জন্য রক্ষা করার ব্যবস্থা না? এ ভেদ তুলে দিয়ে একাকার করলে কি বহুকালের গুণের পুঁজি তছরুপ হবে না? বাঙালি ব্রাহ্মণ ও বাঙালি শূদ্রের দিকে তাকিয়ে, ও শিক্ষা সমান পেলেও তাদের বুদ্ধির তারতম্যে, যাঁরা জাতির তফাত দেখতে ও ধরতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয় অসামান্য লোক! বাঙালি ব্রাহ্মণের ফরসা চামড়া, কটা চামড়া, কাককৃষ্ণ চামড়া; উঁচু নাক, খাঁদা নাক; লম্বা মাথা, গোল মাথা সব দেখেও তাদের রক্তের বিশুদ্ধতায় যাঁরা বিশ্বাস হারান না, তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতের দৃঢ়তাও অসাধারণ! মানুষে মানুষে ভেদ আছে, বুদ্ধির শক্তির, নানা পটুতার যা জন্মগত; কোনও শিক্ষার বলে সে ভেদ লোপ করা যায় না। এর চেয়ে স্পষ্ট সত্য আর কী আছে! কিন্তু যারা প্রমাণ করতে চান যে হিন্দুর জাতিভেদ মানুষে মানুষে এই স্বাভাবিক প্রভেদের রেখা ধরে নিজের গণ্ডি এঁকেছে তারা 'বায়লজি'র নাম নেন বৃথা। 'বায়লজি' কেবল প্রমাণ করবে যে এই কল্পনার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের, সুতরাং বিজ্ঞানের কোনও সম্বন্ধ নেই। জাতিভেদ তুলে দিলে হিন্দু সমাজ

একাকার হবে না। অন্য আর সব সমাজের মতো নানা স্বাভাবিক ভেদ বজায় থাকবেই। যেমন শিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে অশিক্ষিত পরিবারের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটবে কদাচিৎ।

এবং শিক্ষিত হবার সামর্থ্যই প্রমাণ দুই পরিবারের জন্মগত গুণের অমিশ্রেয় প্রভেদ কিছু বর্তমান নেই।

প্রাচীন হিন্দু আচার্যেরা জাতিভেদের গুহাস্থিত এই 'বায়লজি'র তত্ত্ব অবশ্য অবগত ছিলেন না। মনুর 'ভাষ্যে' মেধাতিথি প্রশ্ন তুলেছেন ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্র জাতির এই যে ভেদ এ কেমন ভেদ? একি গোজাতি ও অশ্বজাতির যে দৃষ্ট ভেদ, তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায়, সেই রকম ভেদ, অবশ্য নয়; কারণ দেখে কেউ বলতে পারবে না কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র। সুতরাং এ ভেদ অদৃষ্ট শাস্ত্রীয় ভেদ, লৌকিক জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এ কালের সনাতন পন্থীরা মীমাংসকদের লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের তফাত মানে না। হিন্দুধর্মের 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যায় সুবিধা পেলেই তাঁরা রাজি। প্রাচীন ঋষিদের অভ্রান্ত জ্ঞানের উপর তাঁদের অগাধ ভক্তি, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড়বাদের উপর তাঁদের অসীম অবজ্ঞা। কিন্তু ও বিজ্ঞানের কোনও কিছু তাদের সনাতন মতের সমর্থন মনে হলেই তৎক্ষণাৎ তা লুফে নেন। কিছু আশ্চর্য নয়। তাঁরা আঁকড়ে থাকতে চান তাঁদের সংস্কারগুলিকে, বিনা বিচারে ও বিশ্লেষণে। যদি ঋষিবাক্য পাওয়া যায় ভালই। আর যদি জড়বাদী, ম্লেচ্ছ বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পাওয়া যায় সেভি আচ্ছা।

যাঁরা বলেন জাতিভেদ হিন্দু ধর্মের অত্যাজ্য অঙ্গ, ওকে না মানলে ধর্ম হানি হয়, এবং ঐহিকের সুবিধার জন্য পারত্রিক ক্ষতি মূর্খতা তাঁদের কোনও তর্কই নেই। বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু বাঁচুক কি মরুক সেটা বড় কথা নয়, জাতিভেদের শুচিতা রক্ষা তার চেয়ে অনেক বড় কথা। তাঁরা সে শুচিতা সযত্নে রক্ষা করুন। তাঁদের অশূদ্রস্পৃষ্ট স্বর্গের দরজা কেউ অবরোধ করবে না।

৯

এত কালের অভ্যস্ত প্রথা বর্জন করতে বহু তর্ক ও বহু আন্দোলনের ফলেও সমস্ত বাঙালি হিন্দু একমত হবে সে আশা কেউ করে না। এবং এখানে ওখানে দু'-চার জন ন্যায় ও ধর্ম বোধে জাতি বর্জন করলে তারা একঘরে হওয়া ছাড়া বাঙালি হিন্দু সমাজের উপরে তার অন্য ফল আর কিছু ফলবে না। বাঙালি হিন্দুর মধ্যে এ সংস্কার আনার পথ ওকে জাতীয় আন্দোলনের অংশ করা। যারা মনে করে এবং আন্দোলন আলোচনার কালে মনে করবে ও-ভেদের লোপ জাতির জীবন ও সৃষ্টির জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন তাদের দল বেঁধে ওকে বর্জন করতে হবে। হিন্দু থেকে ও হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রথম থেকেই সে দল ছোট হবে না, এবং তাকে একঘরে করার চেষ্টা হবে অর্থহীন। দলাদলি অবশ্যই আরম্ভে থাকবে কিন্তু মনে হয় বেশি দিন নয়। ও সংস্কারের মধ্যে সত্যের ও মনুষ্যত্বের যে ভিত্তি এবং প্রয়োজনের যে তাগিদ আছে তাতে অল্প দিনের মধ্যে

বিরোধীরাই হবে একঘরে। এবং ফল দেখে চোখের ঠুলি একবার খুললে স্বাভাবিককেই মনে হবে স্বাভাবিক।

এ কাজ অবশ্য আরম্ভ করতে হবে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুর। জাতের গণ্ডি তারা না তুললে শুধু তাঁদের উপদেশ নিম্নশ্রেণির হিন্দু নিজেদের সব অদ্ভুত ভেদ তুলে দেবে এ মনে করা মূঢ়তা। উচ্চ শ্রেণির হিন্দু অনুকরণেই বাঙালি নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে জাতির বিভাগ হচ্ছে আদিম cell এর মতো। এক হচ্ছে দুই, দুই হচ্ছে চার। এবং বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে বহু শ্রেণির হিন্দু চলেছে লোপের মুখে। উপদেশ বৃথা। নিজের জাত তুলে দিয়ে জাত যে তোলা যায় তা দেখাতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' জাতিভেদের উচ্ছেদে বাঙালি হিন্দু যে কেবল নিজেদের যথার্থ এক মনে করে গাঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হবে তা নয়। ওই সংস্কারের চেষ্টায় ও ফলে তার মধ্যে যে শক্তি আজ রুদ্ধ আছে তা প্রকাশের পথ পাবে। এবং তাতে বাঙালি হিন্দুর হবে নবজন্ম, নবশক্তি ও নবদৃষ্টি নিয়ে। বাঙালি হিন্দু আধুনিক ভারতবর্ষকে ভাব ও আদর্শ কম দান করেনি। তার এ চেষ্টা সফল হলে ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর উপর তার ফল ফলতে দেরি হবে না।

১০

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ যুদ্ধ ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হবে, এবং ভরসা করেন তার ফলে মানুষের মধ্যে আসবে এক নবযুগ— 'নিউ অর্ডার'। জাতির সঙ্গে জাতির ও দেশের সঙ্গে দেশের অত্যাচারী অত্যাচারিতের সম্পর্ক আর থাকবে না। পৃথিবীর মানুষ হবে এক গোষ্ঠী, সকলের দরদে হবে সকলে দরদি। এমন যদি ঘটে তবে কথাই নেই। কোথায় থাকবে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, আর কোথায় থাকবে বাঙালি হিন্দুর জাতিভেদ ও দুর্বলতা। মহাযুদ্ধের মহাম্যাজিকে ও সব ছোটখাটো ব্যাপার কোথায় তলিয়ে যাবে লক্ষই হবে না। বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি হয়ে যাবে তাদের মীমাংসা।

মানুষের বাইরের ও মনের সভ্যতাকে ধাপে ধাপে টেনে তুলতে হয় প্রাণান্ত পরিশ্রমে। কখনও এক ধাপ উঠে আবার নীচে গড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমের শেষ নেই, আশাভঙ্গেরও অবধি নেই। যুগ-যুগান্তব্যাপী এই সংগ্রাম জয় হয়ে যাবে একটা মাত্র বিরাট হত্যাকাণ্ডে— কার না আকাঙ্ক্ষা যায় বিশ্বাস করতে! 'মিরাকলে' বিশ্বাসের তাই তো মূল।

কুরুক্ষেত্রের ফলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাম্ভিক দুর্যোধনের রাজ্যহানি ও মৃত্যু এবং মিষ্টভাষী যুধিষ্ঠিরের জয় ও রাজ্যলাভ এ ছাড়া সে ধর্মরাজ্যের স্বরূপ কী ছিল বেদব্যাস কিছু বলেননি।

ইতিহাসের মুক্তি

ইতিহাসের মুক্তি

মানুষ মানুষের কথা শুনতে ভালবাসে— প্রাচীন মানুষের কাহিনি, সমকালীন মানুষের সংবাদ। আধুনিক সভ্য জগতে এই দ্বিতীয় চাহিদার জোগান দেয় খবরের কাগজ। প্রথম আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের জন্য অনেক পূর্ব থেকেই মানুষ রচনা করছে ইতিহাস। কোনও ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই স্বীকার করতে রাজি হবেন না যে তাঁদের ইতিহাস-রচনা খবরের কাগজ প্রকাশের সমধর্মী। ইতিহাস গড়ার মালমশলা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সম্ভব অসম্ভব নানা মূল থেকে বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ কি খবরের কাগজের জন্য ঋজু পথে ও কুটিল কৌশলে সাংবাদিকের সংবাদ-সংগ্রহের সমতুল্য? সংগৃহীত সংবাদের সত্যাসত্য ও লঘুগুরু যাচাই করে সম্পাদকীয় সন্দর্ভ যে তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে, সংগৃহীত উপকরণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ও নির্মম বিচারে খাঁটি সত্য নির্ণয় করে ঐতিহাসিক সে ব্যাপারের যে বিবরণ দেন ও তার মর্মগত ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার করেন, সে কি ওই খবরের কাগজের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের সমগোত্রীয়? নিজ কর্মের গুরুত্বে অবহিত কোনও আত্মসম্মানী ঐতিহাসিক এমন কথা ভাবতে পারেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে তিনি অতীত ঘটনার সাংবাদিক! যদিচ মনে পড়ছে, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড ফাউলার তাঁর রোমের চটি ইতিহাসে, প্রাচীন রোমান সেনেটের যে বিবরণ পণ্ডিতেরা অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষায় সংগ্রহ করেছেন, তাঁর কিছু পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, এসব পাণ্ডিত্য বিস্মৃতির অতলে ডোবাতে তিনি রাজি আছেন যদি ওই রোমান সেনেটের একদিনকার অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন, অর্থাৎ যদি একদিনের অধিবেশনের রিপোর্টার হতে পারতেন।

খবরের কাগজের সঙ্গে ইতিহাসের নাম একসঙ্গে উচ্চারণে ঐতিহাসিকের বিরক্তির কারণ তার চেষ্টা ও সৃষ্টিকে খেলো করে দেখাতে। যে বিচারবুদ্ধি ও মননশক্তি, সত্যসন্ধিৎসা ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ইতিহাস-রচনায় প্রয়োজন তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে। সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও সম্পাদকীয় স্তম্ভের পেশাদার লেখকদের কথা তোলা বিকৃতরুচি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চাঙ্গ মানসিক চেষ্টাকে খাটো করে দেখাই ইতিহাসকে হেয় করার মুখ্য কথা নয়। বড় কথা ইতিহাসের লক্ষ্যকেই ছোট করে ফেলা। মনের নানা খেয়ালখুশির চরিতার্থতায় মানুষ অনেক রকম সৃষ্টি করেছে। রাজারাজড়া এবং বীরপুরুষেরা প্রাচীন বীরত্বের কাহিনি শুনতে চেয়েছে। চারণেরা কিংবদন্তি ও কল্পনায় মিশিয়ে গাথা রচনা করে রাজসভা ও বীরসভায় গান করেছে। মানুষ সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে নিয়ে হাসি-কান্না উপহাস-পরিহাসের কথায় মশগুল হয়। তাই কথাসরিৎসাগরের মতো বই দেশে দেশে লেখকেরা লেখে। মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে।

পড়তে-লিখতে-জানা আধুনিক পৃথিবী গল্প-উপন্যাসে ছেয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাস এসব মনোরঞ্জকদের দলে নয়। তার লক্ষ উঁচু। অতীতের কাহিনি সে বলে বটে— সমস্ত রকম মিথ্যা রাগ-বিরাগ-কল্পনার খাদমুক্ত অতীতের খাঁটি সত্য। কিন্তু সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের কাজ নয়, যদিও গল্প সত্য হলে লোকের তাতে বেশি অনুরাগ। লোকে ভূতের গল্পেও সত্য-ভূতের গল্প শুনতে চায়; কারণ গল্প বলাটা ইতিহাসের উপলক্ষ না হোক, উপায় মাত্র। (ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা) তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা যেসব উপদেশ করেছেন তাঁদের উপদেশের বাস্তব রূপ দেখা যায় ইতিহাসে। (সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগদর্শন হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস কাহিনিকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।)

২

ইতিহাসের এই উপদেষ্টার পদগৌরব অনেককাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, যেসব লোক আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও বলেন ইতিহাসের মতো সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি, সেইসব অল্পবুদ্ধি অরসিক সাধুলোকদের নমস্কার করেছেন।

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায় ॥

ধনঞ্জয়ের মতে নাট্যের স্থান ইতিহাসের উপরে কি না সে কথা অবান্তর। (কিন্তু ইতিহাসের কাজ যে আনন্দ দেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়া, তাঁর এ অভিমত সুস্পষ্ট।)

ধনঞ্জয় আধুনিক লেখক। মাত্র হাজার বছর পূর্বেকার লোক। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সময়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশের নানা পুথিতে ইতিহাস নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে দ্বিজাতির পাঠ্যের তালিকায় একটি পাঠ্যবিষয় হচ্ছে ইতিহাস।

বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোঽন্বহম্ ॥

আচার, ৪৫

বেদাথর্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞার্থসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাং চাঽধ্যাত্মিকীং জপেৎ ॥

আচার, ১০১

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি খুব কম করেও ধনঞ্জয়ের পাঁচশো বছর পূর্বের।

মনুস্মৃতিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের সময় যেসব শাস্ত্র পড়ে শোনাবার বিধি আছে তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥ ৩।২৩২

মনুস্মৃতির যে পুথি আমরা পেয়েছি, খ্রিস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকে মেধাতিথি যার ভাষ্য লিখেছিলেন, তার রচনা বা গ্রন্থন-কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। কিন্তু কোনওমতেই সে রচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে নয়। তার চেয়ে দু'-তিনশো বছর পূর্বে হওয়াই খুব সম্ভব।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সামবেদ ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদ এই ত্রয়ীর বাইরে ইতিহাসকেও অথর্ববেদের সঙ্গে বেদ বলা হয়েছে।

সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।
অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ ॥
প্রথম প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসকে বেদ বলাতে বোঝা যায় যে, নানা বিদ্যাকে লক্ষ করে ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। ওর অর্থ কী তা রাজার নানাবিদ্যাচর্চার প্রসঙ্গে কৌটিল্য নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা দিনের পূর্বভাগে যুদ্ধের নানা অঙ্গের বিদ্যা শিখবেন।

পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে। পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যা-
য়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ ॥
দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায়

দিনের শেষভাগে ইতিহাস-শ্রবণে শিক্ষালাভ করবেন। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র— এদের বলে ইতিহাস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল পণ্ডিতদের বিরাট তর্কস্থল। কিন্তু অপণ্ডিত লোকও যদি প্রচলিত মনুস্মৃতির সঙ্গে এ অর্থশাস্ত্র পড়েন তবে প্রতীতি হতে দেরি হয় না যে, কৌটিল্যের বহু অংশ মনুস্মৃতির চেয়ে প্রাচীনতর। সুতরাং যে পণ্ডিতেরা অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল বলেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক তাঁদের মত অগ্রাহ্য করবার কোনও সংগত কারণ নেই।

গৌতমধর্মসূত্রে, যে-সকল বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষা করেন তাঁদের বহুশ্রুতত্বলাভের জন্য যেসব বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয় তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

দ্বৌ লোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতঃ। ৮।১
স এষ বহুশ্রুতো ভবতি।
লোকবেদবেদাঙ্গবিৎ।
বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ ॥ ৮॥৪-৬

বাকোবাক্য নামে বিদ্যাটির উল্লেখ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচনেও আছে— টীকাকাররা ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রশ্নোত্তর-রূপ বিদ্যা, সম্ভব তর্কশাস্ত্র, গ্রিসে Socratic dialogue-এ যার আরম্ভ।

যে-সকল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পুথি টিকে আছে বা এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, গৌতমধর্মসূত্র তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এর যেসব প্রসঙ্গ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে এক তাদের মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, গৌতমধর্মসূত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীনতর কালের ব্যবস্থা। পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, গৌতমধর্মসূত্রের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ছয়শো থেকে চারশো শতকের পরে নয়। এ মত গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে থেকেই আমাদের দেশে ইতিহাস নামে বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল ও চর্চা চলেছিল। এ বিদ্যার স্বরূপ কী ছিল?

৩

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের গণনা স্পষ্টই পারিভাষিক ব্যাপার। ওর মূল অপারিভাষিক অর্থ, অন্য যেসব বিদ্যার নাম করা হয়েছে তাদের সমষ্টি— পুরাতনকালের বৃত্তান্ত, আখ্যায়িকা ও তাদের মধ্যে যে উপদেশ নিহিত আছে, যেসব ঘটনার উদাহরণ তাদের দৃঢ় করে। এরকম উদাহরণের বেশ একটু চমকপ্রদ নমুনা কৌটিল্য থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

কৌটিল্য রাজাকে বাইরের ও ঘরের নানা শত্রু থেকে আত্মরক্ষায় সাবধানতার উপদেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ এই: অন্তঃপুরে মহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রাজা পূর্বে পরিচারিকাকে দিয়ে অনুসন্ধান নেবেন যে বিপদের কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা এবং এমন পরিচারিকাকে সঙ্গে না নিয়ে একাকী যাবেন না, কারণ—

> দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জঘান।
> মাতুঃশয্যান্তর্গতশ্চ পুত্রঃ কারূশম্।
> লাজান্মধুনেতি বিষেণ পর্যস্য দেবী কাশিরাজম্।
> বিষদিগ্ধেন নূপুরেণ বৈরন্ত্যং মেখলামণিনাং সৌবীরং।
> জালূথমাদর্শেন বেণ্যাগূঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী
> বিদূরথং জঘান। ১৷৷১৭

পট্টমহিষীর ঘরে লুকিয়ে থেকে রাজা ভদ্রসেনকে তার ভাই হত্যা করেছিল। মা'র শয্যার তলে প্রচ্ছন্ন থেকে কারূশ-রাজাকে তার ছেলে হত্যা করেছিল। মধুর ছলে খই-এ বিষ মেখে কাশিরাজের মহিষী তাকে হত্যা করেছিল। বিষদিগ্ধ নূপুরের আঘাতে বৈরন্ত্য-রাজাকে, মেখলামণির আঘাতে সৌবীর-রাজাকে, মুকুরের আঘাতে জালূথ-রাজাকে তাদের মহিষীরা হত্যা করেছিল। বেণীতে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে বিদূরথ-রাজার মহিষী বিদূরথকে হত্যা করেছিল।

সন্দেহ নেই যে, কৌটিল্য প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তবোধেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছেন, কল্পিত আখ্যায়িকার নয়। সে ইতিহাসের মূলে তথ্যের সঙ্গে কিংবদন্তির যতই মিশ্রণ থাক। অজ্ঞাত-অতীরের ভদ্রসেন-বিদূরথের হত্যা থেকে হাল-আমলের 'লিকুইডেশন' পর্যন্ত ক্ষমতালোভী মানুষের ছল ও নিষ্ঠুরতার পরিবর্তন হয়নি।

৪

মনুস্মৃতির যে শ্লোকে 'ইতিহাসাংশ্চ' বলে বহুবচনে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখেছেন, 'ইতিহাসা মহাভারতাদয়ঃ'। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির 'ইতিহাসাংস্তথা'র ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় ওই এক কথাই বলেছেন, 'ইতিহাসান্মহাভারতাদীন্'। মেধাতিথি ও বিজ্ঞানেশ্বর মনুর তুলনায় অনেক আধুনিক। মেধাতিথি খ্রিস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকের, বিজ্ঞানেশ্বর দশম কি একাদশ শতকের লোক। কিন্তু ইতিহাস যে মহাভারতের মতো গ্রন্থ এ ঐতিহ্য প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অথর্ববেদের সঙ্গে ইতিহাসকে বেদ বলা ও মহাভারত যে পঞ্চম বেদ এই প্রচলিত ধারণা, সম্ভব তার প্রমাণ। মনুস্মৃতির কোথাও নাম করে মহাভারতের উল্লেখ নেই। অনেকে মনে করেন যে, মনুস্মৃতির বর্তমান আকারে রচনার সময় বর্তমান আকারের মহাভারতের রচনা হয়নি। কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনি অবশ্য অনেক প্রাচীন; এবং সে কাহিনি নিয়ে অনেক রচনা, অনেক গাথিকার নিশ্চয় সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই সে স্বীকৃতি রয়েছে। সৌতি বলছেন, অদ্ভুতকর্মা ব্যাসের যে রচনা তিনি শোনাতে যাচ্ছেন—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥
আদি, ১।২৬

সে ইতিহাস কোনও কোনও কবি পূর্বে আংশিক বলেছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন এবং অন্য কবিরা ভবিষ্যতে বলবেন। এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে যে অনেক কল্পিত উপাখ্যানের মিশ্রণ ঘটেছে, সে কথা মহাভারতে স্পষ্ট করেই বলা আছে। উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু উপাখ্যান বাদ দিয়ে যে চব্বিশ হাজার শ্লোকে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন প্রকৃত মহাভারত।

ইদং শতসহস্রন্তু শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়ং শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্ ॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥
আদি, ১। ৬৩-৬৪

অনুমান করা কঠিন নয় যে, লক্ষকে কেটে নয়, চব্বিশ হাজারকে বাড়িয়েই লক্ষ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত রচনাটিই মূল ভারতেতিহাস। সে কাহিনি যে ঐতিহাসিক, প্রাচীনকালে সত্য সত্যই ঘটেছিল, প্রাচীনদের এ বিশ্বাস দৃঢ়। আখ্যায়িকা ও পুরাণ থেকে তাঁরা মহাভারতের কাহিনিকে ভিন্ন করে দেখেছেন। পুরাণের কথায় মেধাতিথি বলেছেন, 'পুরাণানি ব্যাসাদিপ্রণীতানি সৃষ্ট্যাদিবর্ণনরূপাণি', অর্থাৎ যার বেশির ভাগ কল্পনা। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মহাভারতের কাহিনিকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন, যেমন থুকিডিডেস হোমার-বর্ণিত ট্রোজান-যুদ্ধকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন। তবে মহাভারতের কাহিনিও যে উপদেশাত্মক, শাস্ত্রকারেরা সে কথা বলতে ভোলেননি। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে বিনয়ের সুফল ও অবিনয়ের কুফল বর্ণনা আছে। জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশে চলার নাম বিনয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অবিনয়। অবিনয়ের ফলে রাজারা সপরিগ্রহ বিনষ্ট হয়, আর বিনয়ের গুণে কোশহীন বনবাসীও রাজ্যলাভ করে। উদাহরণ,

> বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পর্থিবঃ।
> সুদাস্-যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।
> পৃথুস্ত বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ। আদি, ৭ ॥ ৪১-৪২

মেধাতিথি খুব সংক্ষেপে ভাষ্য করেছেন, 'এতানি মহাভারতাদাখ্যানানি জ্ঞেয়ানি'। এবং মহাভারতেই তার উপদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আছে। 'এতে চার বেদেরই কথা আছে, এ কাহিনি পবিত্র ও পাপভয়হারী'।

> বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
> সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্ ॥
> আদি, ১।২১

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সৌতির কাছে সোপাখ্যান লক্ষশ্লোকের 'শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্' শুনতে চেয়েছিলেন।

৫

মহাভারতের কাহিনি থেকে নানা উপদেশ-সংগ্রহ কিছুই কঠিন নয়। মানুষের অনেক কর্মচেষ্টা ও তার পরিণতি থেকেও কঠিন নয়। কিন্তু মহাভারতের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসের রচনা হয়েছিল গুটিকয়েক উপদেশের উদাহরণ-স্বরূপে— ওই উপদেশই লক্ষ্য, কাহিনির বর্ণনাটা উপলক্ষ— এমন কল্পনা সুস্থ মনের কল্পনা নয়। কোনও তত্ত্বের মায়ায় বুদ্ধির বিভ্রান্তি না ঘটলে সর্পে এমন রজ্জুভ্রম হয় না। নৈমিষাবণ্যবাসী তপস্বীরা মহাভারত-কথা শোনার জন্য সৌতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ সে কথা বিচিত্র— 'চিত্রাঃ কথাঃ'।

তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষ্যারণ্যবাসিনঃ।
চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পবিবব্রুস্তপস্বিনঃ ॥

আদি, ১।৩

যে কাহিনি বিচিত্র, গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়, তা মানুষের মনে গভীর দাগ কাটে। মানুষ সে কাহিনি ভুলতে চায় না। তাকে রচনায় নিবদ্ধ করে স্থায়ী করে রাখতে চায়। উপদেশের চিরকালীন ভাণ্ডবোধে নয়, অসাধারণ বিচিত্রকে স্থায়িত্ব দেবার মনের স্বাভাবিক প্রবণতায়। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'। কিন্তু সমাজের হিতে যাঁরা অনন্যচিত্ত তাঁরা একে উপদেশের পুণ্যজলে শোধন করে মানুষের কাজে লাগাতে চান। ঐতিহাসিক কাহিনি যে কাহিনিমাত্র নয়, সংসারের যাত্রাপথে অঙ্গুলিসংকেত, সে শিক্ষা তাঁরা ইতিহাসের কাহিনি থেকে নিষ্কাশিত করেন— সহজে বা কষ্টে। সমাজহিতৈষীদের 'প্রবৃত্তি-রেষা'। ঐতিহাসিক বলেন, 'তথাস্তু। ভেবেছিলাম অতীত নিয়ে খেলা করছি, কিন্তু দেখি সমাজের হিত করছি। মনে করেছিলাম, প্রাচীন কাহিনি-তৃষ্ণার জল এনেছি, কিন্তু দেখছি যা এনেছি তা উপদেশের অমৃত। ধন্যোঽহং।'

৬

বর্তমানে আমরা যাকে বলি 'যথার্থ ইতিহাস' (real history), হোমারের ট্রয়-যুদ্ধের কি বেদব্যাসের ভারতযুদ্ধের ইতিহাসের মতো ইতিহাস নয়, তার লেখকেরাও অনেকে বলেছেন যে, তাঁরা ইতিহাস লিখেছেন কেবল অতীতের কাহিনিকে বর্ণনার জন্য নয়, যাতে অতীতের কাহিনির আলোতে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন, যাতে সেই অতীত ঘটনা থেকে এর পর অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। পলিবিয়াস রোম-কার্থেজ-যুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধের অনুসন্ধান করেছেন, যাতে ভবিষ্যতের সদৃশ ঘটনায় এ সম্বন্ধের প্রয়োগ করা যায়। ইউরোপের কেবল গ্রিক কি গ্রিকো-রোমান যুগে নয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের এই রূপই কল্পনা করেছেন। ইতিহাস লোকশিক্ষক— ন্যায়পথের শিক্ষা দেয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের সে পরামর্শদাতা। এই কল্পনাকে মৃদু উপহাস করে র‍্যাঙ্কে তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের গোড়ায় বলেছেন, 'ইতিহাসের উপরে যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়, অতীতকে যাচাই করে বর্তমানকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, সে গুরুভার-বহনে তিনি অক্ষম। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র দেখাতে চেষ্টা করতে পারেন যে, যা ঘটেছে তা ঠিক কেমন করে ঘটেছে।'

শাস্ত্রকৃৎ কি দার্শনিকেরা যে কারণে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিককে উপদেষ্টার আসনে বসিয়েছেন সে সম্মান বহু ঐতিহাসিক লিওপোল্ড্ র‍্যাঙ্কের মতো প্রত্যাখ্যান করেননি। সে মর্যাদা ও সম্মান শিরোধার্য করেছেন এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে

সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু যদি বাইরের দেওয়া পদবির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজের কাজ পরীক্ষা করে দেখেন 'কিমিদং' তবে ইতিহাসের স্বরূপ ও লক্ষ্যের যথার্থ জ্ঞান, বৌদ্ধেরা যাকে বলেন, 'সম্যক্ জ্ঞান,' তা লাভ হয়।

থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের গ্রন্থ এই বলে আরম্ভ করেছেন :

'এথেন্সবাসী থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান ও এথেনিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করেছেন। যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এই ধারণায় যে, পূর্বে পূর্বে যা সব ঘটেছে এ যুদ্ধের গুরুত্ব তাদের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি দেখলেন, সমস্ত গ্রিস দেশ এই যুদ্ধে এক পক্ষে নয় অন্য পক্ষে যোগ দিয়েছে বা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এবং অনেক অ-গ্রিকেরাও যোগ দিচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হবে। অতীতের, বিশেষ দূর-অতীতের, কথা কালের ব্যবধানে সম্পূর্ণ জানা যায় না। কিন্তু অনুসন্ধান ও গবেষণায় যতদূর জানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় না যে অতীতের কোনও যুদ্ধ বা ঘটনার এই যুদ্ধের মতো গুরুত্ব ছিল।'

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে থুকিডিডেসের পেলপনেসিয়ান-যুদ্ধের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বের ধারণা অতিমাত্রায় মাত্রাজ্ঞানহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেমন এইচ. জি. ওয়েল্স্ বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত ও যুদ্ধটা ছিল একটা মাঝারি রকমের ঝগড়া; ওর স্মৃতি একটু বেশি টিকে আছে এইজন্য যে, থুকিডিডেস তার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। থুকিডিডেসের ধারণায় বিজ্ঞতার হাসি হাসার পূর্বে মনে করা ভাল যে, যেসব ঘটনা ও ব্যাপারের গুরুত্বে ও ব্যাপকত্বে আকৃষ্ট হয়ে বর্তমানের ঐতিহাসিকেবা ইতিহাস লিখছেন, আড়াই হাজার বছর পরে সেসব ঘটনা ও ব্যাপারে তাঁদের ধারণা লোকে কী চোখে দেখবে— অবশ্য যদি ততদিন তার স্মৃতি বেঁচে থাকে।

থুকিডিডেস তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, উপদেশ দেবার মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হননি। এ রচনায় তাঁর প্রবৃত্তি এসেছিল, কারণ এ যুদ্ধের কাহিনি তাঁর মনে হয়েছিল 'চিত্রাঃ কথাঃ'; এবং অতীতের সমস্ত ঘটনার তুলনায় 'বিচিত্রাঃ কথাঃ'।

এর পর থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ ও রচনারীতির কথা বলেছেন :

'এই যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অনুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করিনি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যারা দেখে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।'

থুকিডিডেসকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার গুরু। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও বিচারের এবং অপক্ষপাত কল্পনাশূন্য অনাবিল কাহিনি রচনায় যে সূত্রের তিনি সূত্রকার, আধুনিক ঐতিহাসিক রীতিকে তার ভাষ্য বলা যায়। অবশ্য অতি বিস্তৃত ভাষ্য। কারণ, আধুনিক কালে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও মূল্যবিচারের চেষ্টা ও পদ্ধতি যেমন বিপুল তেমনি জটিল। দু'-তিনশো বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত অনেক বিজ্ঞানবিদ্যা ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ের সহায়. যার কল্পনাও থুকিডিডেসের কালে সম্ভব ছিল না। বহু বিজ্ঞানবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্পষ্ট করে ঐতিহাসিককে অনেক প্রাচীন মূলহীন সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এবং এসব দৃষ্টফল বিদ্যার সার্থক অনুশীলন সত্যমিথ্যা-পরীক্ষার যে কঠোর মনোভাবের জন্ম দিয়েছে, ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ে ঐতিহাসিককে তা প্রভাবিত করেছে। তার স্বীকৃতির সঙ্গে উৎকর্ষের দাবি মিশিয়ে আধুনিক ইতিহাসকার নিজের রচিত ইতিহাসের নাম দিয়েছেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস', অর্থাৎ যা প্রাচীনদের ঢিলেঢালা ইতিহাস থেকে ভিন্ন। এ নামকরণে সত্যাভাস কিছু আছে, নামের মহিমায় বস্তুর তথ্য প্রকাশের চেষ্টায় যা অপরিহার্য। কিন্তু আজকের দিনের ঐতিহাসিকের হাতে সত্যনির্ণয়ের যা সব উপায় এসেছে তার তুলনায় প্রাচীনকালের ইতিহাসকার ছিলেন রিক্ত-অস্ত্র মুষ্টিযোদ্ধা মাত্র। একটু দূর-অতীতের ইতিহাস রচনা থুকিডিডেসের কাছে খুব সম্ভব মনে হয়নি। কারণ, তত পূর্বের ঘটনা সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তুত থুকিডিডেসের একুশ বছরের ইতিহাস তাঁর সমকালীন ঘটনার ইতিহাস। পলিবিয়াসের পিউনিক-যুদ্ধের ইতিহাস ঠিক তেমন না হলেও প্রায় সমধর্মী। দূর-অতীতের ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে আধুনিক ঐতিহাসিকদের রীতিপদ্ধতি অনেক অগ্রসর ও অনেক সূক্ষ্ম। যে প্রাচীনেরা তাঁদের কালের ইতিহাস লিখে গেছেন বা এমন বিবরণ লিখে গেছেন যা থেকে ইতিহাসের মালমশলা পাওয়া যায়, সে ইতিহাস ও বিবরণকে বহু দিক থেকে পরীক্ষা করে সত্যনির্ণয়ের অসীম চেষ্টা— যে কাজকে থুকিডিডেস কঠিন বলেছেন তা থেকে বহুগুণে কঠিন কাজ— আধুনিক ইতিহাস-লেখকেরা নিত্য করছেন। বিবরণের লিপি কত প্রাচীন, তার ভাষা কোন কালের, যে প্রাচীন ভাষা ও লিপির স্মৃতি লোপ হয়েছে তার পাঠোদ্ধার, মানুষের সভ্যতার যেসব সৃষ্টি মাটির নীচে চাপা পড়েছে মাটি খুঁড়ে তার পরিচয়-লাভ, মনে হয় যেন অসাধ্যসাধন। সে অসাধ্যসাধন আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সাধারণ কাজ। অতীতকে জানার এই চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্ভব হয়েছে অতীতকে জানার আগ্রহে। আর কোনও কিছুর উপলক্ষ হিসাবে নয়, ওই জ্ঞানই ঐতিহাসিকের চরম লক্ষ্য বলে। অতীতের নির্ভুল নিখুঁত জ্ঞানলাভের এই বিদ্যা মানুষ সৃষ্টি করেছে। সেই বিদ্যার ও তার আদর্শের আকর্ষণ ইতিহাসকারের উদ্যমের উৎস। সেই আদর্শে পৌঁছবার কোনও শ্রমকেই শ্রম মনে হয় না। এই আদর্শের মাপকাঠি ছাড়া অন্য যে-কোনও মাপকাঠির মাপে ঐতিহাসিকের অনেক শ্রম মনে হবে নিরর্থক পণ্ডশ্রম। যিশু জন্মেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চার অব্দে না দশ অব্দে, যুদ্ধটা আরম্ভ হয়েছিল শনিবার দুপুরে না রবিবার প্রাতে, সে গবেষণায় শ্রম ও বুদ্ধি ব্যয়ের আর কোন সার্থকতা আছে? সে সার্থকতা

হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও সত্য কথনের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে অবিচ্যুতি। সত্যের জন্যই সত্যের অনুসরণ। 'সত্যে নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ'— ঐতিহাসিকের সে ভয় হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয়। অন্য কোনও ভয় নয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যদি হত অতীত সত্য ঘটনার উদাহরণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া— ধর্মের নীতি, সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রের নীতি— তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিকৃত করলেই তা উপদেশের বেশি উপযোগী হত। অনলংকৃত নিরাবরণ সত্যের চেয়ে কল্পনায় রাঙানো ও সাজানো কাহিনির আকর্ষণ লোকের কাছে অনেক বেশি— যে আকর্ষণের অভাব আছে বলে থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাস-রচনার ব্যাজনিন্দা করেছেন। যে কারণে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সোপাখ্যান ভারতকথাকে অধিকতর শ্রাব্য মনে করেছেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে সকল বিদ্যার ধারক ও বাহক ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকেরা। তাঁরা যে ইতিহাস তখন লিখেছেন তার বেশির ভাগ খ্রিস্টধর্মের নানা ঘটনার ও খ্রিস্টান সাধুসন্তদের জীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাসকে বিচিত্র কল্পনায় পুষ্ট ও মনোহারী করে ধর্মের উপর লোকের ভক্তি ও ভয় গাঢ় করার চেষ্টা দোষের ছিল না। তাতে লেখকের ধর্মপ্রচারের নিষ্ঠাই প্রমাণ হত। এ প্রয়োজনে অসত্যকথনেও দোষ ছিল না। কারণ ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক ঊর্ধ্বে। সে কাল গত হয়েছে, কিন্তু সে মনোভাবের বীজ মরেনি। আজ ক্রমশ ধর্মের দাবির জায়গা নিচ্ছে রাষ্ট্রের দাবি। ধর্মগুরুর আসনে বসেছে রাষ্ট্রনেতা। সেই ইতিহাস হবে তাঁদের কাম্য যাতে রাষ্ট্রের উপর, অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতাদের উপর, লোকের ভক্তি ও ভয় প্রবল ও প্রগাঢ় হয়। তাতে যদি কিছু অসত্যভাষণের প্রয়োজন হয় তাতে প্রমাণ হবে রাষ্ট্রসচেতন ঐতিহাসিকের দেশপ্রেম। ইউরোপের মধ্যযুগে থুকিডিডেসের ইতিহাসের আদর্শ বেঁচে ছিল না। আজ সে পুনর্জীবিত আদর্শ অনেক বেশি কঠোর হয়েছে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকের অভাব হবে না। শোনা যাবে ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নয়। কেবল সত্যভাষণের আদর্শ থেকে তার লক্ষ্য অনেক উঁচুতে, তাব লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত. জাতির মঙ্গল।

৮

এক কাল ছিল, যখন আজ যে সকল বিদ্যা গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ তার অনেকগুলি ছিল অন্য সাধনার অঙ্গ ও উপায়। সেই উপায়ের কাজ সম্পন্ন করাই ছিল তার লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্তু মানুষের চঞ্চল কর্মকৃৎ মন ও প্রতিভা উপায়ের গণ্ডি ভেদ করে স্বতন্ত্র বিদ্যায় তাদের গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গবিদ্যাগুলি তার উদাহরণ। যে বিদ্যা ছিল বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ও সত্য অর্থ গ্রহণের উপায় মাত্র, তা গড়ে উঠল ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান হয়ে। ছন্দঃশাস্ত্র বৈদিক ছন্দোবিচারে আবদ্ধ থাকল না। জ্যোতিষ ও জ্যামিতি বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণতি পেল। মানুষের প্রতিভার এসব সৃষ্টি ও বিদ্যার চর্চাকে বৈদিক কুলপতিরা সুনজরে দেখেননি। মনুসংহিতায় তার স্মৃতি রয়ে গেছে। 'যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করে অন্য বিদ্যায় শ্রম করে এই জন্মেই তার সবংশ আশু শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়।'

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ২।১৬৮

'অন্যত্র' কথার ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেন, 'শাস্ত্রাঙ্গেষু তর্কশাস্ত্রগ্রন্থেষু বা।' কুল্লুক সোজাসুজি বলেছেন, 'অর্থশাস্ত্রাদৌ।' সর্বজ্ঞ নারায়ণ শুধু বলেছেন, 'অন্যত্র শাস্ত্রে', অর্থাৎ বেদ ভিন্ন অন্য বিদ্যায়।

ইউরোপের মধ্যযুগে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে অন্য বিদ্যার যারা চর্চা করত ধর্মগুরুরা তাদের সন্দেহের চোখেই দেখতেন। এর প্রেরণা যে ভগবানের নয়, আসে শয়তানের কাছ থেকে, সে সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন। ফাউস্টের প্রাচীন গল্প এর উদাহরণ। ধর্ম ও নীতির রথচক্রের বন্ধন থেকে বিদ্যাগুলির মুক্তি হয়েছে অনেক প্রতিকূলতার বাধা কাটিয়ে। ইতিহাসেরও ঘটেছে সেই মুক্তি। কিন্তু কোনও বন্ধন থেকে মুক্তিই চরম মুক্তি নয়। মুক্তিকে রক্ষার জন্য মানুষকে অতন্দ্র থাকতে হয়। কারণ পুরাতন বন্ধন নূতন নূতন রূপে মানুষের মুক্ত মন ও বিদ্যাকে আবার বাঁধতে চায়। মানুষের মুক্ত মন ও বুদ্ধির উপর আজকের পৃথিবী অনুকূল নয়। সম্ভব ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৯

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ইতিহাস মনের একটা খেয়াল-পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, মানুষের কোনও কাজে লাগে না? মানুষ নিজের কাজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সুতরাং মানুষেব তা কাজে লাগে। কিন্তু যে মানুষের কাজে লাগে সে মানুষ সত্যের পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তত্ত্বের মাপে কাটাছাঁটা প্রমাণসই, স্ট্যান্ডারডাইজড মানুষ নয়। মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় মুখ্যত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে। সুতরাং প্রয়োজনসিদ্ধির কাঠামে সে বস্তুকে পুরতে চায়। তাতে বস্তুর সমগ্রতা ধরা পড়ে না। কিন্তু সমগ্রকে ধরা কাঠামের কাজ নয়; তাতে কাঠামো-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। কার্যসিদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে নিষ্প্রয়োজন অবান্তরকে দূরে রাখার জন্যই কাঠামো। যা থাকে কাঠামোর বাইরে, প্রয়োজনসিদ্ধির দৃষ্টিতে তা অবস্তু। তাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চলে এবং অগ্রাহ্য করলেই কাজ ভাল চলে। ক্রমে মানুষের ব্যাবহারিক মনের ধারণা জন্মে যে, কাঠামোর মধ্যে যা রয়েছে তাই বস্তু, তার বাইরে বস্তুর আর অস্তিত্ব নেই।

আজ যারা সভ্য মানুষ, একদিন ছিল যখন তাদের পূর্বপিতামহদের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হত শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার আহার আবাস ও আচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায়। সে মানুষের কাঠামো বুদ্ধিমান দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামো। তার পর অনেক হাজার বছরের নানা সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মন শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্ত বাহুল্য মন সৃষ্টির প্রেরণায় ও আনন্দে বহু সৃষ্টি করে চলেছে যা শরীরের কাজে লাগে না, বাহুল্য মুক্ত মনের কাজে লাগে। কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাস্কর্য সবই এই মুক্ত মনের সৃষ্টি। কিন্তু সেই আদিম কাঠামোর স্মৃতি মানুষের মনে বেঁচে আছে।

তার এক কারণ, অনেক মানুষের মন আজও শরীরের সেই একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়নি। তাই যখন প্রশ্ন হয়, এ বস্তু মানুষের কোন কাজে লাগে, তখন প্রশ্নকর্তা যে মানুষের কথা বলেন সে মানুষ হচ্ছে দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামোর মানুষ। প্রশ্নের অর্থ, সে বস্তু শরীরের পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগে কি না। যত গাম্ভীর্য ও মুরব্বিয়ানার সঙ্গে প্রশ্ন হোক না কেন, একটু বাজিয়ে দেখলেই আওয়াজ চিনতে ভুল হয় না। যে ইতিহাসের কথা বলছি সে ইতিহাসও মানুষের মুক্ত মনের সৃষ্টি। তাকে শরীরের কাজে লাগানো যায় না। যে সমাজ বহু শরীরের সমষ্টি মাত্র তার কাজেও লাগানো যায় না। চিরপরিচিত মানুষ মানুষের চিরকালের বিস্ময়। সেই চিরবিস্ময়ের বার্তা বহন করে ইতিহাস।

ইতিহাসের রীতি

ঘটনা ঘটে অবিচ্ছেদে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। কালে নিরবচ্ছিন্ন, দেশে পৃথিবীব্যাপী, মানবসমাজে বিধৃত এই ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ ইতিহাস নয়। তাকে ইতিহাসের উপাদান বললে মিথ্যা বলা হয় না, কিন্তু সত্যও প্রকাশ হয় না। কারণ ঐতিহাসিক যে ইতিহাস রচনা করেন তার সঙ্গে এই ঘটনাপ্রবাহের সম্বন্ধ বস্তু ও তার উপাদান-কারণের সম্বন্ধের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ইতিহাসরচনায় বিষয়কে কালে খণ্ডিত ও দেশে সীমাবদ্ধ করতে হয়। অল্পস্থায়ী ঘটনা কি বহুশতাব্দীব্যাপী ব্যাপারের ইতিহাস— ওয়াটারলুর যুদ্ধ কি রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, নন্দকুমারের ফাঁসি কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে দুই মহাযুদ্ধের ইতিহাস— সব ইতিহাস খণ্ডিত কালের, সীমিত দেশের ইতিহাস। কালের খণ্ড ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দেশের গণ্ডি স্বল্পবিস্তার বা দূরপ্রসারী, এইমাত্র প্রভেদ। নিরবধি কালে বিপুলা পৃথিবীর সকল মানুষের ইতিহাস নেই। অনেক ঐতিহাসিক যাকে ঘটা করে বলেন বিশ্ব-ইতিহাস, সে ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের ইতিহাসের সমষ্টি মাত্র। তাদের মধ্যে সে অন্তরঙ্গ যোগ নেই যাতে ওইসব বিভিন্ন ইতিহাস এক ইতিহাস হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ইতিহাসের বিশ্বকোষ বিশ্ব-ইতিহাস নয়। এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিকদের বিশ্ব সব সময় বিশ্বের একটা টুকরো, যেখানকার মানুষের কর্মকলাপ ও সভ্যতার গতিপরিণতির সঙ্গে ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে পরিচয়। কারণ ঐতিহাসিক যে সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতার মানুষ তার সঙ্গে ওই টুকরোটির সবচেয়ে নিকট ঐতিহাসিক আত্মীয়তা। ইবন্ খল্‌দুনের বিশ্ব-ইতিহাস আরবদের অভিযান ও আরবদের সভ্যতা ও অসভ্যতা যে ভূভাগকে প্রভাবিত করেছিল তার ইতিহাস। এশিয়ার পশ্চিম-প্রান্ত, ভূমধ্যসাগরের উত্তর-তীরের ইউরোপ ও দক্ষিণ-তীরের আফ্রিকা— এই ছিল ইবন্ খল্‌দুনের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব। হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাস তাঁর অ্যাবসলিউট বা পরব্রহ্মের মানসের ত্রিকের ছকে ছকে বাস্তবে পরিণতির

ইতিহাস। সৃষ্টির অন্তর্গূঢ় আন্বীক্ষিকীর প্রেরণায় ত্রিকের খেলার এ পরিণতি হেগেল দেখেছেন কেবল ভূমধ্যসাগরের চার পাশে ও পশ্চিম-ইউরোপে। মানসের কল্পনায় যাই থাক, বাস্তবে ওই ভূখণ্ডই হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব।। ইতালিয়ান দার্শনিক ক্রোচে এক জায়গায় বলেছেন যে, 'সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস, এ কথাটা প্রহেলিকা নয়, সত্য।' সে সত্যকে প্রহেলিকা-মুক্ত করতে ক্রোচের দার্শনিক বাগবিভূতি তাকে বেশ ঘোরালো করে তুলেছে। কিন্তু ও কথার মধ্যে একটা সহজ অদার্শনিক সত্য আছে। ঐতিহাসিক যে ইতিহাসই রচনা করেন, নিকট কি দূর-অতীতের, তিনি তাঁর ঘটনাবলিকে দেখেন নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ মোটের উপর তার সমসাময়িক কালের বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ। তার ফলে বিশ্ব-ইতিহাসকার যখন নিজের প্রিয় ও পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে অনাত্মীয় দেশ-কালের ইতিহাসের দিকে তাকান তখন সে দৃষ্টিকোণ থেকে সে ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রায় দেখা যায় না, দেখা যায় ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কমবেশি বিকৃত রূপ। অথচ নিজের দৃষ্টিকোণ ছাড়া কোনও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ নেই। এমন মানুষ অবশ্য আছে যার অন্তর্দৃষ্টি অতি অপরিচিত সত্যতারও মর্মস্থান দেখতে পায়। কিন্তু এরকম বিশ্বমানবের সংখ্যা কম। এবং তাদের বিশ্ব-ইতিহাস-রচনায় হাত লাগাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

২

ইতিহাস সীমাবদ্ধ দেশে খণ্ডকালের ইতিহাস। কিন্তু সে সীমার মধ্যে ওই নির্দিষ্ট কালে যত মানবীয় ঘটনা ঘটে, যে ঘটনা মানুষ নিজে ঘটায় বা যা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে, তার কণামাত্রই ইতিহাসের উপাদান। সে ইতিহাস যে বিষয়ের হোক, যত বিস্তৃত যত ঘটনাবহুল হোক।

অশোক মগধের সিংহাসনে বসলেন পিতার উত্তরাধিকারে। পিতামহ ও পিতার যুদ্ধার্জিত বিশাল সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী-সম্রাট হলেন। সে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দক্ষিণে কিছু বাদে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার দেশ, হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত— যুদ্ধ ও দেশরক্ষার বিজ্ঞানসম্মত, সায়েন্টিফিক ফ্রন্টিয়ার— ব্রিটিশ ভারত-সাম্রাজ্যে যার অভাবে সাম্রাজ্য-গর্বী লাট কার্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। এই বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিদ্রোহ থেকে রক্ষার জন্য অশোককে কোনও নূতন যন্ত্র তৈরি করতে হয়নি— পিতামহ ও পিতার গড়া হস্ত্যশ্বরথপদাতির যুদ্ধনিপুণ বিরাট স্থায়ী বাহিনী প্রস্তুত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন ও শান্তির জন্য কোনও নূতন ব্যবস্থা অশোক প্রবর্তন করেননি। পিতৃপিতামহ-প্রবর্তিত নানা শ্রেণির রাজামাত্য, তাদের সংঘ ও সংহতি, সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল— এ কালের ভাষায় extensive bureaucratic organization. সৈন্য অমাত্য লোক ও বাণিজ্য-চলাচলের রাজপথ সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের শাসনে ও ভোগে অশোকের রাজত্বের সাত বৎসর অতীত হল, অশনে বসনে,

রাজকীয় আড়ম্বরে মগধের পূর্ব পূর্ব সম্রাটদের মতো। বঙ্গোপসাগরের তীরে কলিঙ্গরাজ্য উত্তরাপথে অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। পিতামহ কি পিতা সে রাজ্য জয় করেননি। সম্ভব তাঁদের অনুসরণে অশোক কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করলেন, রাজ্যের সীমা বাড়াতে শক্তিমান রাজারা যা সচরাচর করে থাকেন— 'পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা'। কলিঙ্গ জয় হল। যুদ্ধে বহু লোক হত হল, বহু লোক বন্দি হল, বিজিত দেশের লোকেরা বহু দুঃখদুর্দশা ভোগ করল, এরকম যুদ্ধে যা স্বাভাবিক, সব সময় ঘটে থাকে। কিন্তু অশোকের মনের উপর তার ফল হল, যা যুদ্ধজয়ী রাজার মনে সচরাচর হয় না। পররাজ্যজয়ের নৃশংসতায় অশোকের মনে অনুশোচনা এল। সাময়িক অনুতাপের বিলাস নয়; সম্রাটের জীবনের গতি-পরিবর্তন হল। রাজ্যশাসনের লক্ষ্য বদলে গেল। অশোকের প্রতীতি হল, রাজার রাজ্যজয় বড় জয় নয়, বড় জয় আত্মজয়। সে আত্মজয়ের উপায় যে শীলাচরণ গৌতমবুদ্ধের উপদেশে দেশে সুজ্ঞাত ছিল অশোক নিজের জীবনে তার অনুশীলন আরম্ভ করলেন। তাঁর দৃঢ়নিশ্চয় হল, রাজার রাজ্যশাসন প্রজার কেবল বৈষয়িক সুখসমৃদ্ধির চেষ্টায় সফল নয়, রাজার বড় কর্তব্য প্রজাদের জীবন তাঁর নিজের জীবনের মতো এই শীলের নীতিতে গড়ে তোলা। অশোক সাম্রাজ্যময় এই শীলের প্রচারের এবং প্রজাদের জীবনে শীল রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা করলেন। সম্ভব যে বুরোক্রেসি সমস্ত সাম্রাজ্যে রাজ্যশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই বুরোক্রেসি হল এই প্রচার ও রক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্র। সুতরাং নীতিপ্রচারের পিছনে রাষ্ট্রশক্তির চাপ নিশ্চয় ছিল। রাজার উচিত কি না প্রজার ব্যক্তিগত চরিত্র ও জীবন নিয়মিত করার চেষ্টা নিজের আদর্শ অনুসারে, তার ফল শেষ পর্যন্ত ভাল কি মন্দ, খুব তর্কের বিষয়। যেমন তর্কের বিষয়, অশোকের রাজশক্তির চেয়ে বহুগুণ ক্ষমতাশালী বর্তমানের রাষ্ট্রের উচিত কি না প্রজার জীবনকে নানা দিক থেকে নিয়মিত, 'কন্ডিশনড্', করার চেষ্টা, তার ফল শেষ পর্যন্ত ভাল না মন্দ। অশোক জীবনযাত্রার আদর্শের উপদেশ সাম্রাজ্যময় স্থায়ী রূপ দিয়ে লিখে দিলেন পাহাড়ের গায়ে, আশ্চর্যগড়ন পাথরের স্তম্ভে। গৌতমবুদ্ধের সদ্ধর্মের উপদেশ তিনি জানলেন নিখিল মানবের হিতের জন্য। সুতরাং কেবল নিজের প্রজাদের মধ্যে তার প্রচারে অশোক তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। ভারতবর্ষে তাঁর নিজের রাজত্ব-সীমার বাইরে এবং ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে অন্য সভ্যতার মানুষের নানা রাজ্যে তিনি প্রচারক পাঠালেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগস্থাপন আরম্ভ হল। দু'হাজার বছরের বেশি হয়ে গেছে, তার ফল ও প্রভাব পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি।

এক রাজার রাজত্বের চল্লিশ বছরের ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে তার জুড়ি পাওয়া কঠিন।

এই চল্লিশ বছরে অশোকের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং জীবনের প্রতিদিন ঘটনা ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ চাষি দিনের পর দিন মাটি চাষ করে শস্য ফলিয়েছে, লক্ষ লক্ষ কুমোর কামার ও শিল্পী নানা শিল্পদ্রব্য গড়েছে। লক্ষ লক্ষ বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছে। শিক্ষকেরা তাদের পড়িয়েছে। পণ্ডিতেরা জ্ঞানচর্চা করেছে। কবিরা কাব্য রচনা করেছে। দুঃখসুখে অগণিত

লোকের প্রতিদিন জীবন কেটেছে। অশোকের রাজত্বের ইতিহাসে এসব লক্ষকোটি ঘটনার স্থান নেই। এ চল্লিশ বছরের মানবীয় ঘটনার তুচ্ছাতিতম ক্ষুদ্র অংশ বেছে নিয়েই তবে অশোকের রাজত্বের ইতিহাস রচনা সম্ভব। যদি অশোকের কালে তাঁর রাজ্যের প্রজাদের জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ জানা সম্ভব হত, যেমন জানা যায় বর্তমান কালের কোনও রাষ্ট্রের প্রজাদের; যদি প্রজাদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দ, শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টি, সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে তাদের গতি ও উন্নতির পূর্ণ ও যথার্থ খবর পাওয়া যেত, দু'পুরুষ পূর্বেকার বিদেশি আগন্তুকের খণ্ড বিবরণের ছিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করতে না হত; এবং অশোকলিপির কথাবস্তু, ও সাম্রাজ্যের সব অংশে সে অনুশাসন পাথরে খুদে প্রজাসাধারণের পড়ার জন্য ছড়িয়ে রাখার তথ্য, লিপির অক্ষরের সুডৌল, লিপিবাহী স্তম্ভের বিস্ময়কর সুঠাম ও মসৃণতা, পশুলাঞ্ছন স্তম্ভশীর্ষের আশ্চর্য কারিগরি— এসব থেকে একটা, মোটামুটি অনুমানের উপর নির্ভর করতে না হত, তবে অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস-লেখককে রাষ্ট্রীয় ও রাজার কর্মানুষ্ঠানের বিবরণ মাত্র দিয়েই ইতিহাস লিখতে হত না; সে কালের আর্থিক সামাজিক ও সভ্যতার ইতিহাস, প্রচলিত ইংরেজি সংজ্ঞায় যাকে বলে economic, social ও cultural history, সব মিলিয়ে অশোকের রাজত্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারতেন। কিন্তু যেসব লক্ষ লক্ষ ঘটনা এ সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি, সে ইতিহাস লেখা সম্ভব হত এসব ঘটনার প্রতিটির বিশেষত্ব অর্থাৎ ঘটনাত্ব বর্জন করে, তা থেকে সাধারণ তথ্য ও তত্ত্ব নিষ্কাশন করে। সে কালের নিখিল ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিমাণের কোনও পরিমাণগত তুলনা থাকত না।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শূন্যতাই সব, বস্তু নেই বললেই চলে। নীহারিকা নক্ষত্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ, বস্তুর দু'-চারটে বিন্দু অসীম দূরে দূরে এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। ইতিহাসের যা বস্তু তা অবস্তু ঘটনার মহাকাশে গুটি-কয়েক বিন্দু। সেই বিন্দুগুলি বেছে নিয়েই ইতিহাস রচনা হয় এবং ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। ইতিহাসের দেশ ও কালের সীমায় যে সংখ্যাতীত ঘটনা ঘটে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ ইতিহাসের উপাদান। তুলনায় প্রায় সব বাদ দিতে হয়, রাখতে হয় অতি সামান্য। বাছাই করে কতটুকু রাখতে হবে নির্ভর করে ঐতিহাসিকের প্রতিভার উপর ও তাঁর ইতিহাস রচনার লক্ষ্যের উপর।

৩

আচার্য মেট্‌ল্যান্ড তাঁর ইংল্যান্ডের ব্যবহারশাস্ত্রের ইতিহাসে ঘটনার অবিচ্ছিন্নতাকে বলেছেন সেলাই-শূন্য ঠাসবুননি পট— 'a seamless web'। ঐতিহাসিক এই পটে নানারঙা সুতোর সেলাই দিয়ে ইতিহাসের প্যাটার্ন তোলেন। কোনও প্যাটার্নের ঘের খুব বড়, যেমন মম্‌সেনের জুলিয়াস সিজারের ক্ষমতালাভ পর্যন্ত রোমের রিপাবলিকের পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস। আরও বড় ঘের, যেমন গিবনের রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস, মার্‌কাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে তুর্কিদের কনস্টান্টিনোপল দখল পর্যন্ত প্রায় তেরো

শতাব্দীর ইতিহাস। কোনও ঘের তুলনায় অনেক ছোট। যেমন আচার্য যদুনাথের ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, ভারতবর্ষে মুঘল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূচনার ইতিহাস। বলা বাহুল্য, এ পটের দুই ডাইমেনশন, দেশ ও কাল। কোনও ইতিহাসের ঘের কালের ডাইমেনশনে দূরপ্রসারী, দেশের ডাইমেনশনে তুলনায় ছোট— যেমন ইতিহাসের প্রকৃত আরম্ভ থেকে আলেকজেন্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত তিনশো বছরের গ্রিসের ইতিহাস। দেশের ডাইমেনশনে প্রকাণ্ড, কালের ডাইমেনশনে অত্যন্ত খাটো— যেমন পৃথিবীর বহু অংশে ব্যাপ্ত বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচ বছরের ইতিহাস। ইতিহাসের ঘের কালে ও দেশে কত বড়, কি কত ছোট হবে, তার কোনও স্বাভাবিক মাপ নেই। সে মাপ নির্ভর করে ঐতিহাসিক কতটা কালের ও কতখানি দেশের কথা বলতে চান। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহাসিক যুদ্ধারম্ভ থেকে যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত লিখতে পারেন। কিন্তু সে মহাযুদ্ধের প্রকট ফলাফলও যুদ্ধবিরতিতেই শেষ হয়নি। তার সংঘাতে পৃথিবীর নানা খণ্ডে মানুষের মধ্যে ভাঙাগড়া আজও চলছে। ঐতিহাসিক এ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর সময় পর্যন্ত পৃথিবীর নানা খণ্ডে এই ভাঙা-গড়ার বিবরণ তাঁর ইতিহাসের অন্তর্গত করতে পারেন। অথবা একটিমাত্র দেশে, যেমন ইংল্যান্ডে কি মার্কিন দেশে, তার ফলাফলের বিবরণে ইতিহাস শেষ করতে পারেন। দেশ ও কাল মানুষের মনের সৃষ্টি কি না দার্শনিকেরা তার বিচার করেন। কিন্তু ইতিহাসের দেশ ও কাল যে ঐতিহাসিকের মনের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই।

৪

দেশ ও কালের ঘেরের মধ্যে ঐতিহাসিক ইতিহাসের যে প্যাটার্ন বোনেন সে প্যাটার্ন কত চওড়া? তার মাপ নির্ভর করে প্রথমত ও প্রধানত, ঐতিহাসিক যে ধরনের ইতিহাস রচনা করেন, ওই নির্দিষ্ট দেশ ও কালে সে ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার বহুলতা বা বিরলতার উপর এবং সেসব ঘটনার জ্ঞানের প্রাচুর্য বা দৈন্যের উপর। মগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু পর্যন্ত উত্তর-ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের যে চওড়া প্যাটার্ন তার তুলনায় বৈদিক যুগ থেকে মগধসাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্যাটার্ন অত্যন্ত সরু, এবং তা হবেই হবে। ওই প্রাচীনতর কালের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান যে তুলনায় খুব বিরল কেবল তাই নয়, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাই ঘটেছিল অত্যন্ত অল্প। লোকের জীবনে রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল কম, কারণ রাষ্ট্রগুলি ছিল শিথিলবন্ধন। সম্ভব অনুসন্ধানের ফলে এ যুগের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান ক্রমে অনেক বাড়বে, কিন্তু সে জ্ঞান প্রধানত হবে বিচ্ছিন্ন সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান। এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অল্পবিস্তর ধারাবাহিক ঘটনার সুতোয় বেঁধে ইতিহাসের প্যাটার্ন বোনা সম্ভব হবে, সে ভরসা করতে সাহস হয় না। কিন্তু প্রাচীনতর কালের জ্ঞান, কি ভারতবর্ষে কি অন্য দেশে, বেশির ভাগ এইরকম বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। মানবীয় ঘটনার বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রত্নতত্ত্ব নাম দিয়ে তাদের কেবল ইতিহাসের মালমশলা মনে করা

সত্যদৃষ্টি নয়। যে নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের পূর্ব থেকে জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়, সে জ্ঞান ইতিহাসের মালমশলা। কারণ সে জ্ঞান ইতিহাসের প্যাটার্নকে আর-একটু বেশি চওড়া করে, অথবা ফাঁক পূর্ণ করে সে প্যাটার্নের বুননিকে আরও একটু ঠাসবুননি করে। কিন্তু যে জ্ঞানের এরকম সংযোগ স্থাপন করা যায় না, যা বিচ্ছিন্নই থেকে যায়, সে জ্ঞান মূল্যহীন নয়। মানুষের পরিচয় দেয় বলেই মানুষের কাছে তার মূল্য। মহেঞ্জোদাড়ো কি ক্রীটের মাটি খুঁড়ে মানুষের যেসব চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে সেসব মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি ভূমধ্যসাগরের সভ্যতার ইতিহাসের স্পষ্ট যোগ স্থাপন করা যায়নি। এবং কোনওদিন যদি নাও যায়, মানুষের এই পরিচয় মানুষের বিস্ময় জাগাবেই। সে বিস্ময় ইতিহাস যে বিস্ময় জাগায় তার সমগোত্র। শেলির Ozymandias এর মতো

> .. Two vast and trunkless legs of stone
> Stand in the desert Near them,
> on the sand,
> Half sunk, a shattered visage lies.
>
> * * *
>
> Nothing beside remains Round the decay
> Of that colossal wreck, boundless and
> bare
> The lone and level sands stretch far
> away

কিন্তু ইতিহাসের প্যাটার্নের চওড়ার মাপ কেবল ঘটনার ও তার জ্ঞানের প্রাচুর্য কি বিরলতার উপর নির্ভর করে না; ঐতিহাসিকের প্রতিভার উপরে নির্ভর করে। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগে ইতিহাসের সৃষ্টি। যে ঐতিহাসিক তাঁর কল্পিত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কোনও ঘটনার যোগ দেখতে পান না তাঁর ইতিহাসে স্বভাবতই সে ঘটনার স্থান নেই। প্রতিভাবান ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার ঐতিহাসিক যোগ দেখতে পান, সাধারণ ঐতিহাসিকের যা চোখ এড়িয়ে যায়। সেইজন্য যাঁরা ইতিহাসের প্রতিভাবান স্রষ্টা তাঁদের ইতিহাসের প্যাটার্ন অনেক সময় বেশি চওড়া। তাঁদের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার স্থান আছে, সাধারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাসে যাদের স্থান নেই।

৫

দেশ ও কালের অচ্ছিদ্র ঘটনার পটে কিছু ঘটনা বেছে নিয়ে ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসের ছবি আঁকেন। ইতিহাসের যাঁরা বড় পটুয়া তাঁদের ছবিতে ছোট পটুয়াদের ছবির তুলনায় অনেক সময় ঘটনার রেখা অনেক বেশি। কিন্তু কোন ইতিহাসে কত ঘটনা বেছে নিয়ে স্থান দেওয়া যায় তার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। ঐতিহাসিক বহুরকম ঘটনার নানা রঙের সুতোয় তাঁর ইতিহাসের প্যাটার্ন তোলেন। কিন্তু এমন রঙের সুতো আছে যা সে প্যাটার্নের সঙ্গে 'ম্যাচ' করে না। সে সুতোকে প্যাটার্নের পাশে পাশে চালিয়ে নেওয়া চলে, কিন্তু তা দিয়ে প্যাটার্নের অঙ্গবৃদ্ধি করা চলে না।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, ইতিহাস বলতে লোকে সাধারণত যা বোঝে তা, যে দেশ ও কালের পূর্ণ পরিচয় দেয় না, তা স্মরণ করে অনেকে এই অঙ্গহীন ইতিহাসের উপর কিছু বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বলেন, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হবে এমন ইতিহাস যা উদ্দিষ্ট দেশ ও কালের মানুষের জীবনের সমস্ত দিকের পরিচয় দেবে। কেবল রাষ্ট্র গড়া-ভাঙার পরিচয় নয়; সামাজিক পরিবর্তন, ধনতান্ত্রিক বিবর্তন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তার ক্রমপরিবর্তন; ধর্ম শিল্প সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান— সবকিছুর উত্থান-পতন পরিবর্তনের পরিচয় দেবে। কোনও দেশ ও কালের মানুষের জীবনের সমস্ত দিক না জানলে যে সে মানুষকে সম্পূর্ণ জানা হয় না এ তো স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে tautology। কিন্তু এক ইতিহাসে, অর্থাৎ এক রকমের ইতিহাসে, এ সমস্ত কথা বলা সম্ভব নয়, তাও স্বতঃসিদ্ধ। তা জানাতে ও জানতে একই দেশ ও কালের বিভিন্ন রকমের ইতিহাস লিখতে ও পড়তে হয়। কোনও শর্ট কাট নেই। এক জায়গায় সব কিছু পেয়ে যাব এটা অলস মনের কল্পনা। তারা মানুষের ইতিহাস নিবিড় করে জানতে চায় না। এক এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে অনেকে যেমন সকল জ্ঞানের জ্ঞানী হতে চায়।

এলিজাবেথের যুগের ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখ অবশ্য থাকবে। তার উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সীমার বাইরে এমন-সব ঘটনা ঘটেছিল যার মূল্য রাষ্ট্রীয় ঘটনার চেয়ে কম নয়, বরং বেশি। তেমনি এলিজাবেথের যুগের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ঘটনার উল্লেখ থাকবে। কতক সাহিত্যের ইতিহাসকে কালক্রমিক কাঠামো দেবার জন্য; কতক সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের উপর রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব পড়েছিল, সেইজন্য। কিন্তু এলিজাবেথের যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস জানা যাবে এ আশা তেমনি দুরাশা, যেমন দুরাশা সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জানা যাবে।

রাষ্ট্রীয় ঘটনার ইতিহাসের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক যুগের জীবনের অন্য অনেক দিকের পরিচয় দিতে গেলে তা কী করে সম্ভব করা যায় তার নমুনা মম্‌সেনের রোমের ইতিহাসে আছে। রোমান রিপাবলিকের উত্থান ও ধ্বংসের ইতিহাসকে তার উপযোগী নানা পর্বে মম্‌সেন ভাগ করেছেন। প্রতি পর্বের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণ সমাপ্ত করে তার শেষে সে পর্বকালের ধর্ম ও শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে দু'-একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন।

গ্রেকাই-ভ্রাতাদের রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার ও বিপ্লবের চেষ্টা ও তার ব্যর্থতা, মেরিয়াসের বিপ্লব ও ড্রুসাসের সংস্কারের প্রয়াস, প্রাচ্যে মিথ্রাডেটিসের সঙ্গে সংঘর্ষ (মম্‌সেনের মতে ম্যারাথনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যে প্রকাণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল, বহুদিন স্তিমিত থাকার পর তারই একটা ছোট অধ্যায়; এবং মম্‌সেনের কল্পনায় তাঁর কাল পর্যন্ত এ সংঘর্ষ যেমন হাজার হাজার বছর চলেছে, তেমনি পরবর্তীকালেও হাজার হাজার বছর চলবে), সিনা ও সালার কার্য ও অকার্য— এই নব্বই বছরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, মম্‌সেন যাকে বলেছেন রোমান ইতিহাসে সবচেয়ে অগৌরবের যুগ, এগারো অধ্যায়ে তার বর্ণনা দিয়ে, মম্‌সেন একটি অধ্যায়ে সে যুগের রোমান রিপাবলিকে নানা জাতি, তাদের অবস্থা ধর্ম ও শিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন, এবং আর-একটি অধ্যায়ে সাহিত্য ও শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করেছেন; সালার মৃত্যু থেকে রোমান রিপাবলিকের ধ্বংসের উপর জুলিয়াস সিজারের সাম্রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত চৌত্রিশ বছরের চিত্তাকর্ষী ও নিশ্বাসরোধী অতিদ্রুত রাষ্ট্রীয় ঘটনা-প্রবাহের ইতিহাস আবার এগারো অধ্যায়ে বর্ণনা করে, তার শেষে সে যুগের ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিল্পের বিবরণ দিয়ে একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন।

এসব অধ্যায়গুলি মম্‌সেনের ইতিহাসের পরিশিষ্ট মাত্র। মূল ইতিহাসের অংশ নয়। তাঁর ইতিহাসের প্যাটার্নের পাশে বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে একটু বুননি-করা। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় ঘটনাই একমাত্র ঘটনা নয়, অন্য ব্যাপারও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। মম্‌সেন কখনও কল্পনা করেননি যে তাঁর এইসব বিবরণ সেসব যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের এমন বিবরণ দিয়েছে যে এসব ব্যাপারের প্রতিটির স্বতন্ত্র ইতিহাস লেখার ও পড়ার আর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয়ের স্বতন্ত্র জ্ঞান যাদের নেই তারা মম্‌সেনের বিবরণ পড়ে কিছুই বুঝতে কি জানতে পারবে না।

মানুষকে অখণ্ড করে দেখাই তাকে সত্য করে দেখা। কিন্তু খণ্ড খণ্ড করে প্রথমে তার পরিচয় না নিলে তাকে অখণ্ড করে দেখা অসম্ভব। 'একং বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং' নয়, সর্বকে জানলেই তবে এককে জানা যাবে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অবশ্যই দেশ ও কালের সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। সে সম্পূর্ণ পরিচয়ের উপায় নয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে ফাঁপিয়ে মাল্‌টি-পারপাস ইতিহাসে পরিণত করা। তার উপায় দেশ ও কালের নানা ব্যাপারের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া। তার জন্য স্বতন্ত্র সব ইতিহাসের প্রয়োজন। এসব স্বতন্ত্র ইতিহাস পাঠকের মননের জারক রসে এক হয়ে তবেই দেশ ও কালের অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান দেয়। যে পাঠক সে শ্রম-স্বীকারে প্রস্তুত নন তার জন্য রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে অন্য ইতিহাসের হ্যান্ডবুক অবশ্য জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সে হ্যান্ডবুকগুলি হ্যান্ডবুকই, ইতিহাস নয়।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ যে অন্য সবরকম ইতিহাসের আকর্ষণের চেয়ে বেশি তার কারণ, সে ইতিহাস মানুষের কর্ম-অকর্মের, সুখ-দুঃখের, মহত্ত্ব-হীনতার, দ্বন্দ্ব-মৈত্রীর, জয়-পরাজয়ের বিশিষ্ট কাহিনি। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস, কি ধনতন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাসের মতো নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারের বিবরণ নয়। মানুষের কাছে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শের আকর্ষণ। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষ যে বলবান, সকল বিধিনিষেধের ব্যাখ্যায় এটি একটি প্রযোজ্য নিয়ম। ইতিহাসেও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট

'সামান্য'র চেয়ে কনক্রিট 'বিশেষ' বলবান। তত্ত্বের মহিমা তখনই হৃদয়ঙ্গম হয় বিশিষ্ট তথ্যের মধ্যে যখন তাকে দেখা যায়।

৬

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একদল ইউরোপীয় ইতিহাস-লেখক বলতে আরম্ভ করলেন যে, ইতিহাস সাহিত্য নয়, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। এবং নিজেদের লেখা ইতিহাসের, পূর্বতনদের সাহিত্য-গন্ধী ইতিহাস থেকে তফাত করার জন্য, নাম দিলেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস'— সায়েন্টিফিক হিস্টরি। সে সময় অনেক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির কাল। কিন্তু এক বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের যা পথ ও নিয়মকানুন, অন্য বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার সে পথে ও সে নিয়মকানুনে চলে না। পদার্থবিজ্ঞানের চলার রীতি ও জীবনবিজ্ঞানের চলার রীতি এক নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি রসায়নবিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি নয়। সকল বিজ্ঞানের সাধারণ কোনও বৈজ্ঞানিক রীতি নেই। যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ সে হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, এবং বিনা প্রমাণে কি অপ্রচুর প্রমাণে কোনও কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করা। এবং প্রমাণবিরুদ্ধ হলে চিরপোষিত মত ও চিন্তাধারাকে পরিত্যাগে দ্বিধাহীনতা। যে ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাস, কল্পনাবিভ্রান্ত নয়, সে ইতিহাসে এসব গুণ অবশ্য থাকবে। অর্থাৎ সে ইতিহাস হবে প্রামাণিক ইতিহাস, বিনা প্রমাণে কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করবে না, কোনও মোহতেই প্রমাণিত সত্যকে গোপন করবে না। কিন্তু মাত্র প্রামাণিক বললে ইতিহাসকে 'বৈজ্ঞানিক' নাম দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞানের যে অসীম প্রেস্টিজ, নামের মহিমায় তার কিছুটা ইতিহাস-বিদ্যায় টানা যায় না। এমন মনোভাব ও চেষ্টা নূতন নয়। পূর্বে যখন দর্শনের প্রেস্টিজ ছিল বড়, এবং বহু বিজ্ঞানের শৈশবকাল, তখন পদার্থবিজ্ঞানের নাম ছিল ন্যাচারাল ফিলজফি। আজ সুনীতিবিদ্যাকে মর‍্যাল ফিলজফি না বলে বলি মর‍্যাল সায়েন্স।

কিন্তু ইতিহাস-রচনাকে যাঁরা বিজ্ঞান-রচনা মনে করেছিলেন, তাঁদের রচিত ইতিহাসে তার ফল ফলেছিল। ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন সাহিত্যের মতো তার সুখপাঠ্য হওয়া দোষের, কারণ তা ভঙ্গি দিয়ে সাধারণ পাঠকের মন ভুলাবার চেষ্টা। ইতিহাস হবে বিজ্ঞানের মতো নিরেট, অর্থাৎ সলিড, এবং তাতে রসের স্পর্শ থাকবে না। সাধারণ পাঠক সে ইতিহাস নাই-বা পড়ল, কারণ সাধারণ পাঠক সচরাচর বিজ্ঞানের পুঁথি পড়ে না। ফলে সেসব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস এখন অসাধারণ পাঠকও পড়ে না।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্বের একটা সুবিধা যে, রচনাশক্তির তারতম্যে এক ঐতিহাসিক অন্য ঐতিহাসিকের চেয়ে খাটো হয় না। কেননা রচনাশক্তিটাই অবান্তর। কোনওরকমে সত্য তথ্যটা প্রকাশ করতে পারলেই হল। এবং আরও বড় সুবিধা আছে।

ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন গবেষণায় ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের নিয়মগুলি আয়ত্ত করে পরিশ্রম করলেই সকল ঐতিহাসিক সমান মূল্যের ইতিহাস রচনা করতে পারে। ঐতিহাসিক প্রতিভা বলে কিছু নেই। আছে নিয়ম মেনে চলা ও পরিশ্রম করা।

হাতে-হাতিয়ারে যারা কোনও বিজ্ঞানের চর্চা করে না, বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিজ্ঞানীর মননধারার খবর জানে না, তাদের অনেকের ধারণা যে, বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়মগুলির কঠোরভাবে পালন করে পরিশ্রমনিষ্ঠার ফল। ষোড়শ শতাব্দে যখন ইউরোপে নববিজ্ঞানের উন্মেষকাল, ও তার সাফল্যে সকলে চমৎকৃত, সে সময় ইংল্যান্ডের ফ্রান্সিস বেকন এ নববিদ্যার একজন উদ্‌গাতা ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Advancement of Learning-এ তিনি প্রাচীনকালের কুসংস্কার-মুক্ত সত্য আবিষ্কারের এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, প্রাচীন মত যদি প্রাচীনদের মত বলে গ্রাহ্য করতে হয়, তবে আধুনিকেরাই প্রকৃত প্রাচীন, কারণ প্রাচীনদের চেয়ে আধুনিকদের বয়স অনেক বেশি। ফ্রান্সিস বেকন আর-একখানি পুথি লিখেছিলেন, যার নাম Novum Organum, অর্থাৎ সত্য আবিষ্কারের নূতন বিধিবিধান। এ গ্রন্থে বেকন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের নিময়গুলির এক তালিকা দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলনে এই নিয়মগুলির প্রয়োগ করলেই সে ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হবে। এই আশায় ওই গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপারেরও তালিকা দিয়েছেন, যাতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সেসব ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে বাঁধাধরা নিয়ম প্রয়োগেই হয় তাতে বেকনের সন্দেহ ছিল না। অর্থাৎ নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করলে যে-কেউ নিউটন কি ডারউইন, আইনস্টাইন কি প্ল্যাঙ্কের তুল্যমূল্য সত্য আবিষ্কার করতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে নবনব-উন্মেষশালী বুদ্ধির আবির্ভাব অনাবশ্যক। বিজ্ঞানোৎসাহী বেকনের বিজ্ঞানে যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল না তার বড় প্রমাণ যে, ষোড়শ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানে গণিতের স্থান সম্বন্ধে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদেরও ধারণা বেকনের বিজ্ঞানের ধারণার অনুরূপ— যে-কোনও ইতিহাস-লেখক চেষ্টা করলেই গিবন কি মম্‌সেন হতে পারে!

৭

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের দিন বিগত হয়েছে। এখন যাঁরা সত্যনিষ্ঠ প্রামাণিক ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক বলেন তাঁরা একটা চলতি নাম অভ্যাসবশেই ব্যবহার করেন।

কিন্তু ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্ব-বিশ্বাসের একটা ফল দূর হয়নি, বেশ টিকে আছে। সে হচ্ছে ইতিহাসকে ভবিষ্যদ্‌বক্তা মনে করা।

বিজ্ঞান ভবিষ্যতের অনেক কথা বলে। জোয়ার-ভাটার সময়, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ভবিষ্যতের যে-কোনও দিনে গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান— গুনে বলতে পারে। যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সেসব নিয়ম দিয়ে গণনা করে বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ বলে। ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন ইতিহাস কেন ভবিষ্যতের ঘটনা গুনে বলতে পারবে না? অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যেমন অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের নিয়ম আবিষ্কার

করেছেন, ঐতিহাসিকেরা ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষা করে মানুষের সমাজে ঘটনা ঘটার তেমনি সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। এবং সেইসব নিয়ম অনুসরণ করে বর্তমান কোনও মানবীয় ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস নাকি বলেছিলেন যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে পরমাণুপুঞ্জের সংস্থান কেমন ছিল, তাদের গতির দিক ও শক্তির পরিমাণ কী ছিল, তা জানা থাকলে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সব তথ্য তিনি গুনে বলতে পারতেন। হালের বিজ্ঞানীরা অতটা সাহসিক নন। তাঁরা জেনেছেন যে, সৃষ্টির ব্যাপার ও তার মালমশলার প্রকৃতি এরকম গণনায় ধরা দেবার মতো নয়, অনেক বেশি জটিল। মানুষের সমাজের গতি-পরিণতি তার চেয়ে কম জটিল নয়। এ জটিলতার মধ্যে ঐতিহাসিকের ভবিষ্যদ্‌বাণীর চেষ্টা যে কত নিরর্থক, গিবনের ইতিহাসে তার একটা 'ক্লাসিক' উদাহরণ আছে। গিবন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম-রোমান-সাম্রাজ্যের ধ্বংসে ইতিহাস শেষ করে গিবন লিখছেন, 'and we may inquire, with anxious curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the aims and institutions of Rome. Perhaps the same reflections will iilustrate the fall of that mighty empire and explain the probable causes of our actual security,' এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। 'The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability· monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation'। গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের দু' বছর পূর্বে। তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা আরম্ভ হয়েছে তার কোনও সন্দেহ গিবনের মনে হয়নি।[১]

যে ঐতিহাসিকের ভবিষ্যদ্‌বক্তা হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর একবার ভেবে দেখা ভাল যে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর কি না। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণের উৎসাহ সে ভাবনা অনেক ঐতিহাসিককে ভাবতে দেয় না। তার এক নমুনা ইংরেজ লেখক টয়েনবি। বহু খণ্ডে তাঁর বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা শেষ করে শেষ দু'খণ্ডে সোজাসুজি অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী বলেছেন। এ কালের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর গতিবিধি গোনা যায় না, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জের, অর্থাৎ মাস্‌-এর গতি-প্রকৃতি স্ট্যাটিসটিক্যাল উপায়ে গোনা যায়। টয়েনবি কোনও বিশেষ ব্যাপারের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেননি, গোটা মানবসমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছেন। সে ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবি— যা একজন ইউরোপীয় লেখকের মনে হয়েছে— এসব ভবিষ্যদ্‌বাণীর জন্ম এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে, ইতিহাসের কোনও শিক্ষা থেকে নয়।

১ উদাহরণটি ১৩৩৪ সালের আমার একটি লেখা থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য, শেষ প্রবন্ধ।

এ কাল পর্যন্ত মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যতটুকু ইতিহাস জানা গেছে তাতে সে সমাজ ও সভ্যতার গতির এমন কিছু অলঙ্ঘ্য নিয়ম কি জেনেছি যাতে তার ভবিষ্যৎ গতির কথা কিছু বলা যায়? ইংরেজ ইতিহাস-লেখক এইচ. এ. এল. ফিশার তাঁর 'ইউরোপের ইতিহাস'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'One intellectual excitement has, however, been denied me. Men wiser and more learned than I have discerned in history a plot, a rhythm, a predetermined pattern. These harmonies are concealed from me. I can see only one emergency following upon another as wave follows wave, only one great fact with respect to which, since it is unique, there can be no generalizations, only one safe rule for the historian: that he should recognize in the development of human destinies the play of the contingent and the unforeseen. This is not a doctrine of cynicism and despair. The fact of progress is written plain and large on the page of history; but progress is not a law of nature. The ground gained by one generation may be lost by the next. The thoughts of men may flow into channels which lead to disaster and barbarism.'

কুড়ি বছর পূর্বের লেখা; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয়নি।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ বলা যায়, এ বিশ্বাসের অন্তরে এই স্বীকৃতি লুকিয়ে আছে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিক হয়েই আছে। মানুষের কর্ম অকর্ম নিমিত্ত মাত্র। এ বিশ্বাস কারও মনে হতাশা আনে, কারও মনে উৎসাহ আনে। সমাজের ক্রমপরিণতিতে যে প্রোলিটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যম্ভাবী, এ বিশ্বাস কার্ল মার্কসের মনে উৎসাহ এনেছিল, এবং তিনি অনুচরদের মনে উৎসাহ এনেছিলেন এ বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক সত্য তার প্রমাণ প্রচার করে। এ বিশ্বাসের মূল কোনও পরীক্ষিত সত্য নয়, মনের আকাঙ্ক্ষা। মানুষের ও তার সভ্যতার ভবিষ্যৎ যদি প্রথম থেকেই নির্ণীত হয়ে থাকে, এবং তা যদি পূর্বেই জানা যায়, জানা যাবে ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার অপরোক্ষ দৃষ্টিতে, ইতিহাস-জ্ঞানের সরু পথে নয়। সুতরাং ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণীর দায়িত্ব অপরোক্ষদৃষ্টি দ্রষ্টাদের ছেড়ে দিয়ে, ঐতিহাসিকদের নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল। মানুষের ইতিহাসের ঋজু কুটিল পথে বিচিত্র গতির যে বিস্ময়, মানুষের মনে সে বিস্ময় জাগাতে পারলেই ঐতিহাসিক ধন্য হবেন।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস

বাঙালি যে নিজের দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহহীন, স্বদেশের প্রাচীন কাহিনির জন্য বিদেশির দ্বারস্থ, কিছুদিন পূর্বেও এইসব কথা তুলিয়া আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিয়ে এ বিষয়ে সজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন এখন কাটিয়া গিয়াছে; বাংলার গ্রাম খুঁজিয়া, মাটি খুঁড়িয়া বাঙালিই এখন তাম্রশাসন এবং শিলালিপি বাহির করিতেছে, বাঙালি পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে, বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ তাহার ঐতিহাসিক তথ্য ও মূল্য নির্ণয় করিতেছে। বাঙালি ঐতিহাসিককে বাদ দিয়া এখন আর বাংলার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়। বাংলা সাহিত্যের আকাশে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, আশা করা যায় ইতিহাসের মশাল তাহার একটা কোণ রক্তিম করিয়া রাখিবে।

আমাদের এই নবীন ইতিহাস-চর্চায় যাঁরা অগ্রণী তাঁরা একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিতেছেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা যে ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা করিতেছেন তাহা পুরনো ধরনের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়। তাঁদের রচিত ইতিহাস 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাস, এবং তাঁরা যে প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করেন তাহা 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী'।

ইতিহাসের সম্বন্ধে এই 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'বিজ্ঞানানুমোদিত' প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির প্রকৃত অর্থটা কী তাহার আলোচনার সময় হইয়াছে। কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়ার, আর সকলরকম বিদ্যার আলোচনাকেই বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে গত শতাব্দীর ইউরোপের নববৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাজে। ইউরোপ এখন আবার এই রোগটাকে দূর করিতে সচেষ্ট। সে দেশ হইতে বিদায় লইয়া ব্যাধিটা যাহাতে আমাদের ঘাড়ে আসিয়া না চাপে সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা এ দেশে যা একবার আসে তা তো আর সহজে বিদায় হয় না, তা শক-হুনই কি আর প্লেগ-ম্যালেরিয়াই কি। বিশেষত দুর্বল শরীরে সকলরকম রোগই প্রবল হইয়া উঠে। আর দেহের রোগের চেয়ে মনের ব্যাধি যে বেশি মারাত্মক তাহাতেও কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যে বিদ্যার চর্চাই করি না কেন, তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছার নিদান হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি, আর সেই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব সাফল্য। প্রথমটিতে পণ্ডিতকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জনসাধারণকে অভিভূত করিয়াছে দ্বিতীয়টি। রেল, জাহাজ, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা, বন্দুক, কামান, ইহাই হইল জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রকট মূর্তি। এমন অবস্থা বেশ কল্পনা করা যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি ঠিক আজকের অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সেগুলিকে ঘর-গৃহস্থালির কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাপ ও বাষ্পের সকল ধর্মই জানা আছে, কিন্তু রেল স্টিমার তৈরি হয় নাই। তাড়িত ও চুম্বকের নিয়মগুলি অজ্ঞাত নাই, কিন্তু ঘরে ঘরে বিনা তেলে আলো জ্বলে না, বিনা কুলিতে পাখা চলে না। ফ্যারাডে ও ম্যাকসওয়েল [illegible]ন, কিন্তু এডিসনের জন্ম হয় নাই। যদি সত্যিই এই ঘটনাটা ঘটিত তাহা হইলে

জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের আজ যে আদর ও মর্যাদা আছে তাহার কিছুই থাকিত না। এবং কি ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক জড়বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে কোনও পণ্ডিতই নিজের শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেন না। কারণ এই ব্যস্ততার মূলে আছে শাস্ত্রটাকে 'বিজ্ঞান' নাম দিয়ে জনসমাজে জড়বিজ্ঞানের প্রাপ্য যে মর্যাদা তাহার কিছু অংশ আকর্ষণ করিবার লোভ। 'নামে যে কিছু যায় আসে না' এ কথাটা কবি বসাইয়াছেন প্রেমোন্মাদিনী কিশোরীর মুখে এবং সেইখানেই ও তত্ত্ব শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের অর্ধেক কাজ নামের জোরেই চলিয়া যাইতেছে, এবং পণ্ডিত-সমাজকেও সে সমাজ হইতে বাদ দিবার কোনও সংগত কারণ দেখা যায় না।

নিজের শাস্ত্রকে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রালোচনার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া নিজের ও পরের মনকে বুঝাইবার যে ইচ্ছা তাহার আরও একটু গভীরতর কারণ কাছে। যখনই কোনও একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে তখনই সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালীটাকে সব তালার একমাত্র চাবি মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্রেই সম্ভব অসম্ভব ফললাভের চেষ্টার পরিচয় ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়াছে। দশমিক রাশির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রিসে যখন পাটিগণিতের প্রতিষ্ঠা হইল তখন এই রাশিক্রমটির গুণ আর শক্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ইহাতে আশ্চর্য হইবারও কারণ নাই। যে গণনা মেধাবী পণ্ডিতেরও দুঃসাধ্য ছিল, ইহার বলে শিক্ষার্থী শিশুও তাহা অনায়াসে সমাধান করিতে লাগিল। এমন ব্যাপারে লোকের মন স্বভাবতই উৎসাহে ও আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা। ফলে এই রাশিক্রমের নিয়ম ও প্রণালীকে সকলরকম বিদ্যায় প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। এবং অবশেষে পিথাগোরাস ঠিক করিলেন যে, জগৎটা রাশিরই খেলা, রাশিক্রমেরই একটা বৃহত্তর সংস্করণ। সুতরাং এই রাশিক্রমের হেরফের আরও ভাল করিয়া করিতে পারিলে বিশ্বসংসারের কোনও তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিবে না। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বীজগণিতের প্রয়োগে জ্যামিতিশাস্ত্রের হঠাৎ আশ্চর্যরকম উন্নতি হইল তখন পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে স্থির করিলেন যে, জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী। অমন যে ধীর স্থির বৈদান্তিক স্পিনোজা, তিনিও তাঁর দর্শনশাস্ত্রটিকে জ্যামিতির খোলসে আবদ্ধ করিলেন। এখন সেই কঠিন খোলস অতিকষ্টে সরাইয়া তবে তাঁর চিন্তার রস গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর আসিল নিউটনের আবিষ্কৃত গণিতের পালা। নিউটন যখন তাঁর গণিতের সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহের সমস্ত গতিবিধির ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন তখন চোখের সম্মুখ হইতে যেন চিরকালের অজ্ঞানের পর্দাটা সরিয়া গেল। জাগতিক ব্যাপারের মূলসূত্রটা যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। এবং কোনওরকমে এই গণিতটা প্রয়োগ করিতে পারিলেই যে সকল বিদ্যাই জ্যোতিষের মতো ধ্রুব হইয়া উঠিবে, সকলেরই এই স্থির বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসের জের এখনও চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও গত শতাব্দীর প্রথমে যখন তাড়িত ও চুম্বকের অনেক ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িল তখন আবার জ্ঞানসমুদ্রে একটা ছোটখাটো ঢেউ উঠিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মনের বল যে তাড়িতেরই শক্তি ইহা তো একরকম স্বতঃসিদ্ধই বোঝা গেল, এবং স্ত্রী-পুরুষ,

জল-স্থল, ঠান্ডা-গরম ইত্যাদি যেখানেই জোড়া বর্তমান সেইখানেই যে চুম্বকের দুই প্রান্তের সম্বন্ধ ও ধর্ম বিদ্যমান, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কোনও সন্দেহ ছিল না। জার্মন পণ্ডিত শেলিং এই চুম্বক বেচারির উপর একটা ভারী রকমের গোটা দর্শনশাস্ত্রই চাপাইয়া দিলেন। বিজ্ঞ পাঠকের এরকম ছোটবড় আরও অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়িবে; এবং যদিও খুব ভয়ে ভয়েই বলিতেছি, আমাদের দেশে যে ত্রিগুণতত্ত্বের চাবি দিয়া সংসারের সকল রহস্যের দুয়ার খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও আলোচ্য বিষয়ের আর-একটা উদাহরণ।

সুতরাং আজ যে সকল শাস্ত্রের আচার্যেরাই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই, এমন ঘটনা পূর্বেও অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকবার ঘটিবে। বর্তমান যুগের শরীর ও মন বিজ্ঞানের বলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা এক দিকে দেখিতেছি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির জ্ঞানের পথে অপূর্ব সফলতা, অন্য দিকে দেখিতেছি কর্মের জগতে তাদের বিস্ময়কর পরিণতি। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরের বিষয় লইয়া যাঁদের কারবার তাঁরা যে একবার ওই বিজ্ঞানের পথটা ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। যখন দেখা যাইবে যে ও পথটা যতই প্রশস্ত হোক ওটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই গন্তব্য পথ, অন্য বিদ্যাগুলির নয়, তখন মোড় ফিরিবার কথা মনে আসিবে। যাহাকে ঘাটে যাইতে হইবে সে যদি হাটের পথের শোরগোল দেখিয়া সেই পথেই চলিতে শুরু করে তবে ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব ছাড়া আব কোনও ফল হয় না।

আমাদের নব্য-ইতিহাসের আচার্যেরা যে এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া, এইসব গভীর অগভীর কারণে চালিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কেননা আমাদের দেশে এ কথাটা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের মতো একেবারে বিলাত হইতে তৈরি মালই আসিয়াছে; এবং ইংরেজি পুথির মাড়োয়ারি মহাজন ইহাকে ঘরে ঘরে ছড়াইযা দিয়াছে। সুতরাং ইতিহাস অনুসন্ধানের সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কথাটার মূলে কোনও বস্তু আছে কি না সে আলোচনা আমাদের দেশে নিষ্প্রয়োজন বা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

২

অবান্তর কথা বাদ দিয়া মূল কথা বলিতে গেলে কেবল এইমাত্রই বলিতে হয় যে, বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ, প্রকৃতির বিভিন্ন বিজ্ঞানের কাজের প্রণালী ও প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও ধর্মের আবিষ্কার করা। কিন্তু এই কাজ কিছু বিজ্ঞানবিদ্যারই একচেটে নয়। পৃথিবীতে যেদিন হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে, মানুষ যখন বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় বাস করিত, সেদিন হইতে কেবলমাত্র দেহরক্ষার জন্যই মানুষকে অল্পবিস্তর এই কাজে হাত দিতে হইয়াছে। মানুষ যেদিন আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছে সেদিন সে প্রকৃতির এক মহাশক্তি আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিয়াছে। যেদিন কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছে সেদিন তো প্রকৃতির বহু বিভাগের কাজের প্রণালী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কথা এই যে, জীবনযাত্রাটা চালাইবার জন্য মানুষকে

তাহার চারিপার্শ্বের প্রকৃতির যে সাধারণ-জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, বিজ্ঞানবিদ্যালব্ধ জ্ঞানের সহিত তাহার কোনও জাতিগত প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষত্ব তাহার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়। সাধারণভাবে ঘরকন্নার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় প্রকৃতির বিশালতার তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিরাট প্রকৃতির সমস্ত অংশের পরিচয় করা। সুদূর নক্ষত্রের গঠন-উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অণুবীক্ষণদৃশ্য কীটাণুর জীবন-ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে সাধারণ-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে; বিজ্ঞানবিদ্যার লক্ষ্য একবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলের দিকে। এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসে ভূয়োদর্শনের ফলে, এই যে জ্ঞান ইহা সাধারণ-জ্ঞান। নির্দিষ্ট পথে নিরূপিত সময়ে সূর্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেমন করিয়া ঋতু-পরিবর্তন হয় সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উপযুক্ত আহার পাইলে শরীর পুষ্ট ও বলশালী হয়, আর আহার-অভাবে শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হয়, এ জ্ঞান সাধারণ-জ্ঞান। জীবদেহ কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে এবং পরিপক্ক অন্নরস কেমন করিয়া জীবশরীরের ক্ষয় পূরণ ও উপাদান গঠন করে সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। সাংসারিক কাজের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা স্থূল হইলেও চলে, তাহাতে চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজন নাই, বরং সে হিসাব করিতে গেলে সুবিধা না হইয়া অনেক সময় কাজ অচল হইয়া উঠিবারই কথা; কিন্তু বিজ্ঞান চায় সকল জিনিসেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। একটা চারাগাছ যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়ে ইহা সকলেই জানি, ইহা সাধারণ-জ্ঞান। গাছটা প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু বাড়িতেছে তাহা জানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রচলিত ঘড়ির সময়ের বিভাগ সাংসারিক কাজের জন্য যথেষ্ট; আচার্য জগদীশচন্দ্রকে কতকগুলি পরীক্ষার জন্য এক সেকেন্ড সময়কে হাজার ভাগে ভাগ করা যায় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সাংসারিক প্রয়োজনের পরিমাপ-যন্ত্র মুদির দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞানবিদ্যার চাই 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'।

যেমন জ্ঞানে তেমনি জ্ঞানের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণে কোনও ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ নাই। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথে ও কর্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টায় আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি সেই ইন্দ্রিয়গুলিই বিজ্ঞানেরও ভরসা। যে ন্যায় ও যুক্তি আমরা প্রতিদিনকার সাংসারিক কাজে ব্যবহার করি সেই ন্যায় ও যুক্তির প্রণালীই বিজ্ঞানেরও একমাত্র সম্বল। এমনকী আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আমরা জগৎ-সংসারটার যে রূপ কল্পনা করি এবং যেরকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটি তাহার উপরেই ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক জগৎ নির্মাণের চেষ্টা করে। এ বিষয়টি ফরাসি দার্শনিক বার্গসোঁ এমন চমৎকারভাবে বুঝাইয়াছেন যে তাহার পর আর কাহারও বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রণালী মূলে এক হইলেও, বিজ্ঞান যে ব্যাপক গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান চায় তাহার জন্য তাকে নানারকম কৌশল আবিষ্কার করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এইগুলিই সেই কৌশল। ইহার কোনওটির লক্ষ্য অতিদূর বা অতিসূক্ষ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনা, কোনওটির উদ্দেশ্য এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে তফাত করিয়া অন্য অবস্থায় তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা, কোনওটির চেষ্টা যে কাজের

নিয়মটা এমনি ভাল বোঝা যায় না তাকে গণিতের কলে ফেলিয়া আয়ত্ত করা— এই কৌশলগুলিতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিশেষত্ব এবং ইহারাই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু এই বিশেষত্ব অতি বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব। অর্থাৎ যে কাজের জন্য যে কৌশলটির দরকার সেই কাজ ছাড়া আর অন্য কাজে তাহাকে প্রয়োগ করা বড় চলে না। কারণ এই কৌশলের আকার ও ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানের বিষয়লক্ষ্যের দ্বারা। কাজেই এক বিজ্ঞানের কৌশলকে অন্য বিজ্ঞানে বড় কাজে লাগান চলে না এবং একই বিজ্ঞানের এক বিভাগে যে কৌশল চলে অন্য বিভাগে তাহা অনেক সময় অচল। গতি-বিজ্ঞানে যে গণিত দিগ্বিজয়ী, রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না। রসায়নের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী, তাড়িত-বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।

কাজেই ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীর যাহা বিশেষত্ব তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাহিরে নেওয়া চলে না। এই বিশেষত্বের বেশির ভাগই প্রত্যেক বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র, বিজ্ঞান-বিশেষেই বিশেষভাবে আবদ্ধ। আর যাহা সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই সাধারণ তাহা মোটেই বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ নয়। তাহা হইতেছে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের প্রণালী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানে ও সাধারণ-জ্ঞানে কোনও ভেদ নাই। এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া কোনও লাভ নাই। কেননা এখানে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয়েরই আসন এক জায়গায়।

সুতরাং ঐতিহাসিক যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা বলেন তখন প্রথমেই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার কথাটার অর্থ, যুক্তিসংগত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কেবল এইটুকু বলিলে লোকের মনোযোগও যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় না এবং বিষয়টাকেও সেরকম মর্যাদা দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের নামের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময় কী যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।

দুই-একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। শ্রীযুক্ত রাখালদাসবাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' আমাদের দেশের নবীন ইতিহাস-চর্চার একটি প্রথম ও প্রধান ফল। সেই পুথি হইতে দৃষ্টান্ত তুলিব।

দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে মহীপালদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে, মহীপালদেব বাহুবলে সকল বিপক্ষ দল সংগ্রামে নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। ওই তাম্রশাসনেই তাঁহার পিতা বিগ্রহপালদেবের বিষয় উল্লিখিত আছে যে তিনি সূর্য হইতে বিমল কলাময় চন্দ্রের মতো উদিত হইয়া ভুবনের তাপ বিদূরিত করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার রণহস্তীগণ প্রচুরপয়ঃ পূর্বদেশ হইতে মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া হিমালয়ের অধিত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'মহীপালদেবের পিতার কোনোরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য হইতে চন্দ্ররূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য "কলাময়"ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা ও গজেন্দ্রগণ (আশ্রয়স্থানাভাবে) নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির-সংযুক্ত হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয়লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্য

পুনঃপ্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।' এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাখালবাবু টীকা করিয়াছেন, 'মৈত্রেয়মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।'[১] এ কোন বিজ্ঞান? মৈত্রেয়মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুযুক্তিসংগত এবং রসজ্ঞতারও পরিচায়ক বটে এবং তিনিও সেইভাবেই কথাটা লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান বেচারাকে টানিয়া আনা কেন?

কল্‌হণ রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের গৌড়ের রাজাকে হত্যার এবং রাজ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য গৌড়পতির ভৃত্যগণের 'পরিহাস কেশব'-নামক দেবতার মন্দির অবরোধ ও তাহাদের বীরত্বের এক কাহিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 'গৌড় রাজমালা'য় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে এই কাহিনি সম্ভবত অমূলক নয়, কেননা কল্‌হণ প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং মূলে সত্য না থাকিলে কাশ্মীরে গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনির কোনও জনশ্রুতি থাকিবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবু লিখিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কল্‌হণ মিশ্র কর্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে, প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কল্‌হণ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কল্‌হণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ-বিজয়-কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোনো দ্বিধা বোধ করেন নাই। একই গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক এবং দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস-রচনাব বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে।' তার পর রাখালবাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজি-অনুবাদ-কর্তা স্টাইন-সাহেব এ ঘটনাটা 'সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।'[২] স্টাইন-সাহেবের মত সত্য হইতে পারে এবং রমাপ্রসাদবাবুর ভুল হইতে পারে, কিন্তু কোনও জনশ্রুতির মূলে সত্য আছে কি না তাহা স্থির করিবার কোনও বাঁধা 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী' নাই। চারি দিক দেখিয়া এ কথাটা বিচার করিতে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো ইহা অল্পবিস্তর মতামতের বিষয়ই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব কিছু নাই। সচরাচর দশজনে একটা কথার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে হইলে যে-রকমভাবে বিচার করে এও ঠিক সেই রকমের বিচার। তারপর সম্ভবত একটু অবান্তর হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে রাখালবাবু তাঁহার 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী'র যে একটি সূত্রের কথা এখানে বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই অচল। সে সূত্র আর কোনও বিচার না করিয়াই মানিয়া চলিতে হইলে, কি বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক, সমস্ত ইতিহাস রচনাই বন্ধ করিতে হয়। 'বিজ্ঞানসম্মত' হইলেও প্রকৃতপক্ষে ও সূত্রটা কেহ মানিয়া চলে না, এবং প্রয়োজন হইলে রাখালবাবুও মানেন না। তিব্বতের তারানাথ গোপালদেব গৌড়বাসীর রাজা হইবার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'প্রতিদিন এক-একজন রাজা নির্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া,

---

১ বাঙ্গালাব ইতিহাস, পৃ ২১১
২ বাঙ্গালাব ইতিহাস, পৃ ১০৭

আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।' এই রাজপত্নীর গল্প সম্বন্ধে রাখালবাবু লিখিয়াছেন, 'তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্বাচনের কথা আছে তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্বে ভূতপূর্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।'[৩] সুতরাং 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস' যে একই গ্রন্থের একই বিষয়ে এক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে কেবল তাই নয়, একই ছত্রের এক অংশকে উপকথা এবং অন্য অংশকে সত্য বলিয়াও সাব্যস্ত করে। এইরূপে রাখালবাবু তাঁহার... গ্রন্থে বহুবার বহু স্থলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথার অর্থ, সাধারণ সুযুক্তি-সংগত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত কথা এই যে, যে জাতীয় সত্য ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার করে সেই রকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। সে প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া মনে হয়, বুঝি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা মানিয়া চলিলেই ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছনো যায়। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নাই। ইতিহাসে বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই, তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের একদর হইত। কিন্তু প্রতিভাবান ছাড়া তো কেহ ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে না। এ মজুরের দালান-গাঁথা নয় যে ইটের উপর ইট বসাইয়া গেলেই হইল। যে উপাদান লইয়া সাধারণ লোকে কিছুই করিতে পারে না, ঐতিহাসিক প্রতিভা যাঁর আছে তিনি তাহা হইতেও সত্যের কল্পনা করিতে পারেন এবং অনুসন্ধানে সেই কল্পনা সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। সবরকম বড় সত্যে পৌঁছিবারই এই পথ। তার পর এও ভুলিলে চলিবে না যে, ঐতিহাসিকের আসল কাজ ধ্বংস করা নয়, গড়া। সত্য অনুসন্ধানের একটা অসম্ভব আদর্শ খাড়া করিয়া কিছুই বিশ্বাস করি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেই যে ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া হাতে ধরা দিবে, এমনও বোধ হয় না।

হয়তো উত্তরে শুনিব যে, বিজ্ঞানের যেটা লীলাভূমি সেই সাগরপারে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের নিয়মকানুন কাটাছাঁটা হইয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইতিহাসের যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই আইনকানুন যে ঠিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু তাহা হইলে সমুদ্রপারের ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের 'বিজ্ঞান বিজ্ঞান' খেলা। এ খেলার প্রবৃত্তি কেন হয় এ প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং লর্ড অ্যাক্টন বা সীলীর বচন তুলিয়া কোনও লাভ নাই।

মানবজাতির মুক্তির জন্য ভগবান তথাগত যে চারটি মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটি এই যে, সকল জিনিসই নিজের লক্ষণে বিশিষ্ট— 'সর্বং সলক্ষণং স্বলক্ষণং'।

৩ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ ১৫০

এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জিনিস এক হয় না। বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে যে-সকল বিদ্যা আছে তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধের বাণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

ইতিহাস

প্রাচীন ভারতবর্ষেব যে ইতিহাস নেই এই ঘটনায় আমরা কখনও লজ্জা পাই, কখনও গর্ব করি। আর সব সভ্যজাতির লোকেরা তাদের জয়-পরাজয় কাজ-অকাজের নানা কাহিনি লিখে গেছে, প্রাচীন হিন্দু তা করেনি। এই স্বাতন্ত্র্যকে, মনের অবস্থা-মতো, আধ্যাত্মিকতার প্রমাণও বলা চলে, আবার ঐতিহাসিক বোধের অভাবও বলা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসীর কথা যাই হোক, নবীন ভারতবাসীর ইতিহাসকে উপেক্ষা করার জো নেই। আধ্যাত্মিকতার দাবি তাদের পূর্বপুরুষদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, সুতরাং আধুনিকতার দাবি আর ছাড়া চলে না, এবং ঐতিহাসিক বোধ হচ্ছে আধুনিকতার একটা প্রধান লক্ষণ। নবীন ভারতবাসীর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনের উপর ঔৎসুক্য যতটা আছে, আধুনিকতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার লজ্জা তার চেয়ে কম নেই।

লজ্জার খাতিরে ইতিহাস-প্রীতি আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার আর পাঁচটা ফলের মতোই একটা অদ্ভুত ফল। প্রাচীন যুগের কথা শোনার মানুষের যে স্বাভাবিক আগ্রহ, আর ভবিষ্যৎ-মানুষকে নিজের কথা শোনাবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই দুয়ে মিলে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি। আজকের দিনের যেসব ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনা, অখ্যাত মানুষের অকিঞ্চিৎকর কাহিনি, মানুষের চোখ ও মন স্বভাবতই এড়িয়ে যায়, হাজার বছর আগেকার ঠিক এমনি সব ব্যাপারের কথা শুনতে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। আবার হাজার বছর পরের মানুষের কাছে এইসব তুচ্ছ ঘটনা ও নগণ্য কাহিনিই কবির কথায়— 'সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।'

অতীতের আলো-ছায়ার খেলায় মানুষের মনে যে বিস্ময়রসের সৃষ্টি করে ইতিহাসের তাই প্রধান আকর্ষণ। আর ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, অক্ষরে লিখে অনাগত কালকে নিজের কথা জানাবার মানুষের যেসব উপায়, তারাই ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য না করে শুধু বর্তমানে আবদ্ধ মানুষের যে ক্রিয়াকলাপ ও জীবনখাতা, তার প্রত্নখণ্ড দিয়ে ইতিহাসকে পরীক্ষা করা চলে, সৃষ্টি করা চলে না। মানুষ প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারে, প্রাচীন কালের লোকেরা কোনও-না-কোনও উপায়ে সে ইতিহাস জানিয়ে গেছে বলে।

মানুষ অতীতের মধ্যে নিজেকে দেখতে চায়, ভবিষ্যৎকে নিজের স্পর্শ দিতে চায়। ইতিহাস এই আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপায়। কিন্তু যারা ইতিহাস লেখে ও যারা ইতিহাস পড়ে

তারা এ কথা মানতে রাজি নয় যে, ইতিহাসের কাজ মানুষ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল মেটানো। তাদের মতে এতে ইতিহাসকে অতি খাটো ও খেলো করা হয়। যে জিনিস মানুষের হাতে, হাতিয়ারের যে কাজ তার সাহায্য না করে, তার আবার মূল্য কী? সুতরাং তারা প্রমাণ করে যে ইতিহাস মানুষের মহা উপদেষ্টা। অতীতের আলো দিয়ে ইতিহাস বর্তমানের পথ দেখায়। 'বর্তমানের ঘটনা বা উদ্যোগ-অনুষ্ঠান অতীতের ঘটনা-প্রবাহের সহিত কার্য-কারণ সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যরূপে বদ্ধ, মানবের সমাজগত জীবনের অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের প্রত্যক্ষ অংশ; সুতরাং বর্তমানের উদ্যোগ-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে অতীতের ইতিহাসের ধারা দেখিয়া শুনিয়া লওয়া, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় যাহাকে বলে দেশ কাল পাত্র তাহা সাবধানে হিসাব করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্মী মাত্রেরই কর্তব্য, নতুবা অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতে পারে।"[১]

বর্তমান যদি 'অতীত' কারণের কার্য হয়, অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের একটা অংশ মাত্র হয়, তবে ওই প্রবাহের বেগে তা নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যাবেই। ইতিহাস সে দিকটা পূর্ব থেকে বলে দিতে পারে এ যদি সত্যও হয়, তবুও সে জ্ঞানের ফলে দিকের কোনও পরিবর্তন ঘটার কথা নয়। স্রোতের টানে কোথায় যাচ্ছি তা জানা থাকলেই সে গতিকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। আর কর্মীরা যে দেশ-কাল-পাত্রের হিসাব করে কর্মে সফলতা লাভ করে তা বর্তমান দেশ, বর্তমান কাল ও বর্তমান পাত্র। সে বর্তমানের অতীত ইতিহাস অবশ্য আছে, কিন্তু কর্মীর যা সাবধানে হিসাব করতে হয় তা ওই ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ফলে যে বর্তমান গড়ে উঠেছে সেই বর্তমান। যাকে পাথর কাটতে হয়, পাথরের গড়ন জানা তার দরকার। কিন্তু সে গড়নের যে ইতিহাস ভূতত্ত্ব থেকে জানা যায় তাতে তার প্রয়োজন হয় না। আর ভূতত্ত্বের পণ্ডিত যে পাথর কাটার কাজে অন্যের চেয়ে সহজে ওস্তাদি লাভ করতে পারে এ কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর বড় কর্মীরা সকলেই নিজের প্রতিভার আলোতে বর্তমানকে চিনে নিয়েছে, ইতিহাসের আলোতে নয়।

প্রাচীন ইতিহাসের যে বর্তমানকে চেনাবার শক্তি কত কম ঐতিহাসিক গিবন তার একটা 'ক্লাসিক' উদাহরণ রেখে গেছেন।

এডোয়ার্ড গিবনের তুলি রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বারোশো বছরের যে ইতিহাস এঁকেছে, তার মতো প্রকাণ্ড ও জটিল ঐতিহাসিক চিত্র আর কোনও ঐতিহাসিক কখনও আঁকেনি। এই বহু জন, বহু জাতি ও বহু ঘটনা-সংঘাতের বিচিত্র কাহিনির বর্ণনায় গিবন মানব-সমাজের স্থিতি গতি ও ধ্বংসের যে উদার গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন সকল ঐতিহাসিকের তা চিরদিন বিস্ময় জাগাবে। গিবন রোমান সাম্রাজ্য থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ইতিহাস শেষ করে গিবন লিখছেন : '... and we may inquire, with anxious curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the aims and institutions of Rome. Perhaps the

---

১ বমাপ্রসাদ চন্দ, "ভূত ও বর্তমান", 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

same reflections will illustrate the fall of that mighty empire, and explain the probable causes of our actual security.' এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে : 'The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability; monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation.' গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের দু'বছর পূর্বে। তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা আরম্ভ হয়েছে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ গিবনের মনে হয়নি। রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের ইতিহাস তাঁর বর্তমানের দৃষ্টিকে কিছুমাত্র তীক্ষ্ণতর করেনি। যে ঐতিহাসিক ইতিহাস-জ্ঞানের জোরে বর্তমানকে উপদেশ দিতে সাহস করেন তাঁর একবার ভেবে দেখা ভাল যে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে সূক্ষ্মতর কি না।

২

বর্তমান যে অতীতের ইতিহাসকে কাজে লাগায় না তা নয়। বর্তমানের কাজে মানুষ প্রাচীন ইতিহাস অনেক সময়েই ডেকে আনে; কিন্তু সে উপদেশ লাভের জন্য নয়, অতীতকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অস্ত্রের মতো ব্যবহারের জন্য। ইতিহাসে যা এর অনুকূল লোকে তাকে প্রচার করে; যা প্রতিকূল তার দিকে চোখ বুজে থাকে। ইংল্যান্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পলিটিশ্যনেরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজির তুলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে ইতিহাস যে সব সময়েই সত্য ইতিহাস, তার ব্যাখ্যা যে সকল সময়েই নির্ভুল ব্যাখ্যা হত— এ কথা এখন কোনও ঐতিহাসিক স্বীকার করবে না। কিন্তু ওই ইতিহাসই ছিল সেদিনের কাজের ইতিহাস। বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ইতিহাসে সেদিনকার কাজ চলত না, কাজ অচল হত; এর উদাহরণের জন্য সাগর-পারে যাবার প্রয়োজনও নেই। বর্তমান হিন্দুসমাজের যাঁরা সংস্কার চান আজ তাঁরা হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজির আনছেন, আর যাঁরা সে সংস্কারকে বন্ধ রাখতে চান তাঁরাও ওই ইতিহাস থেকেই নজির তুলছেন। এর কোনও ইতিহাসই সম্পূর্ণ সত্য নয় বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। গোটা প্রাচীন ইতিহাসকে কোনও কাজে লাগানো যায় না, তা থেকে অংশবিশেষ বেছে নিতে হয়। কে কোন অংশ বেছে নেবে তা ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার গরজের উপর।

৩

যাকে 'ঐতিহাসিক সত্য' বলা হয়— যা থেকে মানুষ তার বর্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ পায় বলে অনেকের বিশ্বাস— তার স্বরূপটি কী? যা ঘটে গেছে সেই ঘটনার তথ্য নির্ণয় 'ঐতিহাসিক সত্য' নয়, প্রত্নতত্ত্ব মাত্র। ইতিহাস থেকে যারা উপদেশ চায় তারা ধরে নেয়, সে ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যের মধ্যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, যাকে ঘটনার বিশেষত্ব থেকে মুক্ত করে অবিশেষ সাধারণ সত্য বলে ব্যবহার করা চলে। ঐতিহাসিকের সবচেয়ে বড় কাজ, প্রত্নতত্ত্বের তথ্য থেকে এই ঐতিহাসিক সত্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার করা। প্রতি ইতিহাসের মধ্যেই কোনও-না-কোনও তত্ত্ব আছে। যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে সে তত্ত্ব ধরা পড়ে।

সমসাময়িক ঘটনা, অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতৃদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও মত এক নয়। এদের মূল্য ও ভালমন্দ-বিচারে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমান থেকে অতীতের কোঠায় গেলেই যে এদের মূল্য সবার চোখে এক দেখাবে, এদের বিচারে মতভেদের অবসর থাকবে না, এমন বিশ্বাসের কারণ কী? বর্তমানের ঘটনা নিয়ে অনেক তর্ক যে ভবিষ্যতের ঘটনা দিয়ে মীমাংসা হয় সে কথা সত্য, কিন্তু ঘটনা থেকে যে তত্ত্বোপদেশের আশা করা হয় তার তর্কের অবসান নেই। কারণ একই ইতিহাস সকলের চোখে ও সকল সময়ের চোখে একরূপ নয়। মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে ইতিহাসেরও মূর্তি পরিবর্তন হয়। মানুষের যাত্রাপথের প্রতি বাঁক থেকে পিছনের ইতিহাসের চেহারা বিভিন্ন দেখায়— যেমন পাহাড়-পথের যাত্রী পথের নানা স্থান থেকে সমতলভূমির নানা চেহারা দেখে। এর কোন চেহারা সত্য, কোন চেহারা মিথ্যা? প্রতি যুগের মানুষ ইতিহাসকে নূতন করে লিখছে ও নূতন করে লিখবে। ইতিহাসের এই নূতন নূতন রূপের কোনও রূপই মিথ্যা নয়, কারণ ও সব রূপই ব্যাবহারিক অর্থাৎ আপেক্ষিক। ইতিহাসের কোনও পারমার্থিক রূপ নেই। ইতিহাসের ঘটনানির্ণয়ের শেষ থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্যাখ্যার কখনও শেষ হবে না।

ইতিহাসকে যারা উপদেশের খনি মনে করে তারা তার এই রূপ-পরিবর্তনের কথাটা ভুলে থাকে। অথচ ইতিহাস সম্বন্ধে এর চেয়ে সহজ সত্য আর কী আছে। কোন বড় ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তির বিচারে ঐতিহাসিকেরা একমত? বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই, এক ফরাসি বিপ্লব ও তার কর্মীদের যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, তার কথা মনে করলেই যথেষ্ট হবে। ইতিহাসের ঘটনা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদাহরণ নয়। ও তত্ত্ব মানুষ নিজের মনে মনে গড়ে নেয়, অর্থাৎ যার যেমন মন সে তেমনি তত্ত্ব ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পায়। ইতিহাসের যে উপদেশ তা ইতিহাস থেকে মানুষের মনে আসে না, মানুষ নিজের মন থেকে ইতিহাসে তা আরোপ করে।

৪

মানব-সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবনের প্রয়োজনে। মানুষের আশা ও ভয়, বর্তমানের চাপ ও ভবিষ্যতের কল্পনা, তার জীবনের পথ কেটে চলেছে। ইতিহাসের কাজ জীবনের এই বিচিত্র লীলাকে দর্শন করা, মনন করা, নিদিধ্যাসন করা। যেসব তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চায়, জীবন তাদের চেয়ে অনেক জটিল। তাই কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বই ইতিহাসের চরম ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এবং এক আংশিক ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঐতিহাসিকেরা অন্য এক আংশিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। ইতিহাস-জ্ঞানের চরম লাভ, মানবসমাজের গতি ও পরিণতির এই রহস্যলীলার সঙ্গে পরিচয়। যে ইতিহাস পাঠকের মনে এই রহস্যের বোধকে জাগিয়ে তোলে সেই ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। বাকি সব হয় গল্প নয় প্রপাগান্ডা। ইতিহাস জীবনলীলার কাব্য। যার চোখে আর্টিস্টের উদার দৃষ্টি নেই, আজকের দিনের ভালমন্দ-রাগবিরাগের উপরে উঠে মানুষের জীবনধারাকে যে দেখতে জানে না, তার ঐতিহাসিক হবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আর ইতিহাসের প্রতি পাতায় যারা উপদেশ খোঁজে তাদের বিশ্বাস, ইতিহাস হচ্ছে কথামালারই জ্ঞাতি-ভাই।

৫

ইতিহাস কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে। তার অর্থ এ নয় যে, মানুষ সমাজে ও জীবনে নূতন কিছু ঘটাতে পারে না; তার বর্তমান তার অতীতের কার্য মাত্র, আর তার ভবিষ্যৎ তাব বর্তমানের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যখন ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চান তখন এমনি একটা ধারণা তাঁদের ভাবনার মধ্যে গুপ্ত থাকে। সাদা চোখে অবশ্য আমরা সবাই দেখি যে, মানুষ তার জীবনে নিত্য এমনসব ঘটনা ঘটাচ্ছে যা তাব অতীত ও বর্তমান থেকে কেউ কখনও অনুমান করতে পারত না। ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে তার ব্যাখ্যাও সম্ভব হয়। কিন্তু তত্ত্বের খাতিরে সত্যকে উপেক্ষা না করলে সহজেই বোঝা যায় যে, কার্যকারণের ব্যাখ্যা পেলেই নূতনের অভিনবত্ব দূর হয় না। মানুষের ইতিহাসে যেগুলি তার গৌরবের অধ্যায় তার অনেক ঘটনাকে মানুষ ঘটিয়েছে অতীতকে অতিক্রম করে, বর্তমানকে নাকচ করে— ইতিহাসকে ধরে থেকে নয়।

বাঙালি ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের যে প্রবন্ধ থেকে পূর্বে বচন তুলেছি তাতে তিনি 'কার্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাব-কিতাবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য' যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রথম উদাহরণ, 'অস্পৃশ্যতা বর্জন', নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। চন্দমহাশয় 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে প্রমাণ করেছেন, 'অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলে উভয় পক্ষই পাপভোগী হইবে, এইপ্রকার বিশ্বাস অস্পৃশ্যতার মূল।' এবং তিনি বলেন, 'এইপ্রকার বিশ্বাস হিন্দু সাধারণের মধ্যে এখন খুব দুর্বল হইলেও, ইহার বীজ যে এখনও হিন্দুর মনের ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।' এর শেষ

সত্যটি ঐতিহাসিক সত্য নয়, বর্তমান কালের কথা। যার চোখ আছে সে, চৈতন্যচরিতামৃত পড়া না থাকলেও, বর্তমান হিন্দুসমাজ দেখে এ তথ্য জানতে পারবে। যার সে চোখ নেই চৈতন্যচরিতামৃত তার এ কাজে কোনও সাহায্য করবে না। তার পর চন্দমহাশয় বলেছেন, 'ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষাও অস্পৃশ্যতার প্রবলতর সহায় জাত্যভিমান। ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রত্যাগত অনেকের হিন্দুজাতিতে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায় জাত্যভিমান কি প্রবল পদার্থ।' চন্দমহাশয় প্রশ্ন করেছেন, 'এই প্রবর্ধমান ব্যাধির আরোগ্যের উপায় কি?' এবং উত্তর দিয়েছেন, 'আমার মনে হয়, এই ব্যাধির আরোগ্যের প্রধান উপায়, যথাবিধি সামাজিক রীতিনীতির ইতিহাস অনুশীলন এবং জনসাধারণকে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে শিক্ষা দেওয়া।'

ঐতিহাসিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক বিচার যে কী উপায়ে অপচীয়মান ধর্মবিশ্বাস ও প্রবর্ধমান জাত্যভিমানের ধ্বংস করবে চন্দমহাশয় তা কিছু বলেননি। ইতিহাস অনুশীলনে হয়তো পাওয়া যাবে যে, মানুষের সমাজে বড়-ছোটর বোধ সভ্যতার সঙ্গে একবয়সি। আর ওই ভেদকে অবলম্বন করেই সভ্যতার ইমারত গাঁথা আরম্ভ হয়েছিল। এ বোধ বা জাত্যভিমান যা হোক কিছু-একটাকে অবলম্বন করে চিরদিন মানুষের সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর 'যথাবিধি' ঐতিহাসিক শিক্ষাটি কী? এ ভেদকে দূর করলে সভ্যতার মন্দির ভেঙে পড়বে, না সভ্যতার মন্দির এতটা গড়ে উঠেছে যে ও 'স্কাফোল্‌ডিং' এখন সরিয়ে নেওয়া চলে? এর কোনও অনুমানকেই কি অনৈতিহাসিক বলা যায়? আর যদি বলাও যায় তবে ইতিহাসের তর্কে হেরে এক মতের লোক অন্য মতের চালে চলবে এ মনে করা মানব-চরিত্রের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় নয়। লেনিন ও মুসোলিনির দ্বন্দ্ব যে ঐতিহাসিক সম্মিলনীতে মীমাংসা হবে এ স্বপ্ন ঐতিহাসিকেও কখনও দেখে না। আর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে 'অ্যানথ্রপলজি' থেকে মানুষ সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা পাবে?

চন্দমহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের যেসব ঘটনা তুলেছেন তার প্রধান কথা, শ্রীচৈতন্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ধর্ম-সংস্কারকে নিজে বিন্দুমাত্র মানতেন না।

> 'মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
> একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরস গায় ॥
> বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
> কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥'

এ যে 'ঐতিহাসিক অনুশীলন' বা 'বৈজ্ঞানিক বিচার'-এর ফল নয় তা চন্দমহাশয়কেও স্বীকার করতে হবে। চৈতন্যের যেসব ভক্তেরা তাঁর পাণ্ডিত্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরাও তাঁদের তালিকায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নাম উল্লেখ করেননি। মহাপ্রভু 'কণ্ডুক্লেদ গায়' অস্পৃশ্যকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন ইতিহাস অনুশীলন করে নয়, সমস্ত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে।

সমাজে নূতন কিছু আনতে হলে শ্রীচৈতন্যের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস-অনুসন্ধান-সমিতি

দিয়ে সে কাজ চলে না। মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে, সৃষ্টির প্রেরণায় নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টিলীলার দর্শক। এ লীলার কলকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য বুঝলেই কবি হওয়া যায় না। তা যদি হত তবে মম্‌সেন ইতিহাসের পুথি না লিখে একটা রাজ্যস্থাপন করতেন, আর ব্র্যাড্‌লির হাতে আর-একখানা হ্যামলেট লেখা হত।

প্রবন্ধাবলি

আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ

চল্লিশ বছর পূর্বে যখন প্রবেশিকার দরোজা পার হয়ে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন ছাত্রমহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোভাবের মধ্যে কৌতূহল সবচেয়ে প্রবল। 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত প্রকাশ হয়েছে। নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' চলছে। ভারতীতে 'চিরকুমার সভা' বেরিয়েছে। ছোটগল্পের অনেকগুলি বিখ্যাত গল্পই লেখা হয়েছে। প্রদীপে 'কাদম্বরী-চিত্র' ভারতীতে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বের হয়েছে। কালিদাসের কাব্য-সমালোচনার প্রবন্ধগুলি প্রকাশ্য সভায় পড়া হয়ে বঙ্গদর্শনে ছাপা হচ্ছে। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের আলোচনা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির কণ্ঠ একচেটে করার উদ্যোগ করছে। এ কবি ও লেখক যে নূতন ধরনের এবং সম্ভব জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এ ধারণা দেশে, সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে এসেছে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে যে এই বাংলাদেশে এক আশ্চর্য উৎকর্ষের বহুমুখী প্রতিভা এমন সৃষ্টি করে চলেছে যার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে কদাচিৎ মেলে সে জ্ঞান জন্মেনি এবং সে কথা ভাবার সাহসও মনে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে অস্পষ্ট, ওর মধ্যে যে শক্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে পেয়েছি বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না (যে অভিযোগ আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এনেছিলেন), সে নালিশ আমাদের মধ্যে একদলের মনে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি তো একরকমের নয়। অল্পদিন পূর্বে প্রকাশিত 'কথা' ও 'কাহিনী'র কবিতাগুলি আমাদেব সকলের মন লুট করে নিয়েছিল, "সন্ন্যাসী উপগুপ্ত" কি "পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে" আমাদের অনেকেরই মুখস্থ ছিল। পুরানো University Institute-এর হলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দী বীর' যেমন আবৃত্তি করেছিলেন ঠিক তেমনি গলায় সেইরকম আবৃত্তির চেষ্টা তখন অনেকেই করেছি। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠত রবীন্দ্রনাথকে দেখার আগ্রহ ও তাঁর গান শোনার লোভ। এ কবির আকৃতি ও প্রকৃতি, স্বর ও সুর যে আর পাঁচজনার মতো নয়, অভিনব জিনিস, এ ছিল প্রকাণ্ড আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথ যে সভায় কোনও প্রবন্ধ পড়তেন সেখানে ছাত্রদের ভিড় হত অসম্ভব রকম। কিন্তু সে ভিড় কেবল তাঁর প্রবন্ধ শুনতে নয়, তাঁকে দেখতে ও তাঁর পড়া শুনতে। এবং সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ-পাঠকই থাকুন, আর সভাপতিই থাকুন সভার শেষে তাঁর গান শোনার দাবি ঐকতান চিৎকারে আমরা বরাবর জানিয়েছি; আর এ কাজে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোককেও মাঝে মাঝে abettor পাওয়া যেত। তাঁর সাহিত্যে ও তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু।

এরপর যখন কলেজের উঁচু শ্রেণিতে উঠেছি তখন এল বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন। যে আবেগ ও উত্তেজনা বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, বিশেষ আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ে জেগে উঠল তার অনুরূপ কিছু এ সম্প্রদায়ের জীবনে পূর্বে কখনও ঘটেনি এবং পরেও আজ পর্যন্ত ঘটেনি। এই দেশব্যাপী উন্মাদনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূরত্ব ঘুচিয়ে আমাদের মধ্যে এলেন, হয়ে উঠলেন ছাত্রদের অন্তরঙ্গ। প্রথম রাখীবন্ধনের দিনের গান চাই। "বাংলার মাটি বাংলার জল" প্রস্তুত। টাউন হলের বিরাট জনসভায় গাওয়ার জন্য গান দরকার। এল "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" তার সুরের সঙ্গে আমাদের বেসুর মিশিয়ে সে গান আমরা সে সভায় গেয়েছি। দিনের পর দিন তাঁর প্রবন্ধে, কবিতায়, গানে আমাদের অনুভূতির তন্ত্রী ঝনঝন করে কেঁপে উঠতে লাগল।

"মোদের যাত্রা হ'লো শুরু এখন ওগো কর্ণধার।"
"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।"
"ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।"
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।"
"যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না
ভয় থাকে ত করি মানা।"

সেদিনকার কতক গান কাব্য-ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সেদিনের তরুণ যুবকদের পক্ষে বৃদ্ধ বয়সেও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ দিয়ে এসব গান যাচাই করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে নিয়ে নির্ভয়ে ফাঁসিকাঠে উঠতে পারে তার সংখ্যা আমাদের মধ্যে কম ছিল না। সে মোহের অবশেষ মনের মধ্যে আজও আছে।

এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে এবং তারই ফলে, যখন শিক্ষার আন্দোলন এসে মিশল তখন দেশের ছাত্রসমাজ এল রবীন্দ্রনাথের মনের আরও কাছে। আর আমরা তাঁর মন জয় করে নিলুম দেশের দরিদ্র ও অসহায়দের সেবাতে সংঘবদ্ধ কর্মকুশল নিষ্ঠায়। সুরাটে কংগ্রেসি 'যজ্ঞভঙ্গে'র পর দেশের নরমপন্থী ও চরমপন্থী politics-এর ফাটল ঢাকার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে করা হল 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'র সভাপতি। এর অল্পদিন পূর্বে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার একটা বড় পরিচয় দিয়ে দেশকে চমৎকৃত করেছিল অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে। তাঁর অভিভাষণের শেষদিকে এই তরুণদের সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপরূপ কণ্ঠে পড়লেন— "রক্তবর্ণ প্রত্যুষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে. তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে

আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয় যোগ কেবল এক দিনের নহে।"

আমরা তখন সবেমাত্র কলেজের পাঠ শেষ করেছি। অনেক ছাত্র ও আমাদের মতো অনতিপূর্ব-ছাত্র এ সম্মিলনে উপস্থিত ছিল। মনে হল আমাদের চেষ্টা ও শ্রমের পুরস্কার পেয়ে গেলাম।

৩

আমাদের ছাত্রজীবনে রবীন্দ্রনাথের এ প্রভাব অবশ্য 'বাহ্য'। মনে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের যে স্পর্শ সেই স্পর্শই অন্তরতম, আর তার যা ফল সেই ফলই চরম ফল। নিশ্চয় আমাদের সকলে সে স্পর্শ পায়নি। যারা পেয়েছিল তাদের অনেকের মনে যে ফল ফলেছিল তার স্বরূপ বলছি।

আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় চলছে dark age। ইংরেজি সাহিত্যের যে রস আমাদের পূর্বতনদের চিত্ত সরস করেছিল, ইউরোপের যে নব বিদ্যা ও চিন্তা তাঁদের মনকে মোহমুক্তির নাড়া দিয়েছিল— তাকে প্রসন্ন ঔদার্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে আমাদের মনে এসেছিল সংকোচ। ও-বিদ্যা ও-চিন্তায় যে আমাদের দেশের কোনও দান নেই, অথচ তাকে আয়ত্ত করাই উচ্চশিক্ষা; আমাদের অধ্যাপকেরা যে তাকে যাচাই করেন না, কেবল ওর ভার নিজের মন থেকে আমাদের মনে নামিয়ে দেন, তার পীড়ায় আমাদের মনের গ্রহণের শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না। এ বিদ্যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় দেশ থেকে কেটে গিয়েছিল, কিন্তু মনের মাটিতে শিকড় চালিয়ে তার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হয়নি। সুতরাং আমাদের কাছে এ বিদ্যা ছিল পরীক্ষা পাশের উপায় মাত্র অর্থাৎ বোঝা আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনার গানে—

"জয় তব হোক জয়
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয়।...
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।"

যে মনঃপীড়া প্রচ্ছন্ন আছে আমরা ছাত্রদের অনেকে তার গ্লানি থেকে মুক্ত ছিলাম না। আজ এ দুঃস্থতা কতকটা দূর হয়েছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি ও কর্মশক্তির কল্যাণে।

আমাদের মন্দ ভাগ্যে আমাদের সাহিত্যের পাঠও যথোচিত আনন্দের ছিল না। ওর মধ্যেও ছিল একটা বড়রকম বোঝার ভার। সাহিত্য বলতে অবশ্য বোঝাত ইংরেজি সাহিত্য। সংস্কৃত কাব্য যা দু'-একখানা পড়ানো হত তা সাহিত্য হিসাবে নয়, কী হিসাবে বলা কঠিন। কাব্যকে তার কবিত্ব থেকে বিমুক্ত করে তার anatomy-র উদ্ঘাটন ছিল সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ। এবং সে anatomy-র বেশির ভাগ osteology, অস্থিবিদ্যা। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যও আমাদের কেবল আকর্ষণ করেনি, তার মধ্যে একটা স্পর্ধা যেন আমাদের আঘাত করত। পাঠ্য নির্বাচনে বড় ছোট লেখকের ভেদ ছিল না। ইংল্যান্ডে কিঞ্চিৎ সুনাম থাকলেই তিনি ছিলেন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠ লেখক, যদিও সম্ভব ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরে তাঁর লেখা ইউরোপে আর কেউ পড়েনি। ব্রিটিশ শাসন যেমন নির্বিবাদে মানার জিনিস, ব্রিটিশ কবি ও লেখকের শ্রেষ্ঠত্বও ছিল তেমনি নির্বিচারে স্বীকারের বস্তু। এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের বুঝিয়ে দিতে অধ্যাপকদের ত্রুটি ছিল না, অবশ্য ইংরেজ সমালোচকের বই থেকে টুকে এনে। আমাদের সময় English Men of Letters পর্যায়ের অনেক বই অবশ্য পাঠ্য ছিল। তাতে আমরা দেখতুম যে ইংরেজ লেখক মাত্রই অতি শ্রেষ্ঠ লেখক। যে কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায় না তিনিও নাকি failure of a great poet। নিজের বোধ ও রুচি দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ভালমন্দ বিচার অধ্যাপকেরা কখনও করতেন না। সেটা হত ধৃষ্টতা। ইংরেজি সাহিত্য আমাদের কাছে অনেকটা ছিল কার্জনি আমলের ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যের একটা দিক।

কলেজের শিক্ষার এই inferiority complex আমাদের চিন্তাকে করেছিল ভীরু ও পঙ্গু, রসবোধকে করেছিল অস্বাভাবিক ও অনুদার। মনের এই দুরবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ে। তাঁর কাব্যে আমরা সেই রস পেলাম মন যাকে গ্রহণ করল দ্বিধাহীন আনন্দে। তাঁর নাম আমাদের অধ্যাপকদের কেউ কখনও উচ্চারণ করেননি, কিন্তু আমরা মনে জানলুম যেসব সাহিত্যের তাঁরা 'নোট' লেখান এ সাহিত্য তার থেকে খাটো নয়। এবং এ সাহিত্য যে লেখা হচ্ছে আমাদেরই মুখের ভাষায়, আর যিনি লিখেছেন তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যেই মাঝে মাঝে পাই— এ হয়েছিল আমাদের মনের বিশল্যকরণী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই যে প্রথম-যৌবনে যথার্থ সাহিত্যিক রসে আমাদের মনকে সরস করছিল কেবল তা নয়, তাঁর সাহিত্যই আমাদের মনের দীনতা ঘুচিয়ে ইংরেজি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আমাদের মনকে অনুকূল করেছিল। তাঁর সাহিত্যের আলোচনায় আমাদের মনে হয়েছিল যে আমরা নিজের মনে সাহিত্য-বিচারের একটি কষ্টিপাথর পেয়েছি যা ইংরেজি পুথি থেকে ধার-করা নয়, যাতে সোনাকে সোনা এবং পিতলকে পিতল বলেই চেনা যায়।

আমাদের কলেজে পড়ার সময়েই 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলি প্রায় লেখা হয়। আমাদের সাহিত্যিক রুচি ও অনুভূতির গড়নে সেগুলি ছিল অমূল্য। তাতেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে কালিদাসের কাব্য মল্লিনাথের টীকা নয়, বাল্মীকির রামায়ণ-ধর্মসংহিতা থেকে ভিন্ন।

আমাদের কলেজের শিক্ষার পাথরের চাপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যই বিদীর্ণ করেছিল —

“ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী,
এসেছে রবির কর।”

আষাঢ় ১৩৪৮

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য

কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তাঁর কাব্য-রচনার প্রকৃতি ও পরিমাণ কীরকম হত রবীন্দ্রনাথ তা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র শ্লোকের স্তুতিগানেই যে রাজা উজ্জয়িনীর প্রান্তে একখানা উপবনঘেরা বাড়ি কবিকে দান করতেন তা সহজেই বিশ্বাস হয়। কিন্তু কালিদাসের কালের রবীন্দ্রনাথ যে বিম্বাধরের স্তুতিগীতেই তাঁর কবি-প্রতিভাকে নিঃশেষ করতেন, আর তাঁর কাব্য-সৃষ্টি দু'-একখানি মাত্র ছোট-খাটো পুথি ভরে দিত এ একেবারে অবিশ্বাস্য। ত্বরাহীন জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটিয়ে দেবার কোনও লোভ, কি রাজার চিত্র-শালার কোনও মালবিকার মোহ তাঁর কবি-মর্মের এ সংকোচ ঘটাতে পারত না। তাঁর কাব্যগুলি খুব সম্ভব আকারে ছোটই হত, যেমন 'মেঘদূত' ছোট; কিন্তু সংখ্যায় দু'-একখানি নয়। নরনারীর চিত্তের সহজ ও সূক্ষ্ম বহু ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের পরমাশ্চর্য লীলা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যে বাণীর পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠত, যার অম্লান দীপ্তি কাব্য-রসিকের মন আজও উদ্ভাসিত করত। অনুষ্টুপ থেকে স্রগ্ধরা এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মাননি বলে সংস্কৃত ভাষার যেসব ছন্দ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তাদের বিচিত্র ঝংকার ও দোল, এসব কাব্য থেকে দেড় হাজার বছর পার হয়ে আমাদের কান ও মনে এসে লাগত।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে নানাদিকে নাড়া দিয়েছে। এর কারণ, এ সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিবিড় যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ সুর ও ছন্দের রাজা। তাঁর সুর-রসিক মন ও আশ্চর্য ছন্দকুশলী কান সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের মধ্যে নিজের প্রতিভার একটা অংশের গভীর ঐক্য উপলব্ধি করেছে। বালক বয়সে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রস গ্রহণের সময় হয়নি, তখনও যে তাঁর মনকে ওর ছন্দের তান ও লয়ে মুগ্ধ করত 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষী দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূল উপাদান দুটি— কালিদাসের শব্দ-সম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব ধ্বনি-সামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছিন্ন মূর্তি তখনই তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান 'শুষ্কেন্ধন ইবানলঃ' পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে। কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। 'রঘুবংশে'র যে-প্রারম্ভটা প্রথম যৌবনে নিতান্ত সরল, বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাবপ্রকাশে তার কী অদ্ভুত ক্ষমতা!

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

মনে হয় কি সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণির সহজ, মানব-দেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ। ও এমনি সু-সম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে আমরা মেনে নিই। গড়নের যে আশ্চর্য কৌশলে এই সামঞ্জস্য এসেছে, তার কথা মনেই হয় না।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

একটিমাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেমনি সে লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও 'ব্যালান্স'! ভাষা-প্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য কেবল পৃথিবীর মহাকবিদের লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন শেকসপিয়রে—

"And then it started like a guilty thing
upon a fearful summons."
"a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more;"

ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্তি গড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মহাকবিত্ব লাভে বঞ্চিত হয়, যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই মহাকবির ভাষা; ধ্বনি, রেখা, রঙের অমৃত রসায়ন।

"বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে।"
"শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।"
"পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"
"অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।"

কিছুই আশ্চর্য নয় যে, পূর্ব ভারতের অপভ্রংশের এই মহাকবি পোনর শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ করে উজ্জয়িনীর মহাকবির হাতে হাত মিলিয়েছেন।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে মানুষের চিত্তকে ব্যাপ্ত করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাব ও রসের নিবিড় মিলন ঘটেছে। এইখানে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে-রসমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম ইংরাজি কাব্য-রসিকদের মনে হয়। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে-যোগ, তা প্রধানত তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়— প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কত দিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এর আস্বাদ বিভিন্ন।

যুগল-মিলনের যে মধুর রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বয়ে যাচ্ছে এ রস সে অমৃত-রস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ভাবৈকরসত্ব মানুষের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেয়, বিশ্বপ্রকৃতির সুর মানুষের মনের বীণায় বাজাতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাহিরে কালিদাসের কাব্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের এই দুই মহাকবি এইখানে পরস্পরের একমাত্র আত্মীয়।

কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর একটি যোগ এমন প্রকট নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাড়ির যোগ। সে হচ্ছে, এই কাব্যের একটা আভিজাত্যের সংযম। মহাভারতে, রামায়ণে, কালিদাসে সমস্ত ভাব, রস ও বৈচিত্র্যকে একটা গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যা সমস্তরকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। তার অর্থ নয় যে, এসব কাব্যের ভাব গতানুগতিক, কি রসবৈচিত্র্যহীন। কালিদাস কবি-প্রসিদ্ধির ধার-করা চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেননি, সংস্কারহীন কবির চোখেই দেখেছেন। বহু রসের বিচিত্র নবীন লীলায় তাঁর কাব্য ঝলমল করছে। কিন্তু তাঁর কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্যের যতিভঙ্গ করে না। ইউরোপীয় অলংকারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে 'ক্ল্যাসিসিজম' ও 'রোমান্টিসিজম'-এর অপূর্ব মিল ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা এই মিলন-পন্থী। পৃথিবীর 'লিরিক' কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত সবার উপরে। মানুষের মনের এত অসংখ্য ভাবের রসের পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের প্রাচুর্যে তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা। কিন্তু সমস্ত লীলা ও গতিকে অন্তরের একটি গভীর অটলতা, নটরাজের মূর্তির মতো চিরসুন্দরের ছন্দে গড়ে তুলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে যে কাব্য-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাব ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সেই ইংরেজি কাব্য বরং এর পরিপন্থী। এ কাব্যে ভাব ও প্রাণের বন্যা বহু স্থানেই রসের সীমাকে ভাসিয়ে অদৃশ্য করেছে। দুই তটরেখার মধ্যে কূলে কূলে পূর্ণ নদীর যে রূপ তা এ কাব্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্যা যখন নেমে গেছে তখন জল শুকিয়ে চর দেখা দিয়েছে, যেমন 'টেনিসনে'র কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের অনতিপূর্ববর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্যে এই ইংরেজি কাব্যের ভাবাতিশয্যের প্রভাব অতিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এ থেকে মুক্ত তার কারণ তাঁর প্রতিভার ধর্মবৈশিষ্ট্যের পরেই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের প্রভাব।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত-কাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করেনি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারক রসে জীর্ণ হয়ে স্বতন্ত্র নব সৃষ্টির রস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত-কাব্যের সুর, ধ্বনি, ভাব ছড়ানো রয়েছে; কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত-কাব্যের স্বাদ নয়। নব প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছে।

২

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংস্কৃত কবি ও কাব্যের কবিতা; যেমন 'মেঘদূত', 'ভাষা ও ছন্দ', 'সেকাল', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান'। এ কবিতাগুলি এক অভিনব কাব্য-সৃষ্টি। এগুলি কাব্য বা কবিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রশংসার অঞ্জলি নয়, যেমন কীটস্-এর On Looking into Chapman's Homer, কি রবীন্দ্রনাথের নিজের, "যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু-পারে।" বস্তুর জগৎ কবির চিত্তকে রস-সমাহিত করে কাব্যের জন্ম দেয়; এখানে কবি ও কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে ঠিক তেমনি রসাবিষ্ট করে এই অভিনব শ্রেণির কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ে কবি-চিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। মেঘদূত ও তার কবি রবীন্দ্রনাথের অনুকূল কবি-কল্পনাকে যে দোল দিয়েছে এ তারই ফলে নতুন রস-সৃষ্টি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাও ঠিক তাই। বাল্মীকির রাম-চরিত রচনার যে কাব্যে রামায়ণের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথেব কল্পনায় গলে তা এক নতুন রস-মূর্তি নিয়েছে।

ববীন্দ্রনাথের এই শ্রেণির কাব্য যে কোথাও সংস্কৃত-কাব্যের প্রতিচ্ছবি, তা মনে হয় না; মনে হয, সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, তার কারণ, এসব কাব্যে কবির মন ও দৃষ্টি এখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টির সীমারেখা নয়। তাঁদের কাব্যের পথেই রবীন্দ্রনাথের চোখ ও মন সেই বস্তু ও ভাবে গিয়ে পৌঁছেছে যা তাঁদের কাব্যের মূল উপাদান এবং সেই উপাদানকে নিজের প্রতিভার ছন্দে ও রং-এ নতুন করে গড়ে তুলেছে। 'মেঘদূত' কবিতার যে-অংশটা বাহ্যত কালিদাসের মেঘের যাত্রা-পথের সংক্ষেপ মাত্র সেখানেও এর পরিচয় পাওয়া যায়—

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতী-কূলে
পবিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।"

এ মেঘদূত, কিন্তু ঠিক মেঘদূত নয়। কালিদাস আঙ্গুল তুলে যেদিকে দেখিয়েছেন, কবি সেইদিকেই চেয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন নিজের চোখে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার—

" বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয় নি নত,

সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—"

রামায়ণের রামচরিত্রই বটে। কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি-নারদ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ঠিক এ জিনিস পাওয়া যাবে না।

৩

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যের উপাদান। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই বিশাল ও মহান সাহিত্য তাঁর কবি-চিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছে তা নতুন সৃষ্টি। এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক সুপরিচিত পাত্র ও পাত্রীর উপর যে কল্পনার আলো ফেলেছেন তাতে মনে হয় যেন 'নতুন লোকে' তাদের সঙ্গে 'নতুন করে শুভদৃষ্টি হল'। 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে' রবীন্দ্রনাথ, ব্যাস যে-রসের সৃষ্টি করেছেন, তার ধারা ধরেই মহাভারতের এই চরিত্রগুলির একেবারে অন্তস্তলে পাঠককে নিয়ে গেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথা দিয়েছেন, কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তার অনেক কথাই মহাভারতে নেই। কিন্তু সে-সবই যে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তীর মুখের কথা তাতেও সন্দেহ নেই। এসব চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কল্পনায় একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। এবং তাঁর কাব্যে এদের নতুন কথা ও নতুন কাজ অত্যন্ত পরিচিত লোকের স্বাভাবিক কথা ও কাজ মনে হয়।

"হের দেবী পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বালিয়াছে দীপালোক— এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া।"

মহাভারতে নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলিতে আসন্ন যুদ্ধের যে ভীষণ-গম্ভীর রস পুনঃ পুনঃ ফুটে উঠেছে এ তারই রূপ।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ' মহাভারতের অতি সামান্য ভিত্তির উপর কবির সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। এ দুই কাব্যের যে-রস তার সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যান দুটির সম্পর্ক নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র ও আখ্যান কবির কল্পনাকে জাগায়নি, কবির কল্পনাই এদের আশ্রয় করেছে। এ দুই জায়গায় তবুও গল্পের এক-একটা কাঠামো ছিল; কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান থেকে যে 'পতিতা'র কল্পনা তা রবীন্দ্রনাথেরই সম্ভব।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক বাংলায় কাব্য-রচনার কথায় স্বভাবতই মাইকেলের কথা মনে হয়। 'মেঘনাদ-বধ' ও 'তিলোত্তমা'র বাহ্যিক গড়ন, সংস্কৃত 'ক্ল্যাসিক' কবিরা পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যেসব কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই গড়ন। এবং এই দুই কাব্যের অন্তরের মিলও ওই 'ক্ল্যাসিক' কবিদের কাব্যের সঙ্গে। পুরাণ থেকে আখ্যানবস্তু নেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার ঘটনা কি চরিত্র কবির চিত্তের রসের তারে খুব জোরে ঘা দেয়নি। কাব্য-সৃষ্টিতে কবি যে-কল্পনা এনেছেন তা পুরাণ-প্রসঙ্গকে অতিক্রম করে পাঠককে রসের একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকে নিয়ে যায় না। এ কাব্য পৌরাণিক আখ্যানের ঘরেই থাকে, কিন্তু 'পেইং গেস্ট'। রবীন্দ্রনাথ থাকেন বাহিরে, কিন্তু তিনি ঘরের লোক। বাড়ি যখন আসেন তখন একবারে অন্তঃপুরে যেয়ে উপস্থিত হন। 'বীরাঙ্গনা'য় বিদেশি কবির কল্পনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেল অতি সূক্ষ্ম পৌরাণিক সূত্র ধরে অভিনব রস-সৃষ্টি করেছেন। এ কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপে'র সমশ্রেণির কাব্য। স্বাদের যে তফাত সে হচ্ছে দুই বিভিন্ন প্রতিভার সৃষ্টির প্রভেদ।

৪

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মিলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজ-কবি ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর কাব্যপাঠের শেষে নিজের কান থেকে বর্হ খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।

জয়ন্তী উৎসব, ১৩৩৮ গ্রন্থ থেকে সংকলিত

রবীন্দ্রনাথ

আর এক বছর পরেই রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর একশো বছর অতীত হবে। সেই জন্মবার্ষিকীর উৎসব পালনের জন্য দেশে এবং অল্প কিছু বিদেশে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মধ্যে জন্মেছিলেন সে সৌভাগ্যের কথা বাঙালির মনে আজ বড় হয়ে না দেখা দিয়ে পারে না। বর্তমানে ভবভূতির 'বিপুলা পৃথ্বী' মানুষের কাছে ছোট হয়ে গেছে, এবং দিন দিন ক্রমশ বেশি ছোট হচ্ছে। এক মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে, অন্য মহাদেশের দূর প্রান্তে পৌঁছতে মানুষের যা সময় লাগছে, পূর্বের তুলনায় তাকে সময় লাগছে না-ই বলতে হয়। আমাদের এই পৃথিবী এক ও অখণ্ড এবং তাকে জুড়ে যে মানুষ তারাও এক ও অখণ্ড, মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ আজ অনুকূল। কিন্তু এ পরিবেশ বিফল হবে ও বিকৃত ফল প্রসব করবে, যদি না সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ সত্যদৃষ্টি লাভ করে যে মানুষের যে একত্ব তা নানা ভিন্নত্বের মধ্যে একত্ব। মানুষের একত্ব একতারার চড়া সুরে নয়, নানা সুরের বৈচিত্র্যের ঐক্য। মানুষের বুদ্ধি ও প্রতিভা একদেশে এক জাতির মধ্যে বড় যা সৃষ্টি করে, তা সব দেশের সব জাতির মানুষের পরম সম্পদ। এ সম্পদের বহুলাংশ সব দেশের সব কালের মানুষ অজ্ঞান ও অহমিকার মায়ায় অগ্রাহ্য করেছে ও আজও করছে। কিন্তু দেশ ও জাতির সৌভাগ্যের মাপ— তাদের দেশের ও জাতির মানুষ বিশ্ববীণার সুর-সঙ্গতিতে কেমন ও কত তার উপহার এনেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা এ বীণায় যে বহু বিচিত্র সুরের তার উপহার এনেছে, বাঙালির সে সৌভাগ্য আজ স্মরণ করার দিন।

স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির মনে ঔৎসুক্য জন্মেছে পৃথিবীর নানা ভাষায় প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির বিচার করতে। অল্প কয়েকজন বাঙালি রসজ্ঞ ও সমালোচক এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এবং আশা করা যায় নানা ভাষার কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত নিবিড় হবে, সে আলোচনা তত গভীরতর হতে থাকবে। নানা দেশের কাব্যের বিচার ও মূল্যায়ন আমরা নিজের বোধ ও রসজ্ঞতা দিয়ে করব, ভিন্নদেশি সমালোচকের বাক্য ও বিচার চরম বলে মেনে কাজ সারব না। পৃথিবীর যেগুলি কালজয়ী কাব্যসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির বিচার তাদের তুলনায়। কোনও কিছু একটু নূতনের স্বাদ পেলেই নবীন কাব্য ও তার কবিকে শ্রেষ্ঠ কাব্য ও কবি বলে প্রচারের 'টপিক্যাল' মননশীলতা ও রসজ্ঞতার ফ্যাশন মারাত্মক। বড়-ছোট, সাময়িক ও চিরকালীনের ভেদজ্ঞান সেখানে লোপ পায়। কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি যেন নূতন নূতন কলের সৃষ্টি! পরবর্তী কল তার কর্মদক্ষতায় পূর্ববর্তী কলকে বাতিল করে, তার শুধু ঐতিহাসিক মূল্য অবশিষ্ট রাখে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টির বিচারে আমাদের আর এক বাধা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উপর বাঙালির অন্তহীন ও অসম্ভব দাবি। আমাদের কোনও কোনও পণ্ডিত-সমালোচক আড়ম্বরের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাকবেথ'-এর মতো নাটক লিখতে পারতেন না, যেন শেকসপিয়র 'চিত্রাঙ্গদা'-র মতো কাব্য রচনা করতে পারতেন। পৃথিবীর সমস্ত মহাকবির কাব্যের সমস্ত গুণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নেই। যেন থাকা উচিত ছিল, কিন্তু যখন নেই সেটা তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের লাঘব। রবীন্দ্রনাথ যে এক কবিতায় বলেছেন, তিনি জানেন তাঁর কবিতা নানা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী নয়, সেটা যেন মহাকবির মনের এক বিচিত্র অভাববোধের প্রকাশ নয়, নিজের কাব্যসৃষ্টির বিরূপ ও সত্য সমালোচনা।

কিন্তু বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাদের ভাষার মহাকবি ও মহাসাহিত্যিক নন। বিগত একশো বছরে বাঙালির মন ও চিন্তা যে আকার নিয়ে গড়ে উঠেছে তার এক অতি বড় অংশ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাবে ঘটেছে। আমাদের বাংলা ভাষা ও তার গড়নের চিন্তা, কাব্য ও তার ছন্দ ও রীতির চিন্তা, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক. অর্থনৈতিক, শিক্ষার লক্ষ্য ও তার পদ্ধতি ও উপায়ের চিন্তা, পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের চিন্তা— সব কিছু রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী বিরাট প্রতিভার স্পর্শে মূর্তি ও প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমরা মুখে যা বলি, লেখায় যা লিখি, তার কত ভাগ পদ ও উপকরণ ববীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে এসেছে ভেবে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আমাদেব দেশের আকাশ, তাতে রৌদ্র মেঘের খেলা, দেশের তরু-লতা-শস্যের শ্যামলতা, তার ঋতু-বৈচিত্র্য, এ কি আজ আমরা কেবল নিজের চোখে দেখছি? মহাকবির দৃষ্টি ও কল্পনা সে দেখায় কতখানি জুড়ে আছে?

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ও বিরাট প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে অতি অল্প প্রতিভাধরের জন্ম হয়েছে। এ প্রতিভার মহাভার তিনি অতি সহজেই বহন করেছেন, প্রতিভা তাঁর জীবনের কোনওদিকে শুষ্কতা ও অপূর্ণতা আনেনি। প্রতিভা এক বিশেষ দিকে মনের প্রবণতা ও সৃষ্টির ক্ষমতা। তার দাবি মেটাতে মনের অন্য বহুদিকের উপর টান পড়ে এবং জীবনে অসামঞ্জস্য আনে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিরাট ভাণ্ডার থেকে একদিকের প্রয়োজনে যতই ব্যয় হোক, অন্য বহুদিকের প্রয়োজনের জন্য সে ভাণ্ডার পূর্ণই থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধরের অসামঞ্জস্যহীন পরিপূর্ণ জীবন ইতিহাসের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালির ঋণ ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলেন— যার মধ্যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের অন্তরঙ্গতার একটু ছোঁয়া আছে। কিন্তু অতি ব্যাপক অর্থে তিনি আমাদেব সকলের গুরু। চোখে জ্ঞানের অঞ্জন দিয়ে তিনি আমাদের বোধি ও অনুভূতিকে মোহ থেকে মুক্ত করেছেন। রসের অঞ্জন দিয়ে আমাদের আনন্দকে কলুষহীন মহানন্দে উত্তীর্ণ করেছেন।

শনিবাবের চিঠি, ববীন্দ্র-সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৭

রবীন্দ্রনাথ

কবি সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন, 'জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব।' হয়তো বা সেদিন জগৎ-সভায় এমনধারা গর্ব দেখাবার একটা তাগিদ ছিল। পরাধীন জাতি। যে দূরদেশি জাতির অধীন, তাদের গোষ্ঠী কেবল অস্ত্রবলে ও যুদ্ধকৌশলে প্রবল নয়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কাব্যে সাহিত্যে, সচল মনের বহুমুখী চেষ্টা ও বিচিত্র সৃষ্টিতে সভ্যতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর যুগের প্রবর্তক। এমন পরাধীনতার মধ্যে প্রাচীন সভ্য ও সভ্যতাভিমানী জাতির আত্মসম্মান রক্ষা সহজ নয়। কেবল পূর্ব-পিতামহদের জ্ঞানগরিমার ইতিকথায় নিজের কাছেও মুখরক্ষা হয় না। আবার সে ইতিকথার বেশির ভাগ ওই বিদেশি গোষ্ঠীব লোকদের প্রশংসাপত্রের অনুলিপি।

মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য।

এমন সংকটে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য-প্রতিভাকে আমরা আত্মসম্মান বাঁচাবার দুর্গের মতো ব্যবহার করেছি। পশ্চিম সভ্যজগৎকে ডেকে বলেছি, আমরা পিছিয়ে-পড়া পরাধীন জাতি; কিন্তু তার মধ্যেও দেখ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর সমতুল্য সাহিত্যস্রষ্টা তোমাদের নব ইউরোপেও ক'জন জন্মেছে? সেই রবীন্দ্রনাথের এক কাব্যকে যখন ইউরোপের বিখ্যাত জহুরি সমিতি বহুত সাচ্চা বলে ঘোষণা করল তখন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে জাতির আনন্দ-উল্লাস আমাদের অবস্থায় অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কবির চোখে অশোভন লেগেছিল। নোবেল প্রাইজ যে কাব্যবিচারের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয় সে সরল সত্য তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যে কবি বিদেশের ছাপ দেখে তার স্বভাষাভাষীরা তা চিনতে পারল। সন্দেহের কারণ ছিল। এ আনন্দ-উৎসবে এমন কিছু নামজাদা লোক নেতৃত্ব করেছিলেন যাঁরা নিঃসন্দেহ বিলাতি ছাপ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশি কবিকে সম্মান দেখাতে সাহসী হয়েছিলেন। কিন্তু স্পর্শকাতর কবির মন দেশবাসীর উপর সুবিচার করেনি। রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হলে বাঙালির পক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কবিকে যে অভিনন্দন দিয়েছিল তাতে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালির মনের মর্মকথা প্রকাশ করেছিলেন—

> কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের

নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

তখন নোবেল প্রাইজের কোনও কথা ছিল না। বাঙালি সভ্যপশ্চিমের বিচার-নিরপেক্ষই বুঝেছিল পৃথিবীর লিরিক-কবি-সভায় তিনি মহাকবি।

ভারতবর্ষ বিদেশি রাজশাসনের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন আমাদের দূর হয়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের দরজায় অনেক সভ্যজাতি ঘা দিচ্ছে। দুশো-আড়াইশো বছর যে সব খ্রিস্টান শ্বেতজাতি অবাধে অন্য সকলকে মন্থন করেছে তাদেরও অনেকে আমাদের বাহবা দিচ্ছে। যা বলছে তার ভাবার্থ, 'তোমাদের দেশকে আধুনিক করে গড়ার চেষ্টাকে প্রশংসা করতে হয়। আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-টাকা ধার নিয়ে লেগে থাকলে চাই-কি অল্পদিনেই আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।' নির্বোধ না হলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ সব বাহবা-বাক্যের পিছনে স্বার্থের তাগিদ রয়েছে। আমরা দুর্বল গরিব জাতি, কিন্তু আমরা প্রকাণ্ড জনসংঘ। হাতে থাকলে বর্তমানের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কুস্তিতে সুবিধার সম্ভাবনা। নইলে স্বাধীনতার কয় বছরে বিদ্যাবুদ্ধি ও সৃষ্টিক্ষমতার আমরা এমন কিছু পরিচয় দিইনি, যাতে এ সব জাতির মনে হতে পারে যে আমরা তাদের সমকক্ষ, কি আশু সমকক্ষ হতে চলেছি। সেইজন্য পরাধীন ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে তারা স্বীকার করেছিল, সুযোগ পেলে ও সুযোগ খুঁজে আমরা তাদের সে

কথা স্মরণ করিয়ে দিই। আর সেইজন্যই মার্কিন দেশের চতুর্থ শ্রেণির পদ্যলেখক সে দেশে রবীন্দ্রনাথের 'স্টক' কেমন নেমে গেছে, ওয়াল স্ট্রিটের দর ওঠানামার কায়দায় যখন তার বর্ণনা করে, আমরা খবরের কাগজে তার প্রতিবাদ প্রয়োজন মনে করি। এক প্রচারের উত্তর অন্য প্রচারে দিতে চাই। আবার স্বাধীন ভারতবর্ষে অ-বাংলাভাষী জাতিদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে প্রচারের এক নূতন তাগিদ দেখা দিয়েছে। ইংরেজের ভারতবর্ষ ত্যাগের আংশিক মূল্য আমরা দিয়েছি বাংলাদেশের তিন ভাগের দু'ভাগ কেটে দিয়ে। স্বাধীনতার ক-বছরের অভিজ্ঞতায় আমাদের ধারণা হয়েছে যে স্বল্পাবশিষ্ট বাঙালি জাতির ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা নেই। তাদের অবহেলা করলে কারও কোনও ক্ষতি হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্ন বাঙালির এক রাজ্যে ঐক্যের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করলে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নেই। এই বিপাকে আমরা অন্য ভারতবাসীদের স্মরণ করাবার চেষ্টা করছি বাঙালির অনতিকালপূর্বের রাষ্ট্রচেষ্টার ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য লাঞ্ছনা ও দুঃখবরণের দীর্ঘ ইতিহাস। ভুলে গিয়েছি যে পলিটিকসের পাঞ্জা লড়ায় ভূত ও ভবিষ্যৎ নেই, আছে মাত্র বর্তমান। আর যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য আমাদের সবচেয়ে গর্বের বস্তু, উৎসাহী হিন্দি প্রচারকের'প্রচণ্ড আস্ফালনে তার ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা শঙ্কিত হয়েছি। সংবিধানের কেন্দ্রীয় রাজকাজের রাষ্ট্রভাষাকে এরা জবরদস্তি প্রচার করছে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা বলে। অর্থাৎ হিন্দিভাষাই হওয়া উচিত সকল ভারতবাসীর ব্যবহারের একমাত্র ভাষা। অবস্থাগতিকে এবং অ-হিন্দিভাষীদের দুর্বুদ্ধিতে যদি তা সম্ভব নাও হয়, তবে হিন্দি ভাষা হতেই হবে সকল শিক্ষিত শিষ্ট ভারতবাসীর প্রধান ভাষা। ভারতবর্ষের আর সব ভাষাকে এ ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে, ভাষার উৎকর্ষের জন্য এবং জাতীয় ঐক্যের তাগিদে। উত্তরে আমরা শোনাচ্ছি যে হিন্দি অপরিণত অপক্ক ভাষা। ওর আধুনিক সাহিত্য অকিঞ্চিৎকর। কয়েকশো বছর পূর্বের দু'-চার জন ভক্ত কবির কবিতা সে দৈন্য ঢাকতে পারে না। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রতিভাশালী লেখকপরম্পরায় এবং আজ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রতিভায় যে স্তরে পৌঁছেছে তার তুলনা খুঁজতে হয় সমুদ্রপারের সভ্যজাতিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে। বাঙালির হিন্দি ভাষা ও হিন্দি সাহিত্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ সংস্কৃতির স্তরে অনেক সিঁড়ি নীচে নামা। এ উত্তরে মনের ঝাল কিছু মেটে, আর কোনও ফল হয় না। কারণ ভয় ও ক্রোধের সম্মোহে আমাদের বিভ্রম জন্মেছে যে এ তর্ক বুঝি ভাষা ও সাহিত্যের রুচিবোধের তর্ক। 'অনেকবাহূদরোবক্ত্রনেত্র' জনসংঘের বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের সম্পর্ক নেই। এ দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের নামের দোহাই সাহিত্যকে হেয় করা, ও মহাকবির অপমান।

২

রবীন্দ্রনাথকে প্রচারের প্রলোভন আমাদের ত্যাগ করতে হবে, কি বিদেশে কি ভারতবর্ষে। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উৎসাহের আতিশয্যে কবির অপ্রসন্নতা একটা দিগ্‌দর্শন। যদি আমরা সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টিতে বুঝে থাকি আধুনিক পৃথিবীতে যে দু'-তিন-পাঁচজন মহাকবি জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সেই মহাকবিদের একজনের সৃষ্টি, তবে অপেক্ষা করতে দোষ কী? আশা করব এমন দিন আসবে যখন এক ভাষার মহাকবির কাব্য সব ভাষার কাব্যরসিকদের রসাবিষ্ট করবে। বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরকে কোলে নিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে না। মানুষের বড় সৃষ্টিকে বিদেশি বলে যারা অগ্রাহ্য করে বঞ্চিত হয় তারাই। বড় সৃষ্টি তাতে ছোট হয় না। 'ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ।'

অসম্পূর্ণ

দ্র রবীন্দ্রায়ণ১/ পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

মহাত্মা

মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ কখনও এমন মানুষের আবির্ভাব হয় যাঁর জীবন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের ধারণা ও অনুভূতিকে প্রচলিত স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে উপনীত করে। পশুর বংশে মানুষের জন্ম। এবং আদিম মানুষ বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক গড়নের বিশেষত্ব ছাড়া যে উঁচু শ্রেণির পশু থেকে আরও কিছুতে খুব ভিন্ন রকমের ছিল তা অনুমান করার কারণ নাই। মনের যেসব প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে সভ্য মানুষ সংক্ষেপে বলে হৃদয়বৃত্তি, তার অভাব দলবদ্ধ পশু ও দলবদ্ধ আদিম মানুষে সমান ছিল। নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনে যেসব সহজাত হৃদয়বৃত্তি, যেমন শিশু-অপত্যপরায়ণতা, কি দলের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধ অবৈরতা আদিম মানুষের সমাজে অবশ্য ছিল। পশুর সমাজেও ছিল এবং আছে। তার বাইরে ছিল অবাধ নিষ্ঠুরতা— জীবনের প্রয়োজনে প্রকৃতির দান। এবং এ প্রয়োজনে প্রকৃতি যা দেয় তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত করেই দেয়। তার বুদ্ধির সঙ্গে যোগ হয়ে মানুষের কৌশলী ক্রূরতা পশুর উগ্র ক্রূরতার চেয়ে ভীষণতর ছিল। আদিম মানুষের এই সমাজ দেশে দেশে সভ্য সমাজে পরিণত হয়েছে বহু হাজার বছরে। জৈবিক নিষ্ঠুরতাকে মানুষ দমন করতে চেয়েছে গোপন করতে চেয়েছে, রূপান্তর করতে চেয়েছে বহু উপায়ে। মানুষে মানুষে শুধু অবৈধ ভাব নয়, মৈত্রী ও প্রীতি মনে জাগাতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত বলেছে 'মা হিংসীঃ সর্বভূতানাম্'— কোনও প্রাণীকেই হিংসা করবে না, সকল প্রাণীর সঙ্গেই সম্পর্ক মৈত্রী ও প্রীতি সম্পর্ক।

কেমন করে সম্ভব হল? ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন এসেছে, অনেক হাজার বছর ধরে। কিন্তু সুদীর্ঘকালে আদিম মানব সমাজের অবশ্যম্ভাবী অপৌরুষেয় পরিণতি এ নয়। এ পরিবর্তন এসেছে একদল অসাধারণ মানুষের জীবন ও কর্মের ফলে। যখন কোনও সমাজের ধর্মবুদ্ধি অন্য সামাজিকের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধির ধর্মবুদ্ধির মান এক গ্রাম উপরে উঠে তার মূলে থাকে সে সমাজের কোনও অসাধারণ মানুষের কল্পনা, কর্ম ও জীবন। ধর্ম ও কর্তব্যের নূতন আদর্শ তাঁর মনেই উদয় হয় এবং তাঁর কথায়, কর্মে ও জীবনে রূপ নেয়। এ নূতন আদর্শকে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনে কতক নিতে পারে, কতক পারে না। কখনও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। গতানুগতিকতার শত্রু ও শান্তিঘাতী এ আদর্শকে পিষে মারতে চায়। কিন্তু এ নূতন আদর্শ একবার প্রকট হলে পুরাতন জীবনের দ্বিধাহীন অঙ্গীকার অসম্ভব হয়। ধীরে বা ত্বরায় এ আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব সমাজের বহুজন মেনে নেয়, সে আদর্শ পালনের চেষ্টায় ত্রুটি যতই থাকুক। নানা সমাজের এইসব অসাধারণ মানুষের পরম্পরা আদিম নিষ্ঠুরতাকে ঘুচিয়ে সমাজকে ধাপে ধাপে নিয়ে গেছে মৈত্রী ও প্রীতির পথে; সমাজের মনে জাগিয়েছে নূতন

নূতন ধর্মবোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি। মানুষের সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন সেসব অসাধারণ মানুষের নাম ও পরিচয় আমরা কতক জানি। মহান তাঁদের আত্মা— প্রসারের প্রাচুর্যে ও অনুভূতির গভীরতায়। তাঁরা মহাত্মা। মহাত্মা গান্ধী এই অসাধারণ মানুষ পরম্পরার একজন। সেই বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর লৌকিক বংশ পরিচয় অবান্তর।

সে যুগ মহাত্মা গান্ধীর জন্মকাল ও কর্মকাল সকল সভ্য সমাজে স্বীকৃত হয়েছে। তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে নিজেকে যেমন ভালবাসো; তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ মৈত্রীর সম্বন্ধ। এ আদর্শ পালনে সভ্য মানুষের বিচ্যুতির অন্ত নেই। কিন্তু এ আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার স্বাভাবিক অবস্থায় অল্প লোকেই করে। একে সম্পূর্ণ পালনের অসামর্থ্যকে স্বীকার করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী টানকে প্রতিরোধের ইচ্ছার দুর্বলতার ফল বলেই। কিন্তু এ যুগে মানুষে মানুষে সম্বন্ধের যে আদর্শের দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে এবং মানুষকে যা ভয়চকিত করছে, সে হচ্ছে একদল মানুষের সঙ্গে অন্যদল মানুষের সম্বন্ধের আদর্শ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নয়, দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধের আদর্শ। মানুষ নানা দল বাঁধতে বাধ্য হয়েছে— গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, ধর্মমণ্ডল, ধর্মমহামণ্ডল পৃথিবীতে টিকে থাকার প্রয়োজনে, পশুর জীবনকে সভ্য মানুষের জীবনে পরিণতির জন্যে। কিন্তু দাম না দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না। দল বাঁধা অর্থই অন্য দল থেকে পৃথক হওয়া, তাকে দূরে রাখা। প্রতি দলের মানুষের দলের মধ্যে সম্বন্ধের আদর্শ মৈত্রী। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের সম্বন্ধের আদর্শ কি? আমাদের দেশের ধর্ম শাস্ত্রকার সর্বদলের আচরিত এ আদর্শ সরল কথায় প্রকাশ করেছেন,— স্বরাষ্ট্রে হবে ন্যায়বৃত্ত আর পররাষ্ট্রকে করবে পীড়ন। "স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্‌ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু"। ভাষ্যকার বলে দিয়েছেন শত্রু অর্থ পররাষ্ট্র। দলের সঙ্গে দলের এই শত্রুতাকে অবলম্বন করে কবিরা মহাকাব্য রচনা করেছেন, চারণেরা বীরগাথা গেয়েছেন, ঐতিহাসিক ইতিহাস লিখেছেন, জনসাধারণ বিজয়ীকে জয়মাল্য পরিয়েছে, তাকে মাথার মুকুট করে রেখেছে। মানুষের আদিম নিষ্ঠুরতার এই রূপান্তরকে পরম সম্মানের আসনে মানুষ বসিয়েছে।

কিন্তু এই কবিত্ব, গাথা ও জয়ধ্বনির মধ্যে আজকের মানুষকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি দলের সঙ্গে দলের দূরত্বকে কমিয়ে কমিয়ে পৃথিবীতে অতি ছোট করে এনেছে এবং অনেক দলের হাতেই এমন মারণ অস্ত্র দিয়েছে যে, যুধ্যমান দুই দলের পরস্পর পরস্পরকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উপায় কি? নানা দলের যারা রাষ্ট্রনেতা তারা পরামর্শ সভা ডাকছেন। জটিল নিয়ম ও শৃঙ্খলার সমিতি গড়ছেন যাতে দলের সঙ্গে দলের স্বার্থের বিরোধ অস্ত্র সংঘাতের সীমায় যেয়ে না পড়ে। তার ভীষণ পরিণামের কথা সকলে সকলকে বোঝাচ্ছেন। নানা দলের এক বড় দল নানা দলের অন্য বড় দলকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রচণ্ড শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে শাসাচ্ছেন। ভয়ের ভয়ে যাতে সব দল শান্তি রক্ষা করে। এই সমস্যায় মহাত্মা আনলেন দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধের নূতন আদর্শ। যে সম্বন্ধ শত্রুতার নয়, সর্বনাশের ভয়ে অবৈরতার নয়, যে সম্বন্ধ মৈত্রীর সম্বন্ধ। দূরদর্শী স্বার্থের হিসাব নিকাশের সম্বন্ধ নয়, হৃদয়ের প্রীতির সম্বন্ধ। তত্ত্ব হিসাবে এ আদর্শ হয়তো একেবারে নূতন নয়। কিন্তু আদর্শ যতদিন তত্ত্বমাত্র থাকে ততদিন তা থাকে

দার্শনিকের চিন্তার বস্তু, সাহিত্যিকের সাহিত্যের উপাদান। মানুষের ইচ্ছাকে তখনই তা প্রভাবিত করে যখন কোনও অসাধারণ মানুষের জীবনে ও কর্মে তা রূপ নেয়। এ আদর্শ মূর্তি নিয়েছে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সাধনায়, তাঁর প্রতি কর্মানুষ্ঠানে। বুদ্ধিমান এ আদর্শকে বলেছে অব্যাবহারিক। আজকের বাস্তব জগতে প্রয়োগের অযোগ্য। অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ এ আদর্শ হচ্ছে সভ্যতার এক স্তর থেকে মানুষকে সভ্যতার অন্য স্তরে ওঠার চেষ্টার আহ্বান। নিশ্চয়ই পূর্ব পূর্ব কালে যখন মহাত্মারা সামাজিকের সঙ্গে সামাজিকের সম্বন্ধের অবৈরভাব বাহ্য আচরণকে অন্তরের মৈত্রীতে পরিণতির আদর্শের কথা বলেছেন তখন বুদ্ধিমানেরা তাকে বলেছেন অবাস্তব। মানুষের সমাজে যা কিছু নূতন এসেছে আসার পূর্বে তা ছিল অবাস্তব। বস্তুরূপে তার অস্তিত্ব ছিল না। মহাপুরুষদের কল্পনায় ও ধ্যানে মাত্র তারা ছিল। কিন্তু বর্তমানের চেয়ে মানুষে মানুষে সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠতর আদর্শ যখন মহামানুষের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাহাকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আর শান্তি পায় না। মহাত্মা গান্ধী দলের সঙ্গে দলের যে নূতন আদর্শকে তাঁর জীবনে রূপ দিয়েছেন তাকে অসম্ভব বলে দূরে রাখা মানুষের আর সম্ভব নয়। মানুষের মনে ও ইচ্ছায় তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। সে আদর্শে পৌঁছিবার অক্ষমতা ও তা থেকে বিচ্যুতি মানুষের মনকে পীড়া দিতে থাকবে।

মহাত্মা গান্ধী মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সম্পর্কে নানা উপলক্ষে একটা কথা বলেছেন— Change of heart, মনের অনুভূতিকে নূতন গড়ন দেওয়া। যাঁরা মহাত্মা মহামানব সভ্যতার ইতিহাসে এইটি তাঁহাদেরই দান। বাহ্যিক কর্তব্যনিষ্ঠায় ও সম্যক আচরণে তাঁদের তৃপ্তি নেই। তাঁরা চান মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করতে যাতে কর্তব্যপালন ও সদাচার হয় মনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। বাইরের কোনও শক্তির সমাজের কি রাষ্ট্রের বাধ্যকর নিয়মের অনুবর্তিতা নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিগত যে অহিংস্র আচরণ আজ সকল সভ্য সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় মোটের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটা বড় কারণ রাষ্ট্রের শাসন, ব্যতিক্রমে দণ্ডময়। আমাদের ধর্মসংহিতাকার রাষ্ট্রের এই অতন্দ্র উদ্যত দণ্ডকে স্তুতি করেছেন। ব্রহ্মতেজোময় এই দণ্ডের ভয়েই লোকে স্বধর্ম থেকে বিচলিত হয় না। এই দণ্ড না থাকলে বলবান দুর্বলকে পুড়িয়ে মারত, শূলে যেমন মাছ পোড়ায়। এই দণ্ডই সকলকে সুপথে রাখে, কারণ স্বভাবতই শুচি এরকম মানুষ দুর্লভ। "সর্ব্বোদণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্ণরঃ।" পৃথিবীর যাঁরা মহাপুরুষ মহাত্মা তাঁরা চেয়েছেন মানুষের মনকে এই স্বভাবশুচিতার দীক্ষা দিতে। তাঁদের জীবন ও কর্মের ফলে যদি সমাজের বহুমানুষের মধ্যে চিত্তের এই শুচিতা অল্পবিস্তর না আসত তবে রাষ্ট্রের দণ্ড ব্রহ্মতেজে তৈরি হলেও সামাজিক মানুষকে অহিংস্র পথে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হত মহাত্মা গান্ধী মানুষকে এই স্বভাব-শুচিতায় দীক্ষা দিতে চেয়েছেন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই নয়, দলের সঙ্গে দলের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে। মানুষের উপর এত বড় দাবি ইতিপূর্বে হয়নি, মানুষের স্বভাবের উপর এত বড় ভরসা পূর্বে কেউ পোষণ করেনি। এ আদর্শের বাস্তব সম্ভাবনার পরীক্ষা মানুষের ইতিহাসে অবশ্য হবে। কিন্তু সে পরীক্ষায় কিছুটা উত্তীর্ণ না হলে কোনও বিশ্ব-সমিতি, কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলার কৌশল, কোনও সর্বনাশের ভয় দলের সঙ্গে দলের সংঘর্ষ, যার পরিণাম আজ সবাই জানে জিতজেতা নির্বিশেষে ভয়াবহ, তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

মহাত্মা জন্মেছেন ভারতবর্ষে। তাঁর প্রথম জীবন ছাড়া বাকি জীবনের কর্মস্থল এই ভারতবর্ষ। বিদেশির শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ বড় কাজ। মহাত্মা ইংরেজকে বলেছেন— Quit India। কিন্তু তাকে ভারতবর্ষ ছাড়তে যে বলের প্রয়োগ করেছেন, যে পথ ভারতবাসীকে দেখিয়েছেন, তা সহজেই মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি কতটা মহাত্মার প্রদর্শিত পথে চলার ফল, কতটা অন্য নানা অবস্থার ষড়যন্ত্রের ফল, কতটা অধীন দেশ বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যেসব উপায় প্রয়োগ করে তার প্রয়োগের ফল— এ নিয়ে অনেক তর্কের অবসর আছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণের সূক্ষ্ম বিচার নানা দেশের ভবিষ্য ঐতিহাসিকেরা অবশ্য করবেন। এবং বহুরকম পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন। কিন্তু এক বিষয়ে তর্কের অবসর নেই। সে হচ্ছে এ ব্যাপারে মহাত্মার নিজের আদর্শ-সম্বন্ধে। তিনি বিজিত জাতির লোক, বলদর্পিত জেতাকে বলেছেন দেশ ছেড়ে যেতে। কিন্তু ইংরেজ জাতির উপর তাঁর ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, তাঁর অহিত কামনা নেই। অক্রোধ দিয়ে ক্রোধকে জয় করার ব্যক্তিগত নীতিকে তিনি সবচেয়ে কঠিন রাষ্ট্রনীতিতে প্রয়োগ করেছেন— পরাধীন দেশের স্বাধীনতাহারী দেশের সঙ্গে মুক্তির যুদ্ধে। এর চেয়ে অসম্ভব ও অবাস্তব আর কী হতে পারে? কিন্তু এ অবাস্তবকে আমরা দেখেছি চোখের সামনে মূর্তি নিতে— মুক্তি-যুদ্ধের স্বয়ং সেনাপতির মধ্যে।

মহাত্মার ছোট বড় সকল কাজের মূলমন্ত্র দলের গণ্ডি ভাঙার মন্ত্র, ছোট বড় সকল গণ্ডি। রাষ্ট্রের গণ্ডি, ধর্মের গণ্ডি, বর্ণের গণ্ডি, ধনবৈষম্যের গণ্ডি, বলী-দুর্বলের গণ্ডি। গণ্ডি দূর হলেই থাকে মানুষ, গণ্ডির আবরণ মুক্ত ঠিক অন্য গণ্ডির মানুষের মতো একই মানুষ, যার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ— মৈত্রীর ও প্রীতির সম্বন্ধ। মহাত্মার রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধনতন্ত্র এই গণ্ডিমুক্ত মানুষকে ঘিরে। কোন নীতির কী ফল ফলবে গণ্ডিনিরপেক্ষ মানুষের জীবনে তাই দিয়ে তার বিচার। তত্ত্বকথা দিয়ে নয়, জনসমষ্টি নাম দিয়ে, দেশ নাম দিয়ে কল্পনাকে মানুষের জায়গায় দাঁড় করিয়ে নয়। মানুষ সত্য, তাকে ঢেকে তার উপরে দল বলে কোনও বড় সত্য নেই।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন। আমরা ভারতবাসী তাঁর স্বদেশি। আমাদের বহু পুণ্যের ফল, আমরা তাঁকে চোখে দেখেছি, তাঁর কথা কানে শুনেছি। হাজার বছর পরের লোক আমাদের এ সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করবে। কিন্তু মহাত্মার ভারতবর্ষে জন্ম একটা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ঘটনা মাত্র। মানুষের সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। যেখানে তাঁর মৈত্রীর আদর্শ মানুষকে অনুপ্রেরণা দেবে, সভ্যতাকে এক ধাপ উঁচুতে তুলবে সেইখানেই তাঁর যথার্থ-স্বদেশ। তিনি ভারতবাসী ছিলেন বলে ভারতবাসীর তাঁর উপর স্বতন্ত্র দাবি নেই। পৃথিবীর সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দেখাই যথার্থ দেখা। আমাদের নিজের ঘরের কোনও ঘরোয়া মাপে তাঁকে মাপার চেষ্টা করে নিজেরা যেন ছোট না হই।

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

সংগঠন। ১ম বর্ষ। দশম সংখ্যা। ১৩৫৪

গান্ধীজি

স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে গান্ধীজির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। মহাত্মার চরিত্রের উত্তুঙ্গ মহত্ত্ব, তাঁর অলৌকিক বীর্য ও মৈত্রীর কাছে অন্য সকলের মতো বাঙালি মাথা নুইয়েছে। মানুষের ও তার সামাজিক জীবনের যে আদর্শ মহাত্মার জীবনে কর্মে ও কথায় পরিস্ফুট তার ডাকে বাঙালি অনেকবার বড় রকম সাড়া দিয়েছে। কিন্তু সে আদর্শের কল্পনা তার মনকে কানায় কানায় ভরে দেয়নি। বিচিত্র জীবনের পরিপূর্ণতার যে আনন্দ সে আদর্শে বাঙালি তার স্বাদ পায়নি। ও আদর্শের আহ্বান উপেক্ষা করা যে কাপুরুষতা বাঙালি মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু সে আহ্বান কর্তব্যের আহ্বান, বহুমুখী জীবনের বর্ণগন্ধময় অহৈতুক আনন্দের আকর্ষণ নয়।

যাঁরা বলবেন গান্ধীজি কাজের লোক, কর্মমহাযোগী, প্রকৃত কর্মীর মতো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের যা উপায় তাতে তাঁর একাগ্র মন নিবদ্ধ, তার যা অবান্তর সে চিন্তায় তিনি চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাননি, তাঁরা মহাত্মার কাজকে দেখেছেন অত্যন্ত বাইরে থেকে, তার মর্মকথা উপলব্ধি করেননি। সন্দেহ নেই গান্ধীজি মহাকর্মযোগী; তাঁর জীবনব্যাপী বহু বিচিত্র কর্মের অপ্রমত্ত অনুষ্ঠানের তুলনা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর সকল কর্মের এক লক্ষ্য মানুষ, ব্যক্তিগত মানুষ। মহাত্মার রাষ্ট্রনীতি সমাজচিন্তা ধনতন্ত্র শিক্ষাতত্ত্ব সব-কিছুতে এক মাপকাঠি; মানুষের, ব্যক্তিগত মানুষের, চরিত্রের উপর কোন ব্যবস্থার কী ফল ফলবে তাই দিয়ে সকল ব্যবস্থার বিচার। যে ব্যবস্থা চরিত্রের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করবে মনে হয়েছে তাকে তিনি নির্মম হয়ে বর্জন করেছেন, যতই আশুফলপ্রদ সে ব্যবস্থা হোক-না কেন। মানুষের প্রয়োজনে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক প্রয়োগের যে তিনি বিরোধী ছিলেন তার মূল এইখানে। সে প্রয়োগে মানুষের দারিদ্র্য কিছু কমবে, যে মানুষকে তিনি অসীম ভালবাসতেন তার দুঃখকষ্টের কিছু লাঘব হবে সে কথা তিনি অবশ্য জানতেন। কিন্তু চরিত্রের অমৃতকে যা আবিল করে তা থেকে বঞ্চিত করাই যে প্রিয়জনকে বাঁচানো সে সম্বন্ধে তাঁর চিত্ত দৃঢ় ছিল। বৃহৎ রাষ্ট্র-আন্দোলন আরম্ভ করে তিনি মধ্যপথে থামিয়ে দিয়েছেন, যখনই দেখেছেন তাঁর ডাকে যারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তাদের চরিত্রের উপর ফল হচ্ছে অমনুষ্যোচিত। বলেছেন, তাঁর ভুল হয়েছিল, পর্বতপ্রমাণ ভুল। ভুল আর কিছু নয়; মানুষের চরিত্রের উপর যে ভরসা তিনি রেখেছিলেন মানুষ তার উপযুক্ত হতে পারেনি। তাদের সকল ত্রুটি তিনি নিজের ত্রুটি বলে স্বীকার করেছেন। ফললোভী কোন কর্মীমাত্রের এমন সাধ্য ও সাহস হবে?

যে রাষ্ট্রনায়কদের বলে 'পলিটিশ্যান', তাঁদের সঙ্গে মহাত্মার রাষ্ট্রনেতৃত্বের প্রভেদ এইজন্য একেবারে মূলগত। তাঁদের কথা বলছি না— রাষ্ট্রের কাজ আর হিত যাঁদের উপায় ও

উপলক্ষ, আসলে নিজের উন্নতি ও প্রতিপত্তিই প্রধান লক্ষ্য, ইংরেজিতে যাদের নাম 'কেরিয়ারিস্ট'; সেই পলিটিশ্যানদের কথাই বলছি— নিজের কাজ দিয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল করতে পারবেন বিশ্বাসেই যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব কামনা ও অনুসরণ করেন। অবশ্য মানুষের জটিল মনোবৃত্তিতে রাষ্ট্রের হিত ও নিজের প্রতিপত্তি অনেক সময় জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অভেদে মিশে যায়। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত পলিটিশ্যান তাঁদের কাছে নিজের প্রতিপত্তি মোটের উপর গৌণ, সকল রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যমের উপায়মাত্র। যেসব বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলকর মনে করেন সেসকল বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্রে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন পলিটিশ্যানেরা। এ চেষ্টায় তাঁরা ধরে নেন যে, সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের, চরিত্রের যা মৌলিক গড়ন তা ওই রকমই থাকবে, অন্তত বর্তমানে ও নিকট ভবিষ্যতে। অত্যন্ত মিশ্র গড়ন; ভালমন্দ, ঔদার্য-নীচতা, দয়া-নিষ্ঠুরতা, সাহস-ভীরুতা, বুদ্ধি-নির্বুদ্ধির বর্ণসংকর। বিশেষ বিপন্মুক্তি কি ভাবের উত্তেজনায় এ চরিত্রের সাময়িক পরিবর্তন ঘটে। যা বড় তা প্রকট ও ক্রিয়াশীল হয়, যা ছোট তা চাপা থাকে। অবস্থার যোগাযোগে দেশের মানুষের মন যখন এর অনুকূল হয় তখন পলিটিশ্যানেরা এর সুযোগ নেন প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে, এ আনুকূল্যকে প্রসার ও তীক্ষ্ণতা দেন বাগ্‌বিভূতির মহা অস্ত্রে। তাঁরা জানেন চোখের জল আর বুকের রক্ত দাবি করলে ভয় না পেয়ে লোকে তখন উৎসাহ পাবে; দশের জন্য নিজেকে বলি দেওয়া মনে হবে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা এ-ও জানেন এ পরিবর্তন সাময়িক। উৎকট প্রয়োজনের টানে এর আকস্মিক আবির্ভাব। সে টান শিথিল হলেই মূল প্রকৃতি নেমে যাবে তার বিমিশ্র সাম্যাবস্থায়। বরং উত্তেজনার অবসাদে সাধারণ স্তর থেকেও কিছুকালের জন্য নেমে যাবে একটু বেশি নীচে। নীচতা নির্বুদ্ধি ভীরুতা স্বার্থান্ধতা কিছুদিনের জন্য স্বাভাবিকের চেয়েও প্রবল থাকবে। মানুষের এই প্রকৃতির স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করা পলিটিশ্যানদের কাজ নয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা যথার্থ বড় তাঁরা সম্ভবত ভরসা করেন যে, তাঁদের প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের ফলে তাঁদের কালে দেশের বেশির ভাগ লোকের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি বিকাশের যা সব বাধা আছে, আর্থিক রাষ্ট্রিক সামাজিক বাধা, তা কতকটা দূর হবে। বোধ্য ও দুর্বোধ্য কারণে যেসব মানুষের চরিত্রে স্থায়ী কাম্য পরিবর্তন আসে তারা শক্তি প্রয়োগের পথ পাবে। এমনধারা গৌণ উপায়েই পলিটিশ্যানেরা চরিত্রের স্থায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। সোজাসুজি সে চেষ্টা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। একসঙ্গে পলিটিশ্যান ও চরিত্র সংস্কারকের কাজ কেবল দুঃসাধ্য নয়, তার ফল যে ভাল হয় না ইতিহাসে তার নজিব আছে।

পলিটিশ্যানের এই পলিটিকস আর গান্ধীজির পলিটিকস দুয়ের প্রস্থানভূমি ভিন্ন। গান্ধীজির পলিটিকসে চারপাশের আগাছা-জঙ্গল কেটে গাছকে বাড়বার সুযোগ দেওয়া, গাছকে বড় করার উপায় নয়। গাছের গোড়ায় এমন সার দিতে হবে, শিকড়কে রস টানার জন্য এমন শক্তিমান করতে হবে, যাতে গাছ আপনি বেড়ে উঠবে, আর তার ঘন ডালপাতার আওতায় আগাছার ঝাড় শুকিয়ে মরবে। মানুষের চরিত্রবিকাশের চেষ্টায় অনুকূল পারিপার্শ্বিকে সামাজিক ও মানসিক কারণের জটিল কার্যকারিতার ধীর গতিতে ভরসা রাখা গান্ধীজির কর্মনীতি নয়। গান্ধীজি চেয়েছেন, মানুষকে এমন প্রভাবের মধ্যে আনতে যার

শক্তিতেই তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়ে উঠবে, পারিপার্শ্বিককে প্রায় উপেক্ষা করে। আর এ পরিবর্তন আসবে দ্রুত। কোনও কোনও মানুষের জীবনে ও চরিত্রে যেমন হঠাৎ পরিবর্তন দেখা যায়, পাপী হয় সাধু, সাংসারিক হয় উদাসীন ভক্ত। তবে এ পরিবর্তন হবে ব্যাপক; দু'-একটি অসাধারণ মানুষের জীবনে ঘটবে না, বহু সাধারণ মানুষের জীবনে ও চরিত্রে দেখা দেবে। পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু এ ফল ফলাতে তার যে পরিবর্তন প্রয়োজন তার পরিমাণ সামান্য। এবং বিকশিতচরিত্র মানুষ নিজের চেষ্টাতেই পারিপার্শ্বিকে এমন পরিবর্তন আনবে যা চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের অনুকূল, শ্রেষ্ঠত্বকে স্থায়ী রাখার উপযোগী। পলিটিশ্যানেরা যে ব্যাপক ও আকস্মিক পরিবর্তনকে কাজে লাগান এ পরিবর্তন সেরকমের নয়। কারণ এ পরিবর্তন হবে স্থায়ী, কোনও বিশেষ কার্যসিদ্ধির সুযোগ ও উপায় নয়, সকল কাজের লক্ষ্য ও ফল।

২

নানা দেশের বহু ধর্মপ্রবর্তক মানুষের চরিত্রে এমনধারা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, তাঁদের ধর্মোপদেশে, ধর্মজীবনের আদর্শে লোককে আকৃষ্ট করে। সে উপদেশ ও আকর্ষণে লোকে সাড়া দিয়েছে। চরিত্রে পরিবর্তন এসেছে; কোথাও স্থায়ী ও গভীর, কোথাও চঞ্চল ও বাহ্যিক। কিন্তু এ-উপদেশ ও আদর্শের লক্ষ্য মানুষের সমগ্র জীবন নয়, জীবনের একটা দিক, যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা 'স্পিরিচুয়াল'। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং তাদের ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে স্বীকার করে তার মধ্যেই মহত্তর ও বিশুদ্ধ জীবনের দিকে এ আদর্শের আহ্বান। এর কোনও আদর্শ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক, লৌকিক ও লোকাতীতের মধ্যে গভীর ভেদরেখা টেনেছে। যা রাষ্ট্রের তার দাবি রাষ্ট্রকে মিটিয়ে দাও, যা ভগবানের তা দাও ভগবানকে। যিশুর চরিতলেখকেরা তাঁর মুখের এই উপদেশে ওই প্রভেদের বাণীই প্রচার করেছেন। কোনও আদর্শ অনুসরণ বা সাংসারিক জীবন যাপন করেও মনকে তা থেকে মুক্ত রেখে অসাংসারিক আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা দিয়েছে। পরমহংসদেবের পাঁকাল মাছের দৃষ্টান্ত, কাদায় বাস করেও গায়ে কাদা না লাগা, আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। এসব আদর্শ মানুষের সামাজিক জীবনকে চরম মূল্য দেয় না। সে জীবনকে হয় এড়িয়ে নয় মাড়িয়ে চলতে হবে, তাকে পাশ কেটে প্রকৃত জীবনে পৌঁছতে হবে, অথবা তার আকর্ষণকে জয়ের চেষ্টায় আধ্যাত্মিক জীবনের মেরুদণ্ডকে সবল করাই হবে তার সার্থকতা। সেইজন্য ধর্মোপদেষ্টারা সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে গড়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। সে ব্যবস্থা যেরকম হোক সংসারের পাঁক তাতে থাকবেই। তাকে নির্মল করার বিফল চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জীবনের সমগ্রতায় প্রসার নেই বলে যদি এ-আদর্শকে বলতে হয় অসম্যকদর্শী, তবে এ-ও স্বীকার করতে হবে যে, এক লক্ষ্যে এর একান্ত নিবদ্ধদৃষ্টি, এর পথের ঋজু সংকীর্ণতাই একে প্রচণ্ড শক্তি ও নিত্যতা দিয়েছে। রাষ্ট্রিক সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে এ আদর্শ স্থির নিষ্কম্প থাকে, ভাঙাগড়ার প্রলয় ও সৃষ্টির আবর্তনে মানুষকে টেনে রাখে।

অনেক লোক আছে এই আদর্শের ডাকেই যারা বড় সাড়া দেয়। সমাজ শরীরের তারাই লবণ, পচন থেকে রক্ষা করাই তাদের কাজ।

৩

এর ব্যতিক্রম আছে। এমন ধর্ম ও ধর্মমত আছে যা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনকেই জাগাতে ও গড়তে চায় না, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়; রাষ্ট্র ও সমাজকে করতে চায় নিজের কুক্ষিগত, বিশেষ ধর্মমতের আদর্শের অনুকূল বিধিনিষেধে এদের বেঁধে দিয়ে। রোমান চার্চের অনুসৃত খ্রিস্টধর্ম এর পরিচিত উদাহরণ। এ ধর্মসংঘে এমন বহু সাধক জন্মেছেন, আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়া কোনও কিছুতে যাঁরা দৃষ্টি দেননি। কিন্তু এ সংঘের যাঁরা গুরু তাঁরা বলেছেন, ধর্ম যখন সকলের উপরে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ হবে তার অধীন; ধর্মের অনুশাসনে এদের চলতে হবে। রাজা হবে সংঘের আজ্ঞাবহ, আর ধর্ম হবে রাজ্যশাসনে রাজার সহায়। ঐহিক রাজদণ্ডের ভয় পারত্রিক যমদণ্ডের ভয়ে দুর্বার হবে। ধর্মের এই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাথলিক সংঘের ধর্মগুরুরা ইউরোপের রাজাদের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই লড়েছেন। কখনও প্রকাণ্ড জিত হয়েছে, কখনও প্রকাণ্ড হার। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের দেশে দেশে জাতীয়-রাজ্যের অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধিতে, আর ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘনে পারলৌকিক দণ্ডের বিশ্বাসহ্রাসে এ চেষ্টার চরম পরাজয় ঘটেছে। ইতিহাস সাক্ষী দেয় ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সমন্বয়চেষ্টায় ধার্মিকদের মনে আধ্যাত্মিক জীবনের আকর্ষণের চেয়ে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের কূটনৈতিক উৎসাহ শতগুণ প্রবল ছিল। আধ্যাত্মিকতা বেঁচে ছিল তাঁদের অবলম্বন করে যাঁরা সংঘচক্র এড়িয়ে সাধকের একনিষ্ঠ জীবন যাপন করতেন। ইউরোপে জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষের নিদারুণতায় সে-মহাদেশের অনেক ভাবুক আজ ধর্মের অভিভাবকতায় এক ধর্মরাষ্ট্রের প্রাচীন আদর্শের দিকে লুব্ধ চোখে তাকাচ্ছেন। যিশুর উপদেশ যা-ই হোক, রোমান সংঘ চেয়েছিল রাষ্ট্রকে ধর্মের কাজে লাগাতে; এরা চাচ্ছেন ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজে লাগাতে। ফল ভিন্ন হবার কারণ নেই।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ার আদর্শ ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের চেয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিল হজরত মহম্মদের প্রবর্তিত ইসলামধর্মে। রোমান পদ্ধতি ছিল রাজাকে ধর্মসংঘ ও ধর্মগুরুর শাসনে আনা। আরব পদ্ধতিতে রাজা ও ধর্মগুরু এক লোক। পদ্ধতির ভিন্নতার কারণ ঐতিহাসিক। ক্যাথলিক ধর্মগুরু ও নেতারা তাঁদের ধর্ম প্রচার করেছিলেন অখ্রিস্টান রাজাদের অখ্রিস্টান রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে। তত্ত্ব হিসাবে তাঁদের বলতে হয়েছে তাঁদের ধর্মরাজ্য এ পৃথিবীর নয়, লোকাতীত স্বর্গলোকের, সেইজন্যই পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের উপর তার আধিপত্য। ইসলামরাষ্ট্র আরম্ভ হয়েছিল ইসলামধর্মের দিগ্বিজয়ে। সত্যধর্ম প্রচারের জন্যই রাজ্যজয়। পুরাতন রাজব্যবস্থা লোপ করে ইসলামরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ একাধারে ছিলেন ইসলামের ধর্মগুরু, ইসলামসেনার সেনাপতি, ইসলাম-রাষ্ট্রের রাজা। ধর্ম-অভিযানের উত্তেজনার পিছনে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক প্রেরণা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সত্যধর্ম

প্রচারের আবেগও ছিল প্রকট ও প্রবল। মহম্মদের মৃত্যুর পরও এই প্রথম বেগ যতদিন অব্যাহত ছিল নেতার ত্রিনেতৃত্বও ততদিন ছিল বাস্তব সত্য। কালক্রমে যখন ভাটা এল তখন স্বভাবতই এই একনেতৃত্ব হয়েছিল প্রাণহীন অবাস্তব; তবুও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তির অনস্বীকার্য তত্ত্বরূপে টিকে থাকল। ফলে মুসলমান জনসাধারণের রাষ্ট্র যে মুসলিম ধর্মসমাজের সঙ্গে একাঙ্গ মুসলমান রাষ্ট্রের রাজবিধি চলবে মুসলিম ধর্মবিশ্বাস ও আচারের পথ ধরে, এ ধারণার মূল বিচলিত হয়নি। মুসলমান রাষ্ট্রগুলির ইতিহাসে দেখা যায় যে-যুগে ওর কোনও রাষ্ট্র ও সমাজ সর্বমানবীয় সভ্যতার ধারায় স্মরণীয় কিছু করেছে সে যুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের একাঙ্গতত্ত্বের ব্যাবহারিক প্রয়োগ ছিল শিথিল। যে যুগে বিশুদ্ধ সম্মাতনত্বের নামে ওদের সম্বন্ধকে অচ্ছেদ্য করার চেষ্টা হয়েছে সে যুগে রাষ্ট্র নিজেকে ও অন্যকে শুধু পীড়ন করেছে; সভ্যতার ভাণ্ডারে শূন্য অঙ্কের বেশি কিছু দান করতে পারেনি।

৪

বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হতে পারে গান্ধীজি যে রামরাজ্যের কথা বলেছেন তা এই ক্যাথলিক ও মুসলিম আদর্শের সগোত্র। একটু সাবধানে দেখলেই সে দৃষ্টিবিভ্রম দূর হয়, ভুল ধরা পড়ে। ধর্মের অনুশাসনে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের খ্রিস্টান কি মুসলমান আদর্শে ধর্ম কতকগুলি বিশেষ বিশ্বাস ও তার অনুবর্তী আচারের সঙ্গে প্রকাশ্য ও নিগূঢ় যোগে যুক্ত। সে বিশ্বাস ও আচারে যাদের আস্থা নেই রাষ্ট্রের ভিতরে থেকেও তারা থাকবে বাইরের লোক। ধর্মের নির্দেশ তাদের অন্তরের বাণী না হয়ে হবে বাহ্যিক বাধানিষেধের কাঁটাবেড়া। এ কাঠামোর মধ্যে উদার মুক্ত মানবতাকে দাঁড় করানো যায় না; দার্শনিক তত্ত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ঠেকা দিয়েও নয়। বেশি টানাটানিতে কাঠামোই ভেঙে যাবে, যা থাকবে তাতে খ্রিস্টত্ব ও মুসলিমত্বের অবশেষ পাওয়া যাবে না। গান্ধীজি রাষ্ট্রব্যাপারে যে ধর্মের কথা বলেছেন সে হচ্ছে বিশেষ ধর্মবিশ্বাসনিরপেক্ষ চারিত্রিক আধ্যাত্মিকতা। তিনি বলেছেন, সকল ধর্মবিশ্বাসকে সমান ভক্তি করতে। তার এক অর্থ প্রতি ধর্মমতের যা ঐকান্তিক বিশেষ তাকে অবান্তর জ্ঞানে তাদের মধ্যে যে সর্বধর্মসাধারণ আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা নিহিত আছে তাকেই ধর্ম মনে করা। এতে ধর্মবিশেষের কোনও বিশেষত্ব থাকে না। সেইজন্য গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনাসভায় যখন কোরান থেকে বচন পড়িয়েছেন তখন অনেক মুসলমান তাতে খুশি হননি এবং অনেক হিন্দু আপত্তি তুলেছেন। ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে, কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এক বস্তু নয়। যাঁরা ধর্মবিশেষের নিষ্ঠাবান ধার্মিক তাঁরা আধ্যাত্মিকতাকে নমস্কার করেন, কিন্তু ধর্মের আচার-বিশ্বাসময় দেহকেই ধর্ম বলে মানেন।

যে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমাজের আদর্শকে গান্ধীজি রামরাজ্য বলেছেন সে আধ্যাত্মিকতা সাধকের আত্মোপলব্ধির আধ্যাত্মিকতা নয়। উর্ধ্ব থেকে দৈবশক্তির অবতারণে অতি-মানুষের আধ্যাত্মিক সমাজের যে কল্পনা, সে আধ্যাত্মিকতাও নয়। পরিচিত সমাজের সাধারণ মানুষকে নিয়ে গান্ধীজির চেষ্টা ও চিন্তা। এই মানুষের জীবন ও চরিত্রের

এক আদর্শ গান্ধীজির মনে ছিল। তাঁর সকল কাজের চরম লক্ষ্য মানুষকে এই আদর্শে পৌঁছে দেওয়া। রাষ্ট্রের বিধি, সমাজের গড়ন, ধন উৎপাদন ও বণ্টনের কৌশল এই লক্ষ্যের পথকে সুগম করার ও চারিত্রিক আদর্শকে স্থায়ী করার উপায়। শিক্ষার লক্ষ্য এই চরিত্র গড়া। সেইজন্য উপায় ও উদ্দেশ্যের প্রভেদকল্পনা গান্ধীজি করেননি। যে কাজের ধারা চরিত্রের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে, শীঘ্র ও সহজে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগ্রহে সে উপায়ের উপদেশ তিনি কখনও করতেন না। এ ছিল তাঁর কাছে বিষের মতন পরিত্যাজ্য। সিদ্ধির মহত্ত্ব সাধনের উপায়কে শোধন করবে তাঁর কাছে এ কথার অর্থ ছিল না। কারণ, সিদ্ধি বাইরের কোনও কিছুর লাভ নয়। মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলাই সকল সাধনার সিদ্ধি। যা উপায় তার চেষ্টাই এ চরিত্র গড়ে। উপায়ের প্রত্যেক পদক্ষেপ কেবল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নেয় না, উপায়ের মধ্যেই উদ্দেশ্যকে লাভ করে।

গান্ধীজি মানুষের যে আদর্শচরিত্রের কল্পনা করেছেন তার মধ্যে জটিলতা নেই। মানুষের মনে থাকবে মৈত্রী সকল মানুষের উপর। সেইজন্য সে হবে অহিংস ও অক্রোধ। তার জীবনযাত্রা হবে সরল, উপকরণবাহুল্যশূন্য; অন্যের শ্রমের উপর যত সম্ভব কম যাতে নির্ভর করতে হয়। নিজের শরীরযাত্রার অনেক উপাদান সে নিজেই তৈরি করবে, কারণ প্রতিদান না দিয়ে পরের শ্রমের ফল সে আত্মসাৎ করবে না। যে জন্য সে হবে নিরলস। সমাজ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জটিলতায় এই দান-প্রতিদানের পরিমাণের তুলনা করা দুরূহ। সেজন্য ও ব্যবস্থাকে সরল করার প্রয়োজন, নিজের অল্পের বিনিময়ে অপরের অনেক যাতে আত্মসাৎ না করতে হয়। মানুষ হবে সত্যাগ্রহী; অসত্য ও অন্যায় সে আশ্রয় করবে না, নিজের স্বার্থে কি দশের স্বার্থে। অন্যের অসত্য ও অন্যায় আচারও সহ্য করবে না, ভয়ে কি উপেক্ষায়; নির্ভীক বীর্যে তার প্রতিরোধ করবে। সমাজের শত্রুজ্ঞানে ক্রোধে আঘাত দিয়ে নয়; সে আচারের সঙ্গে অসহযোগ করে, মৈত্রীতে ক্রুদ্ধের ক্রোধকে জয় করে, অলোভে লোভীর লোভকে লজ্জা দিয়ে; প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণকে বিসর্জন করে। এমন চরিত্রের মানুষের সমাজেই সাম্য আসতে পারে; যে সমাজে হিংসা ক্রোধ অসূয়া নেই। কেবল ধনের উৎপাদন ও বাটোয়ারার কৌশলে সে সাম্য লভ্য নয়।

মৃদুণি কুসুমাদপি তবুও বজ্রাদপি কঠোর এ মনকে কবি কল্পনা করেছেন লোকোত্তর মহাপুরুষদের দুর্জ্ঞেয় চরিত্র বলে। গান্ধীজি একে কল্পনা করেছেন সাধারণ মানুষের চরিত্রের আদর্শরূপে। সাধারণ মানুষের জীবনে এ আদর্শ বাস্তব হবে কোন উপায়ে? মানবসমাজের ক্রমবিকাশে ভরসা রেখে সুদূর ভবিষ্যবংশীয়দের জীবনে এর বাস্তবতা-কল্পনা নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর চিন্তাভঙ্গি, কর্মীর মনোভাব নয়। সাধারণ মানুষের জীবনে এই চরিত্র বিকাশের জন্য তাকে আবাল্য বিশেষ শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে রাখার উপদেশও গান্ধীজি করেননি। রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে গান্ধীজি লিখেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন না যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে উপযুক্ত ডাকেও তা সাড়া দেবে না। মানুষের এই মৌলিক মহত্ত্ব স্বার্থের তুচ্ছতায়, ঈর্ষাদ্বেষের জড়তায় আচ্ছন্ন থাকে। ডাকের মতো ডাক শুনলেই সমস্ত হীনতা কাটিয়ে সে জেগে ওঠে, মানুষের মহৎ চরিত্র অম্লান ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশ হয়। সাধারণ মানুষকে আদর্শ-চরিত্রে প্রতিষ্ঠার গান্ধীজির এই পন্থা। কর্মের যাত্রাপথে এ ডাক গান্ধীজি

অনেকবার দিয়েছেন। যাদের ডেকেছেন কখনও তারা অদ্ভুত সাড়া দিয়েছে; লোকে বলেছে অলৌকিক ঘটনা ঘটল। কখনও তারা সাড়া দেয়নি। যখন সাড়া পেয়েছেন তখন বলেছেন, মানুষের মনুষ্যত্বের গুণ; যখন সাড়া আসেনি মহাত্মা বলেছেন তাঁর নিজের দোষ; যে মনে তিনি ডেকেছেন তার বিশুদ্ধিতে খাদ ছিল। মানুষের উপর মহাপুরুষের এই মহাবিশ্বাস হল সেই শক্তি যে শক্তি পর্বতের স্থাণুত্বকে বিচলিত করে। মনুষ্যত্বের যেখানে জয় হয়েছে ইতিহাসের গভীরে ছিল এই শক্তির ব্যঞ্জনা।

৫

মানুষের প্রকৃতিতে বড়-ছোট ভাল-মন্দর দ্বৈত এমন প্রকট যে প্রাচীন কাল থেকে তত্ত্বজ্ঞেরা নানা রূপকে এ তথ্যকে বর্ণনা করেছেন— দেবাসুরের সংগ্রাম, আলো-অন্ধকারের বিরোধ, নিত্যানিত্যের দ্বন্দ্ব। নিজের প্রবৃত্তির অন্তরের উপর শুভকে জয়ী করার নানা কৌশল ও পথ জ্ঞানীরা উপদেশ করেছেন। একজন জ্ঞানী বলেছেন, বুদ্ধির বিশ্লেষণে শুভ ও অশুভের স্বরূপের জ্ঞান হলেই মানুষ অশুভকে দমন করে চিন্তায় ও চরিত্রে শুভকে প্রতিষ্ঠা করবে। সুতরাং শুভের সাধনা এই বিবেক-জ্ঞানের সাধনা। অন্য জ্ঞানীরা বলেছেন, এ উপদেশের ভিত্তি মানুষের মূল প্রকৃতির এক ভ্রান্ত ধারণা। ধর্ম কি তা জানলেই মানুষের তাতে প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম কি তা জানে তবুও তা থেকে নিবৃত্তি নেই। তার হৃদিস্থিত হৃষিকেশ যে পথে চালান সে সেই পথে চলে। প্রাচীনেরা বলেছেন সে হচ্ছে ভগবৎকৃপা, যা না হলে স্বভাব-শুচিতা কিছুতে আসে না। সে কৃপার জন্য একাগ্র ভক্তিতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। নবীনেরা বলেন, মনের অতিগহনে চেতনার অবচেতনে রাগ-বিতৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা-প্রবৃত্তির যে আলোড়ন চলছে সেই হৃদিস্থিত হৃষিকেশ মানুষের প্রকৃতিকে যে আকার দেয় সে সেই আকার নেয়। জন্ম থেকে শৈশবের, জন্মপূর্ব থেকে বংশের পূর্বতনদের অনুভূতি চুইয়ে এই অতলে জমা হয়েছে। বাষ্পের মতো এদের পরিচ্ছিন্ন আকার নেই, রুদ্ধ বাষ্পের মতোই এদের শক্তি। যেদিকে মানুষকে টানে, সচেতন চেষ্টায় তার ভিন্নমুখে চলা দুরূহ, হয়তো অসম্ভব। বাইরের চাপ, সমাজ ও রাজার ভয়, পরলোকে দুর্গতির আশঙ্কা বাহ্যিক কার্যকলাপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত রাখে, কিন্তু মূল প্রকৃতি অশোধিত থেকে যায়। চাপ ও বিশ্বাস শিথিল হলেই সেই প্রকৃতি চরিত্রে প্রকাশ হয়। অন্যেরা বলেন, মানুষের প্রকৃতির বলবৎ দৃঢ় হীনতার উপর তার মহত্ত্বের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন এই হীনপ্রকৃতিকে নিগ্রহের, যা-কিছু প্রবৃত্তিকে সেই নিচু দিকে টানে তার উপর বৈরাগ্যের অভ্যাস। কিন্তু কেন মানুষ এই নিগ্রহ-বৈরাগ্য-অভ্যাসের কৃচ্ছ্রসাধনায় রত হবে? কষ্টলভ্য শ্রেয়ের আকাঙ্ক্ষায় সহজ রাগপ্রাপ্ত প্রেয়কে ছাড়বে কীসের আকর্ষণে? জ্ঞানীরা বলেছেন, ওই শ্রেয়ের আকর্ষণে, আর কিছুর নয়। মোট লাভক্ষতি হিসাবের পাটোয়ারিবুদ্ধি মানুষের প্রকৃতিতে বদলায় না, এ লোকের লাভক্ষতিও নয়, পরলোকের লাভক্ষতিও নয়। চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ যখন মানুষকে আকর্ষণ করে ফললাভের লোভে নয়, স্বে মহিম্নি,

তখনই মূল প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হয়; মানুষের প্রকৃতি নবজন্ম লাভ করে দ্বিজত্বে উপনীত হয়। হীনতার আকর্ষণকে জয় করার কৃচ্ছ্রকে আর কৃচ্ছ্র মনে হয় না।

যে উপযুক্ত ডাকে মানুষের অন্তরতর মনুষ্যত্বে সাড়া দেবেই, গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, তা এই চরিত্রের আদর্শের আহ্বান। এ আদর্শ কোন পথে মনে পৌঁছলে মনকে নাড়া দেয়, মূল প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে? গান্ধীজি চরিত্রের যে আদর্শ কল্পনা করেছেন তা অচিন্তিতপূর্ব নূতন নয়। কিন্তু এ আদর্শ মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে তার চরিত্র পরিবর্তনের যে উপায় তিনি অনুসরণ করেছিলেন তা নূতন। সে উপায় হচ্ছে নিজের জীবনে সে আদর্শচরিত্রকে মূর্ত করা। স্বভাবতই বেশির ভাগ লোক বলবে এর মধ্যে নূতন কিছুই নেই। সকল ধর্ম ও নীতি প্রবর্তক মহাপুরুষেরা এই উপায়ই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের জীবন ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই লোক আকৃষ্ট হয়েছে; তাঁদের ঘিরে শিষ্যসেবক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়', 'Imitation of Christ' — এসব এই তথ্যেরই প্রকাশ। তাঁদের উপদেশের যে প্রভাব তার উৎস তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের আকর্ষণী শক্তি। কিন্তু এই মহাপুরুষদের সঙ্গে গান্ধীজির একটা পার্থক্য আছে। যেসব মহাপুরুষ মানুষের জীবনের অন্তস্তলে পরিবর্তন এনে তাকে নবজীবন দিতে চেয়েছেন তাঁরা সমাজে, বিশেষ করে রাষ্ট্রে, সে জীবনের প্রকাশকে কখনও বড় মূল্য দেননি। হয় এদের উপেক্ষা করেছেন, না হয় অপরিহার্য পরিবেশ বলে অল্প কিছুটা স্বীকার করেছেন। অন্তরটাই মূলতত্ত্ব, বাহিরটা অবশ্য আছে কিন্তু তার সঙ্গে যোগ যত কম ততই ভাল। গান্ধীজি তাঁর জীবনে কর্মে ও বাক্যে এ দ্বৈত স্বীকার করেননি।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একক ধ্যানের আসনে মানুষের জীবনাদর্শ তাঁর কল্পিত আদর্শ নয়। এরকম ধ্যানের আসনে তিনি অনেক বসেছেন, হয়তো প্রতিদিন বসতেন। কিন্তু সে উপবেশন মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নেমে এসে দৃঢ়পায়ে দাঁড়াবার প্রস্থানভূমি। মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন তার সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র ও চেহারার বদল ঘটাবে না এমন পরিবর্তনকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। অথচ মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের উপায়মাত্র, এ কথা তিনি নিশ্চয়ই মানতেন না। যেসব মহাপুরুষ মানুষের অন্তরের মহত্ত্বকে তার বাহ্যিক কর্মের চেয়ে অনেক বড় দেখেছেন গান্ধীজি যে তাদের অগোত্র তাতে সন্দেহের অবসর নেই। ধর্মরাজ্যস্থাপয়িতা মহম্মদের সঙ্গে নয়, যে খ্রিস্ট বলেছিলেন তাঁর রাজ্য পৃথিবীর নয় তাঁর সঙ্গেই যে গান্ধীজির সাজাত্য অতিক্ষীণদৃষ্টি লোকেরও তা চোখ এড়ায়নি। গান্ধীজি যে-মন নিয়ে জন্মেছিলেন সে-মন মানুষের ভবদুঃখত্রাতা পরমকারুণিক মহাপুরুষের মন। কিন্তু তাকে তিনি প্রয়োগ ও প্রকাশ করেছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রের ছোটবড় শতকর্মে। তাঁর কল্পিত আদর্শচরিত্রের মানুষ নিজের চরিত্রকে এমনি করেই প্রকাশ ও প্রমাণ করবে সেই আদর্শই গান্ধীজি তাঁর জীবনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সমাজের, বিশেষ রাষ্ট্রের, কর্মীর যে কাজ তা বহু লোকের মধ্যে কাজ ও বহু লোককে নিয়ে কাজ। এই জনসংঘের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংকীর্ণ মনের পঙ্কিলতা মেনে নিয়ে তার সঙ্গে আপস করে কাজের সফলতার চেষ্টা অনেক কর্মীর কর্মপন্থা। সেই হচ্ছে তাদের মতে বাস্তব পথ, সফলতার সদুপায়। এ পথের কাদা যে কর্মীদের গায়ে কিছু লাগবে সেটা

স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য বেশি ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। গন্তব্য স্থির থাকলেই হল। পথ যেমন হোক, লক্ষ্যে পৌঁছনো নিয়ে কথা। কিছু গুণ ও অনেক দোষে সাধারণ মানুষের চরিত্র গড়া। তাদের নিয়ে কাজে শুচিবাই পথের বাধা। যে অল্প কর্মী এ আপসে রাজি নন, সাধারণ মানুষের চরিত্রকেই যাঁরা বদলাতে চান, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজ মানুষের কল্যাণে তাঁদের কাজের ক্ষেত্র কি না তাতে অনেকের সংশয় আছে। মানুষ তার নিজের স্তরে এঁদের টেনে নামাতে চেষ্টা করবে, যদি না পারে একদিন তাঁদের ছেঁটে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। গান্ধীজির হত্যার পর ইংরেজ লেখক অলডাস হাক্সলি এ সংশয় প্রকাশ করেছেন। বার্নার্ড শ রহস্যের আবরণে এই কথাই বলেছেন, 'দেখ, বেশি ভাল হওয়ার কি বিপদ।' গান্ধীজি অবশ্য বলতেন, মর্ত্যকে যা অমর্ত্য না করে সে অমৃত দিয়ে তিনি কি করবেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনে যখন গান্ধীজির পথ ও মতের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন বালগঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন, রাষ্ট্রকর্মে মহাত্মার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন 'মেজরিটি'র। রাষ্ট্রনীতিবেত্তার কথা। কিন্তু ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংকটের মহাসন্ধিক্ষণে এক মহাত্মাকেই রাষ্ট্রসংগ্রামের নেতা স্বীকার করেছিল। ফল সে পেয়েছে। অন্য ফল যদি থাকে ভোগ করতে হবে। কবি বলেছেন, সৃষ্টির প্রবৃত্তি কেবল শুভকেই জন্ম দেবে, দোষ কিছু মিশে থাকবে না এমন প্রায় দেখা যায় না।

৬

এইজন্য গান্ধীজির চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মের বহুধা বৈচিত্র্যের মধ্যে। তাঁর চরিত্রের ভাব ও শক্তির যা কেন্দ্র— সকল মানুষের উপর বাক্য-কায়-মনে অহিংসা ও মৈত্রী, বিন্দুমাত্র অসত্য ও অন্যায়কে বৃহৎ কাম্যফললাভের প্রয়োজনেও অস্বীকার— তাঁর বড়-ছোট সকল কাজেই প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট কর্ম কোন পথ নেবে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও পূর্ব থেকে তা প্রায় অনুমান করতে পারতেন না। এর দুই কারণ। তাঁর মনের গভীরে অহিংসা ও সত্যের যে পরশমণি ছিল তার পরীক্ষায় কোনটা সোনা আর কোনটা লোহা প্রমাণ হবে তাঁর শিষ্যেরা তা জানতেন না। কারণ সে পরশমণি তাঁদের মনে ছিল না, থাকার কথা নয়। তাঁরা মহাত্মা গান্ধী নন, অনুসরণকারী মাত্র। দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজির কোনও কর্মচেষ্টা কেবল হৃদয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত স্রোতের মতো নিজের বেগে নিজের পথ কেটে চলত না, অনন্যসাধারণ এক কর্মকুশলী বুদ্ধি তাঁর উদ্দেশ্যের উপায় উদ্ভাবন করত। বহু কর্মের আরম্ভে তাঁর উপদিষ্ট উপায় বহুজনের সংশয় জাগিয়েছে; কর্মশেষে তার সফলতা সকলকে বিস্মিত করেছে। ভুল হয়নি তা নয়, কিন্তু অভ্রান্তির তুলনায় তার পরিমাণ সামান্য। আর সে ভুল সর্বপ্রথমে ও অকপটে গান্ধীজিই স্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রীয় কর্মে এই বুদ্ধির নৈপুণ্যে অনেকে, বিশেষ ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের ভূতপূর্ব রাজার জাতির অনেক বুদ্ধিমান লোকে বলেছেন যে গান্ধীজি মূলত ক্ষুরবুদ্ধি পলিটিশ্যান, তার মহাত্মতা বা 'সেন্টলিনেস' বহিরঙ্গ— পূর্বদেশের জনসাধারণকে

নিজের পলিটিক্যাল কর্মপন্থায় আকর্ষণের উপায়। যে সকল মহাপুরুষ মানুষের সাংসারিক ব্যাপারে উপদেশ করেননি তাঁহাদের অনেকের গভীর বাস্তববুদ্ধি প্রসিদ্ধ। বাস্তবে অসম্যকদৃষ্টি শুদ্ধচিত মহাত্মারা ভক্ত ও ধার্মিক হন, মহাপুরুষ হন না। গান্ধীজি একাধারেই সেন্ট ও পলিটিশ্যান ছিলেন। ওর কোনওটাই বহিরঙ্গ নয়। কেবল তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি মানুষের এমন সব প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছিলেন সেন্টরা সচরাচর যা করেন না। আর সে বুদ্ধির অনন্যসাধারণতার মুলে ওই সেন্টলিনেস। যাতে মনের অতিগহনের রাগদ্বেষ সে বুদ্ধিকে বিকৃত কি ম্লান করে না। কোনও মমত্বের টান তার সরল পথকে বেঁকে দেয় না, কোনও মোহের কুয়াশা দৃষ্টির বিভ্রম ঘটায় না।

৭

সেইজন্য মনে বিস্ময় লাগে আজ যখন গান্ধীজির মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য-সহচরেরা দেশের লোককে ক্রমাগত বলেন, এই কাজের এই পথ, কারণ গান্ধীজির অভিপ্রেত পথ। তিনি বেঁচে থাকলে এই পথের উপদেশই তোমাদের দিতেন। গান্ধীজির কর্মপথের যেগুলি মূলসূত্র তা তাঁর নিকটশিষ্যেরা যেমন জানেন, বাইরের লোকেও তেমনি জানে। তার মধ্যে গুহ্য ও গুরুগম্য কিছু নেই। কিন্তু সেই মুলসূত্রের প্রয়োগে কোনও ব্যাপক ও জটিল রাষ্ট্রকর্মের পথ গান্ধীজির অলৌকিক মৈত্রী ও অনাবিল বুদ্ধিবিশুদ্ধ মনে যা উদয় হয়েছে তাঁর শিষ্যদেরও ঠিক তাই হয়েছে গান্ধীজির জীবনকালে এমন ঘটনা ঘটেনি। পথ তিনিই আবিষ্কার করতেন, নির্দেশ তিনিই দিতেন। শিষ্য-সেবকরা তা শিরোধার্য করতেন, প্রচার করতেন, অনুসরণ করতেন; অনেকে বুঝে, অনেকে না বুঝে। তাঁর মতামতকে যে তাঁর শিষ্যেরা বিনাবিচারে মেনে নিচ্ছেন সে সম্বন্ধে গান্ধীজি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। এর বিরুদ্ধে তিনি উপদেশ অনেক দিয়েছেন। বিশেষ ফল হয়নি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে সাধারণ ঐতিহাসিক-মানে যাঁরা বড় পলিটিক্যাল কর্মী ও নেতা তাঁরাও অসম্ভব খাটো হয়ে যেতেন, অন্যের চোখে ও নিজের মনে। কারণ গান্ধীজি ঐতিহাসিক-মানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পলিটিক্যাল নেতা ছিলেন না। জন-গণ-মনের উপর তাঁর যে অধিকার তার মূল হিমালয়ের মতো তার চারিত্রিক মহত্ত্ব, আকাশের মতো তাঁর উদার মন। যাতে দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলেই মর্মে জেনেছে এরকম মানুষ মানুষের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা দেয়; এবং রাষ্ট্রিক ইতিহাসে কখনও দেখা দেয়নি। গান্ধীজির মৃত্যুর পর তাঁর সেই চরিত্র ও মন তাঁর শিষ্যেরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন এ কল্পনায় মনে ভরসা আসে, কিন্তু তার কারণ ও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। গান্ধীজির যেসব শিষ্য নিজের মত ও পথকে গান্ধীজির মত ও পথ ভাবছেন খুব সম্ভব নিজের মনকে তাঁরা গান্ধীজির মনের উপর আরোপ করছেন— সেই অধ্যান, মায়া ও মিথ্যাজ্ঞানের যা বীজ।

গান্ধীজির অনেক শিষ্যের এ ভুলের বিশেষ কারণও আছে। যাঁরা মহাপুরুষের জীবনকালে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিষ্য হন ও সান্নিধ্য পান তাঁদের অনেকে গুরুর বাহ্য আচার ও রীতির অনুসরণ করেন দেখা যায়। এর কতকটা ভক্তির বাহ্য অভিব্যক্তির আবেগ,

কতকটা বাহ্যিক অনুকরণে অন্তরটাও গুরুর অন্তঃকরণের কতক গড়ন পাবে এই বিশ্বাস। গান্ধীজির খদ্দরের খাটো বহির্বাস, তাঁর আহারের সংযম ও আহার্যের অনন্যসাধারণতা, চরকায় নিয়মিত সুতো কাটা, নিরলস সরল দৈনন্দিন জীবনযাপন, নানা উদ্দেশ্যে ও উপলক্ষে উপবাস, নিজের গৃহ বলে কিছু না রেখে আশ্রমিক জীবন গ্রহণ, বস্তুর উপর ব্যক্তিস্বত্ব ও স্বামিত্ব যেখানে আসে লোপের সীমারেখায়— এসব বৈশিষ্ট্য অতিসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এর দুটো-একটার অনুকরণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকে বাহ্যজীবনে অসাধারণ হয়। আর গান্ধীজির এসব আচরণ বাহ্যিক নয়। তাঁর অন্তরের যা সব গভীর অনুভূতি ও প্রিয়তম আদর্শ তাদেরই স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। গান্ধীজির অনুকারী শিষ্যেরা যদি মনে করেন যে এই অনুকরণে তাঁরা গান্ধীজির চরিত্রের মহত্ত্ব অনেকটা আয়ত্ত করেছেন তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষ যে অহিংসা ও মৈত্রীর কথা গান্ধীজি সকল সময়ে বলতেন তার বাচনিক পুনরুক্তি, এমনকী কায়িক পালন, বিশেষ কঠিন নয়। এতে কুশলী যেসব শিষ্য মনে করেন গান্ধীজির মনের অহিংসা ও মৈত্রী তাঁবা নিজের মনে পেয়েছেন তাঁরা হয়তো মায়াগ্রস্ত, সজ্ঞানে মিথ্যাচারী নন। যদিও প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে পৌঁছনোর পথ খাড়া নিচু ও পিচ্ছিল। কারণ ভুল ভাঙলেও ভোল ছাড়া অনেক সাধুর পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়।

৮

বিদেশিরা অধীনতা থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি হতে না হতেই গান্ধীজির মৃত্যুতে দেশে যে হতাশা ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বড় কারণ রয়েছে গান্ধীজি ও তাঁর নিকট শিষ্যদের মন ও চরিত্রের বিরাট পার্থক্যের মধ্যে। ইংরেজের হাতে থেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশাসন সহজেই এসেছে সেই প্রতিষ্ঠানের হাতে যেখানে গান্ধীজির প্রধান শিষ্যদের অবাধ কর্তৃত্ব। সে কর্তৃত্বের মূলে গান্ধীজির উপর দেশের লোকের সীমাহীন আস্থা। সেই আস্থা সঞ্চারিত হয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের উপর, যা ছিল গান্ধীজির নানা কাজের শক্তিসঞ্চয়ের আধার ও শক্তিপ্রবাহের প্রণালী। শতাব্দীর চতুর্থাংশ সে যন্ত্রের তিনি ছিলেন প্রধান যন্ত্রী। দেশের লোকে আশা করেছিল যে গান্ধীজির শিষ্যদের হাতে স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনে ও গড়নে গান্ধীজির মনের ও কাজের ছাপ থাকবে যাতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নিদারুণতা ও ভারতবিভাগের বিভীষিকার মধ্যেও লোকে অন্তরে আশ্বাস ও কর্মে উৎসাহ পাবে। তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। কী আশা? এবং কেন তা পূরণ হয়নি?

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আজ যাঁরা নেতৃস্থানীয়, আধুনিক কি প্রাচীন রাষ্ট্রনেতৃত্বের মাপকাঠির মাপে তাঁরা খাটো নন। পৃথিবীর এক অতি দুঃসময়ে দেশ যখন বহু সমস্যায় পীড়িত ও নানা উৎপাতে বিব্রত তখন অল্পকালের মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রসমস্যার সমাধানে তাঁরা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা নিপুণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্টেটস্‌ম্যানশিপ্'। কিন্তু দেশ নিঃসংশয়ে ভরসা পায়নি, মন উৎসাহে জ্বলে ওঠেনি— অনেক কালের পরাধীনতার অবসানে যা স্বাভাবিক। সত্য কথা, জ্বলে উঠে স্তিমিত হয়ে

এসেছে তেলের অভাবে। লোকে অনুভব করেছে এর মধ্যে কোথাও যেন ফাঁক আছে। যন্ত্র ঠিক সুরে বাজছে না। এর প্রধান কারণ নয় যে বহু সমস্যার তাঁরা সমাধান করতে পারেননি— অন্নবস্ত্র আবাস স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্যা— যা লোকের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর অশিক্ষিত, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নয়। সেজন্য গান্ধীজির শিষ্যদের ভাষণে রামরাজ্যের মনোহারী বর্ণনা শুনেও কেউ মনে করেনি যে, ইংরেজের হাতে থেকে গান্ধীজির শিষ্যদের হাতে দেশের শাসন আসামাত্রই সকল দুঃখকষ্টের অবসান হবে, ধন-ধান্যে-স্বাস্থ্যে দেশ ভরে উঠবে। জনসাধারণের দুর্দশা এ দেশে সুপ্রাচীন। স্বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শ লাগলেই সকল লোহা নিমেষে সোনা হয়ে উঠবে এমন স্বপ্ন কেউ দেখলেও, আশা কেউ করেনি। সুতরাং সে আশাভঙ্গের মনস্তাপেও দেশ ভুগছে না। দেশের মনকে যা পীড়া দিচ্ছে, তার কর্মোদ্যমের মুখে বিফলতার সেতুবন্ধ বেঁধে সে শক্তিকে যা উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে সে হচ্ছে গান্ধীজির দেশ-শাসক শিষ্যদের দেশের লোকের সঙ্গে অসহযোগ। তাঁদের রাষ্ট্রনীতি ও কর্মনীতির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগ নেই। যেমন ছিল না সদ্য-অপগত বিদেশি শাসনের আমলে। দেশের লোকের জন্যই তাঁরা কাজ করছেন, কিন্তু সে কাজের জন্য তাঁদের প্রয়োজন কেবল সৈন্য, পুলিশ, সরকারি আমলা— জনসাধারণের উৎসাহ ও কর্মোদ্যম নয়। তাঁদের রাষ্ট্রশাসনের সঙ্গে 'কো-অপারেশন' করতে তাঁরা অবশ্য দেশের লোককে প্রতিনিয়ত বলছেন। কিন্তু তাঁদের কোন 'অপারেশনে' কেমন করে কোথায় কাঁধ লাগাতে হবে দেশের লোক তার হদিশ পাচ্ছে না। সুতরাং তাঁদের মনে যাই থাক, মুখে তাঁরা যাই বলুন, এ 'কো-অপারেশন' দাবির কার্যত অর্থ দাঁড়িয়েছে তাঁদের সকল ব্যবস্থাকে বিনা হাঙ্গামায় পরমহিতকারী বলে মেনে নেওয়া। আর সভায় মিছিলে নেতাদের নামে জয়ধ্বনি তোলা। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকর্মী ভূতপূর্ব ইংরেজ রাজপুরুষদের অভ্যর্থনায় কলাগাছ ও শালুর রাজসংস্করণ।

৯

সবেমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকর্মে ভারতবাসীকে স্বদেশি শাসকদের সঙ্গে 'কো-অপারেশনে' ডাকার মনোভাবের তলায় যে প্রকাণ্ড ফাঁক রয়েছে, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদসৃষ্টিতে তার মারাত্মক গভীরতাই দেশের মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। এর অর্থ স্বাধীনতার যে দায় তা সমগ্র দেশবাসীর নয়, শাসকসম্প্রদায়ের। ঊর্ধ্ব থেকে তাঁরা যন্ত্র ঘোরাবেন, ফলভোগ অবশ্য করবে দেশের লোক, সুফল ও কুফল। কিন্তু তারা ভোক্তামাত্র, কর্তা নয়। ঠিক ব্রিটিশ আমলের ব্যবস্থা। কেবল যন্ত্রী ও কর্তার রং বদল হয়েছে। গান্ধীজি যখন 'কুইট ইন্ডিয়া' দাবিকে সফল করার জন্য দেশবাসীকে ডেকেছিলেন তখন বলেননি, আমার সঙ্গে কি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা— 'কো-অপারেট' করো। সে ডাকে সবাই বুঝেছিল এ কাজ তাদের নিজেদের কাজ, নিজেদের করতে হবে। গান্ধীজি ও কংগ্রেস পথদর্শয়িতা ও যন্ত্র। গান্ধীজির সকল ডাক ছিল এই রকম ডাক। সহযোগিতা করতে ডাকার

মধ্যে যে ডাকে ও যাদের ডাকা হয় তাদের মধ্যে যে ভেদরেখা থাকে সে ভেদরেখা গান্ধীজি কখনও টানেননি। অভিনব সব পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন ও তাতে যাত্রা করেছেন দেশবাসীকে সেই পথে চলার পথ দেখিয়ে। এ কথা ঠিক যে বিদেশির হাতে থেকে স্বাধীনতা কাড়তে দেশের জনসাধারণের যে কাজ ও তার যা উপায় স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের শাসনে ও গড়নে জনসাধারণের কাজ ও রীতি তার সঙ্গে এক হতে পারে না। কিন্তু এ কথাও সমান সত্য যে, ভারতবর্ষের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশ, অপুষ্টি-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা পীড়িত জনসাধারণের দেশ ও স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণে দেশাত্ম-অনুভূতিশূন্য জনগণের দেশ— এ দেশের রাষ্ট্রশাসন পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে এক হতে পারে না। শতাব্দীর পথ আমাদের চলতে হবে বছরে। শাসনকলের মসৃণ চাকা যত নির্ভুল ও যত জোরে ঘুরুক সে গতির শক্তি জন্মায় না। সে শক্তির একমাত্র উৎস জনসাধারণের আশা ও উৎসাহ। ইংল্যান্ডের মতো দেশকে নকলের চেষ্টায় লাভ নেই। সেখানে বহুদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমবিকাশে দেশের কর্মশক্তির বড় অংশের প্রবাহ চলে রাজশাসনের প্রণালী দিয়ে। দেশের লোক তাতেই অভ্যস্ত। আর সকলেই জানে সে শক্তির সাফল্যের পথে কোনও বাধা দাঁড়াতে পারবে না; বিরুদ্ধ ব্যক্তিস্বার্থের বাধা, সরকারি আমলাদের শৈথিল্য অক্ষমতা দুর্লোভের বাধা। রাষ্ট্রশাসন কঠোর নির্মম হাতে সকল বাধা চূর্ণ করবে। এমন বাধার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি যেমন প্রখর, তার মতামতের প্রতাপ তেমনি প্রবল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনোভাব গড়ে উঠেছে সেই পরিবেশে। অত্যন্ত প্রলোভনেও সে শক্তিকে বাধা দেওয়া কি এড়িয়ে যাবার কথা সচরাচর কারও মনে হয় না। বহুদিনের সাধনায় এ সিদ্ধি। সুতরাং শাসনযন্ত্রের বোতাম টিপলে ইংল্যান্ডে যে কাজ হবে, ও কলের চাবি ঘুরিয়ে আজকের ভারতবর্ষেও সমান ফললাভ হবে, এটা অক্ষমতার আত্মপ্রতারণা, দাম না দিয়ে বস্তু লাভের দিবাস্বপ্ন। তা যে হয় না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিমধ্যেই দেশের লোক ও দেশের শাসকেরা পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের মতো দেশে দেশের শাসন ও দেশের গড়নের মধ্যে প্রায় অনন্যভাব। সেজন্য আকস্মিক বিপৎপাত কি অসাধারণ প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া ওদেশে আধুনিক সভ্যসমাজের বিপুলায়তন নিত্যনৈমিত্তিক শাসন ও গড়নের সুষ্ঠু সমাধার জন্য জনসাধারণের কর্মোৎসাহকে রাষ্ট্রের শাসকদের চেষ্টা করে জাগিয়ে তুলতে ও জাগিয়ে রাখতে হয় না। সে শক্তির সঞ্চয় ও সক্রিয়তা স্বভাবতই দেশের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যে দেশের সে অবস্থা নয় সে অনগ্রসর দেশকে এগিয়ে নিতে হলে শাসনের চেয়ে গড়নের কাজ অনেক বড় ও অনেক বেশি। তার জন্য জনগণের উৎসাহ ও শক্তির উদ্বোধন করতে হয় সজীব আশার মন্ত্রে। যে আশাকে কর্ম দিয়ে বাস্তবে গড়া যায়; অলস কল্পনার আত্মতুষ্ট বাচনের ফুলঝুরি নয়। উদ্বোধিত শক্তিকে সংহত করতে হয় বিশেষ কর্মে তাকে প্রয়োগের ব্যবস্থায়। উৎসাহকে জাগিয়ে রাখতে হয় সে কর্মের ক্রম-সফলতার চাক্ষুষ প্রমাণে। শাসনের কারখানায় আমলাতন্ত্রের মজুরিতে এ কাজ সম্ভব নয়।

এর আধুনিক দৃষ্টান্ত রয়েছে বলশেভিক বিপ্লবোত্তর রুশীয় রাষ্ট্রে। বলশেভিক রাষ্ট্রনেতারা হাতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মতো প্রকাণ্ড জনসংঘ, আর ঠিক ভারতবর্ষের মতোই অন্নহীন স্বাস্থ্যহীন শিক্ষাহীন রাষ্ট্রবুদ্ধিশূন্য সে জনসমাজ। এ দেশকে যখন তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন নিজেদের আদর্শমতো উন্নত দেশে এবং অল্পকালের মধ্যে, তখন তাঁরা শাসনের চাকার সাধারণ গতিতে সন্তুষ্ট থাকেননি, আর সরকারি আমলাদের কর্মকুশলতার উপর ভরসা রাখেননি। তাঁরা দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দলের উৎসাহী সভ্যদের যারা দেশের লোককে দুর্দশামুক্তির আশা দিয়েছে, মনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে, সঙ্গে কাজ করে কাজের পথ দেখিয়েছে। প্রপাগান্ডা-প্রভাবে যাদের মনে ধারণা হয়েছে এসব ভুয়ো, বলশেভিক দলের লোকেরা রুশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ আনেনি, এনেছে ত্রাস, চাবুক উঁচিয়ে রুজিবন্ধের বিভীষিকায় কাজ আদায় করেছে, ক্রীতদাসের কাজ যেমন করে আদায় করে, কার্য-কারণের কাণ্ডজ্ঞান তাদের কম। আর সব ছেড়ে দিলেও যে জার্মনির শক্তির সম্মুখে আধুনিক সভ্যতায় সুপ্রাচীন, জ্ঞানবিজ্ঞানে ধনবলে সমৃদ্ধ পশ্চিম-ইউরোপ এক বছরও খাড়া থাকতে পারেনি সে দেশকে আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে পরাস্ত করতে যে আয়োজন ও মনোবলের প্রয়োজন ক্রীতদাসের শ্রমে তা গড়ে তোলা যায় না। কোটি কোটি নিরক্ষর জনসাধারণের দেশে আধুনিক সভ্যজগতের বিদ্যার প্রথম পাঠকে ভয় দেখিয়ে সর্বজনীন করা যায় না। এই বলশেভিক দলের লোকেরা দেশের নানাশ্রেণিকে পীড়ন করেছে সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুর অত্যাচারে অনেক শ্রেণির, অনেক মনোভাবের লোকদের উচ্ছেদ করেছে, বলশেভিক নেতাদের আদেশে ও শাসনশক্তির সাহায্যে। রাষ্ট্রনেতারা এই উচ্ছেদ-পর্বকে মনে করেছিলেন তাঁদের কল্পিত আদর্শসমাজ ও রাষ্ট্রগড়ার অলঙ্ঘ্য উপায়, ধর্মরাজ্যের শান্তিপর্বে পৌঁছবার সোজা পথ। মার্কিন দেশের আদি উপনিবেশীরা যে প্রয়োজনবোধে সে দেশের আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ করেছিল। দেশের বেশির ভাগ লোকের মন এ অত্যাচারের বিরুদ্ধ ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। এ অত্যাচার সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে রাষ্ট্রের অত্যাচার। এ নিষ্ঠুরতার চরম ফল কী হবে, দেশের লোকের ও নেতাদের মনে সর্বনাশের বীজ এতে রোপণ হল কি না, আর ব্যাবহারিক চোখে কোনও কুফল যদি প্রকট না-ও হয় এ নিষ্ঠুরতা নিজেই নিজেকে ধিক্কৃত করেছে কি না— এসব প্রশ্ন অবান্তর। বলশেভিক নেতারা দেশের সামনে সমাজ ও রাষ্ট্রের যে আদর্শ ও উপায় উপস্থিত করেছেন তাতে রুশিয়ার লোকচরিত্র কী গড়ন নেবে, শোভন না কুৎসিত, সে তর্কও অপ্রাসঙ্গিক। অনগ্রসর দেশকে যে-কোনও আদর্শের দিকে এগিয়ে নিতে সে দেশের শিথিল-শক্তিমন জনসাধারণকে যে উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করতে হবে. আর তার যা অপরিহার্য উপায় আধুনিক রুশিয়া তার দৃষ্টান্ত। যে দেশের রাষ্ট্রনেতারা এ চেষ্টায় ব্রতী হতে চান ও সে চেষ্টাকে সফল করতে চান সে দৃষ্টান্ত তাদের অনুসরণ করতে হবে।

ইংরেজের হাতে থেকে গান্ধীজির শিষ্যদের হাতে যখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছিল তখন বলশেভিক দলের অনুরূপ একটি দল তাঁদের পাশে ছিল, তাঁদেরই

সহচর-অনুচর কংগ্রেসের কর্মীর দল। গান্ধীজি প্রস্তাব করেছিলেন দেশের শাসন থেকে তার গড়নের কাজ যতটা সম্ভব তফাত করা হোক। যে কাজ দেশের জনসাধারণের হাত না লাগলে অচল, এবং সে কাজে হাত না লাগলে জনসাধারণের শরীরমনে মানুষ হয়ে ওঠার পথ অচল, সে কাজকে রাখা হোক বহু পরিমাণে শাসনযন্ত্রের শক্তিচক্রের বাইরে। আর সে কাজের ভার নিক কংগ্রেসের কর্মীর দল। দেশময় তারা ছড়িয়ে পড়ুক দেশের লোককে আশা দিতে, তাদের মনে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা আনতে, কাজের সাথি হয়ে কাজের পথ দেখাতে ও উৎসাহ জাগাতে। কিন্তু তাদের পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি থাকবে না, যেমন ছিল রুশিয়ায়। দেশবাসীকে তাদের কাজে টানতে হবে নিজেদের সেবা দিয়ে। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আস্থার মধ্যেই সঞ্চিত হবে তাদের বল। এ প্রস্তাব গান্ধীজি করেছিলেন সম্ভব দুই কারণে। দেশের কর্মীর হাতে যদি থাকে রাষ্ট্রের বল তবে দেশের লোকের মন অনুকূল করার ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে সেই বলে তার হাত দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া অনেক সহজ, আর অনেক তাগিদ তাতে কাজ হয়, যেমন রুশিয়াতে বহু সময় নিশ্চয় হয়েছে। এ প্রলোভন দুর্দম্য। কিন্তু গান্ধীজির কাছে কাজের ফল কাজের প্রধান ফল নয়। সে কাজের ফল মানুষের চরিত্রের উপর কেমন ফলবে সেই বিচার চরম। আর সে বিচারে জবরদস্তির ফল যে ভাল নয়, যে করে আর যে সয় দুজনার উপরেই নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কেবল ব্যাবহারিক পক্ষই যদি বিচার করা যায় তবে গান্ধীজির প্রণালীতে কাজের ফল বিলম্বিত কিন্তু তার ভিত্তি যে হয় দৃঢ় ও স্থায়ী তাতেও সন্দেহ করা চলে না। কারণ কাজের শেষেই তা শেষ হয় না। এ প্রণালীর কাজে কর্মীর মনের গড়ন বদল হয়, বহু ভারী কাজের শক্তি ও উৎসাহ যা সঞ্চয় করে রাখতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, গান্ধীজি তাঁর শিষ্যদের চিনতেন শিষ্যদের নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি। তাঁর মনে সংশয় ছিল না তাঁর যে-শিষ্যদের হাতে যাবে রাষ্ট্রশাসন, যদি তাদের হাতেই থাকে দেশকে গড়ার ভার, যে গড়ার কাজে উৎসাহ দিয়ে ও পথ দেখিয়ে জনসাধারণের নিজেদেরই প্রবৃত্ত করাতে হবে, তবে শাসনের নীচে গড়ন চাপা পড়বে। শাসনকালের নৈর্ব্যক্তিক চাকা চালাতে তাঁরা এত তদগত হবেন যে, জনসাধারণের ব্যক্তিরূপ, তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের ছোট সব কথা তাঁদের মনে ঝাপসা হয়ে আসবে। দেশের কর্মী বলতে মনে হবে ওই কলের মজুর আমলা সম্প্রদায়, যাদের কাছেই প্রকৃত কাজ কিছু আশা করা যায়। ফলে দেশের জনসাধারণের মনেও তাদের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা ফিকে হতে থাকবে। যেসব বৃহৎ গঠনের কাজ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ চেষ্টাতেই সম্ভব তার দিকে এঁরা অবশ্য দৃষ্টি দেবেন। মহাকরণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নানা শ্রেণির বিশেষজ্ঞ কর্মচারী প্রথম মধ্য ও চরম রিপোর্ট রচনা করবে, জমা-খরচের বিস্তৃত হিসাব-নিকাশ তৈরি হবে, কিন্তু তার বেশির ভাগ রাজদপ্তরের নথির ভার বাড়ানো ছাড়া আর কোনও ফল ফলবে না, যেমন ব্রিটিশ আমলে ফলত না। কারণ কল্পনাকে কাজে ফলিয়ে তোলা কর্মচারীদের দায় নয়; আর বিশেষজ্ঞ হতে হাতেকলমে কাজ করতে জানা, সুতরাং অন্যকে সে কাজ করিয়ে নিতে জানা, দরকার হয় না। রিপোর্ট লেখার কৌশল জানলেই হল। তাতেই তারা অভ্যস্ত। এ আমলা-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে গঠনের কাজ আদায়ে শাসক-শিষ্যদের সামর্থ্য হবে না; কারণ তাঁরাই হবেন এদের করায়ত্ত; অভিজ্ঞতার অভাবে

এবং যে একাগ্র নিষ্ঠা সমস্ত অনভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে এ ব্যাপারে তার অভাবে। কংগ্রেসের যে সকল কর্মী দেশের স্বাধীনতালাভে দেশের লোককে পথ দেখিয়েছে নিজেদের জীবনে কাজে ও আদর্শে, তাদের উপর কংগ্রেসের নেতাদের হাতে রাষ্ট্রশাসনের এই রূপ কি ফল ফলাবে সে সম্বন্ধে গান্ধীজির মনের আশঙ্কা তাঁর জীবনকালেই ফলতে আরম্ভ করেছিল। নেতাদের প্রধান কাজ দেশের শাসন। সে কাজে এই কর্মীদের কোনও প্রকৃত স্থান, সুতরাং ডাক, নেই। কিন্তু নেতাদের হাতেই যখন শাসন তখন সে যন্ত্রে এবং শাসনের আনুষঙ্গিক যে গঠনের কাজে তাঁদের কর্তৃত্ব তার মধ্যে একটু স্থান পাওয়ার লোভ ও চেষ্টা অনেক কংগ্রেসকর্মীকেই আকৃষ্ট করবে। কারণ ও দেশের কাজ পূর্বেকার শুষ্ক দেশসেবা নয়, সরকারি শাসনের রসাল মর্যাদার কাজ। নেতাদের পূর্বাবস্থার অনুচর হওয়াতে সুবিধাও একটু বেশি। এ প্রলোভন হাজারে ক্বচিৎ একজন দমন করতে পারে। বানপ্রস্থের পর এই গার্হস্থ্যে কংগ্রেসকর্মীরা যে পূর্বজীবনের দেশসেবায় ত্যাগের লোকসান নূতন জীবনে উঁচু হারে সুদসমেত পুষিয়ে নেবার কাড়াকাড়িতে দেশের চরিত্র ও দুর্দশাকে ঘনকৃষ্ণ করে তুলছেন ছোট-বড় কংগ্রেস নেতারা সরবে ও সাড়ম্বরে সেজন্য বিলাপ করেছেন। যে অল্পসংখ্যা কংগ্রেসকর্মীদের এই প্রলোভন প্রলুব্ধ করতে পারেনি, তাঁরা আছেন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দিকচক্রবালের বাইরে। নেতারা তাঁদের চেনেন না, এবং তাঁদের সঙ্গে নেতাদের যোগ নেই, কারণ নেতাদের কর্মপথে তাঁরা নিষ্প্রয়োজন। দেশের যে কাজ কেবল তাঁরাই করতে পারতেন নেতৃত্ব ও উৎসাহের অভাবে সে কাজ তাঁদের সম্ভব হচ্ছে না। কর্মীর দারুণ অভাবের দিনে যাঁরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হতে পারতেন তাঁরা বেকার। যে নিশ্চিত কঠিন সমস্যার দিন ছিল অত্যন্ত সহজেই অনুমেয় সে দিনে রাষ্ট্রনেতারা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মীসংঘের কর্মশক্তি থেকে দেশকে ও নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, কাজ দিয়ে ও কাজ করতে না দিয়ে। গান্ধীজি যখন কংগ্রেসের কাঠামো বদলে সে প্রতিষ্ঠানের শাসন ও সেবাকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন সেটা সাংসারিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে মহান আত্মার আদর্শপ্রীতির খেয়াল নয়। সে প্রস্তাব ছিল মানুষের চরিত্রের ও দেশের বাস্তব অবস্থার অন্তর্দর্শী প্রতিভাবান রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের পরিকল্পনা। নূতন অবস্থার নূতন উপায় আবিষ্কার যে প্রতিভার কাজ। অচিন্তিত অভিনবকে গতানুগতিক প্রাচীন কৌশলে আয়ত্তের নিরুদ্বেগ মোহান্ধতা ও মানসিক জড়তা যাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

১১

গান্ধীজির রাষ্ট্রনায়ক শিষ্যেরা এ পথে চলতে ভরসা করেননি; নিজের হাতে পুরাতনকে ভেঙে নূতনকে গড়তে যে সাহসের প্রয়োজন সে সাহস তাঁদের হয়নি। কারণ বোঝা কঠিন নয়। গান্ধীজির নব মন-কলেবর কংগ্রেসের উপর দেশের লোকের যে আস্থা ও শ্রদ্ধা তার মূলে ওই কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের দেশের স্বাধীনতার জন্য কষ্টবরণ এবং দেশের লোকের প্রতি মৈত্রী ও তাদের সেবায় স্বার্থত্যাগ। রাষ্ট্রশাসন-পরিচালক কংগ্রেসের সঙ্গে

দেশের লোকের পরিচয় নেই সেজন্য স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন অধীনতামোচনের জন্য দুঃখবরণ অপ্রয়োজন তখন যদি কংগ্রেসের এক দলের কাজ হয় পূর্বের মতো সাক্ষাৎ মৈত্রী ও সেবা, এবং অন্য দলের হাতে থাকে রাষ্ট্রশাসন তবে স্বভাবতই দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থা যাবে প্রথম দলের উপর, এবং শাসকদলের উপর সশ্রদ্ধ ও অকুণ্ঠ আনুগত্যের দৈন্যে রাষ্ট্রশাসনের বিরাট ও জটিল গতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ অন্য শ্রেণির তুলনায় শাসকশ্রেণির প্রভাব দেশের লোকের মনে ক্রমে কমার আশঙ্কা থাকে, যদি না শাসনের কুশলতায় ও জনসাধারণের হিতে তার সুস্পষ্ট আন্তরিকতায় অচিরকালেই সেই শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করা যায়। সেইজন্য গান্ধীজির রাষ্ট্রশাসক শিষ্যদের প্রয়োজন তাঁদের রাষ্ট্রশাসনের অনুকূলে কংগ্রেসের উপর দেশের শ্রদ্ধা ও আস্থা, যে শ্রদ্ধা ও আস্থা কংগ্রেস অর্জন করেছে রাষ্ট্রশাসন কুশলতার ফলে নয়। সেইজন্যেই স্বাধীন ভারতবর্ষেও কংগ্রেস দেশের সকল লোকের প্রতিনিধি, আবার রাষ্ট্রক্ষমতালাভে গণতান্ত্রিক ভোটের সময় কংগ্রেস পলিটিক্যাল দলের একটি দল। এবং এ অসংগতিকে নিজের মনে ও পরের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয় হঠাৎ-উপস্থিত পরিস্থিতি ও তার বিপদসংকুলতার অজুহাত দিয়ে।

গান্ধীজির প্রধান শিষ্যদের নূতন অবস্থার নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কারে এই অক্ষমতা ও প্রয়োগে অসাহসিকতা নির্ভুল প্রমাণ যে গান্ধীজির জীবন ও কর্ম এই শিষ্যদের মনে নবজীবন সঞ্চার করেনি। তাঁদের জীবনে গান্ধীজির জীবনের প্রভাব বাহ্য। কারও মনের গড়ন গান্ধীজির মনের গড়নের প্রায় বিপরীত। তাঁর জীবনকালে তাঁর দেশব্যাপী প্রায় অলৌকিক প্রভাবের কাছে অবশ্য নতিস্বীকার করতে হয়েছে। কোনও বড় ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ অমান্যের সাহস হয়নি। তাঁর প্রতি দেশের বেশির ভাগ লোকের দ্বিধাহীন আনুগত্যের সুযোগও অনেক নিতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর কাজে প্রকাশ হচ্ছে অশোধিত মূল চরিত্রের, তার দোষে তার গুণে। কারও মন অনেকটা গান্ধীজির মনের সধর্মী। কিন্তু চরিত্রে গান্ধীজির দৃঢ়তা ও বুদ্ধিতে তাঁর প্রতিভার অংশের অভাবে সে মনের উপর গান্ধীজির মনের প্রভাব পরিণতি পেয়েছে ভাবাবিষ্ট কল্পনাবিলাসে, মনোমোহন উদার বাক্যে যা নিজেকে চরিতার্থ করে। কাজ চলে গতানুগতিক সংকীর্ণ পথে, যে পথে রাষ্ট্রনেতাদের কাজ চিরকাল চলেছে; যার মধ্যে গান্ধীজির শিষ্যত্বের পরিচয় নেই। কারও মন ও চরিত্র গান্ধীজির মন ও চরিত্রের প্রভাবে উৎসন্নপ্রায় হয়েছে। চোখে পড়ার মতো নিজের বৈশিষ্ট্য কিছু অবশেষ নেই। তাঁদের চরম সাফল্যবোধ গান্ধীজির কথা ও কাজের অনুকরণে। উপস্থিত প্রসঙ্গে ও অবস্থায় সে কথা ও কাজ প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক তাঁদের মনে সে বিচারের দুয়ার বন্ধ। গান্ধীজির জীবন ও কর্মের বিশাল বেগবান প্রবাহকে তাঁরা নিজের মনে পরিণত করেছেন কঠিন বরফের জমাট পঙ্‌ক্তিতে; যার পরিচ্ছিন্ন অচল জ্যামিতিক রূপের নকল সম্ভব। গান্ধীজি তাঁর কর্মের গতিপথ কতবার পরিবর্তন করেছেন সেদিকে তাঁরা চোখ দিতে চান না। আর সকল পরিবর্তনের মধ্যে আদর্শের যে ধ্রুবত্ব তার দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানে কর্মবিশেষে তাকে প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত হয় না। যদি হত তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা ও মহাপুরুষদের চরিত্রলেখকেরা হতেন পৃথিবীর বড় সব কর্মী। গান্ধীজির এই শিষ্যেরা গান্ধীসংঘে থেরবাদী। নূতন অবস্থাকে তাঁরা স্বীকার করেন না, নূতন উপায়কে গ্রহণ করেন না।

সংসারে গুরু পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু শিষ্য মেলে অল্প— এ প্রবাদের মৌলিক তথ্য হচ্ছে যে-শিষ্যেরা গুরুর বাক্য ও আচারের অনুকরণে তৃপ্ত তারা উপযুক্ত শিষ্য নয়। শিষ্যত্বের সাধনা গুরুর জীবনের ধারাকে নিজের জীবনে আনার 'পাইপ-লেয়িং'-এর সাধনা নয়। গুরুর জীবনের প্রভাবে শিষ্যের মন ও চরিত্রের শক্তি অর্গলমুক্ত হয়, হয়তো নূতন পথে চলে, যে পথ গুরুর জীবনের পথ নয়— যেমন রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ শিষ্য। কিন্তু সে শক্তি শিষ্যের নিজস্ব শক্তি, গুরুর কাছে ধার করা নয়। তার বেগ ও পরিমাণ নির্ভর করে শিষ্যের জীবনে সে শক্তির সঞ্চিত ভাণ্ডারের আয়তনের উপর। কবি বলেছেন, সূর্যের কিরণে মণি থেকে আলো ঠিকরে পড়ে, মাটির ঢেলা থেকে নয়। প্রদীপের স্পর্শে দীপ জ্বলে, কিন্তু তেল-সলতে দীপের নিজের। তাদের উপরে নির্ভর করে তার আলোর ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্বের কাল।

গান্ধীজির সাক্ষাৎ-শিষ্যদের জীবনে গান্ধীজির চরিত্রের প্রভাবে শক্তির কোনও বিশাল ও বিচিত্র স্ফূর্তি দেখা যায়নি। নূতন ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক সমস্যার সমাধানের তাঁরা এমন নূতন পথ আবিষ্কার করেননি যার নূতনত্ব ও কুশলতা মনে বিস্ময় ও আনন্দ আনে; সে নূতন পথে গান্ধীজি কখনও না হাঁটলেও তাঁর পায়ের চিহ্ন যেখানে চোখ এড়ায় না। গান্ধীজির স্পর্শে তাঁর শিষ্যদের মন ও চরিত্রে শক্তির পথমুক্তি হয়নি। যদি হয়ে থাকে তবে গান্ধীজির মাপে সে শক্তির পরিমাণ ছিল অতি অল্প।

১২

সেইজন্য গান্ধীজির রাষ্ট্রনেতা-শিষ্যদের রাষ্ট্রীয় কাজ সেখানেই সফল হয়েছে যে কাজে নূতন কল্পনার প্রয়োজন হয়নি। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বহু বিচ্ছিন্ন শিথিল অংশকে কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে তাঁরা কাঠামোর আভ্যন্তরিক গড়নকে সুদৃঢ় করেছেন। সে মিলনের জন্য যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলির জনসমষ্টি প্রস্তুত ও উন্মুখ ছিল তাতে এ কাজের সার্থকতা ও কৌশলের মূল্য কিছুমাত্র কমে না। কিন্তু একরাষ্ট্র ভারতবর্ষের দৃঢ়সম্বন্ধ কাঠামোর কল্পনা পুরাতন। ইংরেজ রাজশাসন সে কল্পনা করেছিল এবং কল্পনাকে কাজে পরিণত করতে আরম্ভ করে রাজনৈতিক মতপরিবর্তনেই তা থেকে বিরত হয়েছিল। এই দৃঢ় কাঠামোয় রাষ্ট্রের সবল, সুঠাম, কল্যাণমূর্তির প্রতিষ্ঠায় নূতন কল্পনার প্রয়োজন। সে মূর্তি যে রাষ্ট্রনেতাদের ধ্যানেও আছে এ পর্যন্ত তার প্রমাণ নেই। রাষ্ট্রের কাঠামো রাষ্ট্রের কঙ্কাল। কঙ্কালের মতোই দেহের আশ্রয়। কিন্তু রাষ্ট্রের কঙ্কালকেই রাষ্ট্রের দেহ বলে ভুল করা মারাত্মক। অস্থিবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা এক বিদ্যা নয়।

গান্ধীজির শিষ্যদের পররাষ্ট্রনীতি বাচনিক প্রতিজ্ঞায় মহীয়ান। ভারতবর্ষ এশিয়ার অশ্বেতজাতির লোকের রাষ্ট্র। শ্বেতজাতির পরাধীনতার দুঃখ সে জানে। তার পররাষ্ট্রনীতি পরপীড়ক শ্বেতরাষ্ট্রগুলির 'ডিপ্লমেসি' হবে না। উদার মানবতার উপর তার প্রতিষ্ঠা। সকল রাষ্ট্রের প্রতি তার মৈত্রী, সকল উৎপীড়িতের সে বন্ধু। এই নীতিকে বাস্তবে যখন মূর্ত করতে

হয় তখন দেখা যায় আমাদের রাষ্ট্রনেতারা হালে, চালে, মৌখিক সৌজন্যে, অপ্রিয় সত্যের অকথনে, প্রিয় অসত্যের ব্যঞ্জনায়, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় রাষ্ট্রের নেতাদের 'ডিপ্লমেসি'র অনুকরণে ব্যস্ত। সে নেতারা বড় কথার ফেনরাশির তলায় ও অশ্বেত চামড়ার নীচে নিজেদের শিষ্য সহাধ্যায়ীর মূর্তি সহজেই দেখতে পান। সুতরাং নিরুদ্বেগ প্রশংসায় তাঁরা অকৃপণ। গান্ধীজির নিজের ও পরের সম্বন্ধে সে অপক্ষপাত সত্যনিষ্ঠা ও সত্যভাষণ তাঁর অনুচরদের লজ্জিত করত, পরের মনে জাগাত অসন্তুষ্ট বিস্ময়— এ নীতিতে তার প্রাণস্পর্শ নেই। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতিতে ইউরামেরিকার রাজনীতিজ্ঞেরা অর্ধনগ্ন ফকিরের ছায়া না দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

গান্ধীজির যেসকল শিষ্যেরা রাষ্ট্রশাসনে স্থান নেননি, যাকে গান্ধীজির 'গঠনমূলক কাজ' বলে তাতে রত আছেন, তাঁরা গান্ধীজির মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত গান্ধীজি তাঁর জীবনকালে যে পথের যে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে রেখামাত্র প্রসারের কল্পনা করেননি। অথচ এ কথা স্পষ্ট যে গান্ধীজি অনেক কাজের প্রকার ও পরিমাণের উপদেশ করেছেন, উপায়ের অনেক কৌশলের নির্দেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষের অধীনতার পটভূমিতে। যে কাজ ও উপায়ের সফলতা সে অবস্থায় সম্ভব মনে করেননি তার উপদেশও করেননি। অনেক কাজের কোনও উপদেশ দেননি, সে কাজের প্রয়োজন নেই বলে নয়, তার গুরুত্ব কম বলে নয়, কিন্তু তখন অন্য অনেক কাজে তার উপদেশ ও নির্দেশের প্রয়োজন বেশি মনে করে। কারণ স্বভাবতই তাঁর অনেক কাজ ছিল ভারতবর্ষের অধীনতামুক্তির উপায়ের প্রস্তুতি, যদিও তাঁর কোনও উপায়ের উপদেশ এমন ছিল না লক্ষ্যে পৌঁছনো ছাড়া যার অন্য ফল নেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর গান্ধীজি অল্প দিন বেঁচে ছিলেন। এবং সে অল্প কয়েকদিনও কেটেছে মানুষের আকস্মিক নির্দয় পশুত্বকে তাঁর নিজের উপায়ে প্রতিরোধের চেষ্টায়। এই অস্বাভাবিক আকস্মিকতার প্রশমনের পর গান্ধীজি কিছুকাল বেঁচে থাকলে যে অনেক নূতন কাজ ও পথের সন্ধান দিতেন, পুরাতন কাজ ও পথের সম্প্রসার করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ গান্ধীজির গান্ধীবাদে আস্থা ছিল না, গান্ধীদর্শনে তিনি পণ্ডিত ছিলেন না। গান্ধীজির মত ও পথের এক অংশ ভারতবর্ষের লোকদের ভারতবর্ষের এক বিশেষ অবস্থায় উপদেশ; অন্য অংশ সকল দেশের ও সর্বকালের। কিন্তু এ সনাতন আত্মাতেও জড়ত্ব আসে যদি না নূতন অবস্থার নূতন দেহে পুনঃ পুনঃ তার নবজন্ম হয়। গান্ধীজির শিষ্যদের মধ্যে এ নবজাতকের ধাত্রী কাকেও দেখা যায় না। তাঁরা গান্ধীজির কথা মন্ত্রের মতো আবৃত্তি করেন, তাঁর আচার অচল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। গান্ধীজির জীবনের আগুনে তাঁদের জীবনে বহুবর্ণের শিখা জ্বলে ওঠেনি। তার মালমশলা ছিল না। যে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি গান্ধীজির একনিষ্ঠ কর্মে বৈচিত্র্যের বিস্ময় আনত শিষ্যদের জীবনে তার স্ফূর্তি নেই। কারণ, এর উত্তরাধিকারিত্ব নেই, কি সন্তানের কি শিষ্যের।

গান্ধীজির জীবনকালের শিষ্যদের কথা যা হোক, এমন আশা দুরাশা নয় যে, গান্ধীজির চরিতকথা যখন ভবিষ্যবংশীয়দের বিস্মিত কল্পনার বস্তু হবে, যখন তাঁর জীবন সমসাময়িক পরিবেশের স্বল্পতা থেকে মুক্ত হয়ে মহাকালের পটে অঙ্কিত হবে তখন গান্ধীজির উপযুক্ত শিষ্যের আবির্ভাব হবে। যে শিষ্য গান্ধীজির জীবন ও কর্মের বাহ্যিক অনুকরণ করবে না।

যার শক্তির প্রাচুর্য ও প্রতিভার সঞ্চয় গান্ধীজির জীবনস্মৃতির স্পর্শে প্রাণের গতিতে বেগবান হবে। মানুষের চরিত্রে মহত্ত্বের নূতন সম্ভাবনা দেখাবে; মানুষের সমাজবন্ধনে মৈত্রীর নূতন ভিত্তি স্থাপন করবে। সে শিষ্যের জীবনে গান্ধীজির জীবনের আশীর্বাদ বর্ষণ হবে। এমন শিষ্যত্বের দৃষ্টান্ত মানুষের ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়।

১৩

মানুষের ব্যক্তিত্ব গান্ধীজির চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্য। সমাজনিরপেক্ষ বুনো মানুষের নয়, যোগের আসনে একক তপস্বী মানুষেরও নয়। সমাজের মধ্যে সামাজিক মানুষের ব্যক্তিত্ব। সে ব্যক্তিত্বের জন্ম ও বিকাশ হয় সমাজের অন্যসব ব্যক্তির সঙ্গে আদানপ্রদান প্রীতিমমতার সম্পর্কের বন্ধনে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব মানুষের ব্যক্তিত্ব, সমাজের জনসমষ্টির নয়। যে মানুষ সবার উপর সত্য সে মানুষ ব্যক্তিগত মানুষ, মানুষের সমাজ নয়। মহত্ত্ব ব্যক্তির মহত্ত্ব, হীনতা ব্যক্তির হীনতা। ব্যক্তির মহত্ত্ব হীনতার চিন্তা না করে মহৎ সমাজ গড়ার সম্ভাবনার কল্পনা, কাজকে সহজ করার কল্পনা। তাতে কাজ সহজ হয়, কিন্তু কাজ হয় না। সেইজন্য বহুব্যাপী রাষ্ট্রচেষ্টার মধ্যেও গান্ধীজির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত কেবল চেষ্টার ফলের উপরে নয়, ব্যক্তির মহত্ত্ব-হীনতা বল-দুর্বলতার উপর। এটি একশ্রেণির মার্কসপন্থীর বহুনিন্দিত সমাজসচেতনতার অভাব নয়। সমাজের চরম মঙ্গল ও তার অপরিহার্য উপায়ের সচেতনতা।

ব্যক্তিত্বের উপর গান্ধীজির এই চরম মূল্যের আরোপ বাঙালির কৃষ্টির আদর্শের অন্তরঙ্গ। ঠিক সেই কারণেই গান্ধীজি মানুষের কাম্য চরিত্রের যে কল্পনা করেছেন তার শুষ্ক অসম্পূর্ণতা বাঙালির মনকে পীড়া দিয়েছে। নিকট-আত্মীয়ার তেজোদ্দীপ্ত তপঃশীর্ণা বিধবার মূর্তি মনকে যেমন পীড়া দেয়, কাব্য ও সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত— এদের রসজ্ঞতা, জ্ঞানের নিঃস্বার্থ আকর্ষণে উন্মুখতা, জীবনে যে বিচিত্রের আস্বাদ আনে, জীবনকে জৈবিকচক্র থেকে মুক্তির যে আনন্দ দেয়— সে স্বাদ ও আনন্দ গান্ধীজির আদর্শ মানুষের জীবনে নেই। তার চরিত্রের ঋজু দৃঢ়তা, উদার মৈত্রী, সর্বহিতে কর্মের অক্লান্তি— মনকে শ্রদ্ধায় নত করে, প্রীতিতে পূর্ণ করে না। গান্ধীজি যে সাম্য ও মৈত্রীর সমাজ কল্পনা করেছেন তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বে সামাজিক মানুষের এই চরিত্র হল ভিত্তি ও আশ্রয়। কিন্তু সে সমাজে মানুষের এ রূপ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। এ হচ্ছে সৈনিকের বাহুল্যবর্জিত জীবন। যুদ্ধের উন্মাদনায়, আদর্শে পৌঁছবার আকুতিতে এ জীবনে লোকে সাময়িক তুষ্ট থাকে; আর কোনও আকর্ষণ, অন্য কিছুর অভাব সে বোধ করে না। সে উন্মাদনা ও আকুতি শিথিল হলেই এ জীবন আর লোককে তুষ্টি দেয় না। তার শীর্ণতার নিরানন্দ জীবনকে বিরস করে। মানুষের সভ্যতার অহৈতুক আনন্দের যা সব বড় সৃষ্টি জীবনে তার জোগান না থাকলে হালকা আমোদের মত্ততা মানুষের মনকে ছোট ও উচ্ছৃঙ্খল করে। সমাজের ভিত্তি চঞ্চল হয়, গড়নে ফাটল ধরে। এমন মানুষ অবশ্য আছে আদর্শের জন্য সংগ্রামের আকুতি যাদের মনের স্থায়ীভাব।

তাদের সংখ্যা কম। সম্ভব মানুষের আদিম সামরিকতা তাদের মনে এই মঙ্গলময় রূপান্তর নিয়েছে।

যে ব্যক্তিত্বকে গান্ধীজি চরম মূল্য দিয়েছেন তার কল্পনা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের কল্পনা। ব্যক্তির মনের ও চরিত্রের বহুমুখিত্ব ও বহুভিন্নমুখিত্বের তাতে স্থান নেই। মূর্তির সুঠাম গড়ন, কিন্তু সকল মূর্তির এক গড়ন। গান্ধীজির চরিত্রকল্পনার মূলে ছিল তাঁর নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা, আর মানুষের মর্যাদার জন্য যে সংগ্রামের পর সংগ্রামে তিনি যৌবন থেকে বার্ধক্যের শেষসীমা পর্যন্ত রত ছিলেন তার অভিনব সংগ্রামরীতির উপযুক্ত সৈনিকের চরিত্রকল্পনা। সে চরিত্র যত শ্রেষ্ঠ হোক, বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূলে উপকরণের ঐকান্তিকতায় সে প্রয়োজন যতই বড় হোক, এ চরিত্রে যে রিক্ততার দৈন্য আসে, গান্ধীজি কি সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না? এমন কল্পনা কি বাস্তব ভিত্তিহীন যে গান্ধীজির জীবনকাল যদি আরও দীর্ঘ হত, আর তাঁর জীবনকালে এ সংগ্রামের তীব্রতা কিছু কমত, তবে গান্ধীজি তাঁর মানুষের আদর্শে আরও উপাদান আনতেন? যে ব্যক্তিত্ব মানুষের জীবনের তাঁর চরম মাপকাঠি সে ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দিতেন? গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে বলতেন গুরুদেব। তাঁর মুখের ডাকেও মৌলিক সম্মান ও সৌজন্য ছাড়া আর কিছু সত্য নেই, এ কথা মনে করার সাহস হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির কীসে গুরুদেব? তাঁদের দুজনার সকল মানুষের উপর মৈত্রী, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসবীর্য তাঁদের মনে গভীর সাজাত্যবোধ এনেছিল। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির গুরুদেব ছিলেন না। বরং গান্ধীজির চরিত্রে এদের অচল প্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজির উপর পরম শ্রদ্ধাশীল করেছিল। এ কল্পনা কি অসংগত যে গান্ধীজি তাঁর আদর্শ-চরিত্রের কল্পনায় যে অসম্পূর্ণতা বোধ করতেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার পূর্ণতা দেখেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল মহাকবি হতেন, কেবল অসাধারণ সাহিত্যিক অসাধারণ কলাস্রষ্টা ও কলারসজ্ঞ হতেন, গান্ধীজি কখনই তাঁকে গুরুদেব বলতেন না। তাঁর চরিত্রের আদর্শে অসীম অনুরাগী, কিন্তু তার রিক্ততা যাঁর জীবনের ও আদর্শের পরিপূর্ণতায় পূর্ণ সেই রবীন্দ্রনাথকেই সম্ভব গান্ধীজি বলেছেন গুরুদেব। এ কল্পনা সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এ দুয়ের সমন্বয়েই সুস্থ ও সবল, সাম্য ও মৈত্রীর আনন্দময় সমাজ গড়তে পারে। এ সমন্বয় কঠিন। মানুষের ও তার সমাজের সকল সমস্যাই কঠিন। কোনও সমাজে এর কথঞ্চিৎপূর্ণ রূপ যখন কখনও দেখা যায় মানুষের স্বভাব-চঞ্চলতা তার নানা শক্তির দুর্ঘট সাম্যকে অচিরকালেই বিপর্যস্ত করে। তবুও যতকাল থাকে মানুষের তা পরম সম্পদ। এর স্থায়িত্বের দৈর্ঘ্যে এর মূল্য নয়। এর স্বপ্নও 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'— কাপুরুষের হীনতা ও কঙ্কালের রিক্ততার ভয় থেকে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য পুস্তক অতি অল্পই লিখিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ও অভিধান সকলই পদ্যে লিখিত। কাদম্বরী প্রভৃতি যে কয়েকখানি গদ্য পুস্তিকা এখন পাওয়া যায় তাহার দুই একটি বাক্য শ্রবণ করিলে তাহা পদ্য কি গদ্য নিরূপণ করা দুর্ঘট হইয়া ওঠে। বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারই পৌত্রী[1]। সুতরাং এদেশে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে, বাংলা ভাষার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই পদ্যে সমস্ত কঠিন তত্ত্বের আলোচনা হওয়া দুষ্কর। দর্শন ও ইতিহাস পদ্যে লেখা বিড়ম্বনা। কারণ সুমধুর পদ্যে সকল তত্ত্ব পরিস্ফুট করা যাইতে পারে না। এক তত্ত্ব ইহার অন্য তত্ত্ব প্রকাশ, এক মত সমর্থন ও অন্য মতের খণ্ডন, এবং সমাজ পরিচালনার্থ নব প্রথা প্রচলন আদি কার্য গদ্যের আশ্রয় ভিন্ন হইবার উপায় নাই। তাই মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় বঙ্গভাষায়, যাহাকে গদ্য বলা যায় তাহারই অবতারণা হইল। কিন্তু সে গদ্য প্রাণশূন্য। রামমোহনের পুস্তক সকল গভীর ভাবপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাষা জীবনহীন। তাহার পর বঙ্গভাষার গদ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের রাজত্বকাল। বিদ্যাসাগরের ভাষা রামমোহনের ভাষা অপেক্ষা পরিমার্জিত বটে, কিন্তু তাহাও যেন প্রাণহীন। সে ভাষা শুনিয়া হৃদয়তন্ত্রী ঝংকার দিয়া উঠে না, কর্ণে প্রবেশ মাত্রই প্রাণ আলোড়িত করিয়া তোলে না। তবে বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষাকে একরূপ পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে শকুন্তলার ভাষা অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর ও প্রাঞ্জল। ভাষার উচ্ছ্বাস ও শব্দের লালিত্য আমরা প্রথম অক্ষয়কুমারের লেখায় দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমারের ভাষা জীবনশূন্য নহে, সম্পূর্ণ জীবনময়ী। আর ইংরেজিতে যাহাকে easy flow কহে তাহারও এইখানে আরম্ভ এবং বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্র। অক্ষয়কুমারের ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে প্রমাণিত হইবে। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি অতিভাব পূর্ণ। বিদ্যাসাগরের পরেই আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক নীলদর্পণ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা ঠিক নাটকের উপযোগী না হইলেও ইহা নানা নাটকীয় গুণে অলংকৃত। দীনবন্ধুর পরই বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রগণের সাহিত্যরাজ্যে রাজত্বকাল। এবং এই সময়ই বঙ্গভাষার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের পরে কিংবা তাঁহাদের সময়ে সে দুই-একজন গদ্য লিখিতেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ না করিলেও চলে। কবি ঈশ্বর গুপ্তও গদ্য লিখিয়াছিলেন

১ বামগতি ন্যায়বত্নেব "বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ"?

কিন্তু তাঁহার "নব নব নয়ন বল্লভ পল্লব" প্রভৃতি সুমধুর ব্রজবুলিরই উপযোগী, গদ্যের নহে (পদ্যেও প্রায় নহে)। তবে ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" বঙ্গীয় সাহিত্যের অনেক উপকার করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সময়ে বঙ্গদেশে ইংরেজি ভাষার বহুল প্রচার হইয়াছিল। ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুমার্জিত, লালিত্যপূর্ণ, অকৃত্রিম ইংরেজি গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া আর এই কৃত্রিমতাপূর্ণ, লালিত্যশূন্য বঙ্গভাষায় তৃপ্তি পাইলেন না। সুতরাং বঙ্গভাষার আলোচনা শিক্ষিত বঙ্গীয় সন্তানগণ একরূপ পরিত্যাগ করিলেন। অনেকেই ইংরাজি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্গভাষার উন্নতি সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু প্রকৃতির চক্র অন্যরূপ। সেই পাশ্চাত্য সাহিত্য মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র রূপ সূর্যোদয় হইল। এতদিনে বঙ্গীয় গদ্য সংস্কৃত ভাব ও ভাষা প্রধান ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত ভাব মিশ্রিত করিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য একত্র করিয়া আপনার মনোহারিণী ভাষা গঠিত করিলেন। সে ভাষা যেমন প্রাণময়ী, তেমনি ভাবপূর্ণ। তেমনি লালিত্যপূর্ণ, আবার তেমনি লেখকের ইচ্ছামতো সকল ভাব মনে উদ্রেক করিতে সমর্থ। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" ১৮৬৪ খ্রি. অব্দে প্রকাশিত হইলে বঙ্গ সাহিত্যে এক অভাবনীয় যুগান্তর উপস্থিত হইল। এবং যখন তাঁহার "কপালকুণ্ডলা", "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি প্রচারিত হইল তখন সকলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে বঙ্গভাষায় সকল রকম পুস্তকই লেখা সম্ভব। তাহার পর "বঙ্গদর্শন" নামক পত্র বঙ্গভাষার যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে লাগিল। রমেশচন্দ্রের "শতবর্ষ" প্রকাশিত হইল। ইহার ভাষা ওজস্বিনী, লালিত্যপূর্ণ ও প্রাণময়ী। ভাষার উৎকর্ষে "মাধবীকঙ্কণ" সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার পরই "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হইল। ইহাদের ভাষা সরল ও সুন্দর। বঙ্কিমবাবুর "ইন্দিরা"র ভাষা এইরূপ ভাষার আদর্শ। নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে লাগিল। এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের গভীর তত্ত্বের গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষা ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আজ বঙ্গভাষা উন্নতির পথে। এখন বঙ্গভাষায় দর্শন, বিজ্ঞানের বড়ই অভাব অনুভূত হইতেছে। এই সকল পুস্তক যতই প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। এবং ইংরেজির easy flow ও সংস্কৃতের পদলালিত্য একত্র হইলে বঙ্গীয় গদ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে।

অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩০৫। ৪র্থ ভাগ। ৮, ৯, ১০, ১১ ১২ সংখ্যা ১৩০৫।

বীরবল

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবার দিল্লি গিয়ে জেনে এসেছেন যে অনেকে প্রমথ চৌধুরীকে জানেন না, কিন্তু 'বীরবল'কে চেনেন। এঁরা তত্ত্বদর্শী লোক, ঠিক জিনিসকেই চিনেছেন। কারণ 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মবেশ নয়, আত্মপ্রকাশ।

আকবরের সভার ঐতিহাসিক বীরবল লোকটি কে এবং কেমন ছিলেন, শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় তার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। যাঁরা ইতিহাসের প্রশ্নতাত্ত্বিক নন তাঁরা এই গবেষণার ফলের জন্য নিশ্চয় উৎসুক থাকবেন। ইতিমধ্যে বাংলা-সাহিত্য-সভার 'বীরবল'টির একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

কবি সংসারকে বলেছেন নাট্যমঞ্চ, আর মানুষকে তার অভিনেতা, কিন্তু এ অভিনয়ে যারা অভিনেতা, তারাই আবার দর্শক। তবে সকল অভিনেতা দর্শক নয়। অনেকেরই নিজের অভিনয় থেকে মুখ তুলে, কেবল দর্শক হিসাবে, পরের অভিনয় চেয়ে দেখার ক্ষমতা নেই। যাদের আছে তাদের সকলের চোখে এ অভিনয়ের এক রূপ নয়, সকলের মনে এ নাটকের এক রস নয়। 'বীরবল' হচ্ছে এই নাট্যাভিনয়ের দর্শক। অর্থাৎ তার অভিনয়ের অংশটা অপ্রধান এবং প্রচ্ছন্ন, দর্শকের অংশটাই প্রধান এবং প্রকট। এবং এ নাটক 'বীরবলে'র মনে যে রসের সঞ্চার করে সেটি নবরসের অতিরিক্ত এক দশম রস, যাকে বলা যেতে পারে 'মনন রস'। মানুষের মতামত, বিশ্বাস অবিশ্বাস, কর্ম-অকর্ম, কাউকে মাতায়, কাউকে রাগায়, কাউকে কাঁদায়, কাউকে বা হাসায়। 'বীরবলে'র মনের উপর এদের 'ভাব-ফল', মনস্তত্ত্ববিদেরা যাকে বলেন affect, এত সহজ ও সরল নয়। 'মস্তিষ্কের বকযন্ত্রে' অন্তত দুবার না চুইয়ে কোনও জিনিস 'বীরবলে'র 'ভাবে'র পথে ছাড়া পায় না। আর এই কর্মকুশল যন্ত্রটিকে চুইয়ে নেবার ফলে অনেক সময় দেখা যায় খুব প্রকাণ্ড চেহারার জিনিস থেকে গাঁদ ছাড়া এক ফোঁটাও সার বেরুল না। অথবা যেটুকু বেরুল তা মানুষকে মাতানো দূরের কথা, হাসাবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

এই 'বকযন্ত্রটি' বাংলা-সাহিত্যের 'ল্যাবরেটরি'তে 'বীরবলে'র একটা প্রধান দান। এর কাজ ভাব, চিন্তা, ভাষা— সব জিনিসকেই চুইয়ে নেওয়া; যাতে এদের ভার বাদ দিয়ে সার বের হয়। 'বীরবল' যে সংস্কৃত ভঙ্গির গুরুভার থেকে বাংলার সাহিত্যের ভাষাকে মুক্তি দিতে শিখিয়েছেন, সেটাও এই 'বকযন্ত্রে'র কাজ। বীরবলের নিজের কথায়, "ভাষার এখন শানিয়ে ধার বা'র করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।... ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে' এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন— কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেননি।" (কথার কথা) ঠিক এই কারণেই যে চিন্তা

'চিন্তাশীল' অর্থাৎ ধারের চেয়ে ভার বেশি, আলোর চেয়ে আয়োজন বেশি— বীরবলের মন তার উপর বিমুখ। "রসিকতা ছাড়লে আমাকে 'চিন্তাশীল' লেখক হ'তে হবে— অর্থাৎ অতি গম্ভীরভাবে অতি সাধুভাষায় বার বার হয়কে নয় এবং নয়কে হয় বল্‌তে হবে। কারণ, যা প্রত্যক্ষ তাকেই যদি সত্য বলি, তাহ'লে আর গবেষণার কি পরিচয় দিলুম? কিন্তু আমার পক্ষে ওরূপ করা সহজ নয়। ভগবান্, আমার বিশ্বাস মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখ্‌বার জন্য,— তাতে ঠুলি পরবার জন্য নয়। সে ঠুলির নাম দর্শন দিলেও তা অগ্রাহ্য।" (বীরবলের চিঠি)। চিন্তা ও ভাষায় 'বীরবলে'র মনঃপূত আদর্শ কি তা তিনি 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে' খুলে বলেছেন। "এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে' আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়,— তাহ'লে সে জিনিষের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হ'লেও চলে; কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকেরা এই সত্যটি মনে রাখলে গল্প স্বল্প হ'য়ে আসবে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামন রূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে' থাক্‌বে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে।"

মোগল আমলের বীরবল তাঁর হিন্দু-সংস্কার ত্যাগ করেননি। সেখানের মৌলবিরা লিখে গেছেন আকবরের যা কিছু অ-মোসলেম কার্যকলাপ তার মূলে নাকি এই ব্রাহ্মণসন্তানটি ছিলেন। ব্রিটিশ আমলের 'বীরবলে'র মধ্যেও তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কারই কাজ করছে— যাঁরা গল্পকে স্বল্প না করলেও, আর সব জিনিসকেই সূত্রে নয় শ্লোকে গেঁথেছেন।

যে কারণে 'বীরবল' নিজের ও পরের চোখে ঠুলি পরাবার বিরোধী, ঠিক সেই কারণেই বুদ্ধিগম্য জিনিসকে ভাবের রঙিন চোখে দেখতে 'বীরবল' নারাজ। 'বীরবল' চান সব জিনিসকে বুদ্ধির সাদা চোখে দেখতে। ফলে তার দেখার সঙ্গে অনেকেরই দেখার মিল হয় না। কারণ সাদা চোখে জিনিস দেখার ক্ষমতা অতি আয়াসলব্ধ শক্তি চোখের পাছে মন আছে বলেই চোখ দেখে। আর মনকে দরকার মতো ভাবের রং থেকে মুক্ত করা সকলের সাধ্য নয়। এবং সকলে তা ইচ্ছাও করে না। সেইজন্য স্নেহলতার আত্মঘাতে যখন সকলের মন করুণ রসে সিক্ত হয়ে নিজেদের সহৃদয়তায় আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করছে, তখন 'বীরবল' লিখে বসলেন, "আজ ঝোঁকের মাথায় মনে মনে যিনি যতই কঠিন পণ করুন না কেন, তার একটিও টিক্‌বে না,— থাক্‌বে শুধু বরপণ।"

কথা সত্য। কিন্তু নেশা যে ভেঙে দেয় তার উপর রাগও স্বাভাবিক। তাই বীরবলকে বলতে হয়েছে, "আমি চাই অপরের চোখের ঠুলি খুলে দিতে; শুধু শিং বাঁকানোর ভয়ে নিরস্ত হই। ফলে দাঁড়াল এই যে, রসিকতা করা নিরাপদ নয়, আর সত্য কথা বলাতে বিপদ আছে।"

'বীরবলে'র এই রসিকতা জিনিসটাই সাধারণের নিকট সবচেয়ে পরিচিত। একেই বলা হয় 'বীরবলী ঢং'। কিন্তু এ রসিকতার মূল হাস্যরস নয়, এর মূল যাকে বলেছি 'মনন-রস'। অর্থাৎ এ ঢং ভাবের ঢং নয়, বুদ্ধিকে খেলাবার ঢং। বীরবলের রচনা মস্তিষ্ককে জাগিয়ে তোলা ও জাগিয়ে রাখার জন্য 'ইলেকট্রিক শকে'র তার, তার রসিকতা হচ্ছে ওরই 'স্পার্ক'। সুতরাং যারা বিশুদ্ধ হাস্যরস চান, তাদের 'বীরবলে'র কাছে যাওয়া বৃথা। আর যারা বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করতে চান তারা যেন ও-ঢঙের কাছ দিয়েও না হাঁটেন এবং মোটের উপর এ

ঢংকে নকলের চেষ্টা না করাই ভাল। 'শক' দেবার ক্ষমতা নেই, খালি 'স্পার্ক' বের হয় এরকমের ব্যাটারি শিশু ছাড়া আর কারও কাছে আদর পাবে না। বীরবলের নিজের কথা হচ্ছে, "পরের ঢঙের নকল করে শুধু সঙ।"

সব জিনিসকে বুদ্ধির কলে নিংড়ে নিতে হতে হলে তার দাম দিতে হয়। 'বীরবল'কেও দিতে হয়েছে। এই নিংড়ে নেওয়ার ফলে অনেক জিনিসের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শুকনো হয়ে পড়ার একটা আশঙ্কা থাকে। কোনও কোনও জিনিস আছে রঙিন আলো ছাড়া যার স্বরূপ ঠিক দেখা যায় না। স্বাভাবিক ঝোঁকে 'বীরবল' সেখানেও কেবল সাদা আলোতেই দেখতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বীরবলে'র বাংলাদেশের 'এক ঢালা সবুজবর্ণের' বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"সবুজ, বাঙ্গলার শুধু দেশজোড়া রং নয়,— বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালঙ্কাবা হ'য়ে দেখা দেয় না, বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হ'য়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে' আসে না। শীতে বিধবার মত সাদা শাড়ীও পরে না। মাধব হতে মধু পর্য্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়ি কোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃতির ও সকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যভিচারী ভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ী-ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।" (সবুজপত্র)

লেখক মাত্রেরই স্বীকার করতে হবে এ লেখা হাত থেকে বের করা অতি কঠিন কাজ। তবুও এ বর্ণনা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে' মনকে সবুজ করে তোলে না; মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এর চিন্তার পারিপাট্য ও রচনার কৌশল সম্বন্ধে মনকে সচেতন করে। অথচ জিনিসটি হচ্ছে প্রধানত ভাবের বিষয়। মনে সবুজের 'ভাব' ধরাতে না পারলে এ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য সফল হল না। কিন্তু সূর্যের আলোতে মখমলের মসৃণতা নেই কেন এ আপশোস বৃথা।

দর্শন শাস্ত্রে বলে সত্ত্বগুণের লক্ষণ হচ্ছে যে তা লঘু ও প্রকাশক। বাংলা-সাহিত্যকে এই সত্ত্বগুণের ভক্ত করা 'বীরবলে'র সবচেয়ে বড় কাজ।

কল্লোল, ফাল্গুন ১৩৩৩

সমালোচক

সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর আছে তিনি সৃষ্টি করেন, যাঁর রসবোধের শক্তি আছে তিনি আস্বাদন করেন; এর মধ্যে সমালোচক লোকটি আবার কে? ইনি ঠিক লেখকও নন, আবার শুধুই পাঠকও নন, অথচ একাধারে পাঠক ও লেখক। আর সেই দ্বৈত ভাবের জোরে, পাঠককেও চোখ রাঙান, লেখককেও শাসন করেন। এই গুরুগিরির ফলে এঁর ধারণা জন্মে, আর সরল লোকেরও বিশ্বাস হয়, যে ইনি পাঠকদের চেয়ে অনেক উঁচু আর লেখকদের চেয়ে খাটো নন। এই মিথ্যা জ্ঞান নিরাশের এক উপায় 'সমালোচক' সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা।

সমালোচনার মূলতত্ত্ব বোঝা কঠিন নয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসের অনুভূতি সকল পাঠকের সমান নয়। এ অনুভূতি কারও সূক্ষ্ম, কারও মোটা; কারও ব্যাপক আবার কারও সংকীর্ণ। বেশির ভাগ পাঠকেরই সাহিত্যের বোধ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক নয়। কিন্তু অনেক পাঠকের এটুকু শক্তি আছে যে দেখিয়ে দিলে তারা দেখতে পায়। সমালোচনার কাজ এই দেখিয়ে দেওয়ার কাজ। যাঁর অনুভূতিতে সাধারণ দৃষ্টির অতীত সুষমা ও রসের উপলব্ধি হয়, তাঁর যদি অপরকে তা দেখিয়ে দেবার শক্তি ও প্রেরণা থাকে তবে তিনিই সমালোচক। সাহিত্যের জগতে সমালোচক হচ্ছেন দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা।

"কুমার সম্ভব" কাব্যের প্রথম শ্লোকটি সকলেরই জানা আছে।

> [অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
> পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥]

আমরা সাধারণ পাঠকেরা কাব্যের এই প্রথম শ্লোকের কাছে বেশি আশা করি না। কারণ এর কাজ কাব্যের বিষয়ের অবতারণা মাত্র। তবুও এই হিমালয় বর্ণনায় বিষয়োচিত গাম্ভীর্য আমাদেরও দৃষ্টি এড়ায় না, এবং আমাদের কান ও মন দুই-ই যে এতে বেশ খুশি হয়ে ওঠে তাও বুঝতে পারি।

এই খুশি হওয়ার তত্ত্বটা আলংকারিকদের চোখে ধরা পড়েছে। অনেকগুলি পদ নিয়ে এই শ্লোক, কিন্তু এর এক পদের সঙ্গে অন্য পদ, তাজমহলের পাথরের মতো, এমনই চমৎকার মিলে গেছে যে মাঝের জোড়া আর দেখা যায় না, মনে হয় এর সব পদ নিয়ে সমস্ত শ্লোকটা যেন একটি মাত্র পদ। আমাদের কান যে এই শ্লোকে খুশি হয় তার প্রধান কারণ এর এই "মসৃণত্ব"। আলংকারিকেরা আরও ধরিয়ে দিয়েছেন যে এই শ্লোকের সমস্তগুলি পদ, শব্দে ও ভাবে, ঠিক এক পথে চলেছে, হিমালয়ের প্রশান্ত গাম্ভীর্যকে ফুটিয়ে তোলার দিকে; সে "সমতা" কোথায়ও ভঙ্গ হয়নি। এবং এতেই মনকে খুশি করে তোলে।

আলংকারিকেরা নিজেদের সমালোচক বলতেন না। কিন্তু কালিদাসের এই শ্লোকের 'মসৃণত্ব' ও 'সমতা'র দিকে পাঠকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ তা হচ্ছে যথার্থ সমালোচকের কাজ। দেখিয়ে না দিলে অনেক পাঠককেই তা এড়িয়ে যায় এবং একবার চোখে পড়লেই রসানুভূতি পূর্বের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

এর পাশাপাশি এমনি 'সমালোচনা'র একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত তোলা যাক।

"পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন কোনও জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর মর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজলো— "সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু"— তারপরে তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল— "চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"— তারপর ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করল, "কহ হে দেবী অমৃতভাষিণি," তাবপরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড় কথা— সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ-গর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উন্মোচিত হল— "কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃ কুলনিধি রাঘবারি।"

(Rabındranath/ ছন্দ।
Sabujpatra— Chaıtra— 1324)

আলংকারিকদের উপর সুবিচার করতে হলে রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনা'য় যেটুকু মহাকবিব প্রকাশভঙ্গি তাকে পদ দিয়ে তুলনা করতে হবে এবং তা করলে বোঝা যাবে যে প্রাচীন ও নূতন— এই দুই 'সমালোচনা' এক জাতীয়। উভয়েই কাব্য-কৌশলের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তার প্রকাশ।

কিন্তু এমন 'সমালোচনা' ইচ্ছা থাকলেই লেখা যায় না, যেমন ইচ্ছা করলেই কবি হওয়া যায় না। কিন্তু অকবি লোকেও কাব্য লেখে, আর যাব কোনওরকম সাহিত্যিক সূক্ষ্মদৃষ্টি নেই সেও সমালোচক হয়। স্বভাবতই তাদের সমালোচনায় আলো থাকে না, থাকে শুধু উত্তাপ। কোনও নূতন সৌন্দর্য কি রস তারা পাঠকদের দেখাতে পারে না, কারণ তা তাদের নিজের চোখেই পড়ে না; সুতরাং তারা সোজাসুজি সাহিত্যের বিচারক হয়ে বসে ডিক্রি ডিসমিস এর রায় দিতে থাকে। এবং ডিক্রির যে তাদের .. রায় হয় অনেক বেশি তার কারণ এতে সহজেই প্রমাণ হয় যে তাদের সাহিত্যিক আদর্শটা ভারী উঁচু, এত উঁচু যে বেশির ভাগ সাহিত্যই তার সিকিরও নাগাল পায় না। 'কিছু হচ্ছে না' বললেই ইঙ্গিতে জানানো হয় যে 'হওয়া-যাকে-বলে' তার ধারণাটা আমার কত বড় তা তোমরা সাধারণ লোকেরা ধারণাই করতে পারবে না।

সাহিত্যের এই হাকিম-সমালোচকেরা সচরাচর নবীন সাহিত্য ও নূতন লেখকদের সমালোচনা করেন। কালের কষ্টি পাথরে যে সাহিত্য সোনা বলে প্রমাণ হয়েছে তা নিয়ে

আলোচনা কঠিন কাজ। তাকে 'কিছু নয়' বলা চলে না, 'খুব ভাল' বললে কিছু বলা হয় না। অন্য লোকে সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লে তবেই তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু সমালোচক নাম নিলেই চোখে দৃষ্টি আসে না; সেটা বিধাতার দান। নবীন লেখকদের সমালোচনায় এসব আপদ নেই। সেখানে নির্ভয়ে হাকিমি করা চলে। চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, ঘুসির জোর থাকলেই যথেষ্ট। অথচ নবীন সাহিত্যের সমালোচনায় রসবেত্তা সমালোচকেরাও যুগে যুগে কতই না অদ্ভুত কথা বলেছে।

শেকসপিয়রের যশ অচল হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কতদিন? শেলি যে বায়রনের চেয়ে বড় কবি একথা প্রথমে ইংল্যান্ডের কোনও সাহিত্য-সমালোচক বলেনি, বলেছিল একজন ন্যায়শাস্ত্র ও অর্থনীতির পণ্ডিত— নাম জন স্টুয়ার্ট মিল!

কিন্তু সমালোচকদের বিশ্বাস যে সমসাময়িক নবীন লেখকদের সম্বন্ধে তাদের ভালমন্দ লাগাটা বড় ছোটর একেবারে নির্ভুল মাপকাঠি।

এই সমালোচকেরা ভাবেন যে তাঁদের নিন্দা প্রশংসা সাহিত্যের বড় হিতকর। তাঁদের প্রশংসায় সুসাহিত্য উৎসাহ পায়, আর অ-সাহিত্য ও কু-সাহিত্য লজ্জায় মুখ ঢেকে সমাজ থেকে বিদায় নেয়। এর কোনওটাই ঘটে না। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা রসগ্রাহী পাঠকের অপেক্ষা রাখলেও, সমালোচনার কোনও অপেক্ষা রাখে না। আর সাহিত্যের সংসারে অসাহিত্য টিকে থাকে বি-রসজ্ঞ পাঠকদের কৃপায়। তারা যতদিন আছে এবং তাবা চিরকাল থাকবে, ততদিন সমালোচকদের লাঠি তার কিছুই করতে পারবে না।

সাহিত্যের জগতে সমালোচক Brahma, Bishnu, Maheshwar কিছুই নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি, কি পালন, কি সংহারে তার কোনও হাত নেই। যে সমালোচক মনে করে যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তার সহায়তা আছে, তার ভুলটা ঠিক সেই রকমের, যদি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মনে করত যে গ্রহের চলাফেরার রাস্তা আবিষ্কার করে তার গতির সহায়তা করা হচ্ছে। বিশ্বের রহস্য কবির মনে যে প্রকাশের আবেগ আনে তা থেকে কাব্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের বিশ্ব তত্ত্বদর্শী রসজ্ঞের মনে যে আনন্দের আবেগ আনে 'সমালোচনা' তার অভিব্যক্তি। ইনসপেক্টরি করা সমালোচকের কাজ নয়, তা 'স্যানিটোরিই' হোক আর 'লিটেরেরিই' হোক। সাহিত্যের হিতেচ্ছায় যে সব সমালোচনা তা অনেক পরহিতৈষণার মতো শুধুই পীড়াদায়ক।

কালি কলম, ১৩৩৪, দ্বিতীয় বর্ষ

সাহিত্যিক

পরম কাম্যবোধে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী যা সৃষ্টি ও সঞ্চয় করেছে অন্য দল মানুষ মুহূর্তের নির্মম ধ্বংসলীলায় মাটির ঢেলার মতো তাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করেছে— মানুষের ইতিহাসে এ ঘটনা নূতন নয়; উদীচী বর্বরেরা এমনি করেই গ্রিকো-রোমান সভ্যতা ধ্বংস করেছিল, তুর্কিদের আক্রমণে ইরা বোগদাদি সভ্যতা এমনি করেই উৎসন্ন হয়েছিল। নর-নারীর সাধারণ শান্ত জীবনযাত্রা, তাদের গৃহস্থালির ছোটখাটো সুখ-দুঃখ— যা মানুষের জীবনের পনেরো আনা— চিরকাল বিজয়ী ও পলায়মান সৈন্যদলের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়েছে। বীরত্বের নামে সৈনিক ও সেনানায়কের লোভ ও নিষ্ঠুরতা সে জীবনকে ছিন্নভিন্ন করতে কোনওদিনই দ্বিধা করেনি। এ নিষ্ঠুরতার উল্লাস যখন নরমুণ্ডে মঠ গড়া কি ওই ধরনের চমক লাগানো গল্পের উপাদান জুগিয়েছে তখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভেসে উঠতে পেরেছে। তা না হলে হত্যা করে হত হবার আশ্চর্য শৌর্য ও দেশের পর দেশ পিষে ফেলার অদ্ভুত রণকৌশলের বিচিত্র বর্ণনার ও কবি-প্রশস্তির জয়ধ্বনির নীচে এ লোভ ও নিষ্ঠুরতার কাহিনি চাপা পড়েছে। সুতরাং আজ পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ ব্যেপে যে যুদ্ধ চলেছে তার বিস্তার ও প্রচণ্ডতা যতই বেশি মানুষের ইতিহাসে তাকে অভূতপূর্ব ভেবে হতবুদ্ধি হবার কারণ নেই। অতীতের যে শক্তিমান লেখকেরা পৈতৃক বিষয় নিয়ে জ্ঞাতির সঙ্গে বিরোধে আঠারো অক্ষৌহিণীর নিধন ভগবচ্চালিত ধর্মযুদ্ধ বলে সর্বলোকের প্রতীতি জন্মিয়েছে অত্যন্ত হালের প্রপাগান্ডার কৌশলেও তাদের বেশি কিছু শেখাতে পারত না।

কিন্তু বর্তমান কালের যুদ্ধের সঙ্গে, বিশেষ যে মহাযুদ্ধ আজ পৃথিবী জুড়ে চলছে তার সঙ্গে প্রাচীনকালের যুদ্ধ-বিগ্রহের একটা বড় রকম প্রভেদ আছে। এ যুদ্ধ যুধ্যমান দেশের সকল লোকের শরীর ও মনের চেষ্টা নিঃশেষে দাবি করে। সকলকে বলে আর সব পরিত্যাগ করে 'মামেকং শরণং ব্রজ'— কেবল আমার সেবা করো। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এ যুদ্ধের প্রয়োজনে যা লাগে তা-ই কাজ, বাকি সব চেষ্টা অকাজ। এরই নাম 'টোটাল ওয়ার'। এ ডাকে যে সাড়া না দেয় হয় সে রাষ্ট্রের কাছে দণ্ড পায়, নয়তো কাপুরুষ বা দেশদ্রোহী বলে সামাজিক তাচ্ছিল্য ভোগ করে। হালের যুদ্ধের এই দাবির কারণ অনেক। যুদ্ধের যারা নায়ক তারা শত্রুবধের কোনও জ্ঞাত মারণ-অস্ত্রই কোনওদিন বাদ দেয় না, প্রতি-মারণের ভয় নিতান্ত বিভীষিকা না হলে। গিবন দুঃখ করে লিখেছিলেন যে বারুদ যে-দেশেই প্রথম আবিষ্কার হোক যুদ্ধে তার ব্যবহার এত দ্রুত সমস্ত সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল যা মানুষের পরম হিতকর বহু আবিষ্কারের অদৃষ্টে ঘটে না কিন্তু গিবনের বারুদ আজ ব্যবহার হয় আতশবাজিতে, যুদ্ধে নয়। আজকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের হাতে যুদ্ধের যে অস্ত্র ও

উপকরণ দিয়েছে এবং নিত্যনূতন দিচ্ছে, তার শক্তি ও বৈচিত্র্য অদূর প্রাচীনেরও স্বপ্নগম্য ছিল না এবং তার ফলে যে বিস্ময়কর সৈন্যসংখ্যার সমাবেশ আজ সম্ভব ও অপরিহার্য হয়েছে অল্পদিন পূর্বে তা মহাপ্রতিভাবান সেনাপতিরও কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু এই সংখ্যক সৈন্যকে অসংখ্যরকম অস্ত্র ও উপকরণ দিয়ে যুদ্ধরত রাখতে প্রয়োজন হয় দেশের সমস্ত লোকের সমবেত চেষ্টার। দেশের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক বুদ্ধি, কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি যে-দেশ সম্পূর্ণ যুদ্ধের আয়োজনে লাগাতে পারে জয়ের আশা তার বেশি। যে-দেশ পারে না, ঢিলেঢালা যার ব্যবস্থা, তার পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু সমস্ত লোকের চেষ্টা ও চিন্তা যুদ্ধের আয়োজনে অনন্যকর্মা রাখা সম্ভব নয় যদি যুদ্ধের উৎসাহ দেশের সমস্ত স্তরে আগুনের মতো ছড়িয়ে না পড়ে। অর্থাৎ যদি যুদ্ধোন্মত্ততা কেবল সৈন্যদের মধ্যে নয়, দেশের সকল লোকের মনে সঞ্চারিত না হয়। সুতরাং আজকের দিনে প্রত্যেক যুদ্ধকে রাষ্ট্রনায়কদের করে তুলতে হয় একটা 'ক্রুজেড'। শুধু অস্ত্র গড়লে তাদের চলে না, লোকের মন গড়তে হয়। সেইজন্যই আসে স্থূল-সূক্ষ্ম নানা প্রপাগান্ডা— যাতে সত্য-মিথ্যা, সাহস-ভয়, প্রীতি-ঘৃণা, বড় আদর্শ ও ছোট স্বার্থ সব মিশে এমন সম্মোহন সৃষ্টি করে যে মানুষকে যা ভাবতে বলা যায় সে তাই ভাবে, যেমন অনুভব করতে বলা হয় তেমনি অনুভব করে। এ কাজ যে সম্ভব তার একটা কারণ বর্তমান পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রপতি ও ধনপতিদের জনসাধারণের স্বার্থ পূর্বকালের চেয়ে দেখতে হয় অনেক বেশি, তা সে দেশ পরম ক্যাপিটালিস্টই হোক আর চরম ফ্যাসিস্টই হোক। সুতরাং দেশের এই নায়কেরা যখন দেশের লোককে ডাক দেয় সমস্ত দেশের হিতের নামে তার মধ্যে যে পরিমাণ সত্য থাকে মায়া সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন এবং এ সত্য যে-দেশে যত বেশি সে-দেশের লোকের সাড়াও তত বড়। অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর লোকের মন প্রপাগান্ডায় ধরা দেবার জন্য অল্পবিস্তর প্রস্তুত হয়েই আছে।

পৃথিবীর যুধ্যমান দেশগুলিতে এই হিপনটিজমে বেশির ভাগ লোকের বুদ্ধি যখন মোহগ্রস্ত, অনুভূতি যখন বিকৃত, তখন সেসব দেশের সাহিত্যিকদের পরীক্ষার সময়। আমাদের ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ এ অর্থে যুধ্যমান নয়, সুতরাং যুদ্ধের মত্ততা আমাদের নেই। প্রপাগান্ডার ফলও আমাদের মধ্যে ফলে সামান্য, কারণ এর মূলে সত্যের সে স্পর্শ নেই যা মিথ্যাতেও প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু আজ আমরা ভয়ে কাতর। আমাদের দেশ যুদ্ধের রঙ্গভূমি হলে আমাদের ধন-প্রাণ যে পিষে যাবে সেই চিন্তায় দেশ মুহ্যমান এবং তার সঙ্গে আছে যেসব দেশ আক্রমণে বা প্রতিরোধে প্রচণ্ডতা দেখাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে ঈষৎ ঈর্ষাযুক্ত শ্রদ্ধা— কাজ যা তা ওরাই করছে। আমাদের দেশেও সাহিত্যিকদের আজ পরীক্ষার সময়।

সাহিত্যের সৃষ্টি ও চর্চাকে সোজাসুজি যুদ্ধের কাজে লাগানো যায় না, এমনকী জীবনযুদ্ধের কাজেও নয়। সেইজন্যই প্রত্যেক দেশে এমন কাজের লোক অনেক থাকে যারা বিশ্বাস করে যে সাহিত্যের বেশির ভাগ কতকগুলি লোকের বিলাসের খেয়াল মাত্র। যখন স্বাভাবিক শান্তির অবস্থা তখন এ খেয়াল বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু ত্রাস ও বিপদের সময় এ খেয়ালের চর্চা অসহ্য ও মারাত্মক। তুফানের সময় যখন পালের দড়িতে সকলের হাত প্রয়োজন তখন যে বাঁশি বাজাতে বসে তাকে জলে ফেলে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। আজ যখন জীবনের চাপ সকলের উপর প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন এ মনোভাব অনেকের মনে

দেওয়া স্বাভাবিক। সাহিত্যকে যদি এ-আর-পির প্রচারের কাজে লাগানো যায় তবে বরং তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু এই মহাবিপদের দিনেও যা মুশকিল-আসান নয় কি তার প্রয়োজন।

ব্যক্ত ও গোপন এই মনোভাবের মধ্যে সাহিত্যিকদের দিতে হবে আজ নিষ্ঠার পরীক্ষা। মনের এ বিশ্বাস আজ দৃঢ় করতে হবে যে সাহিত্য মনের খেয়াল নয়; আর যদি খেয়াল হয় তবে সেই খেয়াল যার প্রেরণায় মানুষ তার সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, বুনো মানুষ সভ্য মানুষ হয়েছে। শরীরের প্রয়োজনের যা একান্ত অতীত সেই সৃষ্টিকে নিজের সকল সৃষ্টির চেয়ে বড় মনে করেছে। জৈব প্রয়োজনের বিচারে এ ঘটনা অবোধ্য। সে বিচারে এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ ঘটেছে। কেন ঘটেছে সে প্রশ্ন হয়তো অর্থহীন। কিন্তু যখন ঘটেছে তখনই মানুষের মন সমস্ত সংশয় ছেদন করে নিজের এই সৃষ্টিকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন বলে চিনতে পেরেছে। 'প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ো অন্যস্মাৎ সর্ব্বাৎ'। সাহিত্য মানুষের এই ঊর্ধ্বগতিকে মানুষের জীবনের ভার মাটিতে নামাতে চেয়েছে বারবার, প্রতিবার সভ্যতা জয়ী হয়েছে। এক জায়গায় ধ্বংস হলে অন্য জায়গায় তার গতি-লীলার আরম্ভ হয়েছে। আজকের যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনি একটা নিচু-টান। মানুষের সভ্যতা তাকেও কাটিয়ে উঠবে, দু'পক্ষেই যারা সভ্যতারক্ষার নামে অস্ত্র হাতে নিয়েছে তাদের চেষ্টায় নয়। মানুষের মনের গোপন তলে ঊর্ধ্বগতির যে শক্তি সঞ্চিত আছে তারই নিঃশব্দ প্রকাশে। সে শক্তি মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির বীজকে অঙ্কুরিত করে।

আজ সাহিত্যিককে নিষ্ঠার পরীক্ষা দিতে হবে নানা বিভীষিকা ও হৃদয়-দৌর্বল্যের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি ও চর্চা অব্যাহত রেখে। শত্রুসৈন্যের আক্রমণ ও নির্যাতনে সভ্যতা লোপের যে আশঙ্কা সেটাই বড় ভয় নয়। সবচেয়ে বড় ভয় যুদ্ধের মত্ততা ও ত্রাসে আমাদের মনে বড়-ছোট বিচারের বিভ্রম ঘটা। মানুষ যখন প্রবলের প্রচণ্ডতাকেই বড় জেনে মনে তাকে পূজা দেয় সভ্যতালোপেব তখনই সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা। বর্তমান যুদ্ধে সেই আশঙ্কা সবচেয়ে প্রবল। যুগে যুগে পৃথিবীর নানা দেশে মানুষের সভ্যতা যাঁরা গড়েছেন পৃথিবীর সাহিত্যিকদের সেই ঋষি-ঋণ শোধ দিতে হবে প্রবলকেই শ্রেষ্ঠ না মেনে। সভ্যতাব যে চিরন্তন ধারা তাঁরা প্রবাহিত করেছেন আকস্মিকের উৎপাতের মধ্যে সে প্রবাহকে সচল রেখে। এ কাজ কঠিন। অন্য লোকের মতো লেখকদের চিত্তও আজ বিক্ষিপ্ত। নিজের সৃষ্টির মূল্যবোধে ক্ষণে ক্ষণে মনে সংশয় জাগে। প্রপাগান্ডাকে মনে হয় সাহিত্য— জীবনের সঙ্গে যার যোগ। কিন্তু এ চিত্তবিক্ষেপ সংযত করতে হবে, মনের সংশয উঠতে হবে কাটিয়ে। সাহিত্য সৃষ্টির নামে প্রপাগান্ডা রচনা করে কাজের লোক সাজার প্রলোভনকে দমন করতে হবে। যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ তা কেবল আজকের দিনের জীবন নয়, চিরন্তন মানুষের চিরপুরাতন ও চিরনূতন জীবন। আজকের দিনের সাহিত্য আজকের দিনের জীবনই গড়বে, কিন্তু কেবল সেই জীবনের প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদে নয়। আজকের জীবনের পারিপার্শ্বিকে সেই সনাতন মানুষকে গড়বে চিরকালের মানুষ যার মধ্যে চিরপরিচিতিকেই দেখবে।

আমাদের দেশের উপর প্রলয়ের টর্নেডো আজ উদ্যত। এর অবসানে আমরা ভেঙেচুরে কেমন গড়ন নেব কে জানে। তবে নিদারুণ দুঃখের মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হবে।

বিপদের প্রতিকার-চেষ্টার মনে যে উৎসাহের বল আসে আমরা তা থেকেও বঞ্চিত। কারণ প্রতিকারের চেষ্টা আমাদের হাতে নেই। এ দুর্দিনে আমরা হয়তো কিছুই রক্ষা করতে পারব না, কিন্তু মনুষ্যত্বের গৌরবকে যেন রক্ষা করি। সাহিত্যিকদের কণ্ঠরোধ ও কণ্ঠনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলবে। কোনও ভয় বা লোভে আমরা যেন মিথ্যাকে সত্য, কুৎসিতকে সুন্দর না বলি। 'অব্রুবন বিব্রুবন বাঽপি নরোঃ ভবতি কিল্বিষী'। না-বলার পাপ যদি আমাদের স্বীকার করতেই হয়, মিথ্যা-বলার পাপ আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখেছেন আমরা সেই ভাষার লেখক। মানুষের আত্মার মহিমাকে আমরা নিজের মধ্যে খাটো হতে দেব না। ঝান্ডা খাড়া রহে।

বীরভূম (নলহাটি) সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিব অভিভাষণ।

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৯

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

ডক্টর মেঘনাদ সাহা ছিলেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন। বিংশ শতাব্দীতে গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিস্ময়কর। এই বিজ্ঞানের দু'-একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে মেঘনাদ সাহা ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁহার এ কাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। তিনি যদি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা করতেন তবে আধুনিক বিজ্ঞান তাঁর দানে অনেক সমৃদ্ধ হত, এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর স্থান আরও উঁচুতে সুপ্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু মেঘনাদ সাহা তা পারেন নাই। তাঁর কারণ, আমাদের দেশের জনজীবনের নিতান্ত অবনত অবস্থা ও তার উন্নতির কৌশল চিন্তা মেঘনাদকে কিছুতেই উদাসীন বিজ্ঞান-যোগী থাকতে দেয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে যে সব বড় বড় দেশহিতের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয়েছে তার কতকগুলির পরিকল্পনা ও কল্পনাকে কাজে পরিণতির বৈজ্ঞানিক কৌশল চিন্তা ও তথ্য সংগ্রহ মেঘনাদ ইংরেজ আমলেই আরম্ভ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটা উদাহরণ দামোদর নদীর বাঁধ পরিকল্পনা। স্বাধীন ভারতবর্ষে বৃহৎ পূর্তকর্মের এটি একটি প্রধান ও প্রায় প্রথম অনুষ্ঠান। এবং ভাবতবর্ষের অন্যান্য অংশে নানা নদীর বাঁধ পরিকল্পনার আদর্শ ও উদ্যোগের সফলতার বড় প্রমাণ। মেঘনাদ সাহা অনেক পূর্ব থেকেই এর বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা ও কৌশল আলোচনা করেছিলেন, এবং সেদিনের অনেক শক্তিমান কায়েমি স্বার্থের, বিশেষ কয়লার খনির ইংরেজ মালিকদের, প্রচারিত নানা অমূলক আশঙ্কা অকাট্য তথ্য ও তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নিরসন করেছিলেন। যে জন্য ইংরেজ বিদায় হওয়ার পর সে সব আপত্তির কথা আর শোনা যায় নাই। আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর কল্পনার বাস্তবে পরিণতি অনেক দূর পর্যন্ত মেঘনাদ সাহা দেখে গেছেন।

ভারতবর্ষের বর্ষারম্ভ ও দিনগণনার জন্য প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কারের প্রয়োজন। মধ্যযুগের সংস্কৃত পঞ্জিকা প্রাকৃতিক কারণেই বর্তমানকালে অদৃষ্ট ফল সুতরাং অবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পঞ্জিকা সংস্কার মধ্যযুগ থেকে বর্তমানে একটা পদক্ষেপ। এই পঞ্জিকা সংস্কারের কথা মেঘনাদ সাহা অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন, তাঁর চিন্তার ফল প্রকাশ করছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত পঞ্জিকাসংস্কার কমিটির সভাপতিরূপে কমিটির রিপোর্ট তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি দাখিল করে গেছেন। তাতে পঞ্জিকা-সংস্কারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তথ্যের ভিত্তিতে সংস্কৃত পঞ্জিকার সকল নির্দেশই দেওয়া আছে। আশা করি, তাঁর মৃত্যুতে তাঁর কাজের ফল থেকে দেশ বঞ্চিত হবে না, এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর বিদ্যা ও পরিশ্রমের ফলকে

অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির আন্ডার-সেক্রেটারি, সেক্রেটারি, উপ-মন্ত্রী ও মন্ত্রীরা চেপে বসে থাকবেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কারের প্রতিভা নিয়ে যাঁর জন্ম স্বদেশের হলেও একটিমাত্র দেশের দুর্দশার আবেদনে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা থেকে বিচ্যুতি উচিত কি অনুচিত এ প্রশ্ন মনে উঠে। যে শক্তি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডাবে বড় দান দিতে পারত, স্বদেশের উন্নতির চেষ্টায় সে শক্তির ব্যয় কি অপব্যয়? কিন্তু এ প্রশ্ন নিরর্থক। মেঘনাদ সাহার মন ও চরিত্রের গড়ন এমন ছিল যে ভারতবর্ষের যে বিশেষ যুগে তিনি জন্মেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন, তাতে দেশের এ ডাককে অবহেলা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কি তিনি ত্যাগ করেছেন তা ভাল করেই জানতেন। প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নূতন জ্ঞান আবিষ্কারের যে দুর্নিবার আকর্ষণ, এবং জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের অন্বেষণ হলেও বিজ্ঞানীর অবচেতন মনে বৈজ্ঞানিক সমাজে যে যশের আকাঙ্ক্ষা লোপ হয় না, মেঘনাদ সাহা সে আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। দেশের ডাকে নানারকম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেশে ও বিদেশে আছে। কিন্তু এ রকম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বেশি নেই। কারণ, এ রকম স্বার্থত্যাগ করতে পারে তার উপযুক্ত স্বার্থসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে বেশি জন্মে না।

যুগবাণী, ১৫ বৈশাখ ১৩৬৩

বাঙ্গালির শিক্ষা

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য সরকারি কমিশন বসিয়াছে। সাগরপার হইতে গুণী জ্ঞানী সভ্যেরা আসিয়া মন্ত্রণা সভায় বসিয়াছেন। লর্ড কার্জনের তৈরি কাঠামোর উপর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্তমান মূর্তিটি, অনেকটা যাঁর নিজের হাতে গড়া, সাগরের এ পারের লোক হইলেও ওই সভায় তাঁহাকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবং দুই কোটি বাঙালি মুসলমানের স্বার্থের হিসাবে কোনও ভুলচুক না হয়, তাহার দৃষ্টির জন্য আলিগড় হইতে উচ্চ গণিতজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিত সভাসদ হইয়া আসিয়াছেন। আশা ও আশঙ্কায় শিক্ষিত বাঙালির মন অনেকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই সুযোগে বাঙালির শিক্ষার দু'-একটা মোটা সমস্যার আলোচনা করা যাক।

কি প্রাচীন কি আধুনিক সমস্ত সভ্য সমাজেই শিক্ষা ব্যাপারটি লইয়া নানা রকম সমস্যা উঠিয়াছে। শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, আর সে-লক্ষ্যে পৌঁছিবাব সুব্যবস্থাই বা কী এ দুই বিষয়েই যথেষ্ট মতভেদ আছে। এবং দুইটি রাশিই যদি অব্যবস্থিত হয়, তবে তাহাদের সমবায়ে কেমন জটিল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তাহা গণিতের সাহায্য ব্যতীতও সহজেই বোঝা যায়। আর এ বিষয়ে মতভেদও অতি স্বাভাবিক; বরং মতের প্রকার ভেদ কিছু কম হইলেই বিস্ময়ের কারণ হইত। একে তো শিক্ষা জিনিসটি, তা তার প্রণালী যে বকমই হোক, অনেকটাই অজানা মাটিতে বীজ ছড়াইয়া ফসলের আশায় বসিয়া থাকার মতো। কোন জমিতে যে কেমন বীজে কোন ফল ফলিবে তাহা পূর্ব হইতে নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। যে পথে চলিয়া বৈদ্য চিকিৎসক হয় বলিয়া নিন্দুক লোকে রটায়, সেই ঠেকিয়া শেখার পথটা এখানে অনেকটা সংকীর্ণ, কেননা এক জমিতে দুইবার বীজ বুনিবার উপায় নাই। এবং শিক্ষার তত্ত্ব ও শিষ্যের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর পুথি ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও, যে-মন লইয়া শিক্ষককে কাজ করিতে হয়, কোনও বৈজ্ঞানিক আচার্যের যন্ত্রের মধ্যে তাহা ধবা দেয় না। সমস্ত মনস্তত্ত্বই সাধারণ মনের তত্ত্ব, অর্থাৎ যে মন কল্পনায় আছে কিন্তু বস্তুগত্যা নাই। আর শিক্ষকের কারবার হইল বিশেষ মনকে লইয়া, যাহা এই নিয়মের জগতে প্রায় খাপছাড়া অনিয়ম, যাহার বিকাশ ও বিকারের রীতি দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় গুহাস্থিত ও দুর্জ্ঞেয়। সেই জন্য দেখা যায় অতি-অবৈজ্ঞানিক সেকেলে ধরনের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়াও মানুষের মন বিকশিত হইয়া ওঠে, আবার অত্যন্ত টাটকা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ইহার 'সনাতন জড়তা'য় ঠেকিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। কাজেই কোনও প্রণালীরই ফলটা প্রবর্তকের আশানুযায়ী বা নিন্দুকের ভবিষ্যৎ বাণীর অনুরূপ পুরাপুরি রকমে ফলে না। সুতরাং শিক্ষার প্রণালী লইয়া তর্কে কোনও পক্ষেরই একবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। কেননা ফলের কষ্টিপাথরে

প্রণালীকে কষিয়া এমন কিছু দেখানো যায় না, যাহাতে তার্কিককে নিরুত্তর করিতে পারা যায়।

২

এরপর শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে একটা নিত্য চিরস্থির অংশ হয়তো বা আছে। কিন্তু চিরকালই নানা নৈমিত্তিক লক্ষ্য, কখনও জীবন যুদ্ধের টাটকা রক্তে রঙিন হইয়া, কখনও বা কেবল অস্থিরতার চাঞ্চল্যেই মানুষের দৃষ্টিকে তাদের দিকেই টানিয়া রাখিয়াছে। কখনও সমাজ, কখনও রাষ্ট্র, কখনও ধন, কখনও উক্তি, কখনও বাকপটুতা, কখনও বা কেবল জীবিকা, শিক্ষার একমাত্র অন্তত প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মানুষে প্রচার করিয়াছে। এবং ইহাদের কোনওটিই মানুষের কাছে তাচ্ছিল্যের সামগ্রী না হওয়াতে সকলের দাবিই মানুষ উপস্থিতমতো মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তর্কেও কোনও পক্ষেরই একেবারে অজয় পত্র লিখিয়া দিবার মতো, পরাজিত হইবার আশঙ্কা নাই।

কিন্তু এ সকল তত্ত্ব ও তর্ক সব দেশের ও সব কালের সাধারণ সমস্যা, বাংলা-মাসিকের পণ্ডিতদিগের ভাষায় 'বিশ্ব সমস্যা'। পণ্ডিতগণের উপরেই ইহাদের নিরসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাঙালির বর্তমান উচ্চ শিক্ষার দুই একটা বিশেষ সমস্যার আলোচনা শুরু করা যাউক।

৩

বাংলাদেশের স্কুল কলেজে হালে যে শিক্ষা চলিতেছে, সে সম্বন্ধে একটা বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। সকল পক্ষই বলিতেছেন এ শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা নয়; যেমনটি হওয়া উচিত এ শিক্ষা তেমন শিক্ষা নয়। কিন্তু অসন্তোষ সাধারণ হইলেও অসন্তুষ্টির মূল এক নয়। আর সেই ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতেই আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী লইয়া নানা মতভেদের শাখা, কখনও পাতা কখনও কাঁটা মেলিতেছে।

এ দেশের শিক্ষা লইয়া যাঁহারা চিন্তা করেন এবং চিন্তা না করিলেও কথা বলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল পক্ষ হইলেন দেশশাসক আমলাতন্ত্রের সভ্যেরা, এবং তাঁহাদেরই জ্ঞাতি কুটুম্ব ভারতপ্রবাসী ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দানের দরবারে, স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায়, নিজেদের ভোজের মজলিসে আমাদের শিক্ষার গলদ যে কোথায় তা বেশ স্পষ্ট কথাতেই ব্যক্ত করেন। এরা বলেন এই যে, বাঙালির ছেলেরা শেকসপিয়র মিল্টন পড়িতেছে, বার্ক মিল মুখস্থ করিতেছে, লিবিগ ফারাডের তত্ত্ব ঘাঁটিতেছে, এসব একবারে নিরর্থক ও নিষ্ফল। এসব ছেলেরা তো স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া ওকালতি ডাক্তারির বাজারে ভিড় করিবে, না হয় মুনসেফি ডেপুটিগিরির উমেদারি

করিবে, আর অধিকাংশই সরকারি ও সওদাগরি আফিসের কেরানিগিরিতে ভরতি হইবে। ইহাদের জন্য শিক্ষা কেন? ধান কলাই যার লক্ষ্য সে কেন গোলাপের কেয়ারিতে পরিশ্রম করে? অর্থাৎ দেশব্যাপী বহার ও বাণিজ্যের যে কল চলিতেছে, তার চাকাগুলিকে স্বচ্ছন্দে ও বিনা বাধায় চালাইয়া লইবার মতো মজুর, মিস্ত্রি, বড়জোর ফোরম্যান মেকানিকের উপযোগী যে শিক্ষা, তাহাই হইল বাঙালির যথেষ্ট এবং যথার্থ শিক্ষা। ইহার জন্য 'স্যাম্‌সনয়্যাগ্ নিষ্টেশের' সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের অনুশীলন প্রয়োজন হয়; বড় সাহেবের মনঃপূত চলতি ইংরেজিতে কাজের চিঠি মুসাবিদা করিতে জানাটাই বেশি দরকার। আর সেই পত্র রচনায় মিল্টনের ভাষা কোনও সাহায্য তো করেই না, বরং বিদেশিকে বিপথেই লইয়া যায়। সুতরাং আমাদের স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষা যেমন অনুপযোগী তেমনি ফালতো। আর শিক্ষার এই বাহুল্যটা যদি কেবল নিষ্ফলই হইত তবুও সে এক রকম ছিল। কিন্তু ইহার কিছু ফলও ফলে এবং আশঙ্কার কথা এই যে ফলটা সমস্তই কুফল। পশ্চিমের সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাস মুখস্থ করিয়া পুব দেশের লোকদের মাথা ঠিক থাকে না। পশ্চিম যে পশ্চিম এবং পুব যে পুব এই সাধারণ জ্ঞানটাও লোপ পায়। এবং যে সকল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পশ্চিম দেশের জন্যই প্রচার করিয়াছেন এই অত্যন্ত পুব দেশেও এরা হাতে-কলমে সেগুলির প্রয়োগ দেখিতে পায়। এই সকল তত্ত্ব কথায় 'মানুষ' শব্দের অর্থ যে পশ্চিম দেশীয় শ্বেত-বর্ণের মানুষ এ সহজ কথাটা ইহারা বুঝিতে পারে না। যতই কেন জিয়োগ্রাফি মুখস্থ করুক না ল্যাটিচুড লঙ্গিচুডের জ্ঞানটা ইহাদের কিছুতেই পাকা হয় না। ফলে নিজেদের অবস্থায় ইহারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। এমনকী যে শাসকসম্প্রদায় এই দেড়শো বছর ধরিয়া নিশ্চল শান্তির মধ্যে পূর্ব দেশের লোকদের পক্ষে যতটা সম্ভব ইহাদিগকে সেই উন্নতির পথে অতি সন্তর্পণে, সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের উপরেও ইহারা ক্ষণে ক্ষণে বিরাগের ভাব দেখায়; উন্নতির গতির মন্থরতায় অসহিষ্ণু হইয়া মনে করে ছাড়া পাইলে বুঝি আরও একটু দ্রুত চলিতে পারে। এবং শাসনের কলটা যে নিজেরা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া চালাইতেও বা পারে এমন কল্পনাও ইহাদের মনে আসিয়াছে। এমনকী কলটা এ রকম না হইয়া অন্য রকম হইলেও একেবারে অচল হয় না এমন কথাও ইহারা বলিতে শুরু করিয়াছে। এ সকলই যে বাহুল্য শিক্ষার বিস্তৃত ফল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৪

দেশের লোক বলে, এবং বলিতে সাহস না করিলে মনে ভাবে, শিক্ষাটা যে কেবল বর্তমানকে লক্ষ্য করিয়াই দিতে হইবে সেই বা কোন স্থিরসিদ্ধান্ত। বর্তমানে আমরা ছোট কিন্তু ভবিষ্যতে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। শিক্ষাটা সেই ঈপ্সিত ভবিষ্যতের অনুকূল করিয়াই আরম্ভ হোক না। আর জীবিকার জন্য যেটুকু দরকার শিক্ষার পরিমাণ যে, ঠিক সেইটুকুই হইবে এ ব্যবস্থা তো অপর কোনও দেশে দেখা যায় না। আমাদের শাসক

সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজের দেশে যে শিক্ষা পাইয়া আসেন, প্রাচীন গ্রিস রোমের সাহিত্য ইতিহাসই তো তাহার প্রধান উপকরণ। এদেশে যে কাজে তাহাদের জীবিকা অর্জন হইতেছে সে কাজে ওই শিক্ষা কতটা সাহায্য করে এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। আফিসের বাহিরেও কেরানি কেরানিই থাকিবে এত বড় দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া তো সহজ নয়।

প্রজার সঙ্গে রাজকর্মচারীদের এ দেশের উপযোগী শিক্ষার আদর্শের এই প্রভেদ, ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার প্রথম সমস্যা; যাকে বলা যায় শিক্ষার রাজনৈতিক সমস্যা। রাজপুরুষেরা দেখেন আমাদের বর্তমান, আমরা ভাবি আমাদের ভবিষ্যৎ। তাঁরা চান সেই শিক্ষা যেটা বর্তমান শাসনরীতি ও অন্যান্য নীতির অনুকূল। আমরা কামনা করি এমন শিক্ষা যেটা ভবিষ্যৎকেই আমাদের নিকটে আনে। তাঁদের দৃষ্টি এক দিকে, আমাদের চোখ অন্য দিকে।

৫

আমাদের রাজপুরুষেরা যে আমাদের ভবিষ্যৎটাকে একবারে অস্বীকার করেন এমন কথা বলি না। কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করিতে হয় যে তাঁদের অনেকে আমাদের যে একটা ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে, যেটা বর্তমানের চেয়ে অন্য রকম, হয়তো মহত্তর এবং বৃহত্তর, এ কথা প্রকাশ্যেই বলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা বলেন সে ভবিষ্যৎ এতই সুদূর ভবিষ্যৎ যে তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোনও বুদ্ধিমান লোকই বর্তমানের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যে ভবিষ্যৎ এখনও স্বপ্নলোকের কল্পনাতেই আছে, জাগ্রত লোকের বস্তুজগতে তার স্থান নাই। অর্থাৎ যেটি পারমার্থিকভাবে আছে, কিন্তু ব্যাবহারিক হিসাবে নাই। সুতরাং তাকে কথায় স্বীকার করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাজে স্বীকার করা নির্বুদ্ধি ও অকেজো লোকের লক্ষণ।

শিক্ষার এই রাজনৈতিক সমস্যাটি অতি জটিল ও ব্যাপক। এবং এই ব্যাপক সমস্যা হইতে আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতির ছোট, বড়, কঠিন, সুকঠিন নানা রকম সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে এবং দিন দিন হইতেছে। ইহার ফলে কর্তৃপক্ষেরা আমাদের কথা বোঝেন না; আমরা তাঁদের কাজে আশঙ্কিত হইয়া উঠি। আমরা বলি আমাদের গরিব দেশ, শিক্ষাটা যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়সাধ্য করা হোক; তাঁরা ভাবেন সস্তা অর্থ যে খেলো ইহাদের সে জ্ঞান তো নাই। দেশে স্কুল-কলেজ বাড়িতেছে, পড়ুয়া তার চেয়েও বাড়িতেছে; আমরা উৎফুল্ল হইয়া ভাবি শিক্ষার বিস্তার হইতেছে; কর্তৃপক্ষ শিহরিয়া বলেন এ সব ছেলে বাহির হইয়া করিবে কি, সরকারি ও সওদাগরি আফিসে কেরানিগিরি আর তো খালি নাই।

যা হোক এই রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার উপায় শিক্ষানীতির মধ্যে নাই। এ জটিলতার নিবৃত্তি শিক্ষাতত্ত্ববিদের এলাকার বাহিরে। দেশ বিদেশের পণ্ডিত একসঙ্গে করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। কেননা এ সমস্যার মীমাংসা হইবে শিক্ষানীতি ক্ষেত্রের বাহিরে, রাজনীতির ক্ষেত্রে। সুতরাং আর পুথি না বাড়াইয়া সমস্যান্তরে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

৬

আমাদের শিক্ষার দ্বিতীয় সমস্যা হইল অন্নসমস্যা। দেশের অনেকে প্রচলিত শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে, সে শিক্ষা শিক্ষিত বাঙালির অন্ন সংস্থানের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়া ছেলেরা যে কয়টা চাকরি ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত হইয়া বাহির হয় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য এবং ওই শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির অনুপাতে সে সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ফলে শিক্ষিত বাঙালির ঘরে অন্নাভাব প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বর্তমানেই তাহার মূর্তিটি যেমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেশের শিক্ষা যদি শিক্ষিতের এই অন্ন-সমস্যার একটা মীমাংসা করিতে না পারে তবে তাহা ব্যর্থ শিক্ষা, যাহার পরিবর্তন না হইলে দেশের মঙ্গল নাই।

বাংলাদেশের এই অন্নাভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সমস্যা যে দিন দিন উৎকট হইয়া উঠিতেছে সেদিকে চক্ষু বুজিয়া কোনও লাভ নাই। এবং ইহার একটা ব্যবস্থা না হইলে যে জাতিরও মঙ্গল নাই তাহাও নিশ্চিত সত্য। ইংরেজ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার— যাঁর একটা অভ্যাস ছিল সকলের জানা অত্যন্ত সাধারণ তথ্য হইতে গভীর তত্ত্ব কথার নিষ্কাশনের চেষ্টা করা— তাঁর একখানি সুপরিচিত গ্রন্থের একটি অধ্যায়, তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, জীবের কোনও কাজ করিবার পূর্বে তার বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন; সুতরাং যে বিধিব্যবস্থা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে তাহার দাবি, যে সকল বিধিব্যবস্থা, তাহাকে আর সব কাজের উপযুক্ত করে, তাহাদের চেয়ে প্রবল। শিক্ষিত বাঙালির অন্নাভাব মোচনের ব্যবস্থা যে আর না করিলেই নয় এ কথা সমর্থনের জন্য জীববিদ্যার এই আদিতত্ত্বে যাইবার প্রয়োজন হয় না। আজ বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণির ঘরে ঘরে দারিদ্র্য যে কেমন করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতেছে, স্বাস্থ্যকে বিদায় দিতেছে, দেহ মনের সমস্ত স্ফূর্তি ও আনন্দকে পিষিয়া মারিতেছে, মনুষ্যত্বকে পাহাড় প্রমাণ ভারের নীচে চাপা দিতেছে, তাহা দেখিলে স্বয়ং মোহ মুদ্গরের কবিও অনর্থের অর্থ যে কী তাহা, নিত্য না হোক অন্তত মাঝে মাঝে, ভাবিয়া দেখিবার উপদেশ দিতেন।

কিন্তু আমাদের অন্নসমস্যা এমন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন। অন্নসংগ্রহকে জাতির সমস্ত চেষ্টা ও প্রতিভার কেবল প্রথম নয় প্রধান লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যার একটা উত্তর খুঁজিবার প্রলোভন স্বাভাবিক। কিন্তু রোগনাশের উৎসাহে রোগীর প্রাণান্ত ঠিক চিকিৎসা নয়, যদিও সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবল সাফল্যে চিকিৎসিতের মৃত্যুসংবাদ মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। বাঙালির এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কেবল অন্নে জীব বাঁচে কিন্তু জাতি বাঁচে না।

৭

অন্ন সংস্থানের নিক্তিতে ওজন করিয়া স্কুল কলেজের প্রচলিত শিক্ষাকে ঝুটা সাব্যস্তের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। কেননা প্রকৃত কথা এই যে ছাত্রের জীবিকা অর্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া এ শিক্ষার লক্ষ্যই নয় এবং হওয়া উচিত নয়। এ লক্ষ্য কী তাহা একবার 'সবুজপত্রে' আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির অধিকার নাই। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষা দেওয়া, ছাত্রকে শিক্ষিত করা। কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত অন্নে সকলেরই সমান প্রয়োজন। সুতরাং সমাজে ও রাষ্ট্রে শিক্ষিতেরও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা চাই। এই শিক্ষিত শ্রেণিই হইল সমাজের মধ্যমণি, সমাজ বৃক্ষের অমৃত ফল। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে জাতির বর্তমান প্রাণহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দেশের সমস্যা এই যে, শিক্ষিত শ্রেণির অন্ন-সংগ্রহের পথ যথেষ্ট মুক্ত নাই। কেন নাই, সে আলোচনা নাই করিলাম। কিন্তু সমস্যা এ নয় যে, যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা শিষ্যের জীবিকা অর্জনকেই লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইতেছে না।

প্রচলিত শিক্ষার যে সমালোচনার কথা বলিতেছি তার প্রধান কথা এই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেরা এমন শিক্ষা পাইতেছে না যাহাতে চাকুরি, ডাক্তারি, ওকালতির রুদ্ধপ্রায় সংকীর্ণ গলিতে আর ভিড় না করিয়া, শিল্প বাণিজ্যের প্রশস্ত রাজপথে অন্ন সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইতে পারে। এই সমালোচনার মধ্যে যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সত্যের আড়ালে গোটা কয়েক বড় বড় মিথ্যা সব সময়েই উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তাহাদের তাড়াইতে না পারিলে এই সত্যের প্রকৃত চেহারাটি প্রকাশ হইবে না।

৮

প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-বাণিজ্যের যে শিক্ষা দিবে তাহা তার সাধারণ সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে নয়; ওই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেদের জন্যই বিশেষ শিক্ষা। যাঁরা মনে করেন প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই-একটা হাতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করিলেই দেশের দারিদ্র্য সমস্যার মীমাংসা হইবে, তাঁদের সরল বিশ্বাসে অবশ্য মুগ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বর্তমান জগতের শিল্প বাণিজ্য বিষয়টি কী, তাহার অস্পষ্ট ধারণাও তাঁদের আছে কি না তাহাতেও সন্দেহ না করিয়া উপায় থাকে না। যে সব জাতি দেশের শিল্প বাণিজ্যকে দেশের উচ্চ শিক্ষা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিয়াছিল, শিল্প বাণিজ্য শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র চালান যায় ভাবিয়াছিল, আজ পৃথিবীর শিল্প বাণিজ্যের দৌড়ে তারা যে দিন দিন পিছাইয়া পড়িতেছে তাহা তো আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। দেশের উচ্চ শিক্ষাকে সংকীর্ণ করিয়া শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলার কল্পনা, আহার বন্ধ করিয়া কেবল কুস্তিতে শরীর গড়ার চেষ্টার মতোই ভয়ানক।

৯

আচার্য হেলমহোলৎস একবার গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন জার্মন বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করে, সে সত্য ঘরকন্নার কাজে লাগিবে কি না সে চিন্তা তার নয়। আজ জার্মনিতে কি সুর বাজিতেছে জানি না। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, জ্ঞানের এই নিষ্কাম সাধনা বন্ধ হইলে ক্রুপের কারখানাও বেশি দিন খোলা থাকিবে না। আর যে শিল্প বাণিজ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না দেশের উচ্চ শিক্ষিতকেও তাহাতেই রত করান, এই পৃথিবী জোড়া প্রতিযোগিতার যুগে, সমাজ নীতির কথা দূরে থাকুক, কেবলমাত্র ধন বিজ্ঞানের চোখও যে কত বড় অপব্যয়; তাহাতে যে অন্নসমস্যার সমাধান না হইয়া কেবল জটিলতার বৃদ্ধিই হয়, তাহা অল্প চিন্তাতেও বোঝা যায়। শোনা যায় অবস্থা বিশেষে বাঘও নাকি ধান খায়। কিন্তু সেটা ব্যাঘ্র সমাজের ‍্রস খুব উৎসাহের কারণ তাহা প্রবাদও বলে না। মনু ব্রাহ্মণের যে বৈশ্য বৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আপদ্ধর্ম আনন্দের কারণ নয়। বাংলাদেশের যে মুষ্টিমেয় লোক এখন উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে তারও অর্ধেককে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনা, দেশে শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় নয়। সে পথ হইল দেশের উচ্চ শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত কবিয়া, এ যুগের শিল্প বাণিজ্যের যে বিশেষ শিক্ষা, যাহা কেবল উচ্চ শিক্ষিতেব পক্ষেই সম্ভব, দেশে তাহার ব্যবস্থা কবা।

১০

দ্বিতীয় কথা কলিকাতার বিশ্বাবিদ্যালয় ছেলেদের পুথিগত এমনকী ল্যাবরেটবিতে পরীক্ষাগত শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই বাংলাদেশ দেখিতে দেখিতে শিল্পশালায় ও বাণিজ্যাগারে ভরিয়া উঠিবে এমন দুরাশার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দিতে পারে কিন্তু সে শিক্ষাকে সফল করিবাব উপায় বিশ্ববিদ্যালযের হাতে নাই। সে শিক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে দেশের লোকের, হয়তো বা দেশের রাজার উদ্যম বা নিশ্চেষ্টতার উপর। বাংলার অন্ন সমস্যার জন্য দায়ী তার প্রচলিত শিক্ষা নয় এবং কেবল শিক্ষার বদল ঘটাইয়া সে সমস্যার পূরণও সম্ভব নয়। বেশ মনে আছে যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বি. এসসি' পড়াইবার প্রথম আয়োজন হয় তখন অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আর ভাবনা নাই। এইসব বিজ্ঞানে-কৃতবিদ্য ছেলেরা দেশে বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নাভাবের একটা কিনারা করিবে। আজ 'এম. এসসি; বি এল' এ বাংলার সব উকিল লাইব্রেরি ভরতি হইয়া উঠিল! ছেলেরা বিজ্ঞান শিখিল বটে, কিন্তু সে শিক্ষাকে দেশের সমাজ ও দেশের রাষ্ট্র কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারিল না।

তারপর শেষ কথা কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড় কথা, তা এই। উচ্চ শিক্ষায় যার অধিকার আছে তাকে সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করার অধিকার সমাজ বা রাষ্ট্র কাহারও নাই। এখানে

উচ্চ শিক্ষিতের জীবিকা উপার্জনের পথে বিঘ্নবাহুল্যের কথা তোলা নিষ্ফল, কেননা জীবিকার অধিকারের চেয়ে এ অধিকারের দাবি কিছু কম নয়। কাজেই সে পথের মাপে উচ্চশিক্ষার ইচ্ছামতো প্রসার বা সংকোচ ঘটানো চলে না। কথা এই, আর কোনও ফল বা নিষ্ফলতার প্রমাণে উচ্চ শিক্ষার বিচার হয় না; ওই শিক্ষাই সে শিক্ষার চরম ফল। কেরানিরও উচ্চশিক্ষা বিফল নয়, যদিও কেরানিগিরিতে তা কাজে লাগে না। কারখানার মালিকেরও সে শিক্ষা অনাবশ্যক নয়, যদিও তার অভাবে টাকা উপার্জনের কোনও অসুবিধা হয় না। জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ, এ শিক্ষার অধিকারী কত লোকের সে জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাফল্যের পরীক্ষা কত বেশি সংখ্যক অধিকারীর কাছে সে শিক্ষা সহজ লভ্য হয়। মানুষের জন্যই জীবিকা, জীবিকার জন্য মানুষ নয়। জীবিকার মাপে উচ্চ শিক্ষাকে কাটিয়া খাটো করার প্রস্তাব বিছানার মাপে শরীরকে ছাঁটার প্রস্তাবের মতোই সুবুদ্ধির পরিচায়ক! তা যত উচ্চ রাজকর্মচারীই সে প্রস্তাব করুন না কেন, আর যত বড পণ্ডিতই তার সমর্থন করুন না কেন।

১১

শিক্ষামন্দিরের বাহিরে আমাদের দেশে শিক্ষা লইয়া যে সব সমস্যা তার কতক দেখা গেল। এইবার বহিরাঙ্গন পার হইয়া মন্দিরের ভিতরে আসা যাক।

বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষাকে যখন কেবল শিক্ষার মাপেই ওজন করি, কেবল জ্ঞান, ভাব ও রুচির আলোতেই তাকে পরখ করি, তখনও দেখি এ শিক্ষায় আমরা কেহই সন্তুষ্ট নই; এবং এখানেও অসন্তোষের কারণ এক নয় ভিন্ন ভিন্ন।

দেশে একদল আছেন যাঁরা হালে চলতি শিক্ষার উপর এইজন্য বিরক্ত যে তাঁরা যখন স্কুল কলেজে পড়িতেন তখন শিক্ষাটা যে রকম পাকা হইত এখনকার ছেলেদের শিক্ষা সে রকম হইতেছে না। দুই শিক্ষার তফাত কোথায় এবং বর্তমানের শিক্ষা কোনখানে কাঁচা তাহার অনুসন্ধান করিলে, কথার হেরফের বাদে যাহা বাহির হইয়া পড়ে তাহা এই:

পূর্বকার দিনে ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষাটা যেমন পাকা রকমের হইত এখনকার ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা তার কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। তখন শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শব্দ শিখিবার জন্য অভিধান মুখস্থ করিত, 'গ্রামার' 'ইডিয়ামে' নির্ভুল হইবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিত, 'স্টাইল' দোরস্ত করিবার জন্য বেন জনসন হইতে স্যামুয়েল জনসন পর্যন্ত কারও লেখাই কণ্ঠস্থ করিতে বাকি রাখিত না। আর ফলও ফলিত চেষ্টার অনুরূপ। এইসব কৃতবিদ্য লোকের মুখের ইংরেজি শুনিয়া বড় বড় সাহেবদেরও চমক লাগিত; নাম না দিয়া খবরের কাগজে লেখা বাহির করিলে বাঙালির লেখা না সাহেবের লেখা এ লইয়া তর্ক উঠিত। আর আজ দুই ছত্র নির্ভুল ইংরেজি লিখিতে বি এ পাশ ছেলে গলদঘর্ম হইয়া উঠে। শিক্ষার অবনতি আর বলে কাকে!

উঁচুদরের ইংরেজি শেখাই উচ্চশিক্ষা কি না এ প্রশ্ন তোলা অবশ্য নিরর্থক। কেননা সে

সম্বন্ধে এঁদের মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই। তবে খুব চাপাচাপি করিয়া ধরিলে এদের মধ্যে কেহ কেহ সংশয়ীদের একবার নিরুত্তর করিবার জন্য এই শিক্ষার দুই-একটা অবান্তর মাহাত্ম্যও কীর্তন করেন। তাঁরা বলেন আমাদের বর্তমানে যা কিছু উন্নতি তার মূলই তো ওই ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং ওই ভাষাই হইল বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ঐক্যসূত্র। কিন্তু ইহার পরেই কোনও ইংরেজি ইতিহাস আগাগোড়া মুখস্থের উপর বক্তার বর্তমান পাণ্ডিত্য খ্যাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এমনি গম্ভীরভাবে সে কথার শুরু হয় যে আমাদের বর্তমান উন্নতির অর্থ তাঁদের মতো পণ্ডিত লোকের আবির্ভাব না আরও কিছু, এবং ভারতবর্ষের ঐক্য ইংরেজি 'ইডিয়ামে'র ঠিক কতটা বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, অথবা কোনও কোনও বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণের মতো হ্রস্বদীর্ঘের বিন্দুমাত্র গোল ঘটিলেই সর্বনাশ, সে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আর সাহসই হয় না।

আমাদের দেশের ঠিক এই দলটিই বাঙালির স্কুল কলেজে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার প্রস্তাবে একবারে চমকিয়া উঠিয়াছেন। চমকাইবারই কথা! শিক্ষার অর্থই হইল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা; তাকেই যদি খর্ব করা যায় তবে শিক্ষার আর বাকি থাকে কী? কেননা সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, সবই হইল উপলক্ষ্য। যেমন কথাচ্ছলে নীতি শিক্ষা, এও তেমনি নানা ছলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা। নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া ভিন্ন পথের মোহে বাড়ির কথাটাই আর কার ভুল হয়! এঁদের মধ্যে যাঁরা কলেজের অধ্যাপক তাঁরা আরও কঠিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কুপারের কবিতার সৌন্দর্য, কি অ্যাডিশনের রসিকতার রস তাঁরা বাংলা ভাষায় ছেলেদের বুঝাইবেন কেমন করিয়া? সমস্যা গুরুতর। যে সব পুথিতে ওই সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ ও রসিকতার ব্যাখ্যা আছে সেগুলিও যে ইংরেজি ভাষাতেই লেখা! আর এ কথাও ঠিক অনেক ইংরেজ লেখকের কবিত্ব ও রসিকতা আমরা ভক্তিভরে গলাধঃকরণ করিতেছি, মাতৃভাষার সাদা চোখে দেখিলে যে ভক্তি নাও টিকিতে পারে। প্রমাণ, য়ুরোপ মহাদেশের লোকেরা, যাঁরা ভাষা শিখিবার উপায় স্বরূপে নহে, সাহিত্য হিসাবেই ইংরেজি সাহিত্য পড়েন তাঁরা হয়তো সে সব লেখকের নামও শোনেন নাই। এমনকী খোদ ইংল্যান্ডেই তাঁদের অনেকে অচল হইয়া উঠিলেন। আমাদের নিষ্ঠা কিন্তু অটল।

যাক এই পরিবর্তনভীরু অতীতপন্থীদের কথা ছাড়িয়া দিই। এঁরা নিজেদের ইংরেজি জ্ঞানের যতই বড়াই করুন না কেন, গত শতাব্দীর প্রথমে যাঁরা এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন এঁরা তাঁদেরই বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সংস্করণ। সংস্কৃত পড়িলেই চিত্তে জড়তা আসে, আর ইংরেজি শিখিলেই মন স্বাধীন হয়। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বর্ষ বয়সেও উপকথা বাংলাদেশের বালককেও বিশ্বাস করানো কঠিন।

১২

বাংলাদেশের স্কুল কলেজের বর্তমান শিক্ষায় বাঙালি যে আর, সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না, তাহার মূলে অতীত নয় ভবিষ্যৎ। আগেকার দিনের ইংরেজি শিক্ষার পাকা গাঁথনির সঙ্গে তুলনা হালের শিক্ষার উপর আমাদের বিরক্তির কারণ নয়। কারণ হইল বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাব, কলার রাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির শক্তি ও কৃতিত্বের এ একটি ছবি কতক অস্পষ্ট কতক স্পষ্ট হইয়া এ যুগের বাঙালির চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে শক্তির উদ্বোধনে ও কৃতিত্বের সহায়তায় দেশের প্রচলিত শিক্ষার সামর্থ্যের অভাব। বর্তমানের উপর আমাদের সমস্ত বিরাগেরই মূল এইখানে। যা কিছু এই ভবিষ্যতের প্রতিকূল তা আমাদের অসহ্য। যাহা এর অনুকূল নয় তাহা আমাদের চোখে মূল্যহীন। বিশুদ্ধ ইংরেজির অনর্গল বক্তৃতায় বড় সাহেবের চমক লাগাইবার লোভ আমরা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমরা ভাবিতেছি সেইদিনের কথা যেদিন বাংলা ভাষায় বাঙালি কী ভাবে এবং লেখে তাহার খবর না রাখিলে বড় সাহেবের দেশের বড় পণ্ডিতেরও চলিবে না। বাহিরের লোকের কানে এ কথা নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন গর্বের মতো শুনাইবে। কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আজ শিক্ষিত বাঙালির ইহাই অন্তরের কথা এবং সেই কারণেই বাঙালির শিক্ষার প্রধান কথা।

১৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলমোহরে যাঁরা advancement of learning 'জ্ঞানের প্রসার' ছাপ বসাইয়া ছিলেন advancement কথাটার কী অর্থ তাঁদের মনে ছিল বলা কঠিন। অবশ্য আমরা জানি বেকনের যে পুথির নাম হইতে কথাটি লওয়া, সে পুথির প্রতিপাদ্য হইল, কেমন করিয়া নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার হয়। কিন্তু এও জানি যে পশ্চিমের অনেক কথা পুব দেশে আসিলে অর্থের বদল হয়। সুতরাং অসম্ভব নয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলমোহরে ওই কথাটার আদি অভিপ্রেত অর্থ, জ্ঞানের 'প্রসার' নয় জ্ঞানের 'প্রচার'। জ্ঞানের সীমা বিস্তার নয়, পূর্বদেশের অন্ধকারে পশ্চিমের আলোক বিস্তার। সে যাই হোক এ কথা নিশ্চয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা আরম্ভ হইল তাহার একমাত্র লক্ষ্য ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বার্তা দেশের মধ্যে প্রচার করা; বাঙালিকে এই নূতন সাহিত্য ও নূতন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করা। এই জ্ঞান ও বিদ্যা পরের হাত হইতে লওয়াই যে চরম সার্থকতা নয়, ইহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে ইহাকে বহন করিতে জানিতে হয়, ইহাকে সৃষ্টি করিতে না জানিলে যে ইহাকে আপনও করা যায় না এ কথা তখন বাঙালির মনে হয় নাই; মনে হইবার কথাও নয়। সে দিন ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে আসিয়াছিল দেবতার দানের মতো। আমরা ভাবিয়াছিলাম ইহাকে স্বীকার করিয়া ঘরে তোলার নামই অমৃতত্বের

অধিকার। এ যে স্বর্গের মন্দাকিনী নয় পাতালের ভোগবতী, ইহাকে যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিতে হয়, আর যে মাটি খুঁড়িতে না জানে ইহা যে তার কাছে অমৃত নয়, কেবলই তোলা জল, কখনও ঘোলা কখনও কিছু নির্মল, সে কথা বুঝিবার তখনও সময় হয় নাই। তাই যে শিক্ষার লক্ষ্যই হইল অন্যের আবিষ্কৃত জ্ঞান, অন্যের সৃষ্ট রস, অন্যের আহৃত বিদ্যা কেবলই, নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করান, তাহাকেও আমরা পরম সমাদরে সমস্ত মন দিয়া বরণ করিয়া লইলাম।

কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে এ শিক্ষাতেও বাঙালির মন বেশি দিন নিশ্চেষ্ট থাকিল না। আমাদের মনের যে অংশটা পূর্ব হইতেই সচল ছিল, সেই ভাষা ও সাহিত্যের দিক, এই নূতন শিক্ষা ও ভাবের স্পর্শে নব বসন্তের সাড়া দিল। নবযুগের অভিনব ভাব প্রকাশের উপযোগী শক্তিশালী, সৌন্দর্যময় ভাষা আমরা গড়িয়া তুলিলাম। বাংলার নবীন সাহিত্য আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও পুষ্ট করিতে লাগিল। তবুও এই সাহিত্যকে পরীক্ষা করিলেই নূতন শিক্ষা প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ধরা পড়ে। দেখা যায় কাব্য ও রসসাহিত্য বাদে এ সাহিত্যের বেশির ভাগই অনুবাদ ও সংকলনের সাহিত্য। যে তৈরি ভাব ও চিন্তা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির কাছে আসিয়াছে তাহাকেই বাংলা পোশাকে দেশের কাছে দাঁড় করানো মাত্র। আমাদের সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাও য়ুরোপীয় জ্ঞানে বিজ্ঞানের অতি সাধারণকথা ইংরেজি পুথি হইতে সংকলন করিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সে যুগই ছিল প্রচারের যুগ। বঙ্কিমের 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে'র কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের এই সব অতি সাধারণ কথার সংগ্রহও বাঙালি সেদিন 'বিষবৃক্ষে'র লেখনীর অযোগ্য মনে করে নাই।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সর্বপ্রথম যুগে যে অতি-মানুষ বাঙালি, প্রাচ্য সভ্যতার শিখরে দাঁড়াইয়া মোহহীন চক্ষুতে পশ্চিমের সভ্যতাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিজের জাতির সম্পর্কে আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর তাঁর কোথায় লোভ ছিল তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে দুইটি কথা খুব সুস্পষ্ট। প্রথম বাঙালি জাতির বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতায় তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখান নাই। দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁহার লক্ষ্য ছিল বাঙালির বুদ্ধির ধারাকে এমন পথে প্রবাহিত করানো যাতে জ্ঞানের ভূমি সরস ও উর্বর হয়। দ্বিতীয়ত তিনি চাহিয়াছিলেন য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃক্ষটিকে শিকড়সুদ্ধ দেশের মাটিতে রোপণ করিতে ('planting in Asia the arts and sciences of Modern Europe') যেখানে আমাদের মনের রসে ও রৌদ্রে, এ দেশেই সে গাছে নব কিশলয় দেখা দিবে, নূতন ফুলে ও নূতন ফলে মানুষের সভ্যতার শোভা ও সম্পদ বাড়াইবে। কিন্তু যে ইংরেজি শিক্ষা দেশে আরম্ভ তাহা রামমোহনের ঈপ্সিত শিক্ষা নয়। ইহার লক্ষ্য য়ুরোপের জ্ঞানের বৃক্ষ এদেশে রোপণ করা নয়; সেদেশ হইতে কিছু ফুল, ফল, পাতা আনিয়া এদেশের লোকের চোখের সম্মুখে ধরা। যাহাতে ঘর সাজানো যায়, কিন্তু বাগান করা চলে না। আর সে ঘরের সজ্জাও নিত্যনূতন ধার করিয়া আনিতে হয়, কেননা জ্ঞানের তোলা ফুল পাতাও এক রাত্রিতেই বাসি হইয়া যায়।

এ পত্রের পর একশো বছর অতীত হইতে চলিল। আজ বাঙালি অন্তরের মধ্যে নিঃসন্দেহ অনুভব করিতেছি রাজা রামমোহন স্বজাতির মানসিক শক্তিতে যে বিশ্বাস দেখাইয়াছিলেন তাহা অত্যুক্তি নয়। আজ সাহিত্যে, চিন্তায়, বিজ্ঞানে বাঙালির সৃষ্টি বিশ্ব মানবের সভ্যতার সভায় স্থান পাইতেছে, এবং আমরা বুঝিতেছি ইহা কেবল সাফল্যের সূচনা মাত্র। এই সামান্য সফলতার প্রারম্ভকে বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার শক্তি এ জাতির মধ্যে আছে। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন এ শক্তিকে পূর্ণভাবে জাগাইয়া তোলা। ইহাকে সংহত করিয়া সৃষ্টির পথে, মুক্তির দিকে ছাড়িয়া দেওয়া। ইহাই হইল আমাদের শিক্ষার বিশেষ উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত কাজ।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্যাও এইখানেই। আজ বাঙালির প্রয়োজন সেই শিক্ষায় যাতে জাতির বুদ্ধি ও প্রতিভা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া ওঠে। নিজের প্রাণে সেই প্রাণের স্পর্শ পায়, যার সঞ্জীবনী রস মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া' নিত্য নূতন ফলপুষ্পে তার দেহকে মণ্ডিত করিতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিতেছে সেই প্রথম কালের প্রাচীন শিক্ষা, প্রাণের সঙ্গে যার কোনও সম্বন্ধ নাই, কাঠের মূর্তি লইয়াই যার কারবার।

বাঙালির মনের শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া জ্ঞানের রাজ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যার লক্ষ্য নয়, যার উদ্দেশ্য হইল বাঙালিকে ঘরে বসাইয়া জ্ঞান রাজ্যে, ছাপা ছবি তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখা। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকশালায় অন্ন পাকের আগুনের প্রয়োজন, কিন্তু তার হাতে কেবল আছে টিনের কৌটার তৈরি খাবার পরিবেশনের সরঞ্জাম।

স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলাই ভাল এখনকার দিনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের জন্য রাজার দেশ হইতে যে সব অধ্যাপকের আমদানি হইতেছে তাঁহারা এ যুগে বাংলাদেশে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা দিবার অধিকারী নহেন। তাহার সহজ কারণ য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের যথার্থ যোগ নাই। কেননা য়ুরোপের চিন্তার রাজ্যে তাঁরা কেহ ভাবুক নহেন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কেহ কর্মী নহেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার ফেরিওয়ালাকেও গুরুর আসনে বসাইয়া যে দিন আমরা ফল পাইয়াছি সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন চাই শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। দেশি বা বিদেশি আজ বাঙালির আচার্য হইবার কেবল তাঁরই অধিকার, চিন্তার রাজ্যে যিনি নূতন ভাবনা ভাবিতে পারেন, জ্ঞানের আকাশে নূতন আলো যাঁর চোখে পড়ে। এই আচার্যদের সাহায্যেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাকে সফল ও সজীব করিবার একমাত্র উপায়। ইহার অভাবে বড় বাড়ি, ভাল আসবাব, এমনকী বহুমূল্য যন্ত্রপাতি সকলই বৃথা। আর এইটি ঘটিলে সকল অভাবের মধ্যেও আমাদের শিক্ষারও প্রাণ ও শক্তিলাভে বিলম্ব ঘটিবে না।

নূতন সৃষ্টির বেদনার পুলকে বাঙালির মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে কলায়, সাহিত্যে বিজ্ঞানে নূতন রস, নূতন ভাব, নূতন জ্ঞানের দিকে তার চিত্ত উন্মুখ। এই নব জাগ্রত সৃষ্টির শক্তিকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার যাহা সহায় শিক্ষাই এ যুগে বাঙালির প্রকৃত শিক্ষা।

পরের পণ্যে মহাজনী আমরা অনেক দিন করিলাম। এখন শিল্পশালার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কি শিল্প বাণিজ্যে, কীভাবে চিন্তায় দোকানদারি করিয়া তৃপ্তির দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। বৃহৎকে আমরা বরণ করিয়াছি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। স্বল্পতুষ্টির প্রবল প্রলোভন হইতে মানবসভ্যতার বিধাতা বাঙালি জাতিকে রক্ষা করিবেন।

সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

লোকসভার উপনির্বাচন

দেশের ডাকেই ডক্টর মেঘনাদ সাহা কলিকাতার উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছিলেন এবং আপনারা তাঁকে আপনাদের প্রতিনিধি করে লোকসভায় পাঠিয়েছিলেন। এ গৌরব কলিকাতার উত্তর-পশ্চিম নির্বাচন-কেন্দ্রের ললাটে জয়টিকা। কারণ, মেঘনাদ সাহার মতো লোক যাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এরকম আইন-সভার নির্বাচন কেন্দ্র পৃথিবীতে কম আছে। ডাঃ সাহার মনে হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনযন্ত্রের যন্ত্রীদের ভুল-চুক, অবুদ্ধি, অজ্ঞান ও নতস্কন্ধ অনুচরপরিবৃত আত্মতুষ্টির স্বরূপ লোকসভাতেই উদ্‌ঘাটন করে দেখানো প্রয়োজন। এ কর্তব্য তিনি কেমন পালন করেছিলেন সমস্ত দেশ তা জানে। তাঁর তথ্য-ভূয়িষ্ঠ ও বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে বিশদ সমালোচনার উত্তরে পলিটিশ্যান অভ্যস্ত বাক্য-বিস্তার ও ক্ষমতাব ভ্রূকুটি প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু থাকত না। এব তুল্য প্রতিনিধিত্ব আপনারা আর পাবেন না; ভারতবর্ষের কোনও নির্বাচনকেন্দ্রই পাবে না। কিন্তু মেঘনাদ সাহা তাঁর জীবনের শেষ কয়দিন ভারতবর্ষের যে দারুণ অমঙ্গল কল্পনা ও তার আনুষঙ্গিক পশ্চিম বাংলা ও বাঙালির প্রভাব ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবন থেকে নিশ্চিহ্ন করাব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন, এই নির্বাচনে সেই প্রতিরোধের সহায়তা করে মেঘনাদ সাহার কাছে আপনাদের গৌরবের যে অসীম ঋণ তা কিছু পরিশোধ করতে পারেন।

২

বিদেশির শাসনকালে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস যখন, কোনও রাষ্ট্রীয় দলের নয়, সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধি ছিল, তখন তার নেতাদের কাছে সূর্যের আলোর মতো সুস্পষ্ট ছিল যে, ইংরেজ-বিমুক্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় গড়ন হবে ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলির ভৌগোলিক সীমা নির্দিষ্ট রাজ্যগুলির সমষ্টি। এইজন্য তাঁরা ইংরেজ শাসনের প্রদেশ বিভাগকে অগ্রাহ্য করে ওই ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের কংগ্রেস কমিটিগুলির গড়ন দিয়েছিলেন। কারণ, এ বিভাগ কেবল স্বাভাবিক নয়, বিচিত্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের একমাত্র উপায়; যে ঐক্য বাইরের চাপের একত্ব নয়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বোধে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের ঐক্য। কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র যে কংগ্রেস দলের হাতে এল সে দলের মুখ্যেরা... হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে পূর্ব পূর্ব কংগ্রেস নেতারা ভুল

বুঝেছিলেন। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের গড়ন ভারতরাষ্ট্রের ঐক্যের জন্য প্রয়োজন তো নয়ই, ঐক্যের একেবারে পরিপন্থী। ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য আসবে ও বজায় থাকবে ভিন্ন ভাষাভাষী কোটি কোটি লোকদের মিশিয়ে কয়েকটা রাজ্য গড়লে। ঐক্যের জন্য প্রয়োজন রাজ্যগুলির মিলন নয়, মিশ্রণ। কংগ্রেসের পূর্ব নেতারা ভুল করেছিলেন, কারণ, তাঁরা ছিলেন আদর্শের আকাশে নিবদ্ধদৃষ্টি স্বাধীনতার যোদ্ধা মাত্র, আর এঁরা হচ্ছেন বাস্তবের মাটিতে পা গেড়ে দাঁড়ানো শাসক সম্প্রদায়। এ চিন্তার মনস্তত্ত্ব ক্ষমতার খেয়াল, না অন্য অভিসন্ধি, একদিন প্রকাশ হবে। কিন্তু কিছুতেই এ চিন্তাকে বাস্তবের রূপ দেওয়া সম্ভব হল না। অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও অন্ধ্রকে তামিলনাদ থেকে পৃথক করে ভিন্ন রাজ্য গড়তে হল। দুই এক না হয়ে, এক দুই হল। তারপর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হলে দেখা গেল যে দক্ষিণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কমিশন যে প্রস্তাব করেছেন তা প্রায় নির্জলা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়নের। এবং দুই ভাষাভাষী দুই রাজ্য মিশিয়ে এক রাজ্য গড়ার প্রস্তাব কোথাও নেই। এই নিয়ে দিল্লির কংগ্রেসি নেতৃমহলে যখন শোরগোল চলছে, তখন একদিন শোনা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষকে এক মহান আদর্শ দেখিয়েছেন। তাঁরা রাজি হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এই দুই রাজ্যকে মিশিয়ে এক রাজ্য করতে। 'মহান নেতা' বলে দিল্লিতে কংগ্রেস প্রধানেরা তাঁদের কেমন অভিনন্দন জানালেন সে কথাও খবরের কাগজ মারফত প্রচার হল। কিন্তু যা অনুমান করা কঠিন ছিল না তা-ই ঘটল। এই মহান নেতাদের মহান আদর্শের মহত্ত্ব ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি প্রধানেরা উপলব্ধি করলেন না এবং সে মহান আদর্শের পথে এক পাও এগুলেন না। কারণ, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান আছে। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু-কথিত নখ-দন্ত আকারহীন regional council নিয়ে একটু খেলার ভান করলেন। এবং নিজেদের রাজ্য-গড়ন সম্বন্ধে তাঁদের দৃঢ়তা প্রমাণ হল প্রস্তাবিত রাজ্য পুনর্গঠন আইনের বিলে। সমস্ত তেলেগুভাষীদের নিয়ে এক বিশালান্ধ্র গড়তে হল— অবশ্য একটু ভিন্ন নামকরণে; শ্রীনেহরুর প্রিয় হায়দরাবাদের একত্ব ভেঙে ভাষার বিভাগে ভাগ করে টুকরোগুলিকে মিশিয়ে দিতে হল পাশের সমভাষাভাষী রাজ্যগুলির সঙ্গে। সংস্কৃত কাব্যের কবিত্ব-সুরভি বিদর্ভ নাম দিয়েও মহারাষ্ট্রভাষী এক ভূখণ্ডকে মহারাষ্ট্র রাজ্য থেকে ভিন্ন রাখা গেল না। বোম্বাই শহরকে তফাত রাখার চেষ্টার ফল কি হবে বোঝা কঠিন নয়।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার মিশিয়ে এক রাজ্য করে ভারতবর্ষকে ঐক্যের আদর্শ দেখানো গেল না। কারণ আদর্শটিরই অপঘাত ঘটল। তবুও এ মিশ্রণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল না। কার স্বার্থে, কি মূঢ়তায় অনুমান করা যায়। অচিরেই সুস্পষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ভারতবর্ষের এত বড় অংশ নয় যে মিশ্রণ যদি ঐক্য হয়, তবে তাদের মিশ্রণে ভারতবর্ষের একটা বড় অংশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে।

৩

বিধানবাবু ও তাঁর অনুগামীরা দেশের লোকদের বলছেন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার মিশে একরাজ্য হলে বাঙালি ও বিহারিদের লাভ হবে অনেক। এর সত্য-অসত্য বিচারের আগেই মনে খটকা লাগে। কারণ এ প্রস্তাব বিধানবাবু করেছিলেন ভারতবর্ষে ঐক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার অপার্থিব পুলকে। বাঙালি-বিহারির লাভ ক্ষতি বিবেচনা করে নয়। এ আদর্শের কাছে বিহারি-বাঙালির লাভালাভের হিসাব তুচ্ছ। সমস্ত ভারতবর্ষের হিতের জন্য বাঙালি কি বিহারির ক্ষুদ্রস্বার্থ বলি দিতে পারা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আদর্শ-বিমুখ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের উপেক্ষায় যখন মহান আদর্শটি বানচাল হল, তখন তৈরি হল লাভের ফর্দ। মনে সন্দেহ না উঠে পারে না যে হিসাবটি জাল। একটা বিশেষ ফল দেখাবার জন্য ফর্দটি তৈরি। হিসাবের গণনায় সে ফল পাওয়া যায় নাই।

যা হোক, বিধানবাবুর প্রধান কথা যে এই মিশ্রণে বাঙালি ও বিহারির বৈষয়িক ও আর্থিক উন্নতি হবে ব্যাপক ও ত্বরিৎ গতিতে। বিশেষ এই দুই রাজ্যে যে প্রভূত খনিজ সম্পদ আছে দুই রাজ্যের সরকার এক হলে তাদের এমন কাজে লাগাতে পারবেন যে বাঙালি ও বিহারির আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা প্রায় লোপ হবে। বিধানবাবুর না-জানার কথা নয় যে ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদ সমস্ত ভারতবর্ষের এবং সংগত কারণেই তা কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন। তার উপর রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিধানবাবুর অবশ্য অজ্ঞাত নেই যে ১৯৪৮ সালে এক আইন করে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের সমস্ত খনি ও খনিজ সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার নিজের আয়ত্তে এনেছেন। ওই আইনের দ্বিতীয় ধারাটি এই:

It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Central Government should take under its control the regulation of mines and oilfields and the development of minerals to the extent hereinafter provided.

এই 'extent'-এর প্রসারটা কতদূর তা এই জানলেই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে যে ওই আইন অনুসারে যে নিয়মাবলি ১৯৪৯ সালে তৈরি হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বাড়াবার জন্য যার অদলবদল ক্রমাগত চলেছে, তার ২৬ নং নিয়মে আছে:

No mining lease for any mineral specified in Schedule IV shall be granted except with the prior approval of the Central Government.

In case the State Government wants to work any mineral specified in Schedule IV departmentally it shall obtain the prior approval of the Central Government.

এই চতুর্থ তপশীলে যে খনিজদ্রব্যগুলির তালিকা আছে তাদের প্রথম হচ্ছে 'কয়লা'। দুই রাজ্যের প্রধান ও প্রকৃত একমাত্র খনিজ সম্পদ। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এক হোক কি দুই থাকুক, যুক্ত কি বিযুক্ত সরকারের এই কয়লার উপর অবাধ ক্ষমতা নেই। এবং যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আছে তার ব্যবহারে দুই রাজ্য দুই থাকলে কি বাধা এবং এক হলে কি সুবিধা বিধানবাবু কখনও প্রকাশ্যে বলার চেষ্টা করেন নাই। কারণ বলার কিছু নেই।

বিধানবাবুর দ্বিতীয় কথা, পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব বাঙালি হিন্দু ক্রমাগত ভারতবর্ষে আসছে

ও আসবে পশ্চিমবঙ্গ বিহারের অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের ভারতবর্ষে স্থান দেওয়া সহজ হবে। বিহারে সে স্থান আছে কি না তার হিসাব নেওয়া বিধানবাবু প্রয়োজন মনে করেন নাই। বহুবার সে হিসাব দিয়ে লোকে দেখিয়েছে যে বিহারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বৃত্ত পূর্ববঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের স্থান করা সম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা যে এতে রাজি আছেন বিহারের নেতারা ভুলেও সে কথা কখনও উচ্চারণ করেন নাই। সমস্তটাই বিধানবাবুর ভিত্তিহীন একতরফা কল্পনা।

সত্যকথা, বঙ্গ-বিহার যুক্তরাজ্যে উন্নতি ও সুখ-সুবিধার কল্পনা বিধানবাবুর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির দৃষ্টিতে দেখা আধ্যাত্মিক তথ্য। এবং অন্য অনেক আধ্যাত্মিক তথ্যের মতোই তা যুক্তি দিয়ে বুঝানো যায় না। বিধানবাবু যাদের রাষ্ট্রগুরু তাহা গুরুর মুখের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভক্তমণ্ডলীর বাইরে যে গোটা দেশ তার যুক্তিমার্গী পাষণ্ডীরা এই অনির্বচনীয় তথ্য কিছুতেই বুঝতে পারবে না। ভিন্নভাষাভাষী বাজ্যগুলি মিশিয়ে একাকারের সুখ-সুবিধা, ভারতবর্ষের আর কোথাও কেউ বুঝল না। মনের সন্দেহ কিছুতেই নিবারণ কবা যায় না যে, বিধানবাবু যে কারণেই হোক একটা কথা দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর কথাই পশ্চিমবাংলার শেষ কথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুচরপরিবৃত বিধানসভায় তা ই জেনে এসেছেন। বিধানসভার বাইরেও যে একটা দেশ আছে সেকথা ভুলে গিয়েছিলেন। দিল্লির উপরওয়ালাদের সামনে মহান নেতৃত্বের গুরুভার মাথায় নিয়েছেন তাকে বহন করাও কঠিন, মোচন করাও শক্ত। এ হচ্ছে গৌরবের সেই মণিহার যা "পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে"। বিধানবাবু বেকায়দায় পড়েছেন।

কিন্তু চেষ্টার ক্রটি নেই। বিধানবাবু নিজেকে বলেন কাজের লোক। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্য এসব অকেজো বস্তুগুলির উপর তাঁর কর্মীসুলভ তাচ্ছিল্যের কৃপাদৃষ্টি আছে। সেইজন্য পশ্চিমবাংলার বিহার ভুক্তিতে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতির পথে আশঙ্কার কথায় নিজে বেশি কিছু বলেন নাই। সম্প্রতি বেশ মোটা সংখ্যার একদল নানাস্তরের সাহিত্যিক বিবৃতি দিয়েছেন যে, বাংলা-বিহার সংযুক্তির রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক অন্য সব ফলাফল কী হবে না হবে তাঁরা বলতে চান না, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও অবনতি হবে না। অর্থাৎ গলায় ছুরি দিলে তার ফল কী হবে না হবে তাঁরা বলতে চান না, কিন্তু চুলের বাঁকা সিঁথি নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। এত ঢাকাঢাকির প্রয়োজন কী ছিল? সাহস করে সোজা বললেই পারতেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবুর সংযুক্তির প্রস্তাব তাঁরা সমর্থন করেন। সাহিত্য সৃষ্টি সমাজ মহীরুহের সুরভি ফুল ও অমৃত ফল। সেই ফুল ও ফলের জন্ম ও উৎকর্ষ সম্ভব হয় সেই বৃক্ষের সজীবতায়। গাছের খবর রাখি না, মরবে না বাঁচবে, কিন্তু ফুল সমান-ই ফুটবে, ফল সমান-ই ফলবে— কথাটা বিকারের প্রলাপের মতো মনে হয়। ইংরেজ আমলে যে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, কয়েকটি বড় প্রতিভার আবির্ভাবে সে সাহিত্য বড় সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি তার লেখক সংখ্যা, কি তার পাঠক সংখ্যা! স্বাধীন ভারতবর্ষের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির মাপকাঠি কি সেদিনের সঙ্গে সমান থাকবে? লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বাঙালি কি বাংলা সাহিত্যের পাঠক হবে না? পূর্বের তুলনায় অগণ্য লেখক কি সমাজের সকল স্তরে দেখা দেবে না এবং প্রতিভা

সৃষ্টির ক্ষেত্র কি সুবিস্তৃত হবে না? বাংলা সাহিত্যের এই উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বিহারের কুক্ষিগত হওয়া, কি বিহারকে কাঁধে নিয়ে বেড়ানো বাধা না সুবিধা সেইটিই বিচার্য। ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় ভাষা ও সাহিত্যগুলি সম্বন্ধে মিশ্রভাষাভাষী রাজ্যের ফলাফলের সেইটিই বিচার্য। আমাদের বিবৃতিদানী সাহিত্যিকেরা কি তাঁদের বইয়ের কাটতি আশু কমবে কি না তাই দিয়ে বিচার করেছেন? বাঙালি সাহিত্যিকদের রাষ্ট্রক্ষমতাধারীদের কাছে মাথা নোয়ান, ক্ষোভ ও লজ্জার কথা, কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নয়। সাহিত্যিকের স্বাধীনতার ইতিহাস পৃথিবীতে নূতন। আমাদের সংস্কৃত কবিরা রাজাদের নির্জলা স্তুতির নির্লজ্জ প্রশস্তি রচনা করেছেন। প্রাচীন বাঙালি কবিরা পৃষ্ঠপোষক ধনীদের স্তবগান করেছেন। শেকসপিয়রের Venus ও Adonis ও Lucrece কাব্য দুটি Earl of Southampton-এর উৎসর্গে আজকের দিনে অবিশ্বাস্য স্তুতি রয়েছে। সে যুগে এ ছাড়া সাহিত্যিকের গতি ছিল না। সাহিত্যিকের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে লেখাপড়ার বহুল প্রচারে ও বই ছাপা হয়ে লোকের ক্রয়-ইচ্ছা ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। সাহিত্যের ইতিহাস সেদিনের কথা। এর মধ্যেও সব দেশে ক্ষমতা ও ধনের কাছে বহু সাহিত্যিক মাথা বিকিয়েছেন,—মুসোলিনির ইতালিতে, হিটলারের জার্মানিতে, স্তালিনের রুশিয়ায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক সমাজের নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। গরিব দেশ বাংলা, গরিব তার সাহিত্যিকেরা। দেশ নিরক্ষর; পাঠকের সংখ্যা এত কম যে, বই বিক্রি করে সংসার চলে না। সেখানে যদি রাজসরকার পেনশন, সাহায্য, বই ছাপার ব্যয় ও খেতাবের জাল পাতেন তবে কিছু সাহিত্যিক যে ধরা পড়বেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন তাঁবেদারিতে লোকসমাজের যে সম্মান তাঁরা হারাবেন, তা ফিরে পাওয়া সহজ হবে না।

একদল সাহিত্যিক বলেছেন, বাংলা-বিহার সংযুক্তিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও আশঙ্কা নেই। বিপুল সাহসী অতুল্য ঘোষ মহাশয় বলেছেন, কোনওদিকেই কোনও কিছুর আশঙ্কা নেই। চার কোটি বিহারির মধ্যে আড়াই কোটি বাঙালি মিশলে হাতগোনা ডেমক্রেসির যুগে বাঙালির দুর্দশা হবে এ আবার কেমন কথা! এ গভর্নমেন্ট পার্টি গভর্নমেন্ট। এতে বিহারি-বাঙালি বলে কিছু নেই। আছে এ পার্টি কি অন্য পার্টি। দেশ যেন কংগ্রেস পার্টির মধ্যে নানা রাজ্যে দলীয় স্বার্থের কোদল দেখে নাই! পশ্চিমবাংলায় প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়কে সরিয়ে বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কেমন করে? একপার্টির মধ্যে কংগ্রেসের একদল অন্য দলকে দাবিয়ে, না অন্য উপায়ে? বিধানবাবুর অনুচরদের তথ্য ও যুক্তির বালাই নেই।

কিন্তু আশঙ্কা যে কত প্রবল তা বিধানবাবু পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস কমিটি সংযুক্তির যেসব শর্তের ফর্দ দিয়েছেন তার চেয়ে বড় প্রমাণ নেই। সেসব শর্তের অর্থ আমরা একও হব, ভিন্নও থাকব। বিহারের শ্রী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সিংহ উকিল ও পলিটিশ্যান মানুষ। রাষ্ট্র ব্যাপারে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব বুঝতে যদি তাঁর কষ্ট হয়, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। আর বিধানবাবু তাঁর এক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন যে, বিহারের সঙ্গে না মিশলে পশ্চিমবাংলার আর গতি নেই। সিংহ মহাশয় অবশ্যই বলবেন গতি যখন নেই তখন শর্তের কথা কেন? 'সর্ব্বসর্ত্তান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় বিধানবাবু বলেছেন যদি

তাঁর শর্তগুলি অগ্রাহ্য হয়, তবে বিহার-বাংলা মিশে এক হবে না, এবং তিনি পশ্চিমবাংলার ভাষাভিত্তিক সীমানার জন্য, অর্থাৎ যেটুকু রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের রোয়াদাদ রদ করে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট বিহার থেকে পশ্চিমবাংলাভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তার জন্য প্রবল যুদ্ধ করবেন। সেটুকুর জন্য প্রবল কি মৃদু যুদ্ধের প্রয়োজন হবে কেন বোঝা গেল না। বোধহয়, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উপর বিধানবাবুর আস্থা অকংগ্রেসিদের চেয়েও কম। তবে বিধানবাবুর যাত্রার দলের বীররসের অভিনয়ে কেউ ভুলবে না। সকলেই জানে বড় কর্তাদের একটু চোখ রাঙানিতেই তাঁর যুদ্ধসাধ দূর হবে৷ যুদ্ধ যা করবার দেশের লোকেরাই করবে।

৪

বর্তমান কংগ্রেসি দেশশাসনের মুখ্য নেতাদের রাজ্য গড়নের নীতিহীন নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলা সমস্ত ভারতবর্ষের ও নিজের হয়ে বহুরকমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কারণ, ভাষাব ভিত্তি ত্যাগ করলে যা থাকে সে হচ্ছে সাময়িক ক্ষমতাবানের খেয়াল ও অভিসন্ধি। ইহা ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য ও উন্নতির পরম শত্রু। এখন পশ্চিমবাংলা ও বিহার সংযুক্তির হঠাৎ চাপানো উদ্ভট প্রস্তাবের প্রতিরোধ তাকে করতে হচ্ছে। ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি গড়ার যে কাঠামো ভারত সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তার মধ্যে এই সংযুক্তির প্রস্তাবকে পশ্চিমবাংলা ও বাঙালিকে পঙ্গু করার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে বাংলাদেশকে ভাগ করে শক্তিহীন করার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করেছি। এবং সে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে। বাংলাদেশকে একটা বৃহত্তর রাজ্যের মধ্যে মিশিয়ে তাকে পঙ্গু করার দেশি সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তও আমরা ধ্বংস করব। ভারতবর্ষেব বর্তমান শাসকদলেব নেতারা সম্ভব ভুলে গেছেন যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসেব এটা শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র। ভারতবর্ষের উন্নতি ও প্রকৃত ঐক্যের বিরুদ্ধে সমস্ত স্বার্থান্ধ চক্রীদের ও তাদেব চক্রান্তের ফল ভারতবাসী গা থেকে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলবে, আজ না হোক কাল।

বর্তমান নির্বাচন এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একটা প্রকাশ। পশ্চিমবাংলার এই নির্বাচন-কেন্দ্র দিল্লির কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের ভাষাভিত্তিক বাজ্যগঠনের বিরূপতা ও পশ্চিমবাংলাকে বিহারে লুপ্ত করার প্রস্তাবে দেশবাসীর বিরোধিতা আবার প্রমাণ করবে। এ নির্বাচন রাজ্যগঠনের মূল নীতির দ্বন্দ্ব। সুতরাং নির্বাচন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাগুণের তুলনা অনেকটা অবান্তর। তবুও সংক্ষেপে বলি, প্রার্থী মোহিতকুমার মৈত্র, যিনি কংগ্রেস নীতির প্রতিবাদে দাঁড়িয়েছেন, তিনি আযৌবন দেশের নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, তার জন্য অভাব ও দুঃখ সয়েছেন, কারাবরণ করেছেন; আমাদের মতো নির্বিরোধ সাংসারিক জীবনযাপন করেন নাই। পশ্চিমবাংলা ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন সমিতির তিনি সম্পাদক— যে সমিতি ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন নীতির ও পশ্চিমবাংলার বিহারভুক্তির প্রতিরোধে দেশের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। অন্য প্রার্থীর পরিচয় তিনি কংগ্রেসের অর্থাৎ

বিধানবাবুর মনোনীত প্রার্থী। কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের বিরুদ্ধতার সমর্থনে ও বিধানবাবুর পশ্চিমবাংলার বিহারভুক্তি প্রস্তাবের সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ব্যারিস্টারি করে অনেক টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু দেশের কোনও কাজের ডাকে কখনও সাড়া দিয়েছেন এমন কথা দেশ জানে না। তিনি এই সেদিনও বিধানবাবুর রাজ্য সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যই সে কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। কাগজে পড়েছি তাঁর এক নির্বাচন-সভায় এক কংগ্রেসি বক্তা বলেছেন, যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর এরকম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নাই। ভাবলেম, তিনি বুঝি দেশের কাজের জন্য আইনব্যবসায় ছেড়ে ফকিরি নিলেন। খোঁজ করে জানলেম সেরকম কিছু নয়। ওটা বিধানবাবুর অনুচরদের অভ্যস্ত comic sense— শূন্য অত্যুক্তি মাত্র। হাইকোর্টে তিনি যে সরকারি কাজ করতেন তার আর্থিক মূল্যকে তাঁর ব্যবসায়ের আয়ের তুলনায় এতটা বড় করে দেখিয়ে বক্তাটি অজ্ঞানে তাঁর আইন-ব্যবসায়ের সাফল্যের উপর অবিচার করেছেন। তবে একটা কথা আপনারা তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাঁর এই কংগ্রেসপ্রীতি কতদিনের? ইংরেজের শেষ আমলে যখন কংগ্রেস রাজরোষের লক্ষ্য ছিল, তখন তিনি ক'বছর কংগ্রেসের চার আনার সভ্য ছিলেন?

এ নির্বাচনে কাকে আপনারা প্রতিনিধি করে পাঠাবেন তাতে বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হয় না।

৫

মেঘনাদের প্রতিভার সূর্য অস্ত গেছে। সে আলোর প্রতিনিধিত্বের দীপ্তি ফিরে আসবে না। কিন্তু মোহিতকুমার সেই আলোতেই দীপ জ্বালিয়েছেন।

> কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা-রবি।
> শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
> মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
> আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

মোহিতকুমার মেঘনাদের প্রতিভার সূর্যের কাছে মাটির প্রদীপ। কিন্তু নিজের তেল-সলতেয় দীপ্তিমান। চকমকি পাথর নয়, যে অন্যে না ঠুকলে আলোর স্ফুলিঙ্গের এক কণাও দেখা যাবে না।

[৭ এপ্রিল দেশবন্ধু পার্কের নির্বাচনী-সভায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।]

যুগবাণী, কলিকাতা, ৮ বৈশাখ ১৩৬৩

টেনেন্সি বিল

আইন মজলিসে টেনেন্সি বিল পেশ হবার পর থেকে কাউন্সিলের ভিতরে ও বাইরে অনেক বাঙালি হিন্দু-মুসলমান জমিদার ও অনেক মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোক যেসব বচন বলেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কিন্তু দুঃখিত হবার অনেক কিছু আছে। এই দুই সম্প্রদায়েব সামান্য মাত্র স্বার্থকেও ক্ষুণ্ণ করে বাঙালি চাষিকে কিঞ্চিৎ স্বত্ব ও সুবিধা দেবার প্রস্তাব মাত্রেরই এরা বিপক্ষতা করেছেন। নিজের ও পরের স্বার্থের সংঘর্ষে নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই মানুষের সাধারণ স্বভাব। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই। পতিত জাতির মধ্যে যদি কোনও অগ্রগামী সম্প্রদায় জাতিকে টেনে তুলতে চায় তবে সে সম্প্রদায়কে অর্থাৎ সে সম্প্রদায়ের অনেক লোককে, মানুষের সাধারণ স্বভাব অতিক্রম করতে হয়। একটু অসাধারণ হয়ে, জাতির অন্য সম্প্রদায়ের হিতে নিজের যে স্বার্থ নিজের চোখের সামনে থাকায় আর সব স্বার্থকে ঢেকে রাখে, একটু দূরে সরে সেইসব স্বার্থেব তুলনায় নিজের স্বার্থের যথার্থ পবিমাণ বোঝার শক্তি অর্জন করতে হয়। বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু দেশেব মধ্যে এমনি ধাবা পথগামী সম্প্রদায় বলে নিজেদের জেনে ও জানিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যেসব রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একদিন উপস্থিত হয়েছে, তাতে মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর কাজ ও স্থান তাদের এ দাবিকে সমর্থন করে। আধুনিক ভারতবর্ষে যারা দেশের জন্য পরম দুঃখকে বরণ করেছে এবং চরম দাম দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, তাদের অধিকাংশই এই সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু বাংলার চাষেব জমিতে চাষির স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজেদের অতি অকিঞ্চিৎকর আঁকড়ে ধরার যে উগ্র উন্মত্ততা বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু প্রকাশ করেছে তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না যে সম্প্রদায় হিসেবে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন এ সম্প্রদায়কে পাওয়া যাবে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বপক্ষে দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে। ইংরেজের ভারতবর্ষ বিজয়ে বাঙালি হিন্দুর সহায়তা কম ছিল না। যদি ভারতবর্ষের পূর্ণবিজয় ইংরেজের প্রয়োজন হয় তবে এই সম্প্রদায়ের সাহায্য থেকে সে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবে না।

পৃথিবীতে এমন দিন ছিল এবং সে খুব বেশিদিনের কথা নয়, যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের আন্দোলনের নাম ছিল জাতীয় আন্দোলন। সেটা ন্যায় হোক, অন্যায় হোক তাতে তখন কাজ চলে যেত। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি তখনও তাদের দুঃখকে দাবিতে পরিণত করতে শেখেনি। তাদের ফাঁকি দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আন্দোলনে জাগিয়ে দেওয়া সম্ভব ও সহজ ছিল। ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের "রিফর্ম বিল" এই শ্রেণির আন্দোলন। কিন্তু যেসব দেশে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এইরকম আন্দোলনের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাষ্ট্রের নায়কত্ব পেয়েছিল সে সব দেশেও আজ আর মধ্যবিত্তকে অগ্রাহ্য করা চলছে না।

কারণ অভাব ও দুঃখকে তারা আর অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিতে রাজি নয়। এবং তাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতে থাকলে অভাব ও দুঃখ মোচনের চেষ্টায় অনেকটা সাহায্য হয়। এ মনোভাব ও বিশ্বাস ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু যে কাজে গণশক্তির সহায়তা ছাড়া উপায় নেই সে কাজের কাজিকে এ মনোভাব ও বিশ্বাস মেনে নিয়েই কাজে মানতে হবে। নইলে কাজের আরম্ভেই শক্তির অভাবে তার গতি বন্ধ হবে।

আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন যে কিছুদূর গিয়েই আর চলে না, তার কারণ আমরা সকলেই জানি। এসব আন্দোলন দেশের জনসাধারণের আন্দোলন হয়ে ওঠে না, মধ্যবিত্ত শ্রেণিব আন্দোলন মাত্র থেকে যায়। অথচ এর সাফল্যের জন্য গণশক্তির সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনপণও ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনকে সক্ষম করতে পারবে না, যদি না দেশের জনসাধারণ তাদের সহায় হয়। কেননা যে জাতির স্বাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে হবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সে জাতির কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের পরিপন্থী নয়, স্বল্পবিত্ত শ্রেণিরও স্বার্থের প্রতিকূল। ইংরেজের দেশে মধ্য ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণির মধ্যে স্বার্থের এই সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ সে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের চোখে রাজনৈতিক দৃষ্টির মাথায় রাজনৈতিক মুক্তি আছে। সবটা চাপতে হলে যে অনেকটা ছাড়তে হয় তা তারা বেশ জানে। এর ফলেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বার্কেনহেড ও র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের ভাষা ভিন্ন, কিন্তু মত এক। এ জাতির সঙ্গে লড়তে হলে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বল্পবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থের এমনি সমতা ঘটাতে হবে।

কী উপায়ে? এর একমাত্র উপায়, যাদের আছে তাদের, যাদের নেই তাদের অন্যরূপে কিছু কিছু ছেড়ে দেওয়া। শুধুমাত্র ফাঁকির জোরে জনসাধারণকে নিজের কাজ করিয়ে নেওয়ার শুভ বা অশুভ যুগ একেবারে না গেলেও প্রায় যেতে বসেছে। এবং যে দেশে মাথার ওপর আর একজন চেপে রয়েছে এবং ফাঁকির কাজে যার হাত সাফাই কারও চেয়ে কম নয়, সে দেশে এক শ্রেণির পক্ষে অন্য শ্রেণিকে বেশিদিন ফাঁকি দিয়ে নিজের স্বার্থে উপরওয়ালার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। টেনেন্সি বিলের আন্দোলনে বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় প্রমাণ করেছে যে 'জনগণমনের' অধিনায়কত্বে তার রুচি নেই— যদি তার মূল্য হয় নিজের কিছু স্বার্থ ত্যাগ করা। বর্তমান টেনেন্সি বিলের ভাল মন্দ খুব বড় কথা নয়। কারণ ভোটের জোরে আজ যা স্থির হবে, ভোটেব জোরে তা উঠে যেতে বেশিদিন সময় লাগবে না। নেহরু কমিটি ম্যানচে সাফ্রেজের প্রস্তাব করেছেন এবং আমরা সবাই বাহবা দিচ্ছি। যদি ইংরেজ সে প্রস্তাব মান্যই করে, তবে আগামী টেনেন্সি বিলের রূপটা হবে কী রকমের? বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট বলে যে সে দেশের 'ম্যানরডের' শতকরা আশি ভাগ মাটি চষে খায়। আজ মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরা কাউন্সিলে যে খেলা খেলছেন, চাষির প্রতিনিধিরাও কাল সেখানে ঠিক সেই খেলাই খেলবে। যা আজকের দিনে ছেড়ে দিলে 'বাবু' ও চাষির মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন বাঁধা হাত, সেটাই বাধ্য হয়ে ছাড়তে হবে এবং উপরি পাওনাও পাওয়া যাবে স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি আক্রোশ। স্বরাজ অবশ্য তাতে অনেকটা এগিয়ে আসবে।

কিন্তু বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু কি ততদিন স্বরাজ চাইবে? যে নমুনা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কবির কথায় তারা বলবে:

"স্বরাজ এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে",
হয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!

'তারা খুব সম্ভব বলবে— যে স্বার্থের জন্য আমাদের সম্প্রদায়ের লোক দুর্গতি সহ্য করেছে, প্রাণ দিয়েছে, তা চাষার স্বরাজ নয়, আমাদের বাবুদের স্বরাজ।' ইংরেজ বণিককে সরিয়ে রাজার আসনে দেশের চাষাকে বসাবার পূর্বে একবার ইংরেজের চেয়ে 'চাষার সঙ্গে লড়ে' দেখতে হবে।

গণবাণী, ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা

প্রবৃত্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি

প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যবুদ্ধির যুদ্ধ মানুষের জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

প্রবৃত্তি বলিতেছে, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা স্বীয় উদর পরিপূর্ণরূপে পূর্ণ করো, কর্তব্যবুদ্ধি বলিতেছে, দরজায় ওই যে ক্লিষ্টদেহ, বুভুক্ষু ভিক্ষুক বসিয়া রহিয়াছে উহাকে প্রথমে অন্নের এক অংশ দান করো। প্রবৃত্তি কহিতেছে, আজ এক বিখ্যাত গায়কের গীত হইবে, সেইখানে যাও; কর্তব্যবুদ্ধি বলিতেছে, তোমার ওই রুগ্‌ণ প্রতিবেশীটির সেবা করো। প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনেই প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যবুদ্ধির এই বিরোধ ঘটা নিতান্ত সম্ভব। আর এই বিরোধেব ফলাফলের উপর কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে আমাদের ভাল বা মন্দ মতামত প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যুধিষ্ঠির মৃত পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর মধ্যে নকুল ও সহদেবের পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন, অর্জুন বা কৃষ্ণের নহে। তাহার কর্তব্যবুদ্ধি তাহাই বলিল, যুধিষ্ঠির পরম ধার্মিক। দুর্যোধন রাজ্যাংশ ধর্মত পাণ্ডবগণের প্রাপ্য জানিয়াও তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন না। সহস্র উপায়ে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। প্রবৃত্তি জয়লাভ করিল; দুর্যোধন ঘোর অধার্মিক। ঠিক এই কারণে, কর্তব্যবুদ্ধি ও প্রবৃত্তিব জয় বা পরাজয়ে, প্রতাপ ধার্মিক, গোবিন্দলাল অধার্মিক, ভরত পুণ্যাত্মা, Macbeth ঘোর পাপী।

এই যে সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত চলিতেছে; কখনও কর্তব্যবুদ্ধি জয়লাভ করিতেছে, কখনও বা প্রবৃত্তির জয় হইতেছে। কখনও আমরা উদার আত্মবিসর্জন ও কঠোর সত্যপ্রিয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি, আবার কখনও বা স্বার্থের নিকট সত্যের বলিদানে, দুর্বলহৃদয়ীর ন্যায়ের অবমাননায় ঘৃণায় কুঞ্চিতানন হইয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছি। এই যে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ইহার কি সমাপ্তি হইতে পারে না? প্রবৃত্তির ও কর্তব্যবুদ্ধির এই যে বিরোধ ইহা কি তিরোহিত হইতে পারে না? মানুষের জীবনে কি এমন দিন আসিতে পারে না যখন কর্তব্য ও প্রবৃত্তিতে কোনওই প্রভেদ থাকিবে না; যখন যাহা কর্তব্য তাহাই প্রবৃত্তি অথবা যাহা প্রবৃত্তি তাহাই কর্তব্য হইবে?

'প্রবৃত্তির ও কর্তব্যবুদ্ধির নির্বিরোধ সম্ভব কিনা', প্রশ্নটার উত্তব দিতে হইলেই দেখিতে হইবে প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যবুদ্ধির বিরোধ কী লইয়া। একটা সহজ উত্তর প্রথমেই মাথায় আসে— প্রবৃত্তি স্বীয় পরিতোষ কামনা করে, কর্তব্যবুদ্ধি অনেক সময় পরের সুখের নিকট আত্মসুখকে বলি দিতে বলে, সুতরাং উভয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য হইলে প্রবৃত্তি ও কর্তব্যের বিরোধ কোনওদিন হইত না ইহা নিঃসন্দেহ। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে উত্তরটা ঠিক হইল না। প্রবৃত্তি সকল সময়েই আত্মসুখ অন্বেষণ করে না। অনেক মা সন্তানের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, কর্তব্যবুদ্ধি চালিত হইয়া নহে, প্রবৃত্তির

উত্তেজনায়। বিদ্যাসাগর দুঃখ দেখিলেই অশ্রুমোচন করিতেন, বেদনা দেখিলেই গলিয়া যাইতেন; আপনার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পরের সুখ বর্ধন ও দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন। কর্তব্যবুদ্ধির কাজ ইহার মধ্যে অতি সামান্য, প্রবৃত্তির কার্যই সমধিক। তবে কর্তব্যবুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রকৃত বিরোধ কোথায়? আমরা বলি কর্তব্যের সহিত প্রবৃত্তির কোনও বিরোধ নাই এবং থাকাও সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে বুঝিয়া দেখা যাউক। আমরা কতকগুলি শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করি সেগুলির নাম বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলি আমাদিগকে কার্যের যে ইচ্ছা প্রদান করে তাহাই প্রবৃত্তি। মানুষের যে সকল বৃত্তি আছে, তাহার সকলগুলিই মানুষের মঙ্গলকর। ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যে বৃত্তিগুলিকে সাধারণত অতি অনিষ্টকারী বলিয়া বোধহয় প্রকৃতপক্ষে সেগুলিও মানুষের হিতকর[১]। যদি এই বৃত্তিগুলি হিতকর হয় তাহা হইলে এই বৃত্তি-সম্ভূত যে সকল প্রবৃত্তি তাহাও হিতকর সন্দেহ নাই। এখন কর্তব্যপালন যে হিতকর সে সম্বন্ধে বোধহয় কোনও দ্বিতীয় মতের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রবৃত্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি উভয়েই মানবের মঙ্গলজনক। যদি তাহাই হইল তবে তাহারা কখনও পরস্পরের বিরোধী হইতে পারে না।

এখন মনে সহজেই প্রশ্ন উঠে যদি প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের কোনও বিরোধই না থাকে তবে চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিয়ত দেখিতেছি কী? অর্থলোভে মানুষ নরহত্যা করিতেছে, স্বার্থে অন্ধ হইয়া সত্য বিসর্জন দিতেছে, এসব কি প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যবুদ্ধির সংগ্রাম ও প্রবৃত্তির জয়লাভ নহে। কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে কর্তব্য ও প্রবৃত্তির পূর্ণ বিরোধ সংসারে পূর্ণ বেগে চলিতেছে এবং এই বিরোধ অবসান হইবারও কোনও বিশেষ লক্ষণ নাই। তবে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে এই সংগ্রামে রত দুই পক্ষের এক পক্ষ একটু অপ্রকৃতিস্থ এবং তাহাতেই এই বিরোধের উৎপত্তি। দুইটি অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে দেখিয়া কেহ মনেও আনিতে পারে না যে ইহাদের মধ্যে কোনওদিন বিরোধ ঘটিতে পারে। যদি এই বন্ধুর একজন সহসা উন্মত্ত হইয়া অপরকে আক্রমণ করে, এবং আক্রান্ত বন্ধুটি যদি আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে বাধা প্রদান করে, তবে কি আমরা বলিব যে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে? ঠিক এই কারণে প্রবৃত্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি বহুস্থলে পরস্পরের বিরোধী হইলেও আমরা বলিব উভয়ের বিরোধ কখনই সম্ভব নহে। যখনই প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয় তখনই বুঝিতে হইবে প্রবৃত্তি বিকৃত হইয়াছে। অবিকৃত প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের বিরোধ কখনওই সম্ভবপর নহে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি।

পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের কতকগুলি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্তি দান করে। এই বৃত্তির কতকগুলি অতি প্রবল, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কতকগুলি অনুশীলনে অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে, কতকগুলি বা অনুশীলনে হ্রাসও হয়। এই বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অর্থাৎ যে বৃত্তিটি স্বভাবতই প্রবল তাহার আর বড় একটা অনুশীলন আবশ্যক নাই, যে বৃত্তিটি দুর্বল তাহাকে যথোচিত অনুশীলন করিয়া প্রবল

১ কথাটা বঙ্কিমবাবু 'ধর্মতত্ত্বে' অতি বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। পাঠকগণ এইস্থানে 'ধর্মতত্ত্বে'র 'সামঞ্জস্য' নামক ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিবেন।

বৃত্তিটির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। প্রবল বৃত্তিটি যদি দুর্বল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলনের বিঘ্ন হয় তবে ওই বৃত্তির প্রবলতা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিতে হইবে। এইরূপে যাহার সকলগুলি বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইয়াছে তাহার সকলগুলি বৃত্তিই অবিকৃত; সুতরাং তাহার কর্তব্যবুদ্ধির সহিত প্রবৃত্তির বিরোধ কখনওই সম্ভব নহে। যখন মানুষের একটি বৃত্তি অনুচিত বর্ধিত হয় তখনই সেই বৃত্তিজাত প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যবুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই অর্থে আমরা বলিতেছিলাম যে যখন প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয় তখনই প্রবৃত্তির বিকৃত অবস্থা। যে বৃত্তিটির ঠিক অনুশীলন হইয়াছে সেই বৃত্তির যে প্রবৃত্তি তাহার সহিত কর্তব্যের কোনওই বিরোধ নাই। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি মা যে সন্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জন করে এটা প্রবৃত্তির কার্য। কিন্তু এখানে প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যবুদ্ধির কোনওই বিরোধ নাই। মা'র কর্তব্যবুদ্ধিও সন্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে নিষেধ করে না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা মাতৃস্নেহের উপযুক্ত অনুশীলনের ফল। মাতৃস্নেহ যথোচিতরূপে বর্ধিত হইয়াছে, সুতরাং কর্তব্যের সহিত বিরোধের কোনওই সম্ভাবনা নাই। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল আমরা জানি যে মাতৃস্নেহ অতি প্রবল সহজ বৃত্তি। ইহার আর অনুশীলনের বড় প্রয়োজন নাই। ইহার স্বাভাবিক অবস্থাই বোধহয় ইহার অনুশীলিত অবস্থা। অনেক স্থলে এই বৃত্তিকে যে একটু দমনেও না রাখিতে হয়, তাহা নহে। মাতৃস্নেহের অযথা অনুশীলনে অন্যায় বৃত্তি সংসারে বড় বিরল নহে। মাতার স্নেহ এইরূপ অন্যায়রূপে বর্ধিত হইলে মাতার কর্তব্যপালনে যে ত্রুটি হয় তাহা বলাই বাহুল্য। স্নেহের এইরূপ বৃদ্ধিতে স্নেহভাজন সন্তানের যে অবস্থা হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি ও অন্যায় অনুশীলনে কী কুফল প্রদান করে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মাতৃস্নেহের ন্যায় সকল বৃত্তিগুলিই যখন উপযুক্ত অনুশীলিত হইবে তখন কোনও প্রবৃত্তির সহিতই কর্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হইবে না। সত্য, দয়া, প্রেম প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা অতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলি, কাম, ক্রোধ, লোভ, যেগুলি অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া গণ্য সকলগুলিই প্রবৃত্তির সহিত অতি বন্ধুভাবে চলিতে পারিবে। এককথায় যাহা কর্তব্য তাহাই প্রবৃত্তি অথবা যাহা প্রবৃত্তি তাহাই কর্তব্য হইবে এবং সেইদিনই মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবে।

আমাদের কথা ফুরাইয়াছে। প্রশ্ন ছিল— 'প্রবৃত্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি কখন নির্বিরোধ হইবে', উত্তর পাইয়াছি— 'যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উপযুক্তরূপ অনুশীলিত হইবে'। এখন আর একটি কথা বলিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। কথাটা একরূপ বলা হইয়াছে, তবে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য পৃথিবীর প্রায় সকল লোকেরই বহু বৃত্তি অননুশীলিত রহিয়াছে; সুতরাং প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধে বহু ব্যক্তি কর্তব্যের নিকট প্রবৃত্তির বলিদান করিয়াছে ও করিতেছে। প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে তথাপি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমকে বিসর্জন দিতে হইতেছে; ক্রোধে অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে তবুও মানুষ শত্রুকে ক্ষমা করিতেছে। এখানে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্তব্যপালন করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের বন্ধুত্ব নহে, বিরোধ ও কর্তব্যবুদ্ধির জয়লাভ। সহজেই বুঝা

যাইতেছে আমরা যখন বলিয়াছি— 'মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই যখন যথোপযুক্ত অনুশীলিত হইবে তখন প্রবৃত্তির সহিত কর্তব্যের কোনও বিরোধ থাকিবে না'— তাহা এ অর্থে নহে। ইহার অর্থ একরূপ বলা হইয়াছে, আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা যাউক। মানুষ যখন সেই অবস্থায় উপনীত হইবে তখন যাহা কর্তব্য তাহার দিকেই তাহার আন্তরিক তীব্র ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ধাবিত হইবে। প্রবৃত্তি তাহার কর্তব্যবুদ্ধিকে প্রতিহত না করিয়া বরং অধিকতর বেগ প্রদান করিবে। আর যাহা কর্তব্য নহে তাহাতে তাহার প্রবৃত্তিই হইবে না। সেইরূপ মানুষকে শত্রুর প্রতি ক্রোধ কর্তব্যবুদ্ধিদ্বারা দমন করিয়া রাখিতে হইবে না; যেখানে অনুচিত সেখানে আদৌ ক্রোধের উদ্রেক হইবে না। কর্তব্যের সহিত প্রবৃত্তির এইরূপ নির্বিরোধ একেবারে বিরল নহে। চৈতন্য যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে গৃহবাসের প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া কর্তব্যপালন করিতে হয় নাই। গৃহত্যাগের প্রবৃত্তিই অতি প্রবল হইয়াছিল। প্রতাপসিংহের স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জন প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে বেদনাপূর্ণ হইয়া উঠে নাই। পৃথিবীর যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের বহু প্রবৃত্তির সহিতই কর্তব্যবুদ্ধির এইরূপ সখ্য স্থাপিত হয়।

অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩০৭

নীললোহিত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বর্তমানকালের সবচেয়ে উর্বর সাহিত্য হচ্ছে ছোট গল্প। ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে মানুষ চিরদিন গল্প শুনতে ভালবাসে। কিন্তু প্রাচীনকালে এই গল্পের বেশির ভাগ চলত লোকের মুখে মুখে। কারণ লেখা পড়তে পারে এ-রকম লোকের সংখ্যা ছিল যেমন কম, হাতে লিখে লেখার প্রচারও ছিল তেমনি কষ্টসাধ্য। শুধুমাত্র একটি ছোট গল্পের খাতিরে প্রাচীনেরা এ কষ্ট স্বীকারে রাজি ছিলেন না। সুতরাং সেকালে ছোটগল্প মুখ থেকে লেখায় প্রমোশন পেত বড় আখ্যায়িকার সঙ্গে মিশে, না হয় নীতি ও ধর্মোপদেশের বাহন হয়ে। সেইজন্য এই সব ছোট গল্পের উপাখ্যান ভাগটাই ছিল সর্বস্ব, সাহিত্যিক গড়ন অকিঞ্চিৎকর। ছোট গল্পের রূপ দিযে সাহিত্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের নুতন সৃষ্টি। এবং সেইজন্যই আধুনিক ছোট গল্পের রূপও এক নয়, বহু এবং বিচিত্র। কারণ এ গল্পের আখ্যায়িকাই একমাত্র বস্তু নয়, এমনকী অনেক গল্পই প্রধান বস্তু নয়। এ-কালের ছোট গল্প লেখক আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে নানা চরিত্র ও রসের সৃষ্টি করেন, এবং বহু ভাবকে মূর্তি দেন। এসব চরিত্র, রস ও ভাব থেকে তফাত করলে গল্পাংশ যা পাওয়া যায় তা ছোট গল্প নয় ছোট গল্পের কঙ্কাল মাত্র। যাঁরা ছোট গল্পেব বড় লেখক, তাঁদের শ্রেষ্ঠ গল্পের অবশ্য গল্পাংশ থেকে তার চরিত্র ও ভাব সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে তফাত করা যায় না। গল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ওগুলিও গড়ে ওঠে তার অঙ্গাঙ্গি হয়ে। সেজন্য কোনও পৃথক প্রযত্নের চিহ্ন তাঁদের গল্পের গায়ে পড়ে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আধুনিক ছোট গল্পের মুখ্য কাজ নয় পাঠককে গল্প শোনানো। গল্পের মুখে যে সব ভাব ও চরিত্রের সৃষ্টি হয় তারাই আধুনিক ছোট গল্পকে তার বিশেষ রূপটি দেয়। এবং আধুনিক ছোট গল্পের যে রস তা প্রধানত আসে তার ঘটনা থেকে নয়, ওই ভাব ও চরিত্রের সৃষ্টি থেকে। সেইজন্যই গল্পলেখক যে বিশেষ সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবী ও মানুষকে দেখেন তার আলোছায়ার খেলা তাঁর ছোট গল্পের সর্বাঙ্গে দেখা যায়; এবং তাঁর মনের গড়ন তাঁর গল্পকে আকার দেয়।

'নীললোহিত' নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের যে ছোট গল্পের বই সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে তার গল্পগুলিতে প্রমথবাবুর সাহিত্যিক মনের ছাপ সর্বত্র। প্রত্যেক মানুষের দেহের চেহারা যেমন অন্য সবার চেহারা থেকে ভিন্ন, তেমনি মানুষ মাত্রেরই মনের চেহারা অন্য সকলের মন থেকে অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র। কিন্তু এমন মানুষ আছে যার চেহারা ভিড়ের মধ্যেও একাকার হয়ে যায় না, হাজার লোকের মধ্যেও বিশেষ করে চোখে পড়ে। প্রমথবাবুর মন এমনি ধারা বিশিষ্ট মন। সাহিত্যিকের মন স্বভাবতই আর পাঁচজনার মন থেকে একটু বেশি রকম স্বতন্ত্র, যে স্বাতন্ত্র্য তাকে সাহিত্য রচনার প্রেরণা দেয়। কিন্তু এমন মন আছে যার গড়ন ও ভঙ্গির বিশেষত্ব সাহিত্যিক সমাজের বিশিষ্টতার মধ্যেও বিশেষ রকমের স্বতন্ত্র।

প্রমথবাবুর দেহের প্রশস্ত বর্তুলাংশ কপাল, দীর্ঘ উন্নত নাসিকা, বাষ্পলেশহীন স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ চোখ, কৌতুক ব্যঙ্গে ঈষৎ বাঁকা অধর— তাঁর মনের চেহারাকে এমন স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে যে হঠাৎ, ভুলেও অন্য কোনও মনের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। এই মনের ছাপ 'নীললোহিতে'র গল্পগুলির গায়ে পড়ায় পাঠকের যা প্রথমে মনে হয় সে হচ্ছে এ গল্পগুলি অন্য কোনও লেখকের ছোটগল্পের মতো নয়; এদের ধরন একবারে ভিন্ন। ছোট গল্পের শ্রেণিভাগে এ গল্পগুলিকে রাখতে হয় নিজেদের এক স্বতন্ত্র শ্রেণিতে।

'নীললোহিতে'র এগারোটি গল্পের মধ্যে একটি গল্পেরও প্রধান চরিত্র স্ত্রী-চরিত্র নয়। একটিও গল্পে নেই যার বিষয়বস্তু 'প্রেম'; অবশ্য নীললোহিতের সঙ্গে যারা প্রেমে পড়েছিল তাদের প্রেম ছাড়া। বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের পুথিতে এ ব্যাপার অনন্যসাধারণ। অবশ্য এ বিশেষত্ব বাহ্যিক; কিন্তু এই বাহ্য বিশেষত্ব গল্পগুলির মূল গড়ন ও মূলে রসেরই ফল, তাদেরই বহিঃপ্রকাশ। কারণ এই গল্পগুলিতে বিন্দুমাত্র sentimentalism -এর ছোঁয়া যে দূব থেকেও লাগেনি কেবল তাই নয়, কোনও passion -এর সুরও একটুও চড়া গ্রামে ওঠেনি। প্রমথবাবুর সাহিত্যিক মন কেবলমাত্র সমস্ত রকম ভাবাতিশয্যের দিকে বিমুখ নয়, যে সব ভাবের আতিশয্যের দিকে প্রবণতা আছে তাকেও যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে চায়। মানুষের যে অবস্থা ও সম্পর্ক ঈষৎ ব্যঙ্গের তুলিতে ও কৌতুকের রঙে আঁকলে সবচেয়ে স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে প্রমথবাবুর সৃষ্টি ক্ষমতার সেইটি হল সবচেয়ে অনুকূল ক্ষেত্র। তার কারণ বোধ হয় এখানে sentimentalism -এর বাষ্প জমতে পায় না, ভাবের তাপও প্রখর হয়ে উঠতে পারে না, সেইজন্য যে গল্পের ভিতরের সুর গভীর এবং পরিণাম ট্র্যাজিক প্রমথবাবু তাকেও হাসি-কৌতুক-ব্যঙ্গ দিয়ে অনাড়ম্বর লঘুতার সঙ্গে গড়ে তুলতে চান। এবং যে-গল্পের কথাবস্তু তার অনুকূল সে-গল্প অভিনব রসের একটি নবীন সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

এই পুথির 'ঝাঁপান খেলা' গল্পটি তার সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। দেশি বিদেশি সেরা ছোটগল্পের তালিকায় একটি গল্পটি অনায়াসে স্থান পাবে। নীচ অন্ত্যজ শ্রেণির একটি পুরুষের প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ দেহ ও মন এবং সহজ বীরত্বের ছবি প্রমথবাবু হালকা তুলির টানে এমন জীবন্ত ও উজ্জ্বল করে এঁকেছেন যে আনন্দ ও বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় তা সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে তাঁর প্রধান চরিত্র ও মূল গল্পের যে background প্রমথবাবু দিয়েছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনি পূর্ণ। গল্পের বক্তা 'হওয়া উচিত ছিল ডেপুটি' কিন্তু 'আসলে মুনসেফ্'বাবুটি থেকে আরম্ভ করে, 'নীলকুঠেল সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের মেম' টগর বিবি ও 'পেলাগ্' কুকুরটি পর্যন্ত রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে বেঁচে উঠেছে। মাত্র দশ পৃষ্ঠার এই ছোট গল্পে প্রমথবাবু অনেকগুলি মানুষ ও মানুষেতর জীবের নাম করেছেন, কিন্তু কাউকে শুধু নামমাত্র রাখেননি। আশ্চর্য কৌশলে— দুটি-একটি কথায়, ছোটখাটো দু'-একটি ইঙ্গিতে— তাদের জীবন্ত, বিশিষ্ট রূপ পাঠকের চোখে ফুটিয়ে তুলেছেন। টগর বিবি যে সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের হলেও মেম তাতে পাঠকের সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মে যখন শোনা যায় যে তার 'পেলাগের' গুণবর্ণনা হচ্ছে 'তার দাম চড়াবার জন্য'। বিবি যে, 'কুঠীর হেড বরকন্দাজ উমেশ সর্দারের মেয়ে', এবং তার মুখের 'পেলাগ্' যে 'ইংরাজি Pluck শব্দের বুনো অপভ্রংশ'— এই খবরটুকুতে নীলকুঠেল সাহেব ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের জানা ইতিহাস

মনের মধ্যে আকার পায়। যে সংস্কারে বীরবল 'কুকুরের বামন' হয়ে চাকরিতে ঢুকলো তার কর্তা গিন্নি,— মুনসেফ বাবুর বাপ মা, এবং তাঁদের অম্ল-মধুর গার্হস্থ্য সম্পর্ককে পৃথক প্রযত্নে স্বতন্ত্র করে আঁকবার কোনও চেষ্টা না করে, মূল গল্পের মুখে এবং বীরবলকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁদের উপর বীরবলের রূপ ও স্বরূপের প্রভাব প্রসঙ্গেই— প্রমথবাবু একবারে সজীব করে তুলেছেন। 'ঝগড়ু' ও 'লখিয়া' গল্পের প্রায় শেষ পর্যন্ত 'বেটা বাঁদরের বাচ্ছা' এবং 'কি সুন্দরী!'— মুনসেফ বাবুর বাপের মুখের এই বর্ণনা— শেষ হয়েই ছিল, কিন্তু গল্প যখন চরমে পৌঁছিল তখন দু'-এক কথাতেই প্রমথবাবু তাদের বাঁচিয়ে তুলেছেন। ঝগড়ুও ঝাঁপান খেলার রাত্রিতে দলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু 'তুবড়ি বাজাবার ওস্তাদ হিসেবে', এবং 'অতি মাত্রায় মদ্যপানের ফলে সাপের সঙ্গে ইয়ারকির' ফল থেকে তাকে বাঁচাতে যেয়েই বীরবলের হাতে সাপের ছোবল পড়েছিল। 'লখিয়া'কে দেখা গেল সে 'সজোরে বীরবলের পা টিপছে— সাপের বিষ ডলে নামাবার জন্য'। প্রমথবাবু তাঁর এই ছোট গল্পের ছোট জগতটির উপর থেকে যেন ঢাকা খুলে দিয়েছেন, আর পাঠকের মনের চোখে জেগে উঠেছে ছেলে বুড়ো, ইতর ভদ্র, কুকুর ঘোড়ার এক টুকরো গল্পের নয়, বাঁচা মানুষ ও জানোয়ারের প্রকৃত জগৎ। সেখানে হাস্য ও করুণ, 'কমিক' আর 'সাবলাইম' পাশাপাশি নয় একত্র মেশামিশি অভিনয় হচ্ছে। যেখানে লখিয়া বীরবলের সর্বাঙ্গ থেকে সাপের বিষ নামাবার জন্য সজোরে তার গা টিপছে, ও 'বীরবলেব ভাই-ব্রাদারি থেকে থেকে বেহুলার যাত্রার ধুয়ো ধরেছে— "ও যে বাঁচবে না", এবং 'নামী রোজা' মঙ্গলা খ্রিস্টান চণ্ডী ও মেরির দুয়ের মন্তরই লাগিয়ে দেখছে কোনও ফল হয় কি না। আর এই প্রহসনের মধ্যেই একজন 'লালবেগীর' ছেলে তার অনায়াস সহজ বীরত্বে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করছে। বস্তুতন্ত্র বলে সাহিত্যে যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে এই বস্তু।

'ঝাঁপান খেলা'র ঠিক আগের গল্প 'সহযাত্রী'— গল্পের মধ্যে বাস্তবের এই মায়া সৃষ্টিব আর একটি চমৎকার উদাহরণ। এ গল্পের ঘটনাস্থান ঝাঝাগামী slow passenger গাড়িব একটি প্রথম শ্রেণির কামরা, সুতরাং জনবিরল। বহু পাত্রপাত্রীর জীবন্ত পটভূমি সত্যের যে ভ্রান্তি জন্মায় এখানে তার অবসর নেই। কিন্তু পল্টনি ইংরেজ কর্নেল সাহেব, এবং Court of Wards -এর ইংরেজ মাস্টারের হাতে তৈরি বাঙালি জমিদার সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর— এ দু'জনকে এমন সুস্পষ্ট রেখা ও উজ্জ্বল রং দিয়ে প্রমথবাবু এঁকেছেন যে তাদের গল্পের জগতের লোক বলে মোটেই মনে হয় না, এবং পরস্পরের বন্দুক সম্বন্ধে তাদের যে বাক্যালাপ তা যে সত্য ঘটনা নয় কল্পনার সৃষ্টি তা একটু চেষ্টা করেই মনে আনতে হয়। এ হচ্ছে শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সম্যক সৃষ্টি-ক্ষমতার ফল। বস্তুজগতের কোনও অংশ তার চোখ এড়ায় না, এবং কোনও অংশ সাহিত্যের সৃষ্টিতে স্থান দিলে সত্যের মায়া তার চারপাশে নেমে আসে তার অভ্রান্তবোধ শিল্পীকে চালিয়ে নেয়। এ দৃষ্টি ও ক্ষমতা প্রমথবাবুর দু-ই অসাধারণ। অনেক নামকরা বিদেশি ছোটগল্প ও উপন্যাস আমাদের বাঙালির রুচিতে অনাবশ্যক বস্তু ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়। কল্পনার সৃষ্টিকে সত্যের চেহারা দেবার জন্য বস্তুজগতের যতটা ছায়া এবং রচনার রস অনুযায়ী যে সব বিশেষ অংশেব ছায়া প্রয়োজন তার অতিরিক্ত এবং অবান্তর বাস্তবতা যেন লেখক তার লেখায় আমদানি করেন। সে

বাস্তবতা সাহিত্যের সৃষ্টিকে সজীব করে তোলার কাজে কোনও সাহায্যে আসে না, বোঝার মতো তার কাঁধে চেপে থাকে। আমাদের বাংলা গল্প উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায় এর বিপরীত ব্যাপার। কল্পনাকে মূর্তি দিতে হলে বাস্তবের রক্ত-মাংস-হাড় যেটুকু না হলেই নয় তারও সেখানে অভাব ঘটে। ফলে লেখকের বস্তু-ভার-হীন কল্পনা কল্পলোকেই থেকে যায়, সৃষ্টির মর্ত্যলোকে নেমে আসতে পারে না। বাংলা কথা-সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিক রচনা নামে যা চলে এ দৈন্য তাতেই সবচেয়ে বেশি। তার কারণ লেখকের ধারণা যে কতকগুলি বিশেষ রকম ভাবের নামই হচ্ছে বস্তু। সুতরাং কল্পনাকে সুস্পষ্ট আকার দিয়ে গড়ে তোলার কোনও চেষ্টা না করে বিশেষ এক শ্রেণির ভাবলোকে বিচরণকেই লেখক মনে করেন সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র। এই বিদেশি স্ফীতি ও স্বদেশি শীর্ণতার মধ্যে প্রমথবাবু দুর্লভ মধ্যপন্থা খুঁজে পেয়েছেন।

এমন বিষয়বস্তু অবশ্য আছে বস্তুজগতের পূর্ণতার মধ্যে যাকে সাহিত্যে দাঁড় করানো যায় না। সে পূর্ণতা থেকে রসের বিরোধী অংশকে নির্মম হয়ে ছেঁটে ফেলতে হয়। কারণ এমন রস আছে যা exclusive, যার অন্য রসের মিশ্রণ সহ্য হয় না। সত্যিকার জগতে যেখানেই 'কমিক' বস্তু আছে, তার সাহিত্যিক প্রতিরূপে সেখানেই তাকে আনা চলে না। যে গল্পের বিষয়বস্তু এ রকমের সেখানে প্রমথবাবুর গল্প রচনার যেটি প্রিয় রীতি তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। নীললোহিতের 'পূজার বলি' ও 'দিদিমার গল্প' এ দুটি গল্পেই বিষয়বস্তু এই ধরনের। কারণ এদের মূল রস হচ্ছে আলংকারিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'ভয়ানক'। একটি ছোট গল্পের পরিসরের মধ্যে ও রসকে মনে জমিয়ে তুলতে হলে আর প্রায় সব রসকেই দূরে রাখতে হয়, এবং যখন এই ভয়ানকত্ব আসে মানুষের মনের ভাব ও passion থেকে তখন সে ভাব ও passion-কেও গাঢ় রং দিয়ে আঁকতে হয়। প্রমথবাবুর মনের মধ্যে এই কাজের দিকে একটা বিমুখতা আছে। সেই জন্য 'পূজার বলি' গল্পের কোনও পাত্র-পাত্রীকে সজীব করে তোলার চেষ্টা করেন নাই, শুধু একটা ঘটনা বলে গেছেন। 'দিদিমার গল্প'-তেও অনেকটা তাই। কেবল 'মহালক্ষ্মী'কে একটু ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ মহালক্ষ্মীর মধ্যে যে ভীষণত্ব সেটা সূক্ষ্ম, অদ্ভুতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। নিজের অভ্যস্ত রীতির বাইরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ক্ষেত্রেও যে প্রমথবাবুর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সৃষ্টির ক্ষমতা নিজেকে সার্থক করতে পারে প্রমথবাবু তার প্রমাণ দিয়েছেন গত ফাল্গুনের "বিচিত্রায়" 'অহিভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি গল্পটিতে। আশা করা যায় সে ক্ষেত্র থেকে প্রমথবাবু হাত গুটিয়ে নেবেন না। কারণ নূতন ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রথম সাধনা নিঃসন্দেহে সিদ্ধলাভ করেছে।

যার নামে এ গল্পের বই-এর নাম সেই একাধারে গল্পের বক্তা ও নায়ককে যখন প্রমথবাবু মাসিক পত্রের সম্পাদকের তাড়ায় সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মনে করেছিলেন সেই গল্পটিতেই ঘটবে 'নীললোহিতে'র সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। 'নীললোহিতে'র রোমান্টিক ডাকাতির সেই প্রথম গল্পটি পড়লেই তা বোঝা যায়। কিন্তু এ রকম সৃষ্টি এক গল্পেই লয় হয় না। নিজের সৃষ্টিকর্তাকে দিয়ে বার বার সে নিজেকে সৃষ্টি করায়। কারণ যদিচ নীললোহিত একটি বিশেষ মানুষ, তবুও সে হচ্ছে দার্শনিক ভাষায় যাকে বলা চলে একটি principle এবং সে principle হচ্ছে আধুনিক জগতে আরব্যোপন্যাসের principle। মাটির জগতের সত্য থেকে

মুক্তির জন্য নীললোহিত রচনা করতেন 'কল্পলোকের সত্য কথা'। সে কথা পাঠককে মুক্তি দেয় গল্পলোকের সত্য কথা থেকে। কল্পনার সৃষ্টিকে সম্ভব অসম্ভবের অনুশাসন থেকে ছাড়া দিয়ে প্রাচীনেরা রচনা করতেন রূপকথা। কিন্তু রূপকথার অদ্ভুত রস আমাদের বস্তুতান্ত্রিক কালে শিশুর ভোগ্য। অপোগণ্ডদের মন তাতে ভোলে না। অদ্ভুত রস তাদের পরিবেশন করতে হয়, হাসির থালায়; আর আসন বাটি গ্লাস। নুন লেবু লংকা সব হওয়া চাই খাঁটি প্রকৃত জিনিস। নীললোহিতের গল্প তিনটিতে এই অদ্ভুত-হাসি-বাস্তবের এক অপূর্ব রস প্রমথবাবু পাঠকদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গল্পগুলি extravaganza, কিন্তু তাদের প্রতি অংশ বাস্তবের ঠাসবুনোনি। মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গারো পাহাড়ে খেদা করতে গিয়ে নীললোহিতের হাতি ধরার বিবরণটি অদ্ভুত বীরত্বের বে-পরোয়া গল্প; কিন্তু খেদায় কী করে হাতি ধরে তার নির্ভুল, সূক্ষ্ম বর্ণনার উপর হচ্ছে তার ভিত্তি। 'নীললোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পে এই কৌশল চরমে পৌঁছেছে। সম্পূর্ণ অসম্ভব সব 'কমিক' ঘটনা ও অবস্থা একের পর আর প্রমথবাবু এমন অনায়াসে ও convincing রকমে তৈরি করে চলেছেন যে দেখে চমক লাগে; কিন্তু ও সবই গড়ে উঠেছে অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রমথবাবু যে বহুরকম লোকের ধরনধারণ ও গতিবিধির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার হুবহু বর্ণনার উপর। ভোজপুরি দরোওয়ানদের সেজে নীললোহিতের পুরনগর যাত্রার অদ্ভুত ব্যাপারটিতে ওই দরোওয়ান শ্রেণির যে সব টাইপ প্রমথবাবু এঁকেছেন তা একেবার হোগার্তের ছবি। নুরনগরের রাজবাড়ির বাঙালি লেঠেলদের 'সিঙ্গার পটার', ভাবভঙ্গির যে বর্ণনা তা ও-শ্রেণির লুপ্তপ্রায় জীবদের সঙ্গে যার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনিই তাদের প্রথম শ্রেণির চলচ্চিত্র বলে মেনে নেবেন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরের আধুনিক বাংলা সংস্করণটির কথা বলা বাহুল্য। ওর হাসি-ব্যঙ্গ প্রমথবাবুর খাস তালুকের নিজস্ব ফসল। পাঠকেরা নীললোহিতের আরও গল্প অবশ্য শুনতে চাইবে। কারণ এতে তো আর সন্দেহ নেই যে নিজের বীরত্বের ইতিহাস নীললোহিত যা বলেছে তার অনেক বেশি এখনও বলেনি।

এ সব গল্পের বাহন প্রমথবাবুর ভাষা সম্বন্ধে কোনও কথা বলা বাহুল্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেটি একটি দ্রষ্টব্য জিনিস। তাঁর ভাষার সাবলীল গতি ও তরল ইস্পাতের প্রবাহ; প্রমথবাবুর মনের একান্ত ও প্রচণ্ড intellectuality-র বাণীমূর্তি। এ সমস্ত গল্পের সব জায়গা থেকে যে হাসি ব্যঙ্গ ঠিকরে পড়ছে বাংলা সাহিত্যে তা সুপরিচিত। যাকে বলে অনাবিল শুভ্রহাসি এ সে বস্তু নয়। এ হচ্ছে বিদ্যুতের বাঁকা-চোরা চমক। আলোতে চোখ ঝলসে দেয়, গায়ে লাগলে মৃত্যু।

১৩৩৯

সেতু ও অন্যান্য কবিতা: নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত

মাত্র ৭৪ পৃষ্ঠার পুথিতে ২৭টি ছোট বড় কবিতা। বিষয়ে, সুরে, ছন্দে তাদের বৈচিত্র্য বড় কম নয়। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের খোলা যেসব পথ আজ বাঙালি কবিদের প্রশস্ত রাজপথ এ পুথির কতক কবিতার গতি সেই পথে। আর কতক কবিতা চলেছে নূতন পথে। বিদেশে ও এদেশে কবিতার বিষয় ও ছন্দ নিয়ে যে পরীক্ষা চলেছে— যেসব বিষয় পূর্বতন কবিরা রসবস্তু নয় বোধে উপেক্ষা করেছেন কাব্যে তাদের স্থান দেওয়া, ছন্দকে তানলয়ের পৌনঃপুনিকের উপর নির্ভর করতে না দিয়ে মুক্ততর গতির মধ্যে সূক্ষ্মতর ও বিচিত্রতর 'হারমনি' সৃষ্টির চেষ্টা— নন্দগোপালবাবু সে পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন। আর তাঁর হাত অধ্যবসায়ীর হাত নয়, গুণীর হাত। তাঁর প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী কবিতা দুই সানন্দে পড়া চলে; এবং মাঝে মাঝে প্রকাশ ও ভঙ্গির সৌন্দর্য ও নবীনত্ব মনকে আকৃষ্ট করে। অবশ্য তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন ভাব ও সুরের কবি-প্রসিদ্ধি রয়েছে অনেক, যার ফলে অনেক কবিতার অনেক জায়গা সুখপাঠ্য, কিন্তু মনের মধ্যে স্থায়ী দাগ কাটে না। কিন্তু এই কবিতাগুলিরই অন্য জায়গায় তিনি স্বকীয়তার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায় যুষ্মৎ-প্রত্যয়গোচর এইসব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাব্য নিজের বিশিষ্টরূপ লাভ করে বাঙালি কাব্য-পাঠককে আনন্দ দেবে।

১৩৪২

মহাভারতী: শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'মহাভারতী'। গ্রন্থের ২৩টি কবিতার মধ্যে প্রথম ৩টি ও শেষ কবিতাটি মহাভারতের চারটি চরিত্র নিয়ে রচনা। সুতরাং পুথিটিকে ঠিক অন্বর্থনামা বলা যায় না; অনেকটা প্রথম গল্পের নামে গল্পের বইয়ের নামকরণের মতো। বাকি কবিতাগুলি নানা বিষয়ের। তাঁদের বিষয়, ভঙ্গি ও রসের বৈচিত্র্যে পাঠকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।

প্রাচীন কাব্যের, বিশেষ যেগুলি আদি কাব্য তাদের ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে পরবর্তী যুগের কবিদের কাব্য-রচনা নানা পথে চলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে যেসব কাব্য লিখেছেন তাতে তাঁরা ওই দুই আদি কাব্যের কোনও ঘটনাকে নানা নূতন কল্পনা নিয়ে নূতন করে বিবৃত করেছেন, চরিত্রগুলির কাব্যগত রস ও... মোটামুটি বহাল রেখে। এ গ্রন্থের প্রথম দুই কবিতা 'কর্ণ' ও 'দুর্যোধন' অনেকটা সেই শ্রেণির। এই দুই বীরের জীবনে সবচেয়ে 'ক্রিটিকাল' সময়ের ঘটনা ও তাঁদের... তাঁদের নিজের মুখের কথায় ব্যক্ত করে এই দুই কাব্যরচনা। কিন্তু সে কাব্য হয়েছে অতিরিক্ত রকম 'মেলোড্রামাটিক'। মনে হয় এ শ্রেণির কবি-কর্ম কবি যতীন্দ্রমোহনের পরধর্ম। তাঁর কবিত্বের স্বধর্ম কি তার প্রমাণ গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা 'ভীম'।

> সুবিরাট বরদেহে বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন;
> বিপুল বাহুর শক্তি প্রচ্ছন্ন প্রমত্ত প্রভঞ্জন,
> আনত আপন বীর্য্যে; সর্জ্জ-সম দৃপ্ত সরলতা
> জানায় নিখিল চক্ষে দূর হতে বলিষ্ঠ বারতা।
> একাধারে ভীমকান্ত— দেহমনে ভীষণ সুন্দর—
> প্রণতি তোমার পদে, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বৃকোদর!

কোনও ঘটনার বর্ণনা নয়, চিত্রিত চরিত্রের উক্তি নয়, কবির নিজের মুখের স্তুতি অর্থাৎ 'লিরিক'। কবি যতীন্দ্রমোহনের কাব্য এখানে সার্থক।

মহাভারত ও রামায়ণের ঘটনাকে কিছু পরিবর্তন করে, বা নূতন ঘটনা জুড়ে দিয়ে কোনও চরিত্রকে উদ্দিষ্ট রসোজ্জ্বল করে তোলার অধিকার সকল কবির-ই আছে। কিন্তু এ কবি-প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রমোহন সবসময় সফল হননি। একটা উদাহরণ দিই। 'কর্ণ' কবিতায় কবি কর্ণের মুখে বসিয়েছেন—

—আজ মনে পড়ে— রাজ-সভাতলে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর!
পার্থের সেই অপমানে আজও জর্জ্জর অন্তর!
কৌশলে জিনি' মৎস্য-চক্র,
মোর পানে চাহি' হাসিয়া বক্র,
ভুবনধন্য পাঞ্চালীধনে বরিল সে বর্ব্বর—
আজ মনে পড়ে সেই বঞ্চনা— কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর!

অর্জুনের 'বক্রহাসি' বা 'বঞ্চনার কৌশলে' লক্ষ্যভেদের কথা কি বাস্তবে কি কর্ণের কল্পনায় কোথাও মহাভারতে নেই। এবং এতে কর্ণ কি অর্জুন কারও চরিত্রের কোনও কিছু উজ্জ্বল হয়নি। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কর্ণের লক্ষ্যচ্ছেদের চেষ্টা ও তার পরিণামের মূল উপাখ্যানটি। যখন বহু রাজা ও যোদ্ধা লক্ষ্যবিদ্ধ করা দূরে থাক তার জন্য তৈরি ধনুটিতে গুণ আরোপণের চেষ্টাতেই বিক্ষিপ্যমাণ হয়ে স্রস্তকিরীটহার ও ধরণীতলস্থ হলেন—

সর্বান নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণো ধনুর্দ্ধরাণাং
প্রবরো জগাম।
উদ্ধৃত্য তূর্ণং-ধনুরুদ্যতং তৎ সজ্যঞ্চকারাশু
যুযোজ বাণান্ ॥

'তখন ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ কর্ণ রাজাদের অবস্থা দেখে ধনুর নিকটে গেলেন এবং ঝটিতি সেই ধনু ঊর্ধ্বে তুলে তাতে গুণারোপণ ও বাণযোজনা করলেন।' তাঁকে দেখে পাণ্ডুপুত্রেরা মনে করলেন যে পৃথিবীর মধ্যে কর্ণই লক্ষ্যভেদ করে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য দ্রৌপদীকে লাভ করলেন।

দৃষ্ট্বা সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা ভিত্ত্বা নীতং
লক্ষ্যবরং ধরায়াম।

তখন

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং
বরয়ামি সূতম্।
সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং তত্যাজ কর্ণঃ
স্ফুরিতং ধনুস্তৎ ॥

তাঁকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে বললেন— 'আমি সূতকে বরণ করব না। কর্ণ সক্রোধ হাস্যে সূর্যকে নিরীক্ষণ করে সেই স্ফুরিত ধনুক ত্যাগ করলেন।'

মহাভারতকার এক শ্লোকে একটি নাটক রচনা করেছেন। ওই পরিসরের মধ্যেই কথা ও কাজের ঘাত প্রতিঘাতে দুটি চরিত্র রেখা ও রঙ্গে দীপ্তিমান হয়ে ফুটে উঠেছে। এবং সভাপর্বের লাঞ্ছনা ও তার ফলে কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলার সূচনা হয়েছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

উপলক্ষ করে পাণ্ডবদের উপর কর্ণের মনের বিরুদ্ধতা দেখাবার এর চেয়ে ভাল উপাদান কোন নবীন মহাকবি কল্পনা করতে পারেন।

মহাভারতীয় কবিতার ও গ্রন্থের শেষ কবিতা "কৃষ্ণা' গ্রন্থকারের নিজের লেখা নয়। তিনি পাদটীকায় জানিয়েছেন যে তাঁরই অনুরোধক্রমে তাঁর কবি-বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিতাটি রচনা করেছেন; এবং এই কাব্যগ্রন্থে লিখিত ভারতকথার সুরের সহিত ইহার সুরও মিলিয়াছে। তাই, মহাভারতীয় 'কৃষ্ণা'-কথাতেই মহাভারতীর শেষ করা গেল।

এ 'কৃষ্ণা'-কাব্যের সুর কবি যতীন্দ্রমোহনের মহাভারতীয় কবিতা তিনটির সুরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর। এ কবিতা হচ্ছে প্রাচীন কাব্যের আধুনিক 'ইন্টারপ্রিটেশন"। কাব্যের অনেক শ্রেষ্ঠ চরিত্র-সৃষ্টিকে, অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের মতোই, যুগে যুগে নূতন দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রে এ সম্ভাবনা খুব বেশি। যদি বলি এ কাব্য প্রাচীন মহাভারত চরিত্রের আধুনিক 'ফেমিনিস্ট ইন্টারপ্রিটেশন' তবে একটা লেবেল আঁটা হয় বটে, এবং হয়তো লেবেল হিসাবে খুব ভুল লেবেল নয়, কিন্তু তাতে এ কবিতার অভিনবত্ব ও দৃপ্ত ঔজ্জ্বল্যের কোনও পরিচয় হয় না। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর সঙ্গে বিবাহের হেতু আবিষ্কারের চেষ্টায় যেসব অদ্ভুত, অপ্রতীতিকর উপাখ্যান ও যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে সেটা মহাভারতের একটা অতি দুর্বল অংশ। আধুনিক কবি তাঁর স্বাভাবিক পরিহাসপটুতার সঙ্গে তাকে অগ্রাহ্য করে কবি-কল্পনায় অভিনব কাব্যের সৃষ্টি করেছেন।

পাঁজি পুঁথি লয়ে খুঁজে মুনিগণ
সতির পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।

*   *   *

—সে সব কাহিনী জানি বা না জানি,
তেজস্বিনী গো, তোমারে চিনি,
আপন যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্ম জন্ম তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি
তাই গো সাধ্বি, পঞ্চ প্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।
মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী—
সে দিল পরখ অনলে পশি',
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা
তার সতীত্ব কোথায় কবি?

পাঁচ বরের সঙ্গে এক কন্যার বিবাহের যে পদ্ধতি বেদব্যাস বাতলে দিলেন, তাতে পঞ্চ পাণ্ডবেরা পরপর পাঁচদিনে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করলেন। এবং একটি ছেলেভুলানো উপাখ্যান রচনা হল যে বেদব্যাসের বাক্যবলে প্রতি বিবাহ দিবস গতে দ্রৌপদী পুনরায় কন্যাত্ব প্রাপ্ত হতেন। আধুনিক বাঙালি কবি বেদব্যাসের বাক্য না মেনে যে নূতন বিবাহ পদ্ধতির কল্পনা করেছেন শাস্ত্রকর্তা বেদব্যাস তাতে রাজি না হলেও মহাকবি ব্যাস নিশ্চয়ই খুশি হতেন।

কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণপাণি?
উঠেছ অনলে নারীর গর্ব্বে
নারীর গর্ভ তুচ্ছ মানি'।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জ্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা হাসি' পার্থবীরে;
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা,
ধরিল নকুল হৃষ্টমনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিযা
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে!

তারপর সভাপর্বে দ্রৌপদীর যে চরম লাঞ্ছনা মহাভারতে সে একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু নবীন কবির নূতন কল্পনা সেখানেও ব্যাহত হয়নি।

পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,—
ধর্ম্ম-মেয়েরা শাস্ত্র ভাবে!
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে?

* * *

সেদিন আকাশে লিখে' দিলে পণ
ক্ষণ কটাক্ষে বজ্রভরা—
নরশূন্য না করিলে কখনও
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।
এর পর অবশ্যম্ভাবী যে কুরুক্ষেত্র
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে

পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী!
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,
রক্ত-সন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,—
কে লুটে ধরায় ভগ্ন-উরু।
—তবু কোথা শেষ?—

* * *

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারী-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোনও ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে!

* * *

বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি
নলাটে লিখিয়া কিসের লিখা?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা?

সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে, বীর্য ও সাফল্যের মধ্যে যে মরীচিকা বাসা বেঁধে আছে তার মিস্ট্রি কবি পাঠকের চিত্তে ঘনিয়ে তুলেছেন।

বহু-যুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি?
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল?
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি!

এ কবিতার রসাস্বাদ না করলে বাংলার কাব্যামোদী পাঠক বঞ্চিত হবেন।

এ গ্রন্থের অ-মহাভারতীয় কবিতাগুলির মধ্যে যেগুলি গাথাশ্রেণির, যেমন 'অশোক' কি 'জয়পরাজয়' কি 'প্রতিশোধ' কাব্যাংশে সেগুলি দুর্বল। কবির 'কর্ণ' ও 'দুর্যোধনের' দোষ এসব কবিতাকে গ্রস্ত করেছে। অর্থাৎ এগুলি অতিরিক্ত 'সেনসেশনাল'। সমস্ত রকম গতির মধ্যে যে শান্তরস শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রাণ এগুলিতে তার অভাব ঘটেছে। যে কবিতাগুলি 'লিরিক', সোজাসুজি কবির নিজের কথা নিজের মুখে প্রকাশ, রূপে ও রসে সে কবিতাগুলিই কাব্য হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থে কবি যতীন্দ্রমোহনের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'আষাঢ়ে লেখা'।

তিনদিন ধরে মেঘ করে' আছে, রৌদ্রের নাই দেখা,
বন্ধ রয়েছে ধরা-পাঠশালে ধরাবাঁধা পাঠ শেখা।

* * *

খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ যখন, উনোনে চড়ে না হাঁড়ী,
দিকে ওদিকে প্যাচ্‌পেচে কাদা, ভিজে কাপড়ের কাঁড়ি।

এমন সময় ডাকে বন্ধুর জরুরি চিঠি এলো
কাগজের লাগি' রচনা একটি চাই,
যেমন-তেমন চায় না আবার— ঝক্‌ঝকে হ'তে হবে,
রূপে আর রসে ফেটে পড়ে যেন নূতনের গৌরবে।
বিষম মুস্কিল, কোথায় পাওয়া যায় ঝক্‌ঝকে নতুন কল্পনা।
সহসা 'শেল্‌ফে' মেঘদূতের উপর চোখ পড়লো।

বলিহারি কবি— চারিধারে তার হেবিয়া হাজারো খুৎ—
আকাশ হইতে মেঘে টেনে এনে বানাইয়া দিল দূত।

* * *

ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে আস্‌মানি মনোহারী
প্রেমের পথের সঙ্গে লইয়া হ'ল তাই পথচারী!
চিরবিরহীর মানস-মরাল সাথে সাথে উড়ে তা'র
পাখা ঝট্‌পটি প্রাণ ছট্‌ফটি উৎকট অভিসার।

কিন্তু কোথায় নূতনত্ব?

মাটির ধরণী বড়ই পুরাণো, পুরাণো মানবমন,
আরও পুরাণো যে চিরকেলে সেই প্রণয়ের ক্রন্দন।

তবু কালিদাস জেনে শুনে সেই পুরনো কথাই ছন্দে গেঁথে ফাঁকি দিয়ে অমর হয়ে গেছেন।

তা'রি সেই কথা, কাগজ তোমার চলিবে না, জেনে শুনে,
আষাঢ় মেঘের সেই ভিজে তুলো আবার তুলিবো ধুনে'।
ভাল না লাগে টেনে ফেলে দাও আর বিব্রত করো না।
ওদিকে আবার কাজ আছে ঢের দেখাশুনা, তোলা পাড়া;

জ্বরটুকু গেছে ঘুমটা ভেঙেছে, গৃহিণীরও পাই সাড়া
মেঘদূত— দেখি, নিষ্ফল নয়,—তাহারি রুগ্ন চোখে
পালটি' পড়িনু প্রেমের মন্ত্র স্তিমিত বর্ষালোকে।
বুকে রেখে যাইব মিলে না স্বস্তি, তারেই রেখেছি দূরে—
সেই কথাটাই পালটি' শিখিনু পাগ্‌লা কবির সুরে।

কবি মেঘদূতের মেঘকে যে অলকায় উত্তীর্ণ করেছেন তা ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের পথে কুবেরের অলকায় নয়, ফুটো চালের ভিতর দিয়ে মানুষের সামান্য কুটিরে। সেখানে বিরহ-শীর্ণা যক্ষপ্রিয়া নয়, আছেন জ্বরে রুগ্‌ণা ঘরের গৃহিণী। কিন্তু কালিদাস বেজার হবেন না।

১৩৪৩

টাকার কথা : অনাথগোপাল সেন

শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল বাবু ইতস্তত মাসিকে ছড়ানো তাঁর অর্থনীতির প্রবন্ধগুলিকে পুথির আকারে ছাপিয়ে বাঙালির ও বাংলা সাহিত্যের উপকার করেছেন। অনাথবাবু বইখানির নাম দিয়েছেন 'টাকার কথা'। কারণ এ প্রবন্ধগুলিতে ধনতত্ত্বের নানা কথার আলোচনা থাকলেও তাদের প্রধান আলোচ্য হচ্ছে ধনের সৃষ্টি ও বণ্টনের কাজে মুদ্রার মধ্যস্থতা যে সব ব্যাপার ও বিভ্রাট ঘটায়, বিশেষ করে ভারতবর্ষে বর্তমানে ঘটাচ্ছে।

এ পুথির দ্বিতীয় সন্দর্ভ 'স্বর্ণমান' প্রবন্ধটি যখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ হয় অনেক পাঠক তখনই বুঝেছিলেন যে, বাংলায় একজন শক্তিশালী অর্থশাস্ত্রের লেখকের আবির্ভাব হল, মাথা যার শাফ এবং হাতে যার সাহিত্যের কলম। গ্রন্থের পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে অনাথবাবু সে ধাবণাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাতত্ত্ব অধ্যায়টি জটিল, এবং অব্যবসায়ী সাধারণ পাঠকের কাছে অনেকাংশে নীরস। এই মুদ্রাতত্ত্বের অনেক গোড়ার কথা এবং ভারতবর্ষের মুদ্রাতন্ত্রে তার বিশেষ প্রয়োগ অনাথবাবু এমন পরিষ্কার ও সুখপাঠ্য আলোচনায় করেছেন যা দেশে-বিদেশে কোথাও সুলভ নয়। অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীগিরি অনাথবাবুর ব্যাবসা নয়, এবং বঙ্গভাষায় ও-শাস্ত্রের পরিভাষা আজও গড়ে ওঠেনি, খুব সম্ভব এই দুই কারণে বাচ্যের বদলে বাক্য দিয়ে নিজেকে ও পাঠককে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থেকে অনাথবাবু রক্ষা পেয়েছেন।

আধা-সাহিত্য এই শাস্ত্রকে পুরোপুরি বিজ্ঞান বানাবার ব্যর্থ চেষ্টায় পাণ্ডিত্যের কসরত-এ যে ধুলো ওড়ে অনাথবাবুর চিন্তা ও লেখাকে কোথাও তা আচ্ছন্ন করেনি।

মুদ্রাতত্ত্বের গহনে অনাথবাবু স্বর্ণপন্থী। সব দেশের মূল সোনার হলে অথবা বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দেবার কড়ার থাকলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বাজার-দর ভিন্ন ভিন্ন রকমে ওঠানামার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্যের ও দেনা-পাওনার হিসাবের যে সুবিধা হয় অনাথবাবু তা বিশদ করে বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর বাজারে সোনার দর ওঠাপড়ার একটা অনিশ্চয়তা অবশ্য থেকেই যায়, কিন্তু যে-কোনও সম্ভবপর ব্যবস্থাতেই ও রকম অনিশ্চয়তা অপরিহার্য, এবং পাঁচটা অনিশ্চয়ের জায়গায় একটা অনিশ্চয় নিয়ে ঘর করা অনেক সহজ। সোনার সঙ্গে মুদ্রার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হলে দেশে প্রয়োজনমতো মুদ্রা সমষ্টির সংকোচ প্রসারে বাধা ঘটে। কিন্তু তাতে যা অহিত হয় বোধহয় অনাথবাবুর মতে অবাধ সংকোচ প্রসারের ক্ষমতার এক রকম অবশ্যম্ভাবী অপব্যবহারের অহিতের চেয়ে তা অনেক কম। অনাথবাবু মুদ্রাতন্ত্রের যাচাই করেছেন প্রধানত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাপকাঠিতে। তাঁর পুথির শেষ 'যে দেশে টাকা নেই' প্রবন্ধে রুশিয়ার মুদ্রা বা

অমুদ্রা-তন্ত্রের আলোচনায় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন রকমের মুদ্রা ব্যবস্থার কথাটা উঠেছে; কিন্তু অন্যান্য দেশেও ও ব্যবস্থার সাধারণ প্রয়োগ কতটা সম্ভব এবং তার ফলাফল কী হতে পারে অনাথবাবু সে আলোচনায় হাত দেননি। আশা করি ভবিষ্যতে দেবেন। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে সব দেশেই বহির্বাণিজ্য খুব বড় কথা হলেও অনেক দেশেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো প্রকাণ্ড দেশে, অন্তর্বাণিজ্য তার চেয়েও বড় কথা। এই অন্তর্বাণিজ্যের দিক থেকেও মুদ্রাতত্ত্বকে পরীক্ষা না করলে আলোচনা কেবল অসম্পূর্ণ থাকে না, খুব জটিল সমস্যার অতিরিক্ত রকম সহজ মীমাংসা করা হয়।

দেশের মুদ্রাকে স্বর্ণমান থেকে বিচ্যুত করে তার দর কমিয়ে যেমন করে প্রায় সব দেশ নিজের দেশের মাল পৃথিবীর বাজারে অন্যের চেয়ে সস্তায় কাটাতে চাচ্ছে, ও দেউলিয়াগিরির এই প্রতিযোগিতা যে পৃথিবীর বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কোনও স্থায়ী মীমাংসা নয়, আর সে দুর্গতি ঘুচাবার যথার্থ উপায় কি অনাথবাবু তার খাসা আলোচনা করেছেন; এবং সে উপায় অবলম্বন যে কত অসম্ভব তারও ইঙ্গিত করেছেন। পৃথিবীর বর্তমান আর্থিক দুর্দশা দূর হয় যদি প্রত্যেক দেশ ধনের সৃষ্টি ও বিভাগের কাজে হাত দেয় নিজের দেশের বিশেষ স্বার্থে নয়, সব দেশের সাধারণ স্বার্থে। অর্থাৎ এ আর্থিক দুর্গতি মোচনের উপায় বিশ্ব-মানবতার আবির্ভাব। মানব-সমাজে বিশ্বমানবতা হয়তো একদিন আসবে। কিন্তু সে যে আসবে অর্থনীতির তাগিদে এ ভরসা বা ভয়ের কারণ নেই।

'ভারতে মুদ্রানীতি' ও 'আমাদের রেশিও সমস্যা' দুটি প্রবন্ধে অনাথবাবু ভারতবর্ষের বর্তমান মুদ্রানীতির বিশেষ আলোচনা করেছেন। আমাদের টাকা রুপার, এবং তাতে যে রুপা থাকে তার বাজার-দর টাকার দরের চেয়ে অনেক কম। এই প্রতীক মুদ্রা নিয়ে যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের প্রধানত কারবার করতে হয় তাদের টাকা সোনার। এ ব্যবস্থাব ফলাফল এবং যে দেশের সঙ্গে আমাদের দেন-লেন সবচেয়ে বেশি সেই রাজার দেশের মুদ্রার সঙ্গে আমাদের টাকার বিনিময়ের হার নির্দেশ ও রক্ষার চেষ্টায় ভারতবাসীকে কী পরিমাণ ক্ষতি ও দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে তার যে বিবরণ অনাথবাবু দিয়েছেন তার চেয়ে সুখে ও সংক্ষেপে সে আলোচনা শিক্ষিত বাঙালি পাঠক কোথাও পড়তে পাবেন না। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' যে কত বড় দুঃখ তা অনাথবাবুর শুধুমাত্র ঘটনা বিবৃতির কৌশলে যেমন ফুটে উঠেছে কোনও চড়া ও কড়া রাজনৈতিক বাগ্মিতায় তা সম্ভব হত না।

'আমাদের রেশিও সমস্যা'য় অনাথবাবু '১ শিলিং ৪ পেনি' বনাম '১ শিলিং ৬ পেনি' মামলার বিচার করেছেন। তাঁর এ প্রবন্ধ যুক্তিতর্কের সহজ ও পূর্ণ প্রকাশে প্রসাদগুণে যেমন ভরপুর, পরিহাসকুশলতায় তেমনি উজ্জ্বল। 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং আরও দুই-চারজন বাঙালি ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অধ্যাপক সরকারের অভিমতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সর্ববাদিসম্মত সত্যে তিনি সাধারণত আস্থাবান নহেন। তিনি নূতন সত্যের সন্ধানী। তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে জনসম্মুখে আচার্য রায় মহাশয়ের মতো লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।' এর Neatness-এ অধ্যাপক সরকার পর্যন্ত খুশি না হয়ে পারবেন না। আচার্যদেবের কথা অবশ্য বলা কঠিন।

এ পুথির প্রথম প্রবন্ধে অনাথবাবু দুঃখ করেছেন যে, শিক্ষিত বাঙালি পলিটিকসে মশগুল কিন্তু অর্থনীতির শ্রবণ-মননে পরাঙ্মুখ। অথচ, 'ভূমিকায়' শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথায়, 'এ যুগের নব পলিটিকাল সমস্যা... সবই বর্ণচোরা ইকনমিক সমস্যা।' শিক্ষিত বাঙালির আজ গঞ্জনার অন্ত নেই। সে মাদ্রাজির মতো পরীক্ষা পাশ করতে পারে না, বোম্বেওয়ালার মতো শিল্প-বাণিজ্যে পটু নয়, টাকা চায় কিন্তু মাড়োয়ারির মতো টাকৈক প্রাণের সাধনা নেই। নিতান্ত আত্মরক্ষার খাতিরেই একটা কথা বলি। প্রথম প্রবন্ধ 'রাজনীতি বনাম অর্থনীতি'র পর বই-এর বাকি ছয়টি প্রবন্ধে অনাথবাবু বার বার এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, এ যুগের পলিটিক্যাল সমস্যা যদিচ বর্ণচোরা ইকনমিক সমস্যা, সে ইকনমিক সমস্যার সমাধানের উপায় হচ্ছে পলিটিক্যাল উপায়। মুদ্রার বিনিময়ের হার বাড়ানো কমানো, 'টারিফে'র প্রাচীর উঁচু নিচু করা, দেশের পণ্যকে 'বাউন্টির' হাইড্রোজনে লঘু করে পৃথিবীর বাজারে ছেড়ে দেওয়া— এর কিছুই সম্ভব নয় হাতে পলিটিক্যাল ক্ষমতা না থাকলে। সুতরাং পলিটিক্যালি যে মরে রয়েছে সে ইকনমিক নিমতলার ঘাটে চলেছে না কাশী মিত্রের তাতে যদি উদাসীন হয় তবে তার প্র্যাকটিকাল বুদ্ধির দোষ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ অনাথবাবু যে ইকনমিকসের আলোচনা করেছেন আজ শিক্ষিত ভারতবাসীর তা আলোচ্য প্রধানত নিষ্কাম বিদ্যা হিসাবে, সকাম কর্মের প্রয়োজনে নয়। যে সকল 'অবাঙালি' ব্যবসায়ীর তিনি উল্লেখ করেছেন যাঁদের "অনেকে ইংরাজী অনভিজ্ঞ হইয়াও পৃথিবীর টাকার বাজারের সমস্ত সংবাদ নখাগ্রে রাখিতেছেন এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসা ও share speculation করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন" ইকনমিকসে তাঁদের জ্ঞান ও ঔৎসুক্য নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের নাকের ডগা ছাড়িয়ে যায় না। ওসব খবর তাঁরা রাখেন ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ি যেমন 'রেসে'র ঘোড়ার আ'দ্যন্ত বংশ পরিচয় আয়ত্ত করে, 'জুলজি' বিদ্যার প্রতি প্রীতিবশত নয়। তাঁদের দেশের অব্যবসায়ী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইকনমিকস বিদ্যায় শিক্ষিত বাঙালির চেয়ে বেশি অবহিত, তার প্রমাণাভাব। সম্ভব ভারতবর্ষের আর কোনও ভাষায় অনাথবাবুর 'টাকার কথা'-র মতো বই লেখা হয়নি। যদি হত তবে সে সব দেশের ধনকুবের ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই তা কিনে ও পড়ে টাকা ও সময় নষ্ট করতেন না। শিক্ষিত বাঙালি share speculation-এ টাকা করেনি। আশা করা যায়— অনাথবাবুর পুথির তাঁরা সমাদর করবেন।

বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৪৩

কাদম্বরী : শ্রীপ্রবোধেন্দু ঠাকুর

শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর 'কাদম্বরী'র পূর্বভাগের, অর্থাৎ যে অসম্পূর্ণ 'কাদম্বরী' বাণভট্টের রচনা তার একটি বাংলা তর্জমা করে প্রকাশ করেছেন। এই তর্জমা বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে, একাধিক কারণে।

অনুবাদক তাঁর 'নিবেদনে' এবং মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বাণভট্টের হয়ে আধুনিক পাঠকসমাজের কাছে একটু জবাবদিহি করেছেন। বাণভট্ট প্রাচীন কালের লেখক; তাঁর সময়কার সাহিত্যিক রীতি ও রুচির একালের সঙ্গে অনেক গরমিল; তাঁর গুণ-দোষের বিচারে সেকালের মাপকাঠি স্মরণ রাখতে হবে; তাঁর লেখার সম্পূর্ণ রস পেতে হলে মনকে বাঁধতে হবে বাণভট্টের কালের বিদগ্ধসমাজের মনের একসুরে— ইত্যাদি। এর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সাহিত্যের রচনাভঙ্গির কালে কালে বদল হয়, ভিন্ন কালের সাহিত্যের রস ঠিক এক রস নয়— এর চেয়ে সুস্পষ্ট কথা আর কী আছে। এক দেশ ও এক কালের কোনও দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখার রীতি ও রস এক! সাহিত্যসৃষ্টির এই বৈচিত্র্যই সাহিত্যরসিককে নিত্যনূতন আনন্দের জোগান দেয়। এক অমৃতে তৃপ্ত থাকা হয়তো দেবতাতে সম্ভব, মানুষে নয়। মানুষের সৌভাগ্য যে প্রাচীনকালের সাহিত্য তার নিজের কালের সাহিত্যের মতো নয়। যে পাঠকের মন তার সমসাময়িক লেখকদের, প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিবিশেষের লেখকের রচনা ছাড়া আর কোনও লেখায় রস পায় না, পায় কেবল অপরিচয়ের বিমুখতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তার জন্য নয়— সেকালের কি স্বকালের। গতানুগতিকে অভ্যস্ত এই পাঠকদের কাছে 'কাদম্বরী'র রস বাণভট্টর ভাষায় 'অর্করিপোরিবামৃতম্', রাহুর অমৃতপানের মতো— হৃদয় না থাকায় গলার নীচে নামে না। দোষ 'কাদম্বরী'র প্রাচীনত্বের নয়, তথাকথিত আধুনিকতা যা আজ গেলে কালই হবে প্রাচীন, তার ক্ষীণদৃষ্টি সংকীর্ণতার। এ তারুণ্য সেই স্থবিরত্বের ছদ্মনাম, অনভ্যস্ত কোনও কিছু যার কাছে বিরস।

২

'কাদম্বরী'র প্রকট এবং সর্বজনপ্রসিদ্ধ রূপ হচ্ছে তার সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ। 'কাদম্বরী'র প্রস্তাবনায় বাণভট্ট এই রচনারীতিকে বলেছেন, 'নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ'— শ্লিষ্ট পদের নিরন্তর প্রয়োগে বাক্য যেখানে ঘনসন্নদ্ধ অর্থাৎ জমাটবাঁধা। এ শ্লেষশব্দের সুকৌশল বিন্যাসে অনেক পদকে যখন একপদ বলে মনে হয়, আলংকারিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'বৈদর্ভী' শ্লেষ, ভাষার সে মসৃণত্ব নয়, কারণ সে শ্লেষ সংস্কৃত গদ্য রচনায় একরকম অজ্ঞাত; এ শ্লেষ হচ্ছে

সমাসের আকর্ষণে ও চাপে বহু পদকে প্রকৃতই একপদে জমাট বেঁধে ভাষাকে গাঢ়বন্ধ করা।[১] সংস্কৃত উচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে এবং অনুস্বার-বিসর্গের টংকার ও দামামা ধ্বনিতে ভাষায় যে বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য আনে অর্থের বিলম্ববোধ্যতার ক্ষতি তা কিঞ্চিৎ পূরণ করে; কিন্তু বাংলাতে এ রচনারীতি একেবারে অচল। সমাসের এই গুরুভার বাংলার ধাতে অসহ্য। সুতরাং 'কাদম্বরী'র বাংলা তর্জমা পাঠ্য করতে হলে বাণভট্টের লেখার এই 'নিরন্তরশ্লেষঘনত্ব' বর্জন করতে হবে।

রচনার এই ভঙ্গিই যদি হত 'কাদম্বরী'র বড় কথা তবে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদের চেষ্টাকে বৃথা শ্রম বলতে হত। কিন্তু ভাষার দিক থেকেও এটা 'কাদম্বরী'র বহিরঙ্গ মাত্র। বাণভট্ট ভাষার যে দৃঢ়সন্নদ্ধ মালা গেঁথেছেন তার প্রতিটি পদ নিটোল মুক্তা। সমাসের সুতো সরিয়ে নিলেও তাদের ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণত্বের কিছু ক্ষতি হয় না। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর তাঁর তর্জমায় এই সুতো খুলে ফেলেছেন, কিন্তু মুক্তাগুলিকে প্রায় বহাল রেখেছেন, এবং তা দিয়ে এমন মালা তিনি গেঁথেছেন বাংলার কণ্ঠ ও বুকে যা অতিশোভন। তাঁর তর্জমা হয়েছে সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য, কিন্তু বাণভট্টের শব্দ-চয়নে রং ও রূপের যে মোহ তাকে অনেকটা বজায় রেখে। এ সম্ভব হয়েছে বিশেষ এই কারণে যে সমাসের গ্রন্থি কেটে দিলেও তর্জমার ভাষা কিছুমাত্র শিথিলবন্ধ নয়, চমৎকার গাঢ়বন্ধ। বাংলায় অচল সমাসবদ্ধ শ্লেষ ত্যাগ করে অনুবাদক সেই বৈদর্ভী শ্লেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন, আলংকারিকেরা সংস্কৃত পদ্যে যার প্রশংসায় মুখর, কিন্তু সংস্কৃত গদ্য যার পথের সন্ধান পায়নি। সংস্কৃত গদ্যে যদি এ শ্লেষ চলতি থাকত বাণভট্টের মতো আর্টিস্ট 'কাদম্বরী' লিখতেন দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্য দিয়ে নয়, এই অনুবাদের ভাষার রচনারীতিতে।

৩

তর্জমার দু'-একটা নমুনা দেখা যাক।

শবরসৈন্যের মৃগয়া-কোলাহল থেমে এল; যে মৃগয়ার ফলে 'কাদম্বরী'র গল্পের বক্তা শুক বৈশম্পায়নের পিতার হল মৃত্যু, আর মুনিকুমার হারীত শুকশিশুটিকে নিয়ে গেলেন পিতা জাবালি মুনির আশ্রমে। 'অচিরাচ্চ প্রশান্তে তস্মিন মৃগয়াকলকলে নির্বৃষ্টমূকজলধরবৃন্দানুকারিণি মথনাবসানোপশান্তবারিণি সাগর ইব স্তিমিততামুপগতে কাননে'— 'ক্ষণপরেই কোলাহল শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ নিস্তব্ধ নিথর হল অরণ্য— ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মতো মৌন, মন্থনশেষ সমুদ্রের মতো ধীর।'

শবরসৈন্য বন থেকে চলে গেলেও বিকৃতদর্শন এক বৃদ্ধ শবর রয়ে গেল এবং বহু শুকপক্ষীর আশ্রয় অনেক তালতুঙ্গ শাল্মলী তরুতে অবলীলাক্রমে আরোহণ করে শাখা থেকে শাখান্তরে বনস্পতির ফলের মতো শুকশাবকদের গ্রহণ করে তাদের বিগতপ্রাণ করে

১ ১৩৩৮ সালের কার্তিকের ত্রৈমাসিক 'পরিচয়ে' "রীতি বিচার শ্লেষ" প্রবন্ধে এই দু' রকম শ্লেষের একটু দীর্ঘ আলোচনা করেছি। কোনও পাঠক যদি দৈবাৎ তা পড়ে থাকেন, সম্ভব সে আলোচনা তাঁর মনে পড়বে।

ছুড়ে ছুড়ে মাটিতে ফেলতে লাগল। তাদের, 'কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ'— "কারোর পাখা সবে গজিয়েছে, সদ্যফোটা পদ্মের যেন এক একটি পাপড়ি", 'কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্'— 'কারোর চঞ্চুতে সবে দেখা দিয়েছে অরুণ আভা'। বৈশম্পায়নের মা মরেছিলেন বৈশম্পায়নের জন্মকালেই তার প্রসববেদনায়। কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগব্যথাকে মনে নিরুদ্ধ রেখে তার পিতাই সন্তানকে একাকী পালন করে আসছিলেন। জরায় তাঁর শরীর কাঁপত। এই সাক্ষাৎ যমকে দেখে 'দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুর্মরণভয়াদুদ্‌ভ্রান্ততরলতারকঃ'— মরণভয়ে তাঁর "অঙ্গ কাঁপতে লাগল দ্বিগুণ; উদ্‌ভ্রান্ত হল চক্ষুর তরল তারা।" কিন্তু সন্তানের স্নেহবশে তাকে পক্ষপুটে ঢেকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকলেন। 'অসাবপি পাপঃ শাখান্তরৈঃ সংচরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য জীর্ণাসিতভুজংগভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলং কোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমণ্ডকদণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহূর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তমাকৃষ্য তাতং গতাসূমকরোৎ।'

"তারপর সেই পাপ... এল আমাদের বাসার শাখায়। আমাদের কোটরের মুখটায় দেখা দিল তার জঘন্য হাত।

"সে কী হাত! শীর্ণ কৃষ্ণভুজঙ্গের মতো ভীষণ। বুনো বরার চর্বিমাখা। দুর্গন্ধ উঠছে। ব্রণ আর বলীতে ভরা। সাক্ষাৎ যমদণ্ড!

"সেই বামবাহুর উপর পিতা মুহুর্মুহু চঞ্চু প্রহার করতে লাগলেন। কিন্তু কত ক্ষীণ। পিতাকে মুহূর্তমধ্যেই হত্যা করলে সেই পাপ।"

যদি কারও ধারণা থেকে থাকে যে বাণভট্ট কেবল কোমল ও মধুর পদ ও ভাবের মালাকর, তাঁর নিজের কথায় 'স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা'— সেই ধারণানিরসনের জন্য এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করলেম। বৃদ্ধ শবরের প্রসারিত বাঁ হাত যে 'জীর্ণাসিতভুজংগভোগভীষণং', জীর্ণ কৃষ্ণ ভুজঙ্গের দেহের মতো ভীষণ— এ উপমার পারিপাট্য মহাকবিতেই সম্ভব। বৃদ্ধ শবরের কৃষ্ণবর্ণ বাহুর কুৎসিত অমসৃণত্ব ও যে শুকপাখিদের দিকে সে হাত এগিয়ে আসছে তাদের মনের ভয় এক উপমায় নিঃশেষে প্রকাশ হয়েছে। 'মুহূর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তম্'— দুর্বল অসহায় পাখির আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার একখানা ছবি, যেমন স্বাভাবিক তেমনি করুণ। অনুবাদক 'উৎকূজন্তম্' কথাটা অনুবাদ থেকে বাদ দিয়েছেন কেন জানি না। ওতে বাণভট্টের ছবিটির অঙ্গহানি হয়েছে।

বাণের 'হর্ষচরিত' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে শুক বৈশম্পায়নের পিতার অপত্যস্নেহের চিত্রে বাণভট্টের আত্মজীবনের একটু ছায়া আছে। বাণভট্টের অতি বাল্যকালেই তাঁর মা রাজদেবীর মৃত্যু হলে তাঁর বাপ চিত্রভানু "জাতস্নেহস্তু নিতরাং পিতৈবাস্য মাতৃতাম্ অকরোৎ"— জাতস্নেহ পিতাই মাতার কাজ করেছিলেন।

মূল 'কাদম্বরী'র অংশ ও তার অনুবাদ তোলার লোভ সংবরণ করতে হবে। কারণ এ কাজে প্রলোভনের শেষ নেই।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা কঞ্চুকী কৈলাসের অনুগামিনী হয়ে প্রথম আসছে রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের কাছে। 'প্রথমে বয়সি বর্ত্তমানয়া... কিংচিদুপারূঢ়যৌবনয়া'— "কিশোরী; যৌবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।" 'রাজকুলসংবাসপ্রগল্‌ভয়াপ্যনঝিঝতবিনয়য়া'— রাজকুলে বাসের ফলে কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা, কিন্তু বিনয় ত্যাগ করেনি। 'শক্রগোপকালোহিতরাগেণাংশুকেন রচিতগুণ্ঠনয়া সবালাতপয়েব পূর্বয়া ককুভা'— 'শক্রগোপকীটের মত আরক্ত' অংশুকের অবগুণ্ঠন, যেন বালসূর্যে উদ্ভাসিত পূর্বদিক। 'বহুলতাম্বূলকৃষ্ণিকান্ধকারিতাধরলেখয়া'—গাঢ় তাম্বূলরাগের কৃষ্ণিমায় অধররেখা অঙ্কিত। 'সমুপবৃত্ততুঙ্গনাসিকয়া'— "গোল হয়ে নেমে এসেছে উচ্চ নাসা, তার মাঝখানের রেখাটি কিছু বঙ্কিম।" 'পর্য্যুষিতধূসরচন্দনরসতিলকালংকৃতললাটপট্টয়া'— পর্যুষিত ধূসর চন্দনের তিলকে ঈষৎ বিস্তৃত ললাট চিত্রিত।

এখানে অনুবাদকের বিরুদ্ধে একটু অভিযোগ আছে। পত্রলেখার এই বর্ণনা হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল সেই বর্ণনা যা যে কোনও কিংচিদুপারূঢযৌবনা কিশোরীর রূপ নয়, একমাত্র পত্রলেখার ছবি। কবি তাকে চোখে দেখে এঁকেছেন। এই বর্ণনাসংক্ষেপের জন্য অনুবাদে যা বাদ পড়েছে তাতে পত্রলেখা প্রায় হয়ে পড়েছে ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কিশোরীমাত্র। "তাম্বূলরাগে রক্তিম তার অধরের বাঁধুনি" বললে "বহুলকৃষ্ণিকান্ধকারিতাধরলেখা"র কিছুই বলা হয় না। "ভালে চন্দনের তিলক", এক, আর 'বাসি চন্দনের ধূসর তিলক' অন্য জিনিস। অনুবাদক তাঁর 'নিবেদনে' বলেছেন যে সাধারণ্যে যাকে অনুবাদ বলে তিনি তা করেননি; 'খেয়ালের খাতা'য় বীরবল যাকে তর্জমা বলেছেন তাই করেছেন। বহু স্থানেই তাঁর এই 'অক্ষরের উপাসনা-ত্যাগ' সমীচীন হয়েছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু মনে হয় এ জায়গাটায় ও আরও স্থানে স্থানে অক্ষরকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে একটু বেশি পরিমাণে, যার ফলে "পদাবলী-লীন... রসের অনুবাদেও" ঘাটতি পড়েছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুর এই তর্জমা গ্রন্থে ক্ষমতার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে একটু চেষ্টা করলেই যে এ লাঘব নিবারণ করতে পারতেন তাতে সন্দেহ নেই।

এই ঈষৎ চটুলমূর্তি কিশোরীর সঙ্গে তুলনার জন্য মহাশ্বেতার শুচিশুভ্র প্রণয়শোকে প্রশান্ত মূর্তিটির পরিচয় দেবার লোভ কষ্টে সংবরণ করতে হয়। যে দিব্যমূর্তির বয়সের পরিমাণের কথা লক্ষ্যই হয় না, 'দিব্যত্বাদপরিজ্ঞায়মানবয়ঃ পরিমাণাম্।' মনে হয় 'পশুপতিদক্ষিণমুখহাসচ্ছবিমিব বহিরাগত্য কৃতাবস্থানম্'— 'পশুপতির দক্ষিণ মুখের হাসিখানি যেন বেরিয়ে এসে বসে রয়েছে।' 'লাবণ্যেনাপি কৃতপুণ্যেনেব স্বচ্ছাত্মনা পরিগৃহীতাম্'— লাবণ্য যেন নির্মল চিত্তের সুকৃতির ফলে সে তনুকে লাভ করেছে। 'রূপেণাপি রুচিরলোচনেন বিগতচাপলেনায়তনমৃগেণেব সেবিতাম্'— রূপ যেন বিগতচাপল্য আয়তচক্ষু গৃহহরিণের মতো তাকে আশ্রয় করেছে।

কিন্তু আর নয়। পাঠক 'কাদম্বরী'র মূল ও এই অনুবাদ থেকে সে মূর্তির পরিচয় নেবেন। শ্রম নিষ্ফল হবে না।

৫

'কাদম্বরী'র এই তর্জমার বাঙালি পাঠক-সমাজে, বিশেষ বাঙালি লেখক-সমাজে, বহুল প্রচার কামনা করি। বাণভট্টের শব্দপ্রয়োগের ঐশ্বর্য, তার পদগুলির রূপ রং ও প্রকাশের শক্তি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তার সঙ্গে নিকট পরিচয় হলে বাঙালি লেখকের লেখার উপর ফল ফলবে নিশ্চয়। মূল 'কাদম্বরী' পড়ার আয়াস স্বীকারে যাঁরা রাজি নন, শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুরের তর্জমা তাঁদের সে ক্ষতি অনেকটা পূরণ করবে। এর এক বাধা তাঁর এই তর্জমা গ্রন্থের দাম। যাঁরা 'কাদম্বরী' পড়লে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার উপর তার প্রভাব পড়বে তাঁদের অনেকেরই পাঁচ টাকা দিয়ে এ গ্রন্থ কেনা কষ্টসাধ্য। এই চমৎকার কাগজ-ছাপা বাঁধাই পুথির মূল্য এক টাকা করলে শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুর যে ক্ষতি হবে, বাংলা ভাষার লাভ হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। বাঙালি সাহিত্যিকদের এ পুথি বিনামূল্যে উপহার দেবার কথা মনে এসেছিল, কিন্তু কে সাহিত্যিক এবং কে সাহিত্যিক নয় সেই মহাতর্কের নিদারুণ ভয়ে সে পরামর্শ দিতে সাহসী হচ্ছিনে।

১৩৪৫

অণুকথা সপ্তক : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

নামেই পরিচয়। বইখানি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের খুব ছোট সাতটি ছোট গল্পেব সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এরকম ছোট গল্প, চৌধুরী মহাশয় উৎসর্গ পত্রে যাদের বলেছেন যে "একরত্তি কথা", প্রায়শ হয়ে থাকে ভাবপ্রকাশেব উপলক্ষ অর্থাৎ গদ্য-লিবিক। তাদের মধ্যে গল্পের মূর্তি স্পষ্ট নয়, মনের আবেগ প্রকাশই প্রধান কলা। বেখা প্রায় নেই, রংই সর্বস্ব। বলা বাহুল্য এ পুথির ছোট গল্পগুলি সে শ্রেণির নয়। কাবণ চৌধুরী মহাশয়েব মনের গড়ন লেখাব মধ্যে সমস্তবকম ভাবাবেগ প্রকাশের বিরোধী। আর তাঁর গল্পের ঘটনার কি লোকেব চেহারা কখনও আবছায়া থাকে না। দৃঢ় রেখার নিপুণ টানে তাদের মূর্তি প্রকট হয়ে ওঠে। মনে. সুতরাং লেখায়, কি প্রবন্ধে কি গল্পে, তিনি দিনের উজ্জ্বল আলোর পক্ষপাতী; গোধূলির প্রায়ান্ধকার তাঁর পছন্দ নয়। মননের রাজ্যে তিনি ফরাসি দেকার্তেব দলে, জার্মন হেগেলেব দলে নন।

এ পুথির ছোট গল্পগুলি খুবই ছোট। সাতটি গল্পে ১৬ পেজি ক্রাউন কাগজের ৫৯ পৃষ্ঠা মাত্র, তাও পাইকা হরফে। কিন্তু এই অত্যল্প পরিসরের মধ্যে প্রতিটি গল্পে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখার সমস্ত গুণ আশ্চর্য ফুটে উঠেছে। গল্পের ঘটনা যতই ছোট হোক আদি-মধ্য-অন্ত নিয়ে তা একটি সম্পূর্ণ ঘটনা; আব সে ঘটনা কি আর্টিস্টের চোখে কি সাধাবণ গল্প-পাঠকের কাছে মোটেই অকিঞ্চিৎকব নয়। এবং ঘটনার ওই স্বল্পতাব মধ্যেই গল্পের নায়কদের মন ও দেহের চেহারা স্পষ্ট আঁকা পড়েছে; তাবা হয়ে উঠেছে জীবন্ত মানুষ। শুধু নায়কদের বলছি এই জন্য যে একমাত্র "মেরি ক্রিসমাস" গল্পটি ছাড়া আর কোনও গল্পে কোনও নায়িকা নেই। সুতরাং ছোট গল্পের, বিশেষ বাংলা ছোট গল্পেব, প্রধান উপজীব্য প্রেমের কাহিনিও নেই। আর্টিস্টের চোখ থাকলে বাংলাদেশেও যে প্রেম ছাডা ছোট গল্পের উপাদানের অভাব নেই এই গল্পগুলি তার প্রমাণ। বলতে ভুলেছি. "মেরি ক্রিসমাস" গল্পের অদ্বিতীয়া নায়িকাটিও লৌকিক নন, হয় ভৌতিক নয় মায়িক।

এই গল্পগুলির সর্বাঙ্গে ছড়ানো রয়েছে হিরাব চূর্ণের মতো 'হিউমারে'র সুভাষিতাবলী, বাংলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর যা একেবারে নিজস্ব। এ 'হিউমাব' কঠিন দানা বাঁধা, তরল কি বায়বীয় নয়। এ মর্মে প্রবেশ করে জিভ কি কান দিয়ে নয়, মগজ অর্থাৎ মার্জিত বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে। এ থেকে যে-আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে হাসির ঝিলিক অবশ্য আছে, কিন্তু সে আলো 'এক্স-রে'। যাতে পড়ে তার ভিতরের স্বরূপটা একেবারে প্রকট হয়, এবং চরম 'হিউমার'টা সেইখানেই যেমন "ঝোট্টন ও লোট্টন" গল্পের 'নিরীহ বিলিতি শিকারি কুকুরটি পোড়ো আস্তাবলের গো-সাপ ঢোঁড়া সাপ আর গিরগিটি দেখবামাত্র তন্মুহূর্তে বধ

করত; অথচ তাদের মাংস খেত না। সে ছিল ইংরেজরা যাকে বলে real sportsman।... ফল নিরপেক্ষ হত্যাই ছিল তার স্বধর্ম।' বলেছি এ হিউমারগুলি গল্পের সর্বাঙ্গে ছড়ানো রয়েছে; কিন্তু সে কথা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ গল্পের শোভার জন্য এগুলি বাইরে বসানো অলংকার নয়। এগুলি গল্পের দেহের নিজস্ব ভঙ্গি।

বাংলা গদ্যের মেদস্ফীতি ঘুচিয়ে যাঁরা তাকে 'গিরিচর ইব নাগঃ' প্রাণসার করে তুলেছেন। যাঁরা তাকে করেছেন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল, সেই গণে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অগ্রণী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সে কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই ছোট গল্পগুলি তাঁর গদ্যের চমৎকার নমুনা। তার গতিভঙ্গি সবল ও সুঠাম, চলায় যেন পরিশ্রম নেই, স্ফূর্তি আছে। আর সে চলে বিদ্যুৎবাতির আলো ছড়াতে ছড়াতে। প্রথম পড়ে মনে হয় যেন কত সহজ এই ভাষা। কিন্তু যারা কখনও বাংলা গদ্য লিখতে চেষ্টা করেছেন তাদের বুঝতে দেরি হয় না যে কত কঠিন এই সহজকে আয়ত্ত করা। এর নমুনা তুলতে চেষ্টা করব না, কারণ তা হলে ৫৯ পৃষ্ঠাই তুলতে হয়।

উৎসর্গ পত্রে চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন, "এই সব একরত্তি কথার ভিতর কোন বড় কথা নেই তা সত্ত্বেও এদের অন্তরে যদি কিছু গুণ থাকে ত, তা তোমার মতো সহৃদয় হৃদয়বেদ্য।" কিন্তু এসব গল্পের সমগ্র গুণ যাঁদের হৃদয়বেদ্য তাঁরা হচ্ছেন সেই সব গুণী লোক, অলংকারিকদের ভাষায় যাদের মনোমুকুর নিরন্তর সাহিত্য ও নানা বিদ্যার অভ্যাসে বিশদীকৃত। বাংলাদেশের মনের চর্চা যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে এরকম গুণীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। সেইজন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর লেখার সে-প্রচার ও চর্চা উন্নততর দেশে নিশ্চয় হত বর্তমান বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি। বাঙালি পাঠকসাধারণের মনে প্রসার এবং সাহিত্যিক বুদ্ধি ও রুচি যখন ভবিষ্যৎকালে এখনকার চেয়ে অনেক বড় ও মার্জিত হবে তখন তাঁর লেখার গুণগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা যে অনেক বাড়বে তাতে বেশি সন্দেহ নেই। এবং সে লেখা থেকে এই অতি ছোট 'অণুকথা সপ্তক' পুথিখানি বাদ পড়বে না।

পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪৬

আধুনিক বাংলা কবিতা

শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুব ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুব ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এঁদের যৌথ সম্পাদনায় এ সংগ্রহ গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশক: কবিতা ভবন, দাম ২ টাকা।

পত্রাবরণের পুথি পরিচয়ে জানা যায়, "'আধুনিক বাংলা কবিতা' ৩৫ জন কবির রচিত ১০৯টি কবিতার সংগ্রহ। ১৯১৮ থেকে ১৯৩৮, এই কুড়ি বছর এর সময়, এবং স্থানে যতদূর কুলিয়েছে, এই সময়কার সবচেয়ে সার্থক কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।" দ্বিতীয় বাক্যটির পদ-বিন্যাস একটু গোলমেলে, এবং কাল-পরিমাণের আদি ও শেষ দুটি বছর ধরলে হয় একুশ, দুই-ই ছাড়লে হয় উনিশ; সম্ভব ইঙ্গ-ভারতীয় আইনের সময় মাপের কায়দায় প্রথম বছরটা ছাড়তে হবে। আর পুথির শেষ কবিতাটির পাশে সংখ্যা দেওয়া আছে ১০৯ নয়, ১০৮। যাক, এ সব তুচ্ছ কথা। মোটামুটি বেশ বোঝা যায় গত বছর কুড়ির মধ্যে বাঙালি কবিরা যে সব কবিতা রচনা করেছেন তা থেকে বাছাই করা একশোর কিছু বেশি কবিতা নিয়ে এই সংগ্রহগ্রন্থ। এতে রবীন্দ্রনাথের ৪টি গান নিয়ে মোট ১২টি কবিতা আছে। অর্থাৎ এই দুই দশকের মধ্যে ৩৪জন বাঙালি কবি প্রায় একশো "সার্থক" কবিতা রচনা করেছেন। কেবল তাই নয়; এ সময়ের আরও কিছু "সার্থক" কবিতা স্থানাভাবে পুথিব ১৯০ পৃষ্ঠাব মধ্যে স্থান পায়নি, সংকলিত কবিতাগুলির সঙ্গে সমান "সার্থক" নয় বলে। বাঙালির গর্বের কথা। কোন সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সময়ে এমনটা ঘটেছে।

কিন্তু "সার্থক" কথাটার অর্থ নিয়ে খটকা লাগে। এই দুই দশকের মধ্যেই "পূরবী" ও "মহুয়া" প্রকাশ হয়েছে। তার কোনও চিহ্ন এ সংগ্রহে নেই। "যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" (১৯২৩), কি "আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে" (১৯২৮) সম্পাদকদের মতে এ সংগ্রহের ১০৯টি কবিতাব কোনওটির তুল্য "সার্থক" কবিতা নয়।

শ্রীজীবনানন্দ দাশের

> "স্কাইলাইট মাথার উপর,—
> আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।" (৩৩)

কি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের

> "আজ বিকালে হঠাৎ দুপেয়ালা চা খাওয়া ঘটে গেল
> যদিও নিয়মিত চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।" (২৬)

এর চেয়ে "সার্থক" কবিতা! প্রথমে আশ্চর্য লাগে কাব্য-বোধের "রেটিনা"য় এ রকম "ব্লাইন্ড স্পট" কি করে জন্মে। দ্বিতীয় সম্পাদকের ভূমিকায় অনেকটা উত্তর মেলে। তিনি জানিয়েছেন, "কয়েকজন খ্যাতনামা কবিকে আমরা বাদ দিয়েছি, তাঁদের লেখায় আধুনিক ভাব বা ভঙ্গির সন্ধান পাই নি বলে।" নিশ্চয় এই কারণে কবিকে বাদ না দিলেও তার অনেক কবিতাকে বাদ দিতে হয়েছে। কবিতা হিসেবে "সার্থক" নয় বলে নয়, ভাব বা ভঙ্গির 'আধুনিকত্বে'র (তার অর্থ যাই-ই হোক) পরীক্ষায় পাশ-নম্বর পায় না বলে। সম্ভব সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের ৮টি কবিতার মধ্যে ৪টি গদ্য কবিতা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন কাব্যসৃষ্টির সেই একটিমাত্র ভঙ্গিকেই বড় করে দেখানো হয়েছে যার অনুকরণে অনেক নবীন কবি 'রবীন্দ্রোত্তর' যুগের "রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত" কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন। দুই দশকের "সব চেয়ে সার্থক কবিতাগুলি" সংকলনের প্রতিজ্ঞা করে সেই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গির কাব্য সৃষ্টি করেছে তার বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উপর অবিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এ সংগ্রহ থেকে বাদ দিলে সম্পাদকেরা সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথাই বলি কেন! এ সংগ্রহের অনেক কবি ও কবিতাকে "আধুনিকত্বে"র সরু দরজা দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে ভিতরে আনতে হয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটি কবিতা আছে।

"ভুটিয়া যুবতী চলে পথ;
* * *
সহজে নাচিয়া যেবা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানি নাকো তারো কি ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায়।" (১৩)

সার্থক কবিতা। ভাব ও ভঙ্গির কোনও "আধুনিকত্বে নয়, কাব্য-রসের সর্বকালিকত্বে। মোহিতলাল মজুমদারের:

"সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি— মিথ্যা সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার— হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত রচনা!" (২১)

ছন্দে ও অলংকারের পুরাতন, শব্দ-প্রয়োগে অনাধুনিক— শব্দার্থের জন্য গলদঘর্ম হতে হয় না, ভাব ভর্তৃহরিতেও পাওয়া যায়; কিন্তু এ নতুন।

"দৃষ্টপূর্ব্বা অপি হ্যর্থা কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্ব্বে নরা ইবা ভান্তি মধুমাস ইবা দ্রুমাঃ ॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের:

> "প্রকাশিতে নয়,— করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
> ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা?
> তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
> ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয় রক্ত মাখা!" (২৩)

যে "মুডে"র কাব্য-রূপ তা আধুনিক নয়। ভগবান বুদ্ধের জীবন ওই "মুডে"রই কর্মরূপ। হুমায়ুন কবিরের সনেট দুইটি কী অর্থে আধুনিক? অজিত দত্তের ৫টি কবিতায় (৬৮ ৭২) আধুনিকত্বের ছাপ কত বড়?

> "কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙা! ও কেবল ভূষণ তোমার।
>
> * * *
>
> বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।" (১৭)

চটুল ব্যঙ্গের মিষ্টি কবিতা, আধুনিকত্বের একচেটে নয়। বুদ্ধদেব বসুকেও এ সংগ্রহে রাখতে হয পাশে একটা বড প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে। তার কারণ প্রথম সম্পাদকের ভূমিকাতেই বলি, "পূর্বতন সমস্ত প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই হালের ফ্যাশান। সে ফ্যাশানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বুদ্ধদেব বসু উনিশ শতকের খেয়ালী সুবকে সাহস এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন।...

... বুদ্ধদেবের খেয়ালী মনও মাঝে মাঝে বিংশ শতাব্দীব আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়, অমৃতস্য পুত্রদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তবে সমরোত্তব যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লব তাঁর চিত্তকে স্পর্শ কবলেও তেমন করে অধিকার করেনি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দের চিত্তকে।"

নজরুল ইসলামকে এ সংগ্রহে আনা হল কেন?

> "দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
> লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়াব!" (২৯)

এ কি আধুনিক?

২

মোট কথা সম্পাদকেরা মনস্থির করতে পারেননি। দ্বিতীয় সম্পাদক তাঁব ভূমিকায় বলেছেন বটে, "যে ধরণের কবিতা কিছুকাল থেকে লেখা হচ্ছে" এবং যাকে "বিদ্রূপ করবার লোকের অভাব এদেশে নেই তার পরিচয় দেওয়াই এ সংকলনের উদ্দেশ্য", কিন্তু কাজের সময় পিছিয়ে গেছেন। তাঁরা সাহস করে বলতে পারেননি যে তাঁদের সংগ্রহ

উদ্দিষ্ট কালের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ নয়, significant কবিতার সংগ্রহ। অর্থাৎ কেবল সেই সব protestant কবি যারা পূর্বতন কাব্যপ্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজেদের আধুনিকত্ব বজায় রেখেছে। এবং যারা হয়তো ভবিষ্যৎ কাব্যপ্রথার সূচনা (অবশ্য ভবিষ্যতের কথা কে জানে)। সম্পাদকেরা যদি সাহস করে তাঁদের সংগ্রহকে শুধু এই শ্রেণির কবিতার ভাণ্ডার করতেন তবে "বাংলা কবিতার অত্যন্ত সাম্প্রতিক হালচালের খবর" ১৯০ পৃষ্ঠায় দিতে পারতেন অনেক বেশি। ভূমিকা দুটি দীর্ঘ করে, চাই কি সংখ্যা বাড়িয়ে এই নবীন কাব্যের অভিনবত্ব ও গুণ-দোষের সম্যক আলোচনায় অনেক পাঠকের বিরুদ্ধ মন এর প্রতি অনুকূল করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সম্পাদকের প্রধান কাজ ব্যাখ্যাতা হওয়া। শ্রেণিবিশেষের কাব্যের সাধারণ আলোচনায় প্রায় সৃষ্টি হয় কাব্য-তত্ত্বের দর্শন শাস্ত্র। এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু কবিতা বিশেষের রসাস্বাদনে তার সহায়তা খুব কম। সম্পাদকেরা কবিতার পাদটীকায় কি পুথির পরিশিষ্টে এ সব কবিতা থেকে পাঠক সাধারণের আনন্দলাভের যে সব স্বীকৃত প্রাথমিক বাধা আছে তা দূর করবার চেষ্টা করতে পারতেন। শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভূমিকার ভাষায় এ সকল কবিতার অত্যন্ত "ক্ষিপ্রগতির জন্য" নানা দেশের সাহিত্যের যে "বিস্তৃত" "উল্লেখ ও উদ্ধৃতির" নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি কাব্য-পাঠকের যা অপরিজ্ঞাত। সম্পাদকেরা প্রয়োজনমতো তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিলে অনেক পাঠকেরই কবিতার মর্মে প্রবেশের পথ অনেকটা সুগম হত,— যদিও এটা সাহিত্যের প্রশ্নপত্রের সেই মামুলি 'explain the allusion'। যেখানে কবিতার কোনও ভাব আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবির অনিয়ন্ত্রিত মনের নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অপরিস্ফুট খেয়াল, তার "বাসনা" যে বহুজনের মগ্নচৈতন্যে রয়েছে তা টেনে তুলে দেখালে কাব্য-পাঠের আনন্দের সঙ্গে পাঠক শ্বেতকেতুদের মনে "তত্ত্বমসি"র পরম বিস্ময় মিশে কাব্যের রসকে প্রগাঢ় করে তুলত। কবিতাকে দৃঢ়সংবদ্ধ ও মিতবাক রাখার জন্য উপমা-উৎপ্রেক্ষা যেখানে নিতান্ত সংক্ষেপ ও অত্যন্ত ঠাসা, ব্যাখ্যায় তারা একটু বিস্তৃত ও ঢিলে হলে অনেক পাঠক উপকৃত হতেন। এমনকী শব্দের প্রয়োগ যেখানে চরম রকম খামখেয়ালি এবং ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাত আভিধানিক অপপ্রয়োগ, কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার যে কতদূর প্রয়োজন ছিল তার ব্যাখ্যাও নিষ্প্রয়োজন নয়। এবং নিতান্ত অসম্ভব বোধ না করলে কবিতা যেখানে অতিরিক্ত রকম "অর্থঘন" সেখানে একটু ব্যাখ্যার জল মিশিয়ে তরল করলে অনেক পাঠক গলাধঃকরণ করতে পারতেন এবং ক্রমে neat অভ্যাস হয়ে আসত। এসব প্রাথমিক বাধার ক্যাটালগ আমার মনগড়া নয়। একখানা ইংরেজি আধুনিক কবিতা সংগ্রহের গুণগ্রাহী সম্পাদকের ভূমিকা থেকে মোটামুটি নিয়েছি।[১] আর আমাদের সম্পাদকেরা তো স্পষ্টই জানিয়েছেন এইসব কবিতার প্রদীপেই আমাদের অত্যাধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যের দীপ জ্বালাচ্ছেন।

---

১. *The Faber Book of Modern Verse* Edited by Michael Roberts, 1936

"There is the intellectual difficulty which arises from the poet's use of some little-known fact, or some idea hard to grasp, there is the difficulty which comes from the unusual use of metaphor and there is the difficulty which arises when the poet is making a deliberately fantastic use of words." ইত্যাদি।

কিন্তু সম্পাদকেরা এ পথে চলেননি। অবশ্য কারণ আছে, হয়তো একাধিক কারণ। ফলে তাঁরা যে পাঁচ-মিশেলি সংকলন করেছেন তার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠায় দ্বিতীয় সম্পাদকের যে আশঙ্কা তা একেবারে অমূলক নয়।

৩

আধুনিক বাংলা কবিদের, এমনকী তাদের প্রধানদের কাব্যেরও রীতি-রূপ-মমের বিশেষ কিছু আলোচনা সম্পাদকের ভূমিকা দুইটিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি তো সরাসরি বাদ দিতে হবে। "মার্কস্‌পন্থা", "গণশক্তি", "আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল-মজুরদের ধর্মঘট", "বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকবণের সঙ্গতি" ইত্যাদি গরম বস্তু নিয়ে তিনি এত মেতে আছেন যে কাব্য-কৌশলের মতো কবোষ্ণ বিষয়েব আলোচনা তাঁর কাছে আশা করা অন্যায়। কিন্তু মুশকিল এই যে বিষয়-বস্তু কাব্য নয়, তা সে বিষয় যতই গুরুতর ও উৎকট হোক না কেন। বস্তুকে ধ্বনি ও রূপে গড়ে তোলাই কবিকর্ম। আর তার কৌশলের আলোচনাই সমালোচনা। শ্রীযুক্ত আইয়ুবের ভূমিকা থেকে কিছু আলো পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিমের "প্রতীকী" অর্থাৎ symbolist কবিদেব কাব্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা অল্প যা বলেছেন অনুমান হয় তাঁর মতে অল্পবিস্তর সেগুলিই বাংলাব আধুনিক কবিদের কাব্য-প্রথার বৈশিষ্ট্য। মোটামুটি সেগুলি হচ্ছে এই, "এঁদের শব্দচয়ন নিখুঁত ও বাক্যনির্মাণ অত্যন্ত ঘন, এবং ভাষা ব্যবহারে রয়েছে অভূতপূর্ব নির্বাহুল্য।" "কাব্যের প্রকাশ ক্ষমতা তাঁরা অনেক বাড়িয়েছেন ভাষাগত সর্ববিধ শুচিবায়ু পরিত্যাগ করে, শুঁড়িখানার কথোপকথনের সঙ্গে রাজকীয় সালংকার সম্ভাষণের নির্ভীক সমাবেশ ঘটিয়ে।" অর্থাৎ চলতি গ্রাম্য কথা পূর্বতন সাহিত্যিক অলংকৃত ভাষা একসঙ্গে ব্যবহার করে। অল্প পরিসরে অনেকটা কাব্য বস সৃষ্টির জন্য তাঁদের কবিতা নানা সাহিত্যের allusion-এ ঠাসা, যাব "ফলে কবিতার যে পূর্বতন প্রাঞ্জলতা ও অনায়াসবোধ্যতায় আমরা অভ্যস্ত তা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত।" বাহুল্য বর্জনের জন্য এঁরা "সিনেমা প্রযোজকদের cutting পদ্ধতি অনুসবণ" করেন; অর্থাৎ কবিতার আদি-মধ্য-অন্তের দৃশ্যত যোগরক্ষার দায় ঘাড়ে নিয়ে কথা বাড়ান না, সে যোগসূত্র পাঠকের নিজের আবিষ্কার করে নিতে হবে। এ হল বহিরঙ্গ। মর্মের দিক থেকে এঁবা "অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী।" "অনেক সময় এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাববিনিময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।" "কোনও সুনির্দিষ্ট সাধারণের বোধগম্য অর্থ-প্রকাশ করাকে প্রতীকী কবিরা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। বরঞ্চ এঁদেব বিশ্বাস যে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সঙ্গে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্তিসংগত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য তার সংকুচিত করা হয়।"

এ বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলা আধুনিক কবিতায় কী রূপ নিয়েছে না নিয়েছে অল্প পরীক্ষা করা যাক।

এ সংগ্রহে সংকলনের সংখ্যা-প্রমাণে আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে প্রথম তিনজন হচ্ছেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসমর সেন ও শ্রীবিষ্ণু দে। এঁদের সংকলিত কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ৭, ৮ ও ৯। বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সংখ্যাও ৭। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সম্পাদকীয় মতে তিনি বিশুদ্ধ আধুনিক নন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কবিতা "হৈমন্তী" (৪১)

"বৈদেহী বিচিত্রা আজি সঙ্কুচিত শিশির সন্ধ্যায়
প্রচারিলো আচম্বিতে অধরার অহেতু আকুতি।
অস্তগত সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেলো রজনীগন্ধায়।"

অত্যন্ত প্রকট অনুপ্রাসে কবির আসক্তি অসাধারণ। বাংলায় অপ্রচলিত বৈকাল অর্থে "সন্ধ্যা" শব্দের প্রয়োগের আর কোনও সার্থকতা নেই। "মাঙ্গলিক" কথায় যে ব্যঞ্জনা তা এখানে মোটেই উদ্দিষ্ট নয়, তবে ওর আরম্ভে 'ম' আছে। হেমন্তের স্বল্পস্থায়ী গোধূলি আকাশে আলোর রং-এর আন্ত-বিলীয়মানত্ব রেখে গেল রজনীগন্ধার গন্ধে— অত্যন্ত thin. বিশেষ হেমন্তের সন্ধ্যায় কি প্রভাতে রজনীগন্ধা যখন সুলভ নয়। অথচ কথা খরচ হয়েছে অনেক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক শব্দ ব্যয়ে অল্পকথা বলায় সুধীন্দ্রনাথের আনন্দ। তেমনই আনন্দ অপ্রচলিত গালভরা শব্দ অভিধান থেকে নিয়ে বা নিজে গড়ে একত্র জমা করতে। যাতে পাঠকেরা বেশ একটু দিশেহারা হয়। "অধরার অহেতু আকুতি" সামান্য একটু নমুনা।

"দিবো না স্মারক অঙ্গুরীয়
'ব্যবধি বৰ্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ।"

(মহাসত্য, ৪২)

"গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।"

(নাম, ৪৩)

"রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের। অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে।"

(নরক, ৪৬)

এর সব কথার অর্থ বা সার্থকতা বুঝেছি এমন গর্ব নেই, আর কবি ছাড়া অন্য কারও কাছে সব কথার অর্থ ও সার্থকতা আছে তাও স্বীকার করছিনে। তবে ভাষা ব্যবহারে "নির্বাহুল্য"

যদি আধুনিকতার একটা লক্ষণ হয় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সে বন্ধন থেকে আশ্চর্যরকমে মুক্ত। কী সে ভাব এই ভাষা যার প্রকাশের স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক উপায়!

এ সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন আধুনিক কবি সহজে নুইয়ে পড়া বাংলা কবিতার ভাষাকে সোজা হয়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। তাকে দিতে চাচ্ছেন একটা ঋজু কাঠিন্য। ভবিষ্যতের কবিপ্রতিভা হয়তো এ আরম্ভকে কাজে লাগাবে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় উপকরণ অনেক,— "অভিধান", "অন্বীক্ষা", "রসশাস্ত্র", "গভীর এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা," "স্বভাবজ সমাজবিমুখতা", "যদিদং কিঞ্চ সর্বং" সবেতে দারুণ বিতৃষ্ণার ভঙ্গি,— কিন্তু এ সব মিশে কবিতা কাব্য হয়ে ওঠেনি। হামানদিস্তায় চূর্ণ হয়েছে অনেক জিনিস কিন্তু যে উত্তাপে সব গলে রক্তবর্ণ মকরধ্বজ দানা বাঁধে তার অভাবে কজ্জলীই রয়ে গেছে।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র মনে এ উত্তাপের অস্তিত্বে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফ্যাশানের ঠান্ডা বাতাসে সে তাপ টুবে যাচ্ছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন "আধুনিকত্বে"র সর্ব-লক্ষণ যুক্ত কবিতা ছাড়া তিনি লিখবেন না। পাছে সমস্ত কবিতাটার আবছায়া গোছ ছাড়া একটা স্পষ্ট অর্থই দাঁড়িয়ে যায় সেই ভয়ে কবিতার এক অংশ থেকে অন্য অংশকে খাপাছাড়া করেই তাঁর মনে শান্তি নেই, প্রতি শ্লোকের এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের যথাসম্ভব অসংলগ্ন অসংগতি রক্ষা করে চলেছেন।

> "ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
> স্বয়ম্ভর ধর্ম বৃথা, ওরে নষ্টনীড়!"

(চতুর্দশপদী, ৮৪)

রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার চরণ বা চরণাংশ আচমকা এনে ফেলা এ অসংগতি রক্ষার একটা প্রধান উপায়।

> "জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
> শুধু নীলাভ একটু আলো এলো
> তোমার পোস্টকার্ড
> আর এলো তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।
> সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে' চলে'
> যাক্।
> বাসের একি শিং-ভাঙা গোঁ?
> যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
> এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
> ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।"

(টপ্পা-ঠুংরি, ৮৪)

"হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশেহারা দেব দেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হয়ে' গেছে রজনীগন্ধা-বনে।"

(ক্রেসিডা, ৮৭)

উদ্দেশ্য যা-ই হোক শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। এ অসংলগ্নের আনন্দ বিষ্ণু দে-র একচেটে নয়।

"ফরাসী রাজ্য ভালো লাগে, তাই
সংসার-ত্যাগ। লাল ত্রাসে কাঁপে
গ্রেসিয়ার দিন। পেশোয়ারীদের
করকবলেই ভবলীলা শেষ।"

(সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'পদাতিক', ১০৭)

"এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।
গাত্রদাহ শুধু নিষ্ফল আক্রোশ।
সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাবো।"

(সমর সেন, 'বকধার্মিক', ১০২)

সমাজ সংসারের সব জায়গায় খাপছাড়া অসংগতি ও অর্থহীনতা— কাব্যে তার প্রতিরূপ ফোটাবার যদি এই পন্থা হয় তবে দু'-একটা কবিতাই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ প্রতি কবিতায় এর আমদানি প্রত্যেক কবিতাকে করে Waste Land-এর reductio ad absurdum। সেটা Waste Land-এর কাব্য হয় না, হয় কাব্যের Waste Land।

শ্রীযুক্ত আইয়ুব তাঁর ভূমিকায় অনেক আধুনিক কবির কবিতার অর্থবিমুখতা সম্বন্ধে Eliot-এর বচন তুলেছেন। "Some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient of the 'meaning' which seems superfluous, and perceive possibilities of intensity through its elimination।" Eliot পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন ছিল না। এ সংগ্রহের ২০নং কবিতাতেই ওর তত্ত্ব আছে।

"আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।"

নমুনাও আছে,—

> "আলোয় ঢাকা অন্ধকার
> ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার!
> গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
> মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত।
> হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা,
> শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
> মক্ষিরানী পক্ষীরাজ
> দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।"

(সুকুমাব রায়, 'আবোল তাবোল')

কিন্তু বাংলাব আধুনিক কবিরা সুকুমার রায় নন। তাঁরা 'সিরিয়াস' কবি। "সমরোত্তর যুগে"র প্রশ্ন ও নিরাশায় ভারাক্রান্ত।

বেশ কল্পনা করা যায় যদি এমন দিন আসে যখন মানুষের সমস্ত কাজ ও চিন্তা রাষ্ট্রের নিখুঁত ও নিফাঁক নিয়ন্ত্রণে বীজগণিতের 'ফরমুলা' হয়ে উঠবে তখন মন এমনিধারা অর্থহীন অসংলগ্নের মধ্যেই মুক্তি ও কাব্যের আনন্দ পাবে। সে যুগের জন্য এখন থেকে কাব্য-রচনায় হয়তো লাভ নেই। তখন হয়তো এর চেয়ে অন্য ভঙ্গির অসংগতির আদর হবে।

সম্পাদকীয় ভূমিকা পড়ে জানা যায় যে "সাম্যবাদী দলে" শ্রীযুক্ত সমর সেন "নিঃসন্দিগ্ধ কবি", এবং ইতিমধ্যেই তাঁর "রীতমত একটি স্কুল গ'ড়ে উঠেছে।" এ সাম্যবাদ ও নিঃসন্দিগ্ধ কবিত্বে অন্ধতা স্বীকার করছি। চেষ্টা না করেছি তা নয়, কিন্তু নিরুপায়। এ গ্লানি নয়, 'অপটিক নার্ভ'?

৫

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা কয়টি পড়ে আবার আনন্দ পেয়েছি,— তা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি। কারণ অবশ্য "উনিশ শতকের খেয়ালী সুরের' মোহ। তাঁর "প্রেমিক" (৭৩) "বাহু যদি তেমন ক'রে জড়ায় বাহুবন্ধের" কটুপাক। কিন্তু রস জমেছে। "আমার দুর্ভাগ্য এই, সকলি জেনেছি",— সেই নিরলংকার "নির্বাহুল্য", কাব্যে যার শক্তি অসীম। যা "the multitudinous seas incarnadine"-এর মধ্যে নেই, আছে "making the green one red"-এর মধ্যে "ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা" (৭৪) সশস্ত্র বণিক সভ্যতার নিষ্ঠুর বীভৎসতার আশ্চর্য শক্তিশালী কাব্যরূপ। "ম্যাল্-এ"র (৭৯)

> "শাড়ির বাঁধনে শোভে শরীরের ইসারা,
> ঠোঁটের গালের রঙের চমকে কী সাড়া!
> কী করুণ, আহা, অতরুণ তনু সাজানো!"

ব্যঙ্গের কৌতুক হাসি; পড়ে হাঁপ ছাড়া যায়। কেবল তীক্ষ্ণ দাঁত দেখানো নয়।

৬

শ্রীযুক্ত আইয়ুব আধুনিক কবিদের outlook on life-এর কথা বলেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকেন্দ্রিকত্ব ও সমাজবিমুখতা এবং "পলায়নী" মনোবৃত্তি; বিষ্ণু দে-র নেতিবাচক সমাজবোধ, ও গভীর বিরক্তি ও বিষাদ। এবং তাঁদের উভয়ের চিত্তের উপর সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লবের প্রভাবের কথাও বলেছেন। এ সব আলোচনায় বিশেষ কোনও ফল নেই। কবির outlook on life হয়তো কাব্যের বড় ছোট নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কাব্যত্বকে মারে বাঁচায় না। Absolute outlook বলে তো কিছু নেই! কবি তাঁর কাব্যের জাদুতে যে outlook পাঠকের মনে ঘনিয়ে তুলতে পারেন তখন তাই সত্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের

"আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
— আমি কবি যত ইতরের।"

('আমি কবি', ৫৮)

যেমন সত্য, যতীন্দ্র সেনগুপ্তের

"সরে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই; চাষার ব্যারিস্টার।"

('দেশোদ্ধার', ২৪)

তেমনি সত্য।

শ্রীযুক্ত আইয়ুব অনুমান করেছেন বিষ্ণু দে-র "লেখনীর মধ্যে যে-মহৎ কবিতার শুধু প্রতিশ্রুতি নয় অঙ্গীকার রয়েছে, তা তাঁকে অনেকাংশে এড়িয়েই চলেছে, সম্ভবত এই জন্য যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এখনো কোনও অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দানা বাঁধেনি।" অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির দায় তত্ত্বজ্ঞানের, কাব্যের নয়। যে কবির দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড সে বাজায় একতারা, অর্কেস্ট্রা নয়। আশা করছি বিষ্ণু দে-র কাব্য যখন আধুনিক ছাড়িয়ে উঠবে ততদিনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড হয়ে জমে যাবে না।

তবে বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে ওই "সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লবের" প্রভাবটা একেবারে নকল সুতরাং বাজে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ওই কথাটা অক্ষমতার সাফাই। এই জরা-মরণ-গ্রস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যে গত মহাযুদ্ধটা কী নূতন এনেছে যা কবির অন্তর্দৃষ্টিতেও পূর্বে ধরা পড়ার সম্ভব ছিল না? তবে ইউরোপীয় লেখকদের কথাটা কতক বোঝা যায়, Conscript army-তে ভরতি হয়ে তাঁদের অনেককেই সে যুদ্ধেব হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে হয়েছে, তার দুঃখ ও ভয় ভোগ করতে হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের অনেকের চিত্তকে একান্ত অধিকার করেছিল। বাংলা আধুনিক কবি-

সমাজে কোথায় সে অভিজ্ঞতা। এক বাঙালি হিন্দুর চাকরির সংখ্যা ও বেতন কমা ছাড়া কোনও সামাজিক উপপ্লবের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গিয়েছেন! যদি কবির কল্পনার কথা ধরা যায় তবে উনিশ শতকের বাতিল কবির "still sad music of humanity"র কথাই তাঁদের কাব্যে বাজত, যুদ্ধের আকস্মিক আর্তনাদ নয়।

আর আজকের বণিক-সভ্যতার যে অত্যাচার, বদল চেহারায় তা সকল যুগেই ছিল। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "রাজকুমার" কবিতায় এ সরল সত্যটা কাব্যের রূপ পেয়েছে। আধুনিকত্বে ভেসে না গেলে তাঁর কাছে আশা আছে। যদি আজকের দিনের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমস্যাকে কাব্য না এড়াতে পারে, কি এড়ানো অনুচিত হয় তবে আমাদের প্রাচ্যের বড় সমস্যা কি ইউরোপীয় সভ্যতার আসন্ন প্রলয়, না আমাদের বুকে যে সভ্যতার লোভ গর্বের জগদ্দল পাথর? কিন্তু কোথায়? এক বুদ্ধদেবের "আফ্রিকা" কবিতা ছাড়া এ সংগ্রহে তো আর কোনও আধুনিক কবিকে এ দুঃখ উদ্বুদ্ধ করেছে দেখলাম না। পশ্চিমের কবিরা সে গান গাচ্ছেন না বলে কি?

৭

অনেক কটুভাষণ করেছি। কবিরা ক্ষমা করবেন। তাঁদের অবশ্য ক্ষোভ নেই, পৃথ্বী বিপুলা, কাল নিরবধি। ভবিষ্যতের বিচার ভবিষ্যৎ অবশ্য করবে, কিন্তু বর্তমানের বিচার বর্তমানকেই করতে হবে, ভুলের যত আশঙ্কাই থাক। বর্তমানের অবিচার ভবিষ্যতের আপিল আদালত রদ করেছে এর কত নজির সাহিত্যের দরবারে আছে। কেবল সেই নজিরগুলি নেই যেখানে বর্তমানের বিরুদ্ধ রায় ভবিষ্যৎ বহাল রেখেছে। কোন পাল্লা ভারী?

কবিতা। বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৭

বন্দীর বন্দনা (দ্বিতীয় সংস্করণ): বুদ্ধদেব বসু

বয়স যখন অল্প, যৌবনের প্রারম্ভ, তখন কল্পনার প্রসার হয় বিস্তৃত কিন্তু তার আকার থাকে অস্পষ্ট। নিতান্ত যারা জন্ম-পাটোয়ারি তারা বাদে সাধারণ লোকের মনেও এ বয়সে দেখা দেয় কল্পনার কুজ্‌ঝটিকা। কাব্যসৃষ্টির দায় নিয়ে যাদের জন্ম তাদের মনও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বভাবতই তাদের মনের কল্পনা আরও সুদুর-প্রসারী, ছায়াপথের মতো অনুভূতির আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং ছায়াপথের মতোই মৃদু আলোয় আলোকিত শুভ্র মেঘাকার, যার মাঝে মাঝে দেখা যায় সংহত জ্যোতিষ্কের সমুজ্জ্বল জ্যোতি। দু'-চারজন ছাড়া, যেমন কীটস, প্রায় কবির প্রথম বয়সের কাব্য মনের এই ছায়াপথের প্রতিচ্ছায়া। বেশির ভাগ কল্পনা নীহারিকার মতো ছড়ানো, আকারে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু সাধারণ মনের কুয়াশা নয়, কবি-মানসের দীপ্তি তা থেকে বিচ্ছুরিত। অল্প কিছু কল্পনা নক্ষত্রের উজ্জ্বল-কঠিন রূপ নিয়েছে, ভাবী জ্যোতিষ্ক-মালার পূর্বাভাস। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বাইরের জগৎ ও সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে চেতন ও অচেতন মনে যে অনভূতি সঞ্চিত হয় মনের রসায়নে তা থেকে জন্মে বিচিত্র সব ছায়ামূর্তি,–– ছবি, সুর, ভাব, চিন্তার। মনে কল্পনার এই প্রবাহ কাব্যের মৌলিক উপাদান। এই কল্পনার জগৎ প্রতি মানুষে ভিন্ন; কারণ এর মূলে আছে কেবল অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা নয়, সমগ্র মনের গড়নের ভিন্নতা, যা জন্মগত। কবির মনের স্পর্শানুভূতি সাধারণ মনের চেয়ে বহুতরমুখী ও অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, সে মনের রসায়ন অদ্ভুত বিচিত্রকর্মা। কিন্তু এ-কল্পনা-প্রবাহের প্রকাশ কাব্য নয়। মনে এ কল্পনার প্রবেশ ও গতি খামখেয়ালি, অসংলগ্ন, নিতান্ত সাময়িক ও ব্যক্তিগত কারণে পরিবর্তনশীল। কবিকর্ম হচ্ছে এই নানাত্ব থেকে যোগ্য উপাদান মূর্তির একত্বে গড়ে তোলা। সে মূর্তির রূপ ও উপাদানেব যোগ্যতাবোধ দুইই জোগায় কবির সৃষ্টি-প্রতিভা। কিন্তু কবি-কর্মের কৌশল আয়ত্ত করতে অনেক কবিরই সময় লাগে। প্রতিভারও আছে পরিণতি। সেইজন্য কবির প্রথমে বয়সের কাব্যে অনেক কল্পনা দেখা দেয় যা অনেকটা সোজাসুজি এসেছে কবির কল্পনা জগৎ থেকে কবির কাব্যে, কবি-কর্মের গড়ন সম্পূর্ণ যারা পায়নি।

বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা'র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ হয়েছে। এই কবিতাগুলি পরবর্তী বই কঙ্কাবতী ও বুদ্ধদেবের আধুনিক কবিতাগুলির সঙ্গে একসঙ্গে পড়লে তাঁর কবিকর্মের এই পরিণতি সহজেই চোখে পড়ে। "বন্দীর বন্দনা" নামের কবিতাটির সুর বই-এর আরও কয়টি কবিতার মূল সুর,— যেমন "শাপভ্রষ্ট", "মানুষ", "মোহমুক্ত"। রক্তমাংসের বাসনা-কামনার অনিবার্য আকর্ষণ, আর তাতে ধরা দিয়েও মানুষের, বিশেষ কবি-মনের, চরম অতৃপ্তি। কল্পনার বিষয়বস্তু বড়। মানুষের এই দ্বৈত-রহস্য ধর্মের নানা

অনুষ্ঠানে, তত্ত্বচিন্তার বহুস্তরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"রক্ত-মাঝে মদ্য ফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনা-লেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী!—"

"বন্দীর বন্দনা" কবিতায় এই দ্বৈতকে কাব্যের মূর্তি দেওয়া হয়েছে— বন্দনার ছলে বিধাতাকে বিদ্রুপের কল্পনায় যে তাঁর সৃষ্টি মানুষ, প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দি মানুষ, নিজেকে নিজে গড়েছে অমৃতের পুত্র, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু' করে।

"প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছো আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম। এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার।...

*   * *

বিশ্বস্রষ্টা তুমি মোরে গড়েছো অক্ষয় করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।"

কিন্তু

"তুমি যারে সৃজিয়াছ, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি;— তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহা-সৃজন-কালে— তুমি শুধু জানো সেই কথা।...
আমি কবি, এ-সঙ্গীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এ গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেল হানি'
তোমার সকাশে।"

পুনশ্চ "মানুষ" কবিতায়—

"আমি যে রচিব কাব্য, এ-উদ্দেশ্য ছিলো না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম; এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।"

কাব্য-কল্পনার বিপক্ষে দার্শনিক সন্দেহ অবান্তর। সুতরাং এ প্রশ্ন তোলা চলে না যে যে-বিধাতার ইচ্ছাশক্তি বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি করেছে দেহের ভোগকামনা কেন তাঁর সৃষ্টি, আর

মনের মুক্তির বাসনা তাঁর সৃষ্টি নয় কেন! কিন্তু এই মুক্তির সন্দেহ অন্য সন্দেহ মনে আনে কাব্য-পরীক্ষায় যা প্রাসঙ্গিক। "বন্দীর বন্দনা" কবিতা থেকে যে সব জ্যোতিষ্ক-কণা আহরণ করেছি সেসব সত্ত্বেও সমস্ত কবিতাটি কাব্যানুভূতির চোখে লাগে যেন নীহারিকাপুঞ্জ। তার কারণ কি এই নয় যে যে-বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশে এই কাব্যের গড়ন কবি তাকে নিয়েছেন গতানুগতিক বিশ্বাস থেকে। সে বিশ্বাসের উপর কবি-কল্পনার সে প্রতীতি নেই কাব্যের মায়াসৃষ্টির জন্য যা অপরিহার্য। রামপ্রসাদ যেমন গেয়েছেন:

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত।
* * *
আমি দিন মজুরী নিত্য করি
পঞ্চ-ভূতে খায় মা বেটে।"—

তখন, সাধন-ভজনের কথা বলছিনে, কিন্তু কাব্য-পাঠকের কল্পনায় সে "মা" জীবন্ত হয়ে ওঠেন। "বন্দীর বন্দনা"র বিধাতা কবিরা একটা বিশেষ ভঙ্গি প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র। পুতুলেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মনে বিদ্রোহ-রস জাগানো সম্ভব নয়।

"বন্দীর বন্দনা" কবিতার এ দিকটা আলোচনা করছি এইজন্য যে এর মধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতার পরিণতির একটা দিকের তথ্য রয়েছে। তাঁর প্রথম বয়সের কাব্যের অনেক জায়গায় কল্পনার অবলম্বন গতানুগতিক বিশ্বাস ও মত, যার সঙ্গে কবির মনের নিগূঢ় যোগ নেই। সে বিশ্বাস অতি প্রাচীন হোক বা অত্যাধুনিক হোক বুদ্ধদেবের কাব্য সেখানে দুর্বল। মনকে আবিষ্ট করে না।

"তাই আজ মুক্তকণ্ঠে আমন্ত্রণ করি তোমা, হে সুন্দরী নারী,
সকল বিক্ষোভ আজ অতিরিক্ত সুরা-সম ফেলেছি উদগাবি।
নাহিকো সংশয় আর;— প্রতিদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী— তোমার কী দাম!"

খুব জোরের সঙ্গেই অতি আধুনিক মোহমুক্তির বাণী অতি আধুনিক নগ্নতায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এ কবিতা মনকে সে 'মুডে' সম্পূর্ণ নিয়ে যায় না। কারণ এ 'মুড' কবির নিজের ধার করা, কল্পনার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত নয়। এর ভঙ্গি ও ভাষায় যে জোর সে বাইরের জোর, এবং সেইজন্য অতিরিক্ত জোর। ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ে। সেও "মোহমুক্তি"র বাণী. কিন্তু সে কাব্যের জগৎ ও জীবনের তত্ত্বে পাঠকের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিরপেক্ষ তার 'মুড' কাব্য-পাঠককে সম্পূর্ণ 'হিপ্‌নটাইজ' করে। বুদ্ধদেবের কবিতাটি যে করে না তার প্রধান কারণ ও-কবিতার 'মুড' যথার্থ 'মুড' নয়, attitude মাত্র।

সম্প্রতি কেউ কেউ বলেছেন যে আমাদের বর্তমান কাল শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টির অনুপযোগী। কারণ তেমন কাব্যের সৃষ্টির জন্য চাই বিশ্ব ও সমাজ ব্যবস্থার একটা সনাতনত্বে কবির মনের

বিশ্বাস এবং তাতে কবির অন্তরের সায়। কিন্তু এ কালে কোনও কিছুর সনাতনত্বে বিশ্বাস কারও মনে দৃঢ় নয়, এবং চলতি বা কল্পিত কোনও সমাজব্যবস্থায় কারও অন্তরের সম্পূর্ণ সায় নেই। এ মতের মধ্যে সম্ভব এইটুকু সত্য আছে যে বড় কাব্য, বিশেষ 'লিরিকে' কবির কল্পনার মূলে একটা সত্য দৃষ্টির প্রত্যয় বোধ থাকে। কিন্তু এরকম প্রত্যয় আজ আর নেই এ কথা সত্য নয়। যেমন পূর্বকালে তেমনি একালে সত্য-মিথ্যা নানা বস্তুতে মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। তার মধ্যে কোনও কিছু সনাতন নয়, সবই পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক— একটি। প্রকৃত কি কল্পিত কোনও সমাজব্যবস্থাই মানুষকে চরম তৃপ্তি দেবে না— আর একটি। এ কালের কবি যদি সত্যই বড় কাব্য রচনায় অক্ষম হন তার কারণ সকল প্রত্যয়ের ধ্বংসাভাব নয়; তার কারণ পূর্ব পূর্ব কালে বড় কাব্যের মূলে যেসব প্রত্যয় ছিল, যাতে আর এখন প্রতীতি নেই, তাদের ছেড়ে নবলব্ধ প্রত্যয়ের ভিত্তিতে কাব্য রচনার প্রতিভা সুতরাং সাহসের অভাব। "ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ"। ইউরোপের মনীষী সমাজের এখানে ওখানে যে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের মূলতত্ত্বে ফিরে যাবার আগ্রহ দেখা দিয়েছে তার মূলে এই সাহসের অভাব। দান্তের মহাকাব্য যখন রচনা হয়েছিল ওই তত্ত্বের ভিত্তিতে তখন তাতে ফিরে গেলে এ কালের মহাকাব্যও গড়ে উঠবে!

বুদ্ধদেবের কবিতা সেখানেই কাব্যের অনাবিল আনন্দ এনে দেয় যেখানে সে কাব্যের কল্পনার মধ্যে তাঁর মনের নিবিড় আত্মীয়তার নাড়ির সংযোগ; ঐতিহ্যের কি হাল গতানুগতিকের বাইরের চাপে জোড়া লাগানো নয়। এই বাইরের চাপ বুদ্ধদেবের কল্পনা অল্পদিনেই কাটিয়ে উঠেছে। "কঙ্কাবতী"তে এর প্রভাব নেই। তাঁর আধুনিক কবিতাগুলি, যা 'কবিতা'র পৃষ্ঠায় ছড়ানো রয়েছে, এ থেকে মুক্ত। "কঙ্কাবতী"র কবিতা:

"নিতান্ত মনের কথা, ছোটো কথা,"
[কঙ্কাবতী। 'আমার কবিতা (রমাকে)'।]

কিন্তু কেবল 'রমা' নয়, কাব্যরসিকেরাও "খুশি হবে প'ড়ে"। প্রথম যৌবনের কল্পনার বৃহত্ত্বের মায়া ছুটে গেছে, দেখা দিয়েছে কল্পনাকে কাব্যের গড়ন দেবার কবি-কর্মের নিপুণতা। যেমন "কঙ্কাবতী"র "বেহায়া" কবিতাটি "বন্দীর বন্দনা"র অনেক কবিতার তুলনায় নিতান্ত হালকা। কিন্তু ছবি, ছন্দ, সুরের অনায়াস পরিপূর্ণ মিলনে এ "ড্রামাটিক লিরিক"টি কাব্য-সাহিত্যের কোণে সঞ্চয় হয়ে থাকবে। হলই বা সে কোণ ছোট।

"কোনো বন্ধু-র প্রতি" নামের দীর্ঘ কবিতাটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্পর্কে কীটস যাকে বলেছেন sublime egotism। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজের জীবনের সঙ্গে বোনাপার্টের জীবন তুলনা করে কবির জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছিলেন। এ "সাব্‌লিমিটির"র একটু "রিডিকুল্যাস" দিক না থেকে যায় না। বুদ্ধদেবের কবিতারও আছে। "সেকালের যে রাজাদের"

"দুটি ছিলো প্রধান ব্যসন,
* * *
পৃথিবী— প্রথমা প্রিয়া, তারপর, নারী।"

পৃথিবী থেকে অনেকদিন তারা লোপ পেয়েছে। তাদের জীবনাদর্শের মাপে আজ কোনও কিছুকে মাপা কাব্যের কল্পনাতেও নিরর্থক। কিন্তু এ egotism ছাড়িয়ে কবিতার দ্বিতীয় পর্বে যখন কবি-চিত্তের আশা-আশঙ্কা বেজে উঠেছে তখন অকবি পাঠকেরও মনের তার হার্মনিতে বেজে ওঠে।

"না, না,— নহে কবি-যশ,
মহান কাব্যের বুকে নহে সে নামের অমরতা।
* * *
... কিন্তু যেই আত্মার আলোক
শুভ্র আলোকের কণা এ-বারের এ-জন্মের মতো
লভেছিনু, তার দীপ্তি কভু নিবিবে না, তার গতি
যুগ হ'তে যুগান্তরে অবিরাম চলিবে বহিয়া,
নব-নব কবিদের জন্ম-ক্ষণে নামিবে আবার—
বিধাতার স্তুতি-লেখা জ্বালি' দিবে তাঁদের ললাটে;
তোমার, আমার স্পর্শ তারি সাথে লভিবেন তাঁরা।"

সকল কবির Ode on the Imitations of Immortality।

"অমিতার প্রেম", "মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান," "অপর্ণার শত্রু"— সেই শ্রেণির কবিতা যার প্রকাশভঙ্গি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটু নতুন রূপ এনেছে। এই প্রাথমিক কবিতাগুলি অনাবশ্যক দীর্ঘ, এবং সমগ্র কবিতা মূল কল্পনা থেকে যেন স্বচ্ছন্দগতিতে বেরিয়ে আসেনি, কিছু আয়াসের চিহ্ন আছে। কিন্তু এ সূচনা। "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

"বিজয়িনী" ও "পরাজিতা"— যুগ্ম সনেট দুটির "মদনভস্মের পর"-এর ধ্বনি বাঙালি পাঠকদের আনন্দ দেবে। "ক্ষণিকা" কবিতার আরম্ভে আছে,

"আমরা রচেছি আজ প্রেম-মুগ্ধ, মধুর মিলন
মিলাইয়া বাস্তবে স্বপন;"

বই-এর শেষ কবিতা "মোরা তার গান রচি"-তে প্রশস্ত জীবন-নদীর কল্পনা,—

"মিশে আছে সোনা আর ধুলা যার সলিল শীকরে।"

নিখাদ বাস্তবে আর অমিশ্র ধুলায় হয়তো কাব্য গড়া চলে, কিন্তু সে কাব্য গড়ার চেষ্টা বুদ্ধদেবের কাছে পরধর্ম। তাঁর কল্পনা সেখানে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন মিলায়, বালুতে সুবর্ণরেখা দেখতে পায় সেখানেই সম্পূর্ণ কাব্যের মূর্তিতে গড়ে উঠতে পারে। তাঁর কাব্যসৃষ্টির এই স্বধর্ম, যাতে নিধন নেই। সে কাব্য সত্য কথা হয়তো বলতে পারে না, কিন্তু কাব্য-কথা বলে।

১৩৪৮

সব-পেয়েছির দেশে : বুদ্ধদেব বসু।

কবিতা ভবন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ রোগ-ভোগের সময় যখন মাঝে মাঝে সামান্য সুস্থ থাকতেন তেমনি এক অবসরে লেখক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য তাঁর মনে যে আনন্দ এনেছিল তার আবেগে লেখক বইখানি লিখেছেন, এবং সে-আনন্দ এ বই-এর সর্বত্র ছড়ানো। তার বিষয়-সন্নিবেশ, তার ভাষা, তার স্টাইল 'আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি জায়ন্তে।' বইখানি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে এ আনন্দ মহাকবি ও মহালেখকের সন্দর্শনে নবীন কবি ও লেখকের আনন্দমাত্র নয়। এ আনন্দ তাঁরই নিকটে এসে মনে জমেছে যাঁর মনের মন্ত্রে লেখকের মন দিয়েছে খুব বড় সাড়া। লেখকের নিজের কথায় " 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এই তাঁর প্রথম ও শেষ মহামন্ত্র।" বস্তুর বাস্তবতা তিনি কারও চেয়ে কম অনুভব করেননি। এ বাস্তবতাকে তিনি যে কর্মে স্বীকার করেছেন তার তুলনাও আমাদের দেশে খুব বেশি নেই। কিন্তু তাঁর মন ও সৃষ্টির আনন্দ পৃথিবীর ধূলিকে ধূলিমাত্র দেখেনি, বেদের ঋষির মতো 'মধুমৎ' দেখেছে।

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের দেশের নবীন লেখকেরা কী চোখে দেখতেন, তাঁদের শ্রদ্ধায় ভালবাসার পরিমাণ ছিল কত তার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় এ পুথিতে রয়ে গেল ভাবীকালের লোকদের জন্য। কেবলমাত্র জীবন-চরিত এ জিনিস কিছুতেই দিতে পারবে না। আর আমাদের মতো যারা কবি নয়, সত্যিকারের লেখকও নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেছে, তাঁর মনের আলোর স্পর্শ পেয়েছে তারা নিবিড় আনন্দ ও গভীর বিষাদে এ বই পড়বে।

এ বইখানি লেখা শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে। না হলে অনেক কথা ও আলোচনা যা এ বই-এ আছে তা বাদ পড়ত। এর মধ্যে যে উচ্ছল আনন্দের প্রবাহ তা বাধা পেত। এ বই হত অন্য বই।

এ বই-এর ভাষা সকলের চোখে পড়বে। আধুনিক বাংলা গদ্য যোগ্য লেখকের হাতে কত স্বচ্ছন্দগতি ও উজ্জ্বল হয়েছে এ বই তার একটি দৃষ্টান্ত।

লেখকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট মেয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সেই উপলক্ষে নিজেদের কিছু ঘরোয়া কথা এ বই-এ আছে। সে সব কথা এ বই-এ স্থান দেওয়ার কড়া এবং মৃদু বিদ্রূপ সমালোচনা দেখেছি। সমালোচকেরা লেখকের সমবয়সি, বা সে বয়সের মনোভাবকে দূর থেকে দেখার বয়স তাঁদের হয়নি। আমার মতন যারা বৃদ্ধ, লেখকের বয়সকে স্নেহের চোখে দেখতে পারে, তারা এ ঘরোয়া কথা সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে পড়ে আনন্দ পাবে। ভাবী-কাল এ বৃদ্ধদের দিকেই। কালের ব্যবধান বয়সের প্রভেদের কাজ আপনি করবে।

পৌষ ১৩৪৮

জাগরী— শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী।

সমবায় পাবলিশার্স, কলিকাতা।

ছোট পাইকা হরফে, ডবল ক্রাউন ৩১১ পৃষ্ঠার বই। লালচে রঙের প্যাকিং কাগজের মতো কাগজে ছাপা। অগুন্তি ছাপার ভুল। একটু মন দিয়ে প্রুফ দেখার কষ্ট কেউ স্বীকার করেনি। খেলো পিসবোর্ডের মলাট দাগশূন্য। বই-এর নামটিও তার উপর ছাপা প্রকাশক ব্যয়বাহুল্য মনে করেছেন। এই হল বহিরঙ্গের পরিচয়। বইখানি পড়া শেষ করে মনে যে বিস্ময় জেগেছে তাতে মনে পড়ল শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের গড্ডলিকার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন। ভোরে দরজা খুলে সামনে যদি দেখি একটা নূতন আগাছা বিশেষ কিছু মনে হয় না। যদি দেখি ডালপালা ছড়ানো একটা বটগাছ, পূর্বদিন যা ছিল না, তবে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। লেখকের আর কোনও লেখা পড়িনি। তাঁর নামও শুনিনি। কিন্তু এ বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। প্রথম চেষ্টার জড়তার চিহ্ন কোথাও নেই। শক্তির ছাপ সর্বত্র। নবীনত্বে ঝলমল করছে।

পূর্ণিয়া প্রবাসী একটি বাঙালি পরিবারের কাহিনি। বাপ, মা, দুই ছেলে— ডাক নাম বিলু ও নিলু। বাপ ছিলেন ওখানেই সরকারি ইংরেজি স্কুলের হেড মাস্টার। বিদ্যা ও চরিত্রের খ্যাতিতে সকলের সম্মানিত মাস্টার সাহেব। গান্ধী আন্দোলনে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সেখানেই আশ্রম খুললেন। আশ্রমেই কংগ্রেস অফিস। খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম মহাত্মার আশ্রমের অনুকরণে। মা আশ্রমের গৃহস্থালি চালান। স্বামীর ইচ্ছায় আশ্রমের অন্য কাজ এবং কংগ্রেসের কাজও মাঝে মাঝে করতে হয়। ছেলে দুটি আশ্রমেই মানুষ হল। বড় ছেলে বিলু ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। কিন্তু আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে মিল রেখে তাকে আর কলেজে পড়ানো চলল না। কাশী বিদ্যাপীঠে পড়ে সে শাস্ত্রী উপাধি পেল। ছোট ছেলে নিলু কলেজে পড়েই পাশ করল, দাদার চেষ্টায়। দুই ভাই আশ্রমে থেকে কংগ্রেসের কাজ করে, মহাত্মার নির্দিষ্ট পথে। মাঝে মাঝে জেল খাটে। যেমন বাপও খাটে। ক্রমে এ কাজ ও পথের উপর দু'ভাই-এর এল সংশয় ও বিরাগ। তারা হল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সভ্য।

একই পার্টির মধ্যে থেকে দু'ভাই উৎসাহে কাজ করতে লাগল। তারপর একবার জেলে 'চন্দ্রদেও'-এর সঙ্গে আলাপ ও পরিচয়। জেলে কাঁঠাল গাছের নীচে কম্বল বিছানো তার লেকচার ক্লাসে তার অকাট্য যুক্তিতে ও দল ছেড়ে ছোট ভাই নিলু যোগ দিল কম্যুনিস্ট দলে। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন। সরকারি হুকুমে আশ্রম ও কংগ্রেস অফিস 'জপতো' হল। বাপ-মা দুজন জেলে সিকিউরিটি বন্দি। আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বড় ভাই বিলুর

বিচারে হল ফাঁসির হুকুম। ছোট ভাই নিলু কম্যুনিস্ট, এ আন্দোলনের বিরোধী। আদর্শ ও পার্টির খাতিরে দাদার বিচারে সে সরকার পক্ষে সাক্ষী দিল। যেদিন প্রত্যুষে বিলুর ফাঁসি হবে বলে সকলে জানে তার পূর্ব রাত্রে বিলু পূর্ণিয়া জেলের 'ফাঁসি সেলে', বাপ 'আপার ডিভিসন ওয়ার্ডে', মা 'আওরৎ কিতায়', নিলু 'জেল গেটে' সৎকারের জন্য দাদার মৃতদেহের অপেক্ষা করছে, পকেটে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতি পত্র। কাহিনিটি বলা হয়েছে চার অধ্যায়ে এই চারজনের সেই রাত্রে মুখের কথায়। খুব সহজসাধ্য কৌশল নয়। কিন্তু ওর সাহিত্যিক সম্ভাবনা লেখকের হাতে আশ্চর্য সফল হয়েছে।

যে ঘটনা দেশের মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছে, যার ফলাফল এখনও প্রত্যক্ষভাবে লোকের মনে কাজ করছে, ইতিহাস হয়নি, তা নিয়ে সার্থক কাহিনি রচনার বিপদ অনেক। এ রকম ঘটনা সম্পর্কে পাঠকের মন আপনা থেকেই উত্তেজিত থাকে। তার সুযোগে গল্পে ও চরিত্রে কোনও সাহিত্যিক পরিণতি না থাকলেও কেবল সেই চাঞ্চল্যকর পটভূমিকার জোরে অনেক পাঠককে মোহাবিষ্ট করা যায়। স্বল্পক্ষম লেখকের কাছে এ প্রলোভনের আকর্ষণ প্রবল। ১৩৫০ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে যেসব গল্প ও উপন্যাস লেখা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত তাতে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের যে নিরপেক্ষ সম্বন্ধের প্রয়োজন, এ রকমের বিষয় সম্পর্কে শক্তিশালী লেখকের পক্ষেও সে মানসিক দূরত্ব আয়ত্ত করা কঠিন। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখকের লৌকিক মন যে উদাসীন নয়, স্পর্শকাতর, তা গ্রন্থের উৎসর্গপত্র থেকেই বোঝা যায়। এ গ্রন্থ তিনি তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন "যে সকল অখ্যাতনামা রাজনৈতিক কর্মীর কর্মনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের বিবরণ জাতীয় ইতিহাসে কোনোদিনই লিখিত হইবে না।" ভূমিকায় নিজের ঠিকানা দিয়েছেন পূর্ণিয়া— তাঁর উপন্যাসের ঘটনাস্থল। কিন্তু এই মমত্ব ও নৈকট্য লেখকের সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করেনি।

নিজের ও অন্য তিনজনের মুখের কথায় এই চারটি মানুষ দেহে ও মনে একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে নানা শ্রেণির, নানা চরিত্রের, নানা বয়সের বহু নরনারী— এই চারজন নিজের কথা বলতে প্রসঙ্গত যাদের কথা বলেছে। বিলু-নিলুর প্রতিবেশিনী পাতানো জ্যাঠাইমা বিলুর উপর যার তীব্র স্নেহ মা'র মনে কখনও আনন্দ ঈর্ষা আনে। ভূমিহার ব্রাহ্মণের ঘরের কিশোরী মেয়ে সরস্বতী। বিলু ও মা'র দু-চারটি কথায় বিলুর উপর এই কিশোরীর অনুরাগের একটু ছবি পাঠকের মনে অরুণোদয়ের কোমল রং মাখিয়ে দেয়। জেলের পরিবেশে নানা পলিটিক্যাল দলের লোক। মেহেরচন্দজি— যিনিই কেবল 'রাষ্ট্র গগনকী দিজ্বিয় জিয়োতী' গানটি, জেলে যার নাম 'প্রার্থনা', তার সুর জানেন। কিন্তু প্রত্যহই একটি লাইন ভুলে যান এবং পকেট থেকে 'আশ্রম ভজনাবলী' বের করে দেখে নেন। সেবাপরায়ণ অতি ভাল ছেলে সদাশিউ— 'বস্ত্র-স্বাবলম্বী' প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম লেখার পর সে প্রত্যহ অন্তত এক হাজার গজ সুতা কাটে। কমরেড সুখলাল— সে মুখ দিয়ে চরকার শব্দের চমৎকার ক্যারিকেচার করে। জেলের ডাক্তার, ওয়ার্ডার, সুবেদার, কনস্ট্রাটকার, কয়েদি সব নিয়ে লেখক একটা জগৎ তৈরি করেছেন যার বাস্তবতার প্রতীতি কখনও ভঙ্গ হয় না। জেলের বাইরের কত লোক। হরদা বাজারের দোকানদার দুবেজি ও

তার স্ত্রী। দুজনেই বুড়ো। দুবেইন 'নিমক' সত্যাগ্রহে জেলে গিয়েছিল। বয়স বেশি বলে দুবেজিকে পুলিশ ধরেনি। সেই থেকে দুবেইন নিজেকে দুবের চেয়ে বড় মনে করে। সরল দুবের তা নিয়ে বিলুর কাছে নালিশ। এই নিঃসন্তান দম্পতি নিজেদের যে কয়েক বিঘা জমি আছে, দুজন মরার পর যাতে মহাত্মাজির কাজে লাগে তার জন্য বিলুর কাছে উমেদার।

অক্লান্ত কংগ্রেসকর্মী সহদেও কিন্তু আধিয়ারদের কায়েমি স্বত্ব বন্ধ করার জন্য 'বন্দোবস্তী'র মিথ্যা দলিল তৈয়ারি করতে দ্বিধা করে না। ডি পি আই অফিসের আরদালি, পূর্বে অফিসে গেলে দেখাত নির্লিপ্ত ভাব। কিন্তু বিলুর বাপ 'স্বরাজীমে শরিফ' হইয়া কাজে ইস্তফা দিচ্ছেন শুনে গড় হয়ে প্রণাম করে জানালে তারও মনের ইচ্ছা 'স্বরাজীমে' যাওয়া। আসছে বছর ছেলেটা 'মিডিল ইস্তিহান' পাশ করলে সাহেবকে বলে তার একটা চাকরি করে দিয়েই 'স্বরাজীমে' যাবে। পাড়ার বৃদ্ধ মিত্তির মশাই— যিনি কালীবাড়ির পিছনের ইটের পাঁজার কাছে বিলুর বাপকে নিয়ে গিয়ে খুব দরদের সঙ্গে বুঝিয়েছিলেন কেন এসব ব্যাপারে যাচ্ছে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার রয়েছে। ভারতবর্ষে যদি স্বরাজ হয়, তবে পূর্ণিয়াতে বাদ দিয়ে তো আর হবে না। খুব অল্প পরিসরের মধ্যে দু'-চার টানে এসব চরিত্র আঁকা। ফটোগ্রাফ নয়, ক্যারিকেচারও নয়; নিপুণ শিল্পীর হাতের ছবি। দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাহিত্যের অক্ষয় কল্পলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এসব চরিত্রের অধিকাংশ অবাঙালি। সহজ অনায়াসে লেখক প্রাদেশিক সীমা ছেড়ে বাংলা সাহিত্যে নূতন স্বাদ এনেছেন। এ উপন্যাসের মালমশলা কতটা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কতটা কল্পনা সে কথা অবান্তর। সৃষ্টির উত্তাপে সব গলে সাহিত্যের উপাদান হয়েছে। Crude কিছু নেই।

বিলুর মুখে পূর্ণিয়া অঞ্চলের আগস্ট আন্দোলন উন্মাদনায়, সাহসে, ভয়ে, মুক্তির উল্লাসে, নিষ্ফলতার নৈরাশ্যে, ছোট বড় অসঙ্গতিতে— যা মানুষের জীবন জ্বলজ্বল করছে। জীবনের একটা কোণ থেকে যেন ঢাকনা খুলে গেছে।

বাংলা সাহিত্যের এই নবীন শক্তিমান লেখককে অভিবাদন জানাচ্ছি। বয়সে নবীন কি না জানি না। হলে আশ্চর্য হব। এ উপন্যাসে লেখকের মনের যে পরিচয় সে পক্ককষায় মন। এই এক উপন্যাসে তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। আশা করছি এটি শুভ আরম্ভ। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি অবাধ হোক। 'শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ'।

৩০ চৈত্র ১৩৫২

নবযুগের কথা

প্রকাশক চন্দননগর প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যখন বেশিদিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জো নেই, যে পথে হোক তাকে যখন চলতেই হয়, তখন যে-সভ্যতা কিছুদিন টিকে থাকে, তারই যুগের পর যুগ আসে। অর্থাৎ এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ইতিহাসের খানিকটাকে দু'-একটা সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট লক্ষণ অনুসারে পূর্বাপর থেকে সেটিকে তফাত করে তার একটা যুগ নাম দিয়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের কারবার চালান। এবং এ হিসাবে পরবর্তী যুগ মাত্রেই পূর্বের যুগের তুলনায় নূতন যুগ। কিন্তু 'নবযুগ' কোনও নূতন যুগ নয়, সে হল নবীন যুগ। গাছের জীবনের বার্ষিক ইতিহাসে শীতে যখন পাতা ঝরে ন্যাড়া ডাল ক'খানি টিকে থাকে সেও একটা নূতন যুগ; কিন্তু যখন বসন্তের স্পর্শে তার সারা দেহ রঙিন কিশলয়ে সাড়া দেয় সেইটি হল তার নবযুগ।

কোনও সভ্যতারই এমন সৌভাগ্য ঘটে না যে আগাগোড়া তার জীবনটা হয়, একটা একটানা উন্নতির ইতিহাস। কখনও দৌড়িয়ে, কখনও খুঁড়িয়ে এমনি করেই মানুষের সভ্যতা চলে। কখনও তার জীবনে আসে প্রাণের জোয়ার, যা তাকে অপূর্ব লীলা ও অভিনব সৃষ্টির পথে নিয়ে যায়। কখনও বা তার প্রাণের স্পন্দন মৃদু হয়ে আসে, অবসাদ এসে সমস্ত শক্তিকে চেপে ধরে; সে তখন প্রাণপণে প্রাচীন সৃষ্টিকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, ভয়, পাছে নূতন পথে পা দিলেই যা-কিছু পুঁজি তাও বুঝি হারায়। সভ্যতার এই যে সম্প্রসারণেব যুগ, মুক্ত-প্রাণের বিচিত্র লীলার যুগ, এর প্রারম্ভই হল 'নব-যুগ'; যে-যুগ নবীন সৃষ্টির বেদনার পুলকে আকুল, যার অরুণালোক রাত্রিশেষে সভ্যতার নব সূর্যোদয় ঘোষণা করছে। যে প্রবন্ধ-পুস্তকখানি আমরা আলোচনা করছি, তার কথা এই যে বাঙালি জাতির সভ্যতার আজ এইরকম একটি নবযুগ এসেছে।

নবযুগ যে এসেছে, ১০২ পৃষ্ঠার এই ছোট পুথিখানি তার একটা প্রমাণ। বইখানিতে লেখকের নাম নেই। প্রকাশক মহাশয় "প্রবন্ধগুলি পূর্বে 'প্রবর্ত্তকে' বাহির হইয়াছিল"— এ ছাড়া বিজ্ঞাপনে আর কিছুই বলা আবশ্যক মনে করেননি। সুতরাং লেখকের সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল দমন করে আমরা লেখার সঙ্গেই পরিচয় করব।

বইখানিতে 'মুখপত্র' ধরে মোট ন'টি প্রবন্ধ আছে। সবগুলি একই সুরে বাঁধা এবং তাদের অন্তরের কথাও মোটামুটি একই। লেখকের মর্মবাণীটি এই প্রবন্ধগুলির নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধগুলির এই অন্তরের বাণীই হচ্ছে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পুথিখানিতে লেখক যা বলেছেন তার দুটো ভাগ আছে। একটা হচ্ছে বিচার ও যুক্তির দিক— অর্থাৎ তত্ত্বাংশ, আর একটা হচ্ছে অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক— অর্থাৎ সাহিত্যাংশ। প্রথমটা তর্কের বিষয়, সুতরাং তা নিয়ে তর্ক উঠবেই। দ্বিতীয়টি নিয়ে কোনও তর্ক উঠবে না। সেটি নবীন বাংলার একেবারে অন্তরে গিয়ে পৌঁছিবে। কেননা বিংশ শতাব্দীর বাংলার মর্মকথাটি এ প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যের সুষমাময় মূর্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বিচারের কথাই আগে বিচার করা যাক। বিচারের বিষয় হল আমাদের অর্থাৎ— হিন্দু সভ্যতার বর্তমান অধঃপতনের কারণ। এ প্রশ্ন এবং তার সমাধান প্রায় সব ক'টি প্রবন্ধেই আকারে ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'মানুষের কথা' প্রবন্ধটিতে লেখক সোজাসুজি একটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন। "আমরা ত চিরকাল এরূপ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমরা ধরাপৃষ্ঠে গৌরবোন্নত শিরে বিচরণ করিতাম। তখন এই বিশ্বমানবের মহামেলায় আমাদের চক্ষে কাতর দৃষ্টি ফুটিয়া অপরের করুণা ও অবজ্ঞা উদ্রেক করিত না। তখন চিত্ত ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীবন ছিল খেলিবার সামগ্রী। সে সব আর নাই। কেন? অধঃপতনের কারণ কি? আমরা কোন্ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি যে আজ আমাদের এ অবস্থা?" এবং মীমাংসায় লেখক বলেছেন, "ইহার একই উত্তর, সে-উত্তর হইতেছে এই যে, আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অস্বীকার করিয়াছি— তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। আমরা মনুষ্য-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি।" উত্তরের ব্যাখ্যায় লেখক বুঝিয়েছেন যে মানুষ তার দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, বিজ্ঞান; তার বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়; তার কর্ম, ভোগ, ত্যাগ এইসব নিয়েই তবে মানুষ। যদি এর মধ্যে কতকগুলিকে অস্বীকার করে, অমঙ্গল ভেবে পিষে ফেলবার চেষ্টা করা যায় তা হলে মনুষ্যত্বকেই পঙ্গু করা হয়। ফলে জাতির মন থেকে জীবনের যে সহজ আনন্দ, সে আনন্দ থেকে মানুষের সভ্যতার যা কিছু মহৎ ও বৃহতের সৃষ্টি, সেটি চলে যায়। তখন জীবনটাই হয়ে ওঠে দুর্বহ ভার। তাতে আর কোনও প্রাচুর্য, কোনও লীলার জায়গা থাকে না। তখন কর্ম হয় জীবনযাত্রা, ধর্ম হয় প্রাণহীন আচারের লোহার শিকল, ভোগ হয় প্রাণপণে প্রাণকে আঁকড়ে থাকা, ত্যাগ হয় অপৌরষের অক্ষমতা। লেখক বলেন, "হিন্দুজাতিটা কয়েক শতাব্দী ধরে' এই অস্বীকারের, এই পিষে-ফেলার কাজটা করে আসছে। আর তার অধঃপতনও হয়েছে তখন থেকেই, আর সেই কারণেই। জাতির শিক্ষকেরা সমস্ত জাতিটাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবন দুঃখময়, জগৎ মায়া, ভোগ অমঙ্গল।" আর এই দুঃখ থেকে, মায়া থেকে, অমঙ্গল থেকে মুক্তির এক উপায় কর্ম-ত্যাগ, ভোগে বিরক্তি, জগৎকে অস্বীকার। জীবন ও জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হল পুরুষার্থ। কিন্তু সে পথে পা বাড়াতে হলেই চাই "ইহামুত্রফলভোগ বিরাগং", কি একালে কি পরকালে ফল ভোগে বিতৃষ্ণা। এই শিক্ষা যখন জাতির হাড়ে হাড়ে বসে গেল তখন তার জীবন হয়ে উঠল বিস্বাদ, প্রাণ হল আনন্দহীন, কর্ম হয়ে উঠল বেগার। দেহের রক্তপ্রবাহ মৃদু হয়ে গেল, তার হাত পা শিথিল হয়ে এল। তাতে জাতিটা যে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল তা নয়, কেননা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সে হয়ে উঠল আমরা বর্তমানে যা, অর্থাৎ— 'জড়ভরত'। তার কর্মও থাকল, ভোগও গেল না; কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা হয়ে উঠল একটা 'কর্ম্মভোগ'। এই পেষণের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, "জীবনে উচ্ছ্বাস শক্তির অনুভব

করিতেছি— মনে হইতেছে যে শক্তির বলে অশান্ত সিন্ধুকে তাড়িত মথিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি। কিন্তু খবরদার— সে শক্তিকে সার্থক হইতে দিয়ে না। মনে অনন্ত কল্পনার খেলা খেলিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগসামর্থ্যের আভাস পাইতেছি, বুদ্ধিতে আশ্চর্য রূপ নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভার, জ্ঞানের, আলোকের সন্ধান পাইতেছি, কিন্তু না, উহাদিগকে আপন আপন ধর্ম্মের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপিয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিষিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে না পারে— তোমাকে ভোগবান্ করিয়া ফেলিতে না পারে— এ সৃষ্টিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি আহরণ করিতে না পার।"

এ বিষয়ে যে তর্ক উঠবে তা এই যে, সত্যিই কি হিন্দু জাতিটা তার দুঃখবাদী দার্শনিকদের আর মায়াবাদী আচার্যদের উপদেশ মনে আঁকড়ে ধরেই জীবনের আনন্দ হারিয়ে, সৃষ্টির ক্ষমতাকে পঙ্গু করে, ক্রমে 'জড়ভরত' হয়ে উঠেছে? এই দুঃখবাদ আর মায়াবাদ, এ কি জাতির জীবনের আনন্দহীনতার কারণ, না তার ফল? রোগের নিদান না রোগের লক্ষণ? হয়তো এ মতবাদগুলির উদ্ভব হয়েছে তখন যখন হিন্দুজাতির মন সরস ও সচল ছিল, কেননা দার্শনিক চিন্তাও একটা সৃষ্টি, সচল মনেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু জাতির জীবনের উপর লেখক এদের যেমন প্রভাব কল্পনা করেছেন সে কি সম্ভব? জাতি যখন 'জীবনে উচ্ছ্বাস শক্তিব অনুভব' করছে, যখন তার মনে 'কল্পনার অনন্ত খেলা খেলছে', 'বুদ্ধিতে নব নব উদ্ভাবনী শক্তি' ফুটে উঠছে, তখন সে কি বৈরাগ্যের বাণীতে কান দেয়; না, কান দিলেও মন দেয়? সৃষ্টিপদ্মের আনন্দমধু যার জিহ্বাতে লেগে রয়েছে তার কানে 'জগৎ মিথ্যা' মন্ত্র জপে দিলেই কি সে মধু তিতিয়ে উঠবে? বরং এই কি সত্য হওয়া বেশি সম্ভব নয় যে, হিন্দুজাতির জীবনে যখন ভাটা ধরেছে, সহজ আনন্দের উৎস যখন শুকিয়ে এসেছে তখনই সে ওই মতবাদগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে? এবং তাদের শিক্ষায় আরও বেশি করে নিরানন্দ, বেশি কবে কর্ম-বিমুখ হয়ে উঠেছে? জাতির জীবনে এই যে ওঠা-নামা, উৎসাহ অবসাদের যুগ একটার পর একটা আসে, লেখক তা মোটেই ভোলেননি। তাঁর 'মুখপত্রে' এ কথা তিনি চমৎকার করেই বলেছেন। কেন যে মানুষের সভ্যতার এই নিদ্রা জাগরণ, বিকাশ সংকোচ, একের পর আর আসে তার রহস্য কে জানে? এ তো জীবন মৃত্যুরই রহস্য। এবং সে পুরাণ রহস্য চিরদিনই গুহাস্থিত, এবং হয়তো চিরদিনই তেমনি থাকবে। অবশ্য প্রত্যেক সভ্যতারই উত্থান পতনের একটা ইতিহাস আছে, হিন্দু সভ্যতারও তা আছে। এবং সে ইতিহাস নিশ্চয়ই জটিল; এক কথায়, একটা সূত্রে গেঁথে ফেলার বিষয় নয়। কারণ মানুষের সভ্যতা জিনিসটিই অতি জটিল এবং হিন্দু-সভ্যতা আর সব সভ্যতার চেয়ে কম জটিল ছিল মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে সে ইতিহাস কল্পনায় ছাড়া এখনও গড়ে তোলা চলে না। কেননা তার পনেরো আনাই এখনও আমাদের অজ্ঞাত। এবং হয়তো তাকে ঠিক সত্য করে বিচার করবার মতো এখন আমাদের মনের অবস্থাও নয়। বর্তমানের দারিদ্র্য না ঘুচলে পূর্বপুরুষের কি ঐশ্বর্য কি দারিদ্র্য, কিছুই মন খুলে বিচার করা সহজ নয়।

কিন্তু এসব বিচার বিতর্কের কথা এখানেই শেষ করা যাক। এইসব যুক্তি-বিচার এ প্রবন্ধগুলির প্রধান কথা নয়। লেখকও তাদের প্রধান করতে চাননি, লেখাতেও তারা প্রধান

হয়ে ওঠেনি। এ প্রবন্ধ-পুথিখানির প্রধান কথা ও প্রাণের কথা হল বাঙালির জীবনে আজ দীর্ঘরাত্রি শেষে জাগরণের যুগ ফিরে এসেছে। সেই সহজ আনন্দ ভগবান আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন যার প্রাচুর্য হল সভ্যতার সমস্ত সৃষ্টিধারার মূল উৎস। লেখকের প্রাণে এই আনন্দের যে সুর বেজে উঠেছে প্রবন্ধগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারই ঝংকারে মুখর। এবং আগেই বলেছি, এ সুরের ঢেউ নবীন বাংলার একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করবে। হিন্দু-সভ্যতার কেন পতন হল, এ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু লেখক যখন ডেকে বলেছেন— "আমরা যারা নবীন— যাদের মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে; অতীতের বোঝা যাদের প্রাণ হ'তে নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে দূর করে রাখতে সক্ষম হয়নি— তাদের আজ লড়াই করতে হবে এই ত্যাগ মন্ত্রের বিরুদ্ধে। এ বিচার যারা সারাদিন মার্তণ্ড-তাপে কাটিয়ে অবসন্ন দেহে শুষ্ক মুখে সন্ধ্যার আড়ালে তাদের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে ঢলে পড়ছে তারা করবে না— ঊষার স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের বিপুল স্পন্দনের সাথে সাথে হাসিমুখে যারা আজ জীবন-মন্দিরে সাধকের বেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তারা করবে, আমরা আহ্বান করছি আজ নবীনকে, পুরাতন আজ বিদায় নিক।" তখন তার আহ্বানে, আজ বাংলায় যারা নবীন তারা সাড়া দেবেই দেবে। কেননা আনন্দের এ সুর তাদের প্রাণে এসেও পৌঁছেছে। এ সোনার কাঠি যাকেই স্পর্শ করেছে সেই মনে জানে— যে-ত্যাগের মন্ত্র বিশ্ব থেকে মানুষকে বিমুখ করে সে যারই ধর্ম হোক আজ বাঙালির পক্ষে সেটা পরধর্ম। শীতের দীর্ঘ রাত্রির পক্ষে 'অচলায়তনে'র পাথরের ঘের ও আচারের কম্বল-চাপা কতটা উপযোগী কি অনুপযোগী, এ নিয়ে বিচার চলে। কিন্তু আজ বসন্তের ঊষার রঙিন উত্তরীয় গায়ে মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়াতেই হবে।

এ বইখানি যিনিই পড়বেন দুটি প্রবন্ধ বিশেষ করে তাঁরই চোখে পড়বে। এর একটি হল "দরকার", আর একটি হল "ইয়োরোপের কথা।" দ্বিতীয় প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন, "আসল, সে বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা নয়, অন্তর দিয়ে কি অনুভব করে তারই প্রকাশ। অবশ্য যে চিন্তা করে আর যে করে না, এ দু'য়ের অন্তর একরকম নয়, এবং তাদের সৃষ্ট-সাহিত্যও এক দরের নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তরের ভিতর দিয়ে না এলে জিনিসটি মোটে সাহিত্যই হয় না।" এ দুটি প্রবন্ধে লেখক যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশে তা সুলভ নয়; কিন্তু সে চিন্তা এসেছে লেখকের অন্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আর প্রকাশ হয়েছে সাহিত্যের সুন্দর মূর্তিতে। "দরকার" প্রবন্ধটির কথা এই— "দরকারের তাগিদে মানুষ সভ্যতা গড়ে নাই, কেননা বেশির ভাগ দরকার সভ্যতারই ফল। এই সৃষ্টিটা অদরকারী বলেই, এ পৃথিবীর হাজার বস্তু, হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত আনন্দ। কারণ যেখানে দরকার সেখানেই দাসত্ব।" "Necessity is the mother of invention— এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা— Necessity, invention-এর mother তো নয়ই, মাসি পিসিরও কেউ নয়— ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃতজনের কথা, ধরতাই বুলিরই একটা বুলি। Invention-ই বলো, discovery-ই বলো, আর যাই বলো, এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ— প্রকাশ করবার আনন্দ— সৃষ্টি করবার আনন্দ।" 'ইয়োরোপের কথা'য় লেখক এইরকম আর একটি 'ধরতা'ই বুলির টুঁটি চেপে ধরেছেন। সেটি হচ্ছে— আধুনিক

ইয়োরোপ জড়সর্বস্ব আর আধুনিক বা প্রাচীন হিন্দু আধ্যাত্মিক। "ইয়োরোপ তার অন্তরের, তার প্রাণের, তার জীবনের আনন্দ দিয়ে যে সভ্যতা গড়ে' তুলল— যে সভ্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল— যে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পুরাতন দেহে নূতন প্রাণ জেগে উঠল— সে সভ্যতা একটা গভীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে— তাতে হাজার রকম ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে— হয়ত তাতে মানুষের সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে ওঠে নি— কিন্তু তাই বলে যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে কতগুলো জড়বস্তুসমষ্টির উপরে একথা যে বলে তার মতো জড়বাদী এ ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। জড়বস্তুর এমন শক্তি এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মানবে না।" "বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইয়োরোপকে গড়ে তোলেনি— ইয়োরোপেই বস্তুসমষ্টির জন্ম দিয়েছে।— আপনার অন্তরের শক্তিতে— জীবনের আনন্দের আতিশয্যে— প্রাণের গতির বেগে। আসল কথা হচ্ছে যে জড় জড়ই, যতক্ষণ না সেটা মানুষের অন্তরের শক্তিতে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। সুতরাং ইয়োরোপ আজ যা, তার মূল কারণ হচ্ছে তার জীবনে অনুভূত— প্রাণে ওজস্-রূপিণী চিৎশক্তি— তার জীবনদেবতার, ভগবানের এ সৃষ্টিতে লীলা-বিলাস।" তারপর প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথায় লেখক অতি সরস করে দেখিয়েছেন যে, কথায় কথায় আমরা যে আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি বের করি তার মাপে হিন্দু-সভ্যতার গৌরবের যুগগুলিকে জড়সর্বস্ব বলে ঠেলে দিতে হয়। "যে যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে, সে যুগে কি তারা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নি? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বল্কল পরে সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করতেন— না সীতাদেবী নিজ হাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অম্বল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন? গীতা রচনা হল, সে তো একটা ভীষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসটা কেবল জড়বাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হত তবে এমন আধ্যাত্মিক জাতি যে হিন্দু, তাদের মধ্যে যুদ্ধ ইত্যাদি করবার জন্যে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে' উঠত না।" লেখক এই কথা বলে তার "ইয়োরোপের কথা" শেষ করেছেন— "আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব্ব গৌরবের স্থান অধিকার করে বসবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে' থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাঁতিরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে, আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক্ক কদলীর চাষ করবে, তবে তাঁরা নিরাশ হবেন নিশ্চয়।"

এ প্রবন্ধ দুটির অন্তর্দৃষ্টি যেমন গভীর, এদের ভাষাও তেমনি লঘু, প্রকাশের ভঙ্গিও তেমনি সরস ও বিচিত্র।

তাঁর ন'টি প্রবন্ধ জুড়ে লেখক তাঁর স্বজাতি সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার অনেকগুলিকে গালমন্দ বললে খুব ভুল হয় না। টুর্গেনিভ তাঁর রুডিনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, "জাতিকে গাল দেবার কেবল তাঁরই অধিকার আছে, জাতিকে যে ভালবাসে।" "নবযুগের কথা" পড়ে কারও সন্দেহ থাকবে না যে, লেখকের সে অধিকার নেই।

সবুজপত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৬

জুপিটার : শ্রীমতী বাণী রায়

লেখিকা অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে। কিছু প্রয়োজন ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তিনি অপরিচিতা নন। শক্তিমতী লেখিকা বলে অনেকেই তাঁকে জানে। সে শক্তির পরিচয় এ গ্রন্থে অনেক আছে।

এই কবিতাগুলি বাঙালি পাঠককে কিছু নূতন আস্বাদ দেবে। প্রধানত দুই কারণে। কবিতাগুলির ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গিতে একটা ঋজু দৃঢ়তা আছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা পুরুষের নয়, নারীর। এই দৃঢ়তার সাধনায় লেখিকা নিজের স্বাভাবিক অনুভূতি ও দৃষ্টিতে আবৃত করে সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে পুরুষের মতো ভাবতে ও দেখতে চেষ্টা করেননি, যদিও দৃঢ়তা পুরুষোচিত গুণ বলেই পরিচিত। এ কাজ সহজ নয়। কাব্য ও সাহিত্য আজ পর্যন্ত মোটের উপর পুরুষের সৃষ্টি। সেই জন্য অল্পসংখ্যক মেয়ে যাঁরা লেখেন, তাঁরা প্রধানত পুরুষের মতোই লিখতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তাঁদের অনুভূতি ও দৃষ্টির যে অংশ পুরুষ-বিলক্ষণ, তার প্রকাশকে কাব্য ও সাহিত্যের মর্যাদা দেন না, বিশেষ লিরিক কবিতায়, যেখানে নিজের মনকে প্রকাশ করতে হয়। মুখের পরদা ঘুচানো সহজ, মনের পরদা তোলা কঠিন কাজ। নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টির অবিকৃত প্রকাশ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম কথা। কিন্তু সে সাহস কেবল শক্তিশালী লেখকদেরই থাকে। এই কবিতাগুলিতে লেখিকা সে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। চেষ্টাকৃত বিদ্রোহের উৎসাহে নয়, সহজ স্বাভাবিকতায়।

এই কবিতাগুলির দ্বিতীয় বিশেষত্ব এদের বিষয়-বস্তু, উপমা, রূপক, ধ্বনির অবলম্বনে যে পুরাণ ও সাহিত্য তা প্রধানত বিদেশি— গ্রিক ও ইউরোপীয়।

চেষ্টা অতি-আধুনিক বাংলা কবিতায় পূর্বে হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মন প্রথমেই বিমুখ হয় একে কাব্যে নূতনত্ব আনার সহজ মেকানিকাল উপায় ও কলেজে অধীত ও অধ্যাপয়িতব্য বিদ্যার প্রকাশ মনে করে। যে কাব্য প্রাচীন পুরাণ ও পূর্বতন কাব্য থেকে সৃষ্টির উপাদান আনে, ক্রোচে যাকে বলেছেন, 'সাহিত্যিক সাহিত্য', তা সার্থক হয় যদি কবি ও পাঠকের মন সে পুরাণ ও সাহিত্যের সুরে এমন বাঁধা থাকে যে, ঘা পড়লেই বিচিত্র ঝংকার জাগে। বিদেশি পুরাণ ও সাহিত্য সম্বন্ধে এর সম্ভাবনা কম, যদিও প্রথম বয়স থেকেই আমরা তাতে কৃতশ্রম। লেখিকা এক কবিতায় বলেছেন—

> বিজাতীয় ভাব রক্তে বহে খরতর;
> স্বদেশ ত্যজিয়া বিদেশের পথে পথে
> করি বিচরণ।

সত্য কথা বলতে এর সবটা রক্তে মিশেনি (কারণ তা অসম্ভব), অনেকটা আছে মগজে। কিন্তু এ কবিতাগুলি যিনি পড়বেন, তিনিই দেখতে পাবেন যে কতকটা কবির রক্তেই মিশেছে এবং সেখানে তার ব্যবহার ও প্রকাশ হয়েছে সহজ ও স্বাভাবিক।

জুপিটার! জুপিটার!
বজ্র করে হাহাকার,
ম'রে গেছে জুপিটার জানি বহুদিনই,
তবু কে দেউলে তার?
নব পূজারিণী!

বিদেশি গল্প অবশ্য আছে, কিন্তু বিজাতীয় নয়। শিক্ষিত বাঙালির মন একে সহজেই স্বীকার করে নিয়ে একটু নূতন আস্বাদের আনন্দ পায়। যেমন—

রূপা-গলা নীলনদে জাগ 'ওসিরিস'
অতলের হে দেবতা। জাগ 'আইসিস্',
জাগ তুমি সূর্যরূপী জীবনদেবতা
'রা' জাগ।
পাষাণের বিরাট প্রতীক,
অন্ধদৃষ্টি দিয়ে দেখ বন্দনা আমার,
বালুকার ধ্বংস-দেশে গ্রানাইট্ স্তূপে
পশুমুখী দেবতার পায়ে উপহাব ॥

প্রকৃত কথা এই বিদেশি পুরাণ-ইতিহাস-সাহিত্যের কতক অংশ আমাদেব মনে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশেছে। বাংলা কাব্য ও সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক। যদি না হয় তবে কোন 'ইন্‌হিবিশানে'র বাধায়। এতে বাংলা কাব্যের বিষয়-বস্তুর প্রসার ও প্রকাশের বৈচিত্র্য বাড়বে। যেটা শুদ্ধ অতীত বিদ্যাই আছে, তাকে কাব্য-সৃষ্টির কাজে লাগাবার চেষ্টা জবরদস্তি, সুতরাং পণ্ডশ্রম। এর সীমারেখা কোথায় কবির অন্তর্দৃষ্টিতেই তা প্রকাশ পায়।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলি আধুনিক বাংলা কাব্যে গতানুগতিক সৃষ্টি নয়; সহজ স্বকীয়তায় নবীন। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

১৩৫০

নিশান্তিকা: যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এই কাব্যসংগ্রহের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৩৫৪ সালের পৌষ থেকে ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন মাস। মোটামুটি কবির মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব থেকে দু' বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। ১৩৫৪ সালে কবির বয়স ষাট। কবিতাগুলি তাঁর ষাটোত্তর বয়সের রচনা। "সায়ম্" ও "ত্রিযামা"র কবিতায় কবির মনের ভাব ও অনুভূতির পরিবর্তনে কাব্যে যে সুরের বদল দেখা দিয়েছিল এ কবিতাগুলি সেই বদল সুরের।

বাংলা সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি তাঁর তিনখানি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। "মরীচিকা", "মরুশিখা" ও "মরুমায়া"। এর কবিতাগুলি লেখা হয় ১৩১৭ থেকে ১৩৩৭ সালের মধ্যে। কবির পরিণত যৌবন প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা ছোঁয়া পর্যন্ত। এ কবিতাগুলির অনাস্বাদিতপূর্ব ভাব ও রস, ভাষার ও প্রকাশভঙ্গির অগতানুগতিক অমলিন তীক্ষ্ণতা, ঝাঁঝাল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিদ্যুৎস্ফুরণ, বাঙালি কাব্য-পাঠকদের মনে বিস্ময়ের চমক জাগালো। নূতনকে আয়ত্তে আনার বহু আচরিত চেষ্টা, তাকে নামের বন্ধনে বাঁধা। সকলে মিলে কবির গায়ে একটা লেবেল এঁটে দিলাম। যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদের কবি।

মানুষের ও প্রাণীমাত্রের জীবনে দুঃখ কঠোর সত্য। এ তথ্যকে ভুলে থাকার কি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কিন্তু ওর "বাদটা" তথ্য নয় তত্ত্ব। অন্য অনেক তত্ত্বের মতোই কিছু তথ্য জড়ো করে, বাকি সব তথ্যকে বাদ দিয়ে, মননের একটা কৌশল গড়া যাতে বহুকে এক করে এক ধরনের বোঝার সুবিধা হয়। এ-দুঃখবাদ সভ্য মানুষের সমাজে নূতন কিছু নয়। বৌদ্ধদের চার আর্য বা প্রধান সত্যের একটি হল "সর্বং দুঃখং দুঃখং"। আমাদের দেশের আস্তিক দর্শনগুলির মত ভিন্ন নয়। জীবন দুঃখময়, দুঃখেই গড়া। তার মধ্যে সুখ বা আনন্দ যেটুকু থাকে দুঃখের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। তার ক্ষণিক ছলনা স্থায়ী দুঃখকেই বাড়ায়। দর্শনের তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ এই দুঃখের আত্যন্তিক বা চরম নিবৃত্তির পথ দেখানো। যে পথের সন্ধানে গৃহী গৌতম গৃহহীন বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিদেশের দেশে দেশে তত্ত্বচিন্তায় ও সাহিত্যে এই দুঃখবাদের ছাপ। জীবনে দুঃখ এমন সর্বব্যাপী, তীক্ষ্ণ ও প্রকট যে, তা না হলেই আশ্চর্যের কথা হত। 'He alone is happy who never was born'। সুতরাং কবি যখন বলেন:

> মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ,
> মিথ্যা রঙিন সুখ:
> সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবনের দুখ।
>
> (মরুশিখা)

তখন নূতন কোনও তত্ত্বের কথা বলেন না।

কিন্তু তত্ত্বের বিচারে কাব্যের বিচার হয় না। সৃষ্টির মূল দুঃখে, না আনন্দাদ্ধেব্য খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে সে প্রশ্ন নিরর্থক। যে দেহী মনোময় জীবের দুঃখ সুখ আনন্দের কথা আমরা জানি ও কল্পনা করতে পারি, বিশ্বসৃষ্টির লক্ষ কোটি সূর্য গ্রহ উপগ্রহ তারা সংখ্যায় ক'জনা যে সৃষ্টির মূলে দুঃখ না আনন্দ তার তর্ক তুলি? আমাদের কারবার এই অতি ছোট পৃথিবীকে নিয়ে। তার প্রকৃতির রমণীয়তা ও ভীষণতা, তার গুটিকয়েক সংবেদনশীল জীবের বেদনা ও আনন্দ আমাদের সফল কাব্যের উপাদান। "আর পাবো কোথা?" এই ছোট গণ্ডির মধ্যে দুঃখ এক প্রকাণ্ড সত্য। একমাত্র সত্য নয়। যেটুকু আনন্দ আছে তা-ও সমান সত্য; পরিমাণে যতই কম হোক। এই দুঃখের সর্বব্যাপী বৈচিত্র্য যে কবির অনুভূতিকে আবিষ্ট করে কাব্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে, তার অনুভূতি যদি সত্য ও গভীর হয়, তার কবিকর্মের যদি ক্ষমতা থাকে সে দুঃখের রসমূর্তি সৃষ্টি করার, তবে সে কাব্য আমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে। দুঃখ ও বেদনা আমরা জানি, তার কাব্যরসের স্বাদ্যমানতার বীজ আমাদের মনেই আছে। যেমন আছে কবির 'অকারণ পুলকে' ক্ষণিক আনন্দ গানের আস্বাদনের বীজ। কাব্যের রস কেবল মধুর রস নয়, নবরস, অর্থাৎ অসংখ্য রস। সর্বব্যাপী দুঃখ ও বেদনার সার্থক রসমূর্তি সৃষ্টি করে কবি যতীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অমর হয়েছেন। কবি যখন 'বহ্নিস্তুতি' দিয়ে কাব্যারম্ভ করেন,

> শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ,
> রূপে রূপে তব শিখা,
> তৃষিত মরুর নীরস অধরে
> তুমি ধরো মরীচিকা।
>
> (মরীচিকা)

তখন দুঃখের বিশ্বরূপ ও তার ছলনাময় মূর্তি মনের চোখে ফুটিয়ে তোলেন। যাকে জানি সুন্দর, কবি যখন তার মধ্যে দুঃখের জ্বালা দেখেন ও দেখান, "রূপে রূপে তব শিখা" তখন তার যে কাব্যানন্দ সে সেই এক আনন্দ কবি যখন অসুন্দর ও সাধারণের মধ্যে সুন্দরকে দেখেন ও দেখান। এ দুয়ের কবিধর্ম ভিন্ন, কিন্তু কবিকর্ম অভেদ। একে একদেশদর্শী বলা অর্থহীন। সর্বদেশদর্শী দৃষ্টি যদি কিছু থাকে তা কাব্যের দৃষ্টি নয়। সাংখ্যেরা বলেন, ত্রিগুণের যখন সাম্যাবস্থা প্রকৃতি তখন বন্ধ্যা। গুণের তারতম্যেই সৃষ্টির আরম্ভ। কবি অবশ্য দুঃখের একতারা বাজিয়েছেন, খুব চড়া সুরে, বহু অনুভূতির সিম্ফনি নয়। যে কবির কাব্যে বহু-রসের সিম্ফনি তা ছড়িয়ে থাকে বহু কবিতায়, এক কবিতার অর্কেস্ট্রায় নয়। ব্যথার বাঁশিতে যখন আনন্দের গান বেজে ওঠে, সে গান আনন্দের, ব্যথার নয়। যদিও সেই বাঁশিতেই আবার ব্যথার গান বাজে।

২

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়" গ্রন্থে শ্রীঅজিত দাসের একটি প্রবন্ধ থেকে যতীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁর কাব্য-রচনায় এক ইতিহাস উদ্ধৃত করেছেন। যতীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর কবি হবার আদপেই কোনও অভিপ্রায় ছিল না। তিনি পাশকরা materialist ইঞ্জিনিয়ার। লোহা-লক্কড়, ব্রিজ-কালভার্ট এমন সব ভারী কাজের নিরেট জিনিস নিয়েই তাঁর কারবার। সুতরাং সমকালীন কবিদের ভাবালুতার আকাশকুসুমের একঘেয়ে ভ্যাপসা মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠল। এসব কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে জাগল বিদ্রোহ। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যেই তিনি কবিতা রচনায় হাত দিলেন। কিন্তু বাংলার কবিদল তাঁর বিদ্রুপকেই কাব্যজ্ঞানে "চেঁচিয়ে উঠলেন,— কবি— কবি— কবি"।

যতীন্দ্রনাথের এই কাব্যোৎপত্তির ইতিহাসে সত্য ততটা যেমন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কারের ইতিহাসে গাছ থেকে আপেল ফল মাটিতে পড়ার কাহিনিতে। সর্বব্যাপী দুঃখ বেদনাকে কাব্যের মূর্তি দেবার তাগিদে নয়, বাঙালি কবিদের ভুয়া ভূমানন্দের প্রতিবাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে "মরীচিকা" "মরুশিখা"'র সৃষ্টি এমন কথা কবি নিজের মুখে বললেও সত্য হয়ে ওঠে না। আকস্মিক উপলক্ষটা কারণ নয়। শিব গড়তে বানর গড়া সহজেই ঘটে, বানর গড়তে শিব গড়ে ওঠে কেবল শিল্পীর হাতে। বাঙালি কবিদের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে আনুষঙ্গিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকে ছাপিয়ে উঠেছে দুঃখের তীব্র রূপ। যতীন্দ্রনাথ প্যারডি-কার নন, যতীন্দ্রনাথ কবি।

কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে কাব্যের উৎপত্তির কাহিনিতে যেটুকু বাহ্যিক সত্য ছিল যতীন্দ্রনাথের কাব্যের উপর তা ছায়া ফেলেছে। যে কবিরা অজানা 'সুদূরের পিয়াসী', সৃষ্টির আনন্দ ও মঙ্গলেই যারা বদ্ধদৃষ্টি, 'উদাসীন আর সবা পরে', 'আঁখি না মেলেই সে ভাগ্যবান পড়ে আলোকের প্রেমে'— তাদের প্রতিনিধি তিনি করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। যে কবির কাব্যসৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্যে মানুষ ও প্রকৃতির সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার, সুন্দর ও ভীষণতার সকল সুরই বেজেছে। যে কবির কাব্য থেকে অতীন্দ্রিয় রসের দীপ্ত প্রকাণ্ড অধ্যায়টা সম্পূর্ণ ছেঁটে দিলেও কবি মহাকবিই থেকে যান। যাঁর বিশাল কাব্য সৃষ্টিকে প্রকৃতির সৃষ্টির মতোই কোনও তত্ত্বের কৌটায় পুরে রাখা যায় না। ফলে যখন যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার *রসে বিরুদ্ধরসের সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন তখন সে চেষ্টা প্যারডিরই গা ঘেঁষে গেছে। যেমন শরৎ ও সোনার তরী কবিতায়। অথচ যখন দ্বিজেন্দ্রলালের মামুলি গঙ্গাভক্তির প্রতিস্তোত্রে* যতীন্দ্রনাথ লিখলেন,

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী,
যুগে যুগে নরনারী-অফুরাণ-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

তখন তা কাব্য হয়ে উঠেছে। কারণ তার মূল প্রতিবাদ নয়, অনুভূতি। যদিও "হিমগিরি-নির্ঝরে' গঙ্গার উৎপত্তি খাঁটি materialist সত্য। কিন্তু কাব্যেব কল্পনা তত্ত্বের শাসন মানে না; না বস্তুতান্ত্রিক না ভাবতান্ত্রিক তত্ত্বের।

৩

'সায়ম্' থেকে কাব্যের সুর বদলের মানসিক পরিবর্তনের তত্ত্ব কবি এই সংগ্রহেব প্রথম কবিতা "গন্ধধারা"'য় ব্যক্ত করেছেন।

যে-সুখ বেলি ও চামেলি গন্ধে,
অবশ করিছে এ নাসারন্ধ্রে,
যে-সুখ কাঁপিছে এ মোর ছন্দে—
তা যদি মিথ্যা হয়,
যে দুঃখ তবে হৃদয়ে হৃদযে
তুষানল সম ধোঁয়াইয়া দহে,
যেদুখ বীণাব ছেঁড়া তাব বহে,
কেন তা মিথ্যা নয়?

কিন্তু এ হচ্ছে তত্ত্বান্বেষীব বুদ্ধির গবেষণা, কবির অনুভূতিব প্রকাশ নয়। এ কবিতার অন্যত্র সে অনুভূতির যে প্রকাশ—

গোলাপে কমলে ডাঁটায় ডাঁটায়
সে ব্যথা শিহরে কাঁটায় কাঁটায়
সেই ব্যথা ফুটে' পাপড়িব পুটে,
হয়ে ওঠে সৌবভ—

'আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'বে গোলাপ হয়ে উঠবে'-র বিলম্বিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
"ও অশথ" কবিতায় কবি যখন অশ্বত্থকে জিজ্ঞাসা করেন—

ফাল্গুনের ভাঙা হাটে
সেদিনও পাইনিরে তোর
অগোণা গাঁঠে গাঁঠে
বয়সের গাছ কি পাথর;
বয়সের সেই গহনে
চকিতে মন উদাসি'

বাজাল কেমন ক্ষণে

কে কিশোর এমন বাঁশি?

তোর অঙ্গভরা জীর্ণজরা

শ্যামে শ্যামে শ্যামময়।

তোর পক্ষে বসা পাতাখসা

জীবন হ'লো মধুময়!

কেমন করে এমন হয়?

* * *

ফিরে সেই ঝরু ঝরু

চলে নাচ দিনে রেতে

পুরানোর পাঁজর বাজে

নতুনের পাঁয়জোড়েতে।

তখন রসের আনন্দে মন ভরে। কিন্তু এ সুর বাংলা কাব্যের অতি পরিচিত রবীন্দ্রনাথের সুর। যতীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ পৃথক করে এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

সে ঋষি-কবিরা পৃথিবীর ধূলিকে মধুময় দেখেছিলেন, সৃষ্টির মূল সত্তাকে তাঁরাই জেনেছিলেন 'ভীষণং ভীষণানাম্'। তাঁরা রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখার আর্ত প্রার্থনা জানিয়েছেন, বাম মুখ যে ভ্রূকুটি-করাল তা জানতেন। যতীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি যখন রুদ্রের বামার্স্যের হিপ্‌নটিজম্ মুক্ত হয়ে প্রসন্ন দক্ষিণ মুখের উপরেও পড়ল তখন তাঁর কাব্যানুরাগীদের এ আশা অস্বাভাবিক নয় যে তাঁর কাব্যে বেদনা-আনন্দের, আলো-অন্ধকারের যুগলমূর্তির কোনও অপূর্বরূপ ফুটে উঠবে। কিন্তু এই শেষের কবিতাগুলিতে সে আশা পূর্ণ হয় না। কবির সৃষ্টি পাঠকের আকাঙ্ক্ষার ফরমাশি পথে চলে না। কিন্তু এ কবিতাগুলির নানা রস ও বহু রং পাঠককে মুগ্ধ করবে। কবি যৌবনে কঠোর দুঃখের যে কঠিন মূর্তি সৃষ্টি করেছিলেন তা যদি দগ্ধ হয়ে থাকে তার ভস্মের আগুন এর বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

এ সংগ্রহের একটি কবিতা কারও চোখ এড়াবে না। "খোলা কথা"— প্রেমিক স্বামীর প্রতি সতী-সাধ্বী স্ত্রীর উক্তি।

শুধালে তো কহি প্রিয়,

অপরাধ নাহি নিও,

যৌবন গেছে—গেছি বেঁচে।

তোমার প্রেমের ভার

দিবা রাতি বহিবার

গুরুদায় আজ ফুরায়েছে।

* * *

সেই যৌবন মম
সেই প্রেম, প্রিয়তম,
চ'লে গেছে তুমি কাঁদো তাই।
আমি যে বেঁচেছি প্রিয়,
দু'পায়ের ধূলা দিও
তারে আর ফিরিয়া না চাই।

ছন্দে গাঁথা সত্যের ভীষণতায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কয়েকটি কবিতা টপিকাল। আশ্চর্য টপিকাল। "দরিদ্র নারায়ণের" কথাবস্তু পলিটিশ্যানরা যাকে বলেন 'রেফুজি প্রবলেম'।

এবার সেবার সুবর্ণযোগ
ধ্বনিত দিক্ দিগন্ত
দ্রাবিড় বেলুড় মাড়োয়ার হ'তে
ছুটিছে পুণ্যবন্ত।
যে যেমন পায় কুড়িয়ে নে যায়
পতিতোদ্ধার-পরায়ণ;
বাংলায় আর নর মেলা ভার,
যা আছে সেরেফ নারায়ণ।

ব্যঙ্গ! জমাট বাঁধা তপ্ত চোখের জল।
স্বাধীনতোত্তর দেশে 'তিন চোরের' ছড়া—

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর যারা,
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে—
সেয়ানা স্বদেশী তারা।
যে চুরিতে ভাই জেলখাটা নেই
না আগে না পশ্চাৎ;
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।

বদল সুরের শ্রেষ্ঠ কবিতা দিয়ে শেষ করি।

দেখা দাও দেখা দাও
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।

তুমি র'য়ে গেলে দেখার অতীত
সব কিছু তাই দেখি কুৎসিত,
দেখার এ দোষ যাবে না যদি না
দেখা দাও।
অপরূপ রূপ আঁখির সমুখে
আপনি যদি না ফুটে
অপরের ডাকা নামে বারে বারে
ডাকিতে কি মন উঠে?

* * *

কণ্ঠে তোমার— যে মালা দুলাই
হয় তা শুষ্ক ম্লান,
যে ধূপেই তোমা করি গো আরতি
ভস্মে সে অবসান।
এ জ্বালা আমার যায় না কিছুতে
তাই ছুটি মরীচিকার পিছুতে
সারা জীবনের নয়নাশ্রুতে
চির সুন্দর, দেখা দাও।

(দেখা দাও)

সন্দেহ নেই আলো নেবার আগে চির-সুন্দর কবিকে দেখা দিয়েছিলেন।

১৩৬৪

বঙ্গ-প্রসঙ্গ: সুশীল রায় সম্পাদিত

বাংলা গদ্যসাহিত্যের বয়স বেশি নয়। খ্রিস্টাব্দের উনিশ শতকের প্রারম্ভ ওর জন্মকাল বললে খুব ভুল হয় না। অবশ্য জন্মের আগেও জন্মাবার প্রস্তুতি আছে। দীপ জ্বালার পূর্বে সলতে পাকাবার কাল। সে সময়টা বাদ দিচ্ছি। এই অল্পকালের মধ্যে বাক্য-বচনা-রীতির সৌকর্য, তার শব্দসম্ভার, সূক্ষ্ম ও জটিল ওজঃ ও গভীর সবরকম ভাবপ্রকাশের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য বাংলা গদ্যকে যে পরিণত সমৃদ্ধি দিয়েছে তা বাঙালির আনন্দের উৎস। প্রতিভাশালী ও মহাপ্রতিভাশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাবের সৌভাগ্যে তা সম্ভব হয়েছে।

জন্ম থেকে অর্ধ শতাব্দীর কিছু বেশি সময় অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস বচনা আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত, বাংলা গদ্যসাহিত্য রসসৃষ্টির সাহিত্য ছিল না। সে রকমের সাহিত্য তখন যা লেখা হয়েছিল ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া তার বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য দিতে সাহিত্যরসিকেরা সম্ভব রাজি হবেন না। সে সময়ের যা বড় সাহিত্য তা ছিল চিন্তা-প্রকাশের সাহিত্য। ইউরোপের নব বিদ্যা ও নূতন শক্তিমান ভাবধারার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে ধর্মে সমাজে শিক্ষায় আচরণ ও ব্যবহারে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সে সাহিত্য ছিল মুখ্যত তার প্রতিক্রিয়া। আলোচনার সাহিত্য, বিচারের সাহিত্য। কিছু বড় পুথি লেখা হয়েছিল। কিন্তু সে আলোচনা ও বিচার প্রধানত লেখা হয়েছে প্রবন্ধের আকারে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সে যুগের নাম দেওয়া চলে 'প্রবন্ধ-সাহিত্যের যুগ'।

সে প্রবন্ধ-সাহিত্যের যেগুলি শ্রেষ্ঠ রচনা তাদের সাহিত্যিক আকর্ষণ আজও লোপ হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের কাছেই নয়, তারা শিক্ষিত সাধারণ পাঠকের চিন্তাকে সচল করে সাহিত্য-পাঠের আনন্দ দেয়। বর্তমানকালের বাঙালি পাঠক, বিশেষ বাংলার লেখকদের সঙ্গে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের নিকট-পরিচয় আজ একটা বড় প্রয়োজন। বর্তমানের বাংলা গদ্য বাক্য-গড়নের সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে সংস্কৃত ও দেশজ শব্দের সুষ্ঠু মিশ্রণে এক মহিমময় লঘু গতিছন্দ পেয়েছে। সাধারণ গুণী লোকের পক্ষেও বাংলা গদ্যের এই মনোরম ভঙ্গিটি গড়ে তোলা দুঃসাধ্য নয়। এবং তা গড়ে তোলার আকর্ষণ প্রবল। বিস্ময়ের কথা নয় যে, আমাদের হালের প্রবন্ধ-সাহিত্যে ভাবের চেয়ে ভঙ্গি বেশি। চিন্তার অভাব পূরণ করতে চাচ্ছে ভাষার চাতুরি। সে চেষ্টায় যা লেখা হচ্ছে তার নামকরণ হয়েছে 'রম্যরচনা'। অর্থাৎ যে রচনার পোশাকটা ছিমছাম। সে পোশাক কীরকম শরীর ঢেকে আছে তা দেখার প্রয়োজন নেই। কোন ভদ্রলোক সেটা দেখতে চায়! বক্তব্য বিশেষ কিছু না থাকলেও চলে, যদি বলার কায়দাটা মনের চামড়ার উপর সুড়সুড়ি দেয়।

এই শৌখিন সাহিত্য-রচনার লোভ ও পড়ার আসক্তির একটা প্রতিষেধক আমাদের

প্রাচীন প্রবন্ধ-সাহিত্যের চিন্তার গভীরতা ও সূক্ষ্মতা; ও যাকে ইংরেজিতে বলে high seriousness তার সঙ্গে পরিচয়। সেসব লেখা এখন সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাতে পাওয়া তার ব্যবস্থা প্রয়োজন। তার শ্রেষ্ঠ উপায় এসব প্রবন্ধ বেছে বেছে নানা সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রকাশ। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য নয়, শিক্ষিত সাধারণ পাঠকের জন্য।

শ্রীসুশীল রায় সম্পাদিত 'বঙ্গ-প্রসঙ্গ' বইখানিকে সেইজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বইখানি নানা লেখকের প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ। সংগ্রহ কোনও বিশেষকালে আবদ্ধ নয়। রামমোহন রায়ের ১৮২১ সালে লেখা প্রবন্ধ থেকে বিনয়কুমার সরকারের লেখা প্রবন্ধ পর্যন্ত বহু লেখকের লেখা এতে সংগ্রহ হয়েছে। যে সকল পাঠক এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধ প্রথম পড়বেন তাঁরা সম্ভব চমৎকৃত ও বিস্মিত হবেন। যেসব ভাব ও চিন্তাকে আমরা মনে করি আধুনিক, অনাধুনিক কালে তাদের গভীর মর্মস্পর্শী আলোচনায়। বাংলা গদ্যের যে লঘু ছন্দকে আমরা মনে করি সেদিনের সৃষ্টি, বহুদিন পূর্বে তার আবির্ভাব ও সৌকর্য দেখে।

এ সংগ্রহের প্রবন্ধগুলির স্বতন্ত্র উল্লেখ সম্ভব নয়, আর তার প্রযোজনও নেই। পাঠকেরা এ প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখবেন সেই আশায় ও ভরসাতেই বইখানি প্রকাশ হচ্ছে। তবে এ কথা নিশ্চয় বলা যায় এ প্রবন্ধগুলি পড়তে আরম্ভ করলে পাঠকের মন ক্লান্ত হবে না, কখনও ঝিমিয়ে পড়বে না। নানা সময়ের নানা লেখকের নানা বিষয়ের প্রবন্ধগুলির এমনি বৈচিত্র্য।

অনেকগুলি প্রবন্ধ বাংলা ভাষা নিয়ে। রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলার ভাষা', কেশবচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গালা ভাষা', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার সাহিত্য', যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা', স্বামী বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা'। এর কতকগুলি অনেকে পূর্বে পড়েছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধগুলি বহুবার পড়লেও মন প্রতিবার চিন্তার উদ্দীপনার ও সাহিত্যপাঠের আনন্দের দোল খাবে। কেশবচন্দ্রকে যাঁরা নবধর্ম-প্রবর্তক ও সমাজসংস্কারক বলেই জানেন, বিবেকানন্দকে কেবল মহাযোগী রামকৃষ্ণের সহকর্মী বীর্যবান শিষ্য বলে জানেন, 'সুলভ সমাচার' থেকে সংগ্রহ কেশবচন্দ্রের লেখাটি ও 'উদ্বোধন' থেকে উদ্ধৃত স্বামীজির চিঠিটি তাঁদের বিস্মিত করবে। ও দুটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করার লোভ কষ্টে দমন করলেম। ভক্তদের একাধিপত্য লোপ করে বাঙালি সাহিত্যিকদের ও-দুজনকে নিজের বলে দাবি করার সময় হয়েছে।

ভূমিকা আর বাড়াব না। এ সংগ্রহকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৩৬৫

গ্রন্থ-পরিচয়

শিক্ষা ও সভ্যতা

প্রথম সংস্করণ আশ্বিন ১৩৩৪। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃ. ৮ + ১৪৮। মূল্য ১.৫০।

উৎসর্গ: ' পিতৃদেবের স্মরণে

মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন—

> এ বই-এর প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগ 'সবুজপত্রে', আর বাকি কয়েকটি কয়েকখানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সবুজের হিন্দুয়ানি' প্রবন্ধটি নবপর্যায় 'সবুজপত্রের' প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা। উপলক্ষের উপযোগী আকারটি বদলালে বক্তব্য বহাল থাকলেও রসটা ঠিক থাকে না দেখে ওর সে আকারটি আর বদলাইনি। প্রবন্ধগুলিকে পুথিতে গেঁথে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা উচিত হল, না পুরনো মাসিক-সাপ্তাহিকের স্তূপের মধ্যে বিস্মৃতির কবর দেওয়াই সমীচীন হত তাতে অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে, 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্'।
>
> আশ্বিন ১৩৩৪ — শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কাব্যজিজ্ঞাসা

তৃতীয় সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৪১১। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা। পৃ. ৮০। মূল্য ২২.০০

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩৫

ভূমিকা অংশে লেখক লিখেছেন—

> ১৩৩৩ সালের সবুজ পত্রে কাব্যজিজ্ঞাসা নামে আমার যে-কয়েকটি প্রবন্ধ-প্রকাশ হয়েছিল, এ বইখানি, উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন না করে, সেই প্রবন্ধগুলির একত্র সংগ্রহ মাত্র।
>
> এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত-অবলম্বনে কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল প্রসঙ্গের আলোচনার চেষ্টা করেছি। বইখানি আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আলংকারিকদের মতবাদের সমষ্টি নয়। কারণ, প্রায় প্রতি বিষয়ে নানা আলংকারিকের নানা মত; কিন্তু এ গ্রন্থে কেবল সেই-সব মত ও কথা উদ্ধৃত ও আলোচনা করেছি, যা আমার নিজের মনে লেগেছে। বিরুদ্ধ মতের যেখানে উল্লেখ করেছি, সে কেবল গ্রাহ্য মতকে পরিস্ফুট করার জন্য।
>
> বলা হয়তো বাহুল্য যে, কাব্য সম্বন্ধে আলংকারিকদের যত-সব আলোচ্য বিষয় ছিল, তার সকলগুলি আমার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের এ যুগের লোকের মনে কাব্য সম্বন্ধে যে-সব প্রধান জিজ্ঞাসা— এ গ্রন্থে কেবল তারই আলোচনা করেছি। আলংকারিকেরা এমন অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন, যাতে আমাদের কোনও কৌতূহল নেই। কারণ, কালভেদে কেবল মীমাংসার পরিবর্তন ঘটে না, প্রশ্নেরও বদল হয়। কিন্তু কাব্যবস্তু এক বলে যে-সব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উঠেছে, তার অনেকগুলিই অনেক আলংকারিকের মনেও

উঠেছিল, এবং কোনও কোনও আলংকারিক তাদের যে বিচার ও মীমাংসা করেছেন, তা বিশ্লেষণের নিপুণতায় ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় কাব্যতত্ত্বের প্রাচীন বা নবীন কোনও আলোচনার চেয়ে কম উপাদেয় নয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের সেই বিচার ও মীমাংসার কিছু পরিচয় দিতে এই গ্রন্থে প্রয়াস করেছি। সেজন্য তাঁদের নানা স্থানে ছড়ানো মত ও কথাকে একসঙ্গে সাজিয়ে গাঁথতে হয়েছে, যার সুতোটি আমার। মাঝে মাঝে তাঁদের কথাকে প্রাচীন পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে হালের পোশাকও পরাতে হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানত তাঁদের মত ও কথাকে বিকৃত করে আধুনিক মত ও কথার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করিনি। যদি তাঁদের কথা ও মত পাঠকের কাছে খুব আধুনিক রকমের বলে মনে হয়, তার কারণ, আমরা আধুনিকেরা যে-প্রশ্নের যে-প্রণালীতে বিচার করছি, প্রাচীন আলংকারিকেরাও সেই প্রশ্নের ঠিক সেই প্রণালীতে বিচার করেছিলেন। তাঁদের পরিভাষা ও প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য এক।

উল্টো রকমের সন্দেহের বিরুদ্ধে দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ গ্রন্থে আলংকারিকদের সংস্কৃত বচন ক্রমাগত তুলেছি, সংস্কৃত কবিদের কাব্য থেকে বহু উদাহরণ নিয়েছি— বেশির ভাগ আলংকারিকদের দেওয়া, কতক আমার নিজের। এ থেকে যদি কেউ সন্দেহ করেন যে, এ গ্রন্থের আলোচিত কাব্যতত্ত্ব কেবলমাত্র সংস্কৃত কবিদের কাব্যের তত্ত্ব, এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বাইরে সে তত্ত্বের কোনও প্রয়োগ নেই— তবে আশ্চর্য হওয়া হয়তো অনুচিত; যদিচ ইংরেজ কাব্যসমালোচকদের ইংরেজি বচন তুলে ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে উদাহরণ দিয়ে লিখলে এ সন্দেহ কারও হত না যে, মীমাংসাগুলি কেবল ইংরেজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য, আর কোনও কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে নয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের যে-সব কথা ও মতামতের আলোচনা করেছি, তা যদি সকল কাব্যসাহিত্যে সমান প্রযোজ্য না হত, তবে সেগুলি হত প্রত্নতাত্ত্বিকের আলোচ্য এবং আমাদের মতো 'অ্যামেচিয়র'-এর বিভীষিকা। তাঁদের আলোচনা ও মীমাংসা বিশ্বজনীন, ও সকলকাব্যসাধারণ— এই বুদ্ধি ও বিশ্বাসেই তার পরিচয় দিতে উৎসাহিত হয়েছি। যদি সে পরিচয়ে পাঠকের অন্য রকম ধারণা হয়, সে ত্রুটি আমার, সংস্কৃত আলংকারিকদের বা কবিদের নয়। মানুষ বিশেষকে পরীক্ষা করেই সাধারণকে পায়, কারণ সাধারণ হচ্ছে যা নানা বিশেষের মধ্যে সাধারণ। সেজন্য সকল বিশেষকে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, এবং তা অসম্ভব। যার দৃষ্টি আছে সে একটি বিশেষকে পরীক্ষা করেই সাধারণকে ধরতে পারে। সংস্কৃত কবিদের কাব্যে যদি কাব্যত্ব থেকে থাকে, আর সংস্কৃত আলংকারিকদের যদি তত্ত্বদর্শিতার অভাব না থেকে থাকে, তবে বিশ্বসাহিত্যের খবর না রেখেও, আলংকারিকদের সকল কাব্যের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের মধ্যে সন্দেহর কিছু নেই। যেমন ইংরেজ সমালোচকেরা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের কোনও খবর না রেখেও সকলকাব্যসাধারণ কাব্যত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যারিস্টটল 'পোয়েটিক্স' লিখেছিলেন, কিন্তু গ্রিক কাব্যসাহিত্য ছাড়া আর কোনও কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। সবুজ পত্রে যখন এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি প্রকাশ হয়, তখন দু'-একজন পণ্ডিত লোক তাদের আলোচনার বিশ্বজনীনত্বে সন্দেহ করেছিলেন— তাই এ কথাগুলি বলতে হল।

এ গ্রন্থে দুজন আলংকারিকের লেখার উপরে প্রধানত নির্ভর করেছি— আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত। এঁরা দুজনেই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। আনন্দবর্ধন সম্ভবত খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগের লোক। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোক গ্রন্থের 'বৃত্তি' অংশের লেখক। ধ্বন্যালোক গ্রন্থখানি অন্যান্য অনেক অলংকারের পুথির মতো কারিকা ও তার বৃত্তির সমষ্টি। এই কারিকা ও বৃত্তি সাধারণত হয় এক লেখকের লেখা। লেখক কারিকায় বক্তব্য সংক্ষেপে বলে বৃত্তিতে তার আলোচনা করে তাকে বিশদ করেন। কিন্তু সহজেই প্রতীতি

হয় যে, ধ্বন্যালোকের কারিকার শ্লোক ও বৃত্তির আলোচনা এক লোকের লেখা নয়। এই বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন 'ধ্বনিবাদ'-এর মতটিকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু কারিকার শ্লোকগুলিতে কোনও বিশেষ মত খুব শক্ত দানা বাঁধেনি। একটি পরম রসগ্রাহী মনের গভীর অনুভূতি এই কারিকাগুলিতে প্রকাশ হয়েছে। এর এক-একটি শ্লোক উজ্জ্বল দীপশিখার মতো পাঠকের মন আলোতে ভরে দেয়। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেই পাঠক তার অনেক উদাহরণ পাবেন। কিন্তু এই সহৃদয় লেখকের নাম পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত, এবং একাদশ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে সংস্কৃত আলংকারিক-সমাজেও অজ্ঞাত ছিল মনে হয়; কারণ, অনেক আলংকারিক আনন্দবর্ধনকেই কারিকার লেখক বলে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি। সম্ভবত বৃত্তিকার আনন্দবর্ধনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির নীচে এই রসজ্ঞ কারিকাকারের নাম চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু ধ্বনিবাদের ইমারতের অনেক পাণ্ডিত্যের ইট আজ খসে পড়লেও, এই কারিকাগুলির জ্যোতি অনির্বাণ রয়েছে। এই অজ্ঞাতনামা রসিকশ্রেষ্ঠের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করছি।

অভিনবগুপ্তের নিজের লেখা থেকেই জানা যায় যে, তিনি খ্রিস্টাব্দের দশম শতকের শেষ ভাগের ও একাদশ শতকের প্রথম ভাগের লোক। তিনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং শৈবদর্শন সম্বন্ধে নানা পুথি লিখে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর দুখানি প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে ধ্বন্যালোকের লোচন নামে টীকা, এবং ভরতনাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী নামে সুবিস্তৃত বিবৃতি বা ভাষ্য। আমার এই গ্রন্থে ধ্বন্যালোকের টীকা থেকেই অভিনবগুপ্তের মত ও লেখা তুলেছি। যে রসবাদ সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যজিজ্ঞাসার চরম মীমাংসা, অভিনবগুপ্ত তার সর্বপ্রধান আচার্য। যে তত্ত্ব পূর্বে অস্ফুট, অ-সুব্যক্ত ও অপূর্ণাঙ্গ ছিল, আচার্য অভিনবগুপ্ত তাকে অনবদ্যসর্বাঙ্গ রূপ দিয়ে রসিকসমাজে পরিস্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ পুথিতে ধ্বন্যালোকলোচন থেকে তাঁর যে-সব রচনা উদ্ধৃত করেছি, তা থেকেই পাঠক অভিনবগুপ্তের চিন্তার তীক্ষ্ণতা, বিশ্লেষণক্ষমতার নৈপুণ্য ও রসদৃষ্টির গভীরতার পরিচয় পাবেন। তাঁর অপর গ্রন্থ অভিনবভারতী এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি Gaekwad's Oriental Series-এ শ্রীযুক্ত মনবল্লী রামকৃষ্ণ কবি মহাশয় অভিনবভারতী সমেত ভরতনাট্যশাস্ত্র চার খণ্ডে প্রকাশ করছেন। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়েছে; এবং নাট্যশাস্ত্রের যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে রসের পরিচয় ও বিচার আছে, অভিনবগুপ্তের ভাষ্য-সহ সেই 'রসাধ্যায়' এই খণ্ডেই ছাপা হয়েছে। কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পক্ষে এটি আনন্দের সংবাদ। কিন্তু অভিনবভারতীর যে কয়খানি মূল পুথি কবি মহাশয় পেয়েছেন, তার একখানিও সম্পূর্ণ পুথি নয়, এবং সবগুলিই এত ভ্রমপূর্ণ যে, তা থেকে অনেক জায়গায় প্রকৃত পাঠ নির্ণয় অসম্ভব। কবি মহাশয় রহস্য করে বলেছেন যে স্বয়ং অভিনবগুপ্ত স্বর্গ থেকে নেমে এলেও এ-সব পুথি থেকে তাঁর মূলপাঠ উদ্ধার করতে পারতেন না। সে যা হোক, আমাদের মতো অপণ্ডিত লোকের কাজ ওতেই অনেকটা চলে। কারণ অভিনবগুপ্তের মনের কথাটা মোটামুটি ও থেকে ধরা যায়।

এই ভূমিকায় আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের যে দেশকালের খবর দিয়েছি, তা সংগ্রহ করেছি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে- প্রণীত *Studies in the History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে। সেজন্য তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। কৌতূহলী পাঠক সুশীলবাবুর গ্রন্থে ওই দুই আলংকারিকের আরও কিছু পরিচয় পাবেন।

আমার এই ক্ষুদ্র পুথিখানি বাঙালি রসিক ও ভাবুক-সমাজে উপস্থিত করে প্রার্থনা করছি যে, আমাদের দেশের নবীন ও প্রাচীন রসজ্ঞদের মধ্যে চিত্তের যোগ স্থাপিত হোক।

আশ্বিন ১৩৩৫

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

নদীপথে

আনন্দ সংস্করণ মাঘ ১৪১৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। পৃ. ৬২। মূল্য: ৬০.০০

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৪৪। বিশ্বভারতী
প্রথম আনন্দ সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯১
প্রচ্ছদ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
অলংকরণ: পরিতোষ সেন
উৎসর্গ: শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী/কল্যাণীয়াসু
ভূমিকায় আছে—

> পর-পর তিন বড়দিনের ছুটিতে বাংলা ও আসামের নদীতে বেড়াবার সময় স্টিমার থেকে যে-সব চিঠি লিখেছিলাম, কিছু রদবদল করে সেগুলিকে ছাপানো গেল এই ভরসায় যে, পাঠক-সাধারণকেও তা কিঞ্চিৎ আনন্দ দিতে পারে। ইতি
>
> আষাঢ় ১৩৪৪ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

জমির মালিক

প্রথম প্রকাশ : ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃ. ২৮। মূল্য· আট আনা
উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী/শ্রদ্ধাস্পদেষু

সমাজ ও বিবাহ

প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৫৩। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃ. ৪ + ৮৮। মূল্য ১ ৫০

ইতিহাসের মুক্তি

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪ নভেম্বর ১৯৫৭। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃ. ১১২। মূল্য: ২.৫০

প্রচ্ছদ-লিপি: জগদিন্দ্র ভৌমিক
উৎসর্গ : বাংলার নবীন ঐতিহাসিকগণকে/একজন সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের/এই অনধিকারচর্চা/উৎসর্গ করিলাম।

> এ বইয়ের প্রথম দুটি প্রবন্ধ— 'ইতিহাসের মুক্তি' ও 'ইতিহাসের রীতি'— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৫ সালের অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে প্রথমটি বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৬২ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় ও দ্বিতীয়টি ইতিহাস পত্রিকার ১৩৬১-৬২ সালের ফাল্গুন-বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।
>
> অন্য প্রবন্ধ দুটি 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' ও 'ইতিহাস' অনেক দিন পূর্বের লেখা। প্রথম প্রবন্ধটি 'সবুজপত্রের' ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ও দ্বিতীয়টি 'বিচিত্রা'র ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক বিষয়ে চিন্তা ও ভাবের সমতার জন্য ও দুটি প্রবন্ধ এ.বইয়ে ছাপানো হল।
>
> ভাদ্র ১৩৬৪ অতুলচন্দ্র গুপ্ত

নির্দেশিকা